

ଆଜ୍ଞାନ-ଶାରୀମର ବିଧାନ
ଅଳ୍ପକିଳ ଜ୍ଞାନିକ୍ୟାତ ପ୍ରକୃତି

ଆଜ୍ଞାନ ଶାରୀମର ବିଧାନ

ড. ହିତେଜୁଦ୍ଦିନ ଆଜାନ-କାନ୍ତାରି

শান্তি শান্তিমের বিধীণ

ড. হউসুফ আল-কারয়াবি

বই : হালাল-হারামের বিধান

লেখক : ড. ইউসুফ আল-কারয়াবি

ভাষাস্তর : আসাদুল্লাহ ফুয়াদ

সম্পাদনা : সমকালীন সম্পাদনা পরিষদ

বানান ও ভাষারীতি : মাহবুবুর রহমান, যাহিদ আহমাদ, ওমর আলফারুক

প্রচ্ছদ : সমকালীন গ্রাফিক্স টিম

ଶାଖାଳ ଶାନ୍ତିମେନ୍ଦ୍ର ବିଧାନ

କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରକାଶନ

হালাল-হারামের বিধান

ড. ইউসুফ আল-কারয়াবি

প্রথম প্রকাশ

নভেম্বর ২০২২

গ্রন্থসূত্র

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

মুদ্রণ

সুরবর্ণ প্রিন্টিং এন্ড প্রেস

১৩৫/১৪৪, ডি.আই.টি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুর, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০১৮০৯-৩০৪০৫০

একমাত্র পরিবেশক

লেভেল আপ পাবলিশিং

১১/১, পি কে দাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

ISBN: 978-984-96823-1-8

Published by Somokalin Prokashon Limited, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 890.00 US \$25.00 only.

 সোমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৮০৯-৮০০-৯০০



প্রকাশকের কথামালা

মুসলিম-জীবনে হালাল-হারামের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন এবং নিষেধ পরিহারের সমষ্টিত রূপই তো মুসলিম-জীবন। কালে কালে তাই ইসলামের করণীয় বর্জনীয় বিষয়ে অসংখ্য বইগুলি রচিত হয়েছে। হালাল-হারাম বিষয়ে বিশ্বজুড়ে সমাদৃত বইটি লিখেছেন ড. ইউসুফ আল কারযাবি রাহিমাহুল্লাহ।

ড. ইউসুফ কারযাবি রাহিমাহুল্লাহর নাম শোনেনি এমন মুসলিম খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তার কাজ তাকে এনে দিয়েছে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি। হালাল-হারাম তার সবচেয়ে বিখ্যাত বই। জীবন থেকে নেওয়া উপমা, উপস্থাপনের সারল্য, সর্বাধুনিক বিষয়াবলির সম্বিশে আর জনসাধারণের উপযোগী বিশ্লেষণ এই বইয়ের সুত্র। এই বইয়ের পাঠকপ্রিয়তার মূল রহস্য—বইটি সহজ এবং সবার জন্য উপযোগী। তাই প্রকাশের পর থেকে অদ্যাবধি চলমান রয়েছে এর পঠন-পাঠন ও বিশ্লেষণ। বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে এ বই; ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে।

হালাল-হারাম তথা প্রাত্যহিক মাসআলা-মাসায়িল নিয়ে রচিত হয়েছে অগুনতি বই। নিউনেমিতিক করণীয় বর্জনীয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ফিকহশাস্ত্র। হালাল-হারাম-বিষয়ক বাকি কিতাবাদি প্রাচীন অ্যাকাডেমিক পদ্ধতিতে রচিত হওয়ায় সেগুলো জনসাধারণের তুলনায় স্কলারদের জন্য বেশি উপযোগী। ড. ইউসুফ কারযাবির হালাল-হারাম এক্সেত্রে ব্যক্তিক্রম। এটি তিনি রচনাই করছেন সাধারণ মানুষের জন্য। প্রকাশের পরপর তাই সাধারণ মানুষ সাদরে গ্রহণ করে নেয় এ বই।

হালাল-হারামের বিধান

মানবরচিত অন্যান্য বইয়ের মতো এ বইয়েও কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। এছাড়াও দেশীয় প্রেক্ষাপটে বইয়ে বর্ণিত মাসআলাগুলোর সূরূপ বুঝতে প্রয়োজন অনুপাতে আমরা কিছু টীকা যুক্ত করেছি। এতে করে পাঠক বইয়ের মূল বস্তু আরো সহজে বুঝতে পারবেন বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। পরিশেষে সবার জন্য প্রয়োজনীয় এমন একটি বই প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি। যাদের শ্রমে সম্মুখ এ বই, আল্লাহ তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন, আমিন।

প্রকাশক

সমকালীন প্রকাশন





অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই। যিনি ইসলামকে পূর্ণজ্ঞ দ্বীন হিসেবে আমাদের জন্য মনোনীত করেছেন। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার-পরিজন এবং সাহাবা রায়িয়াল্লাহু আনহুমের ওপর।

মুসলিম-জীবনে হালাল-হারাম তথা বৈধ-অবৈধ-বিষয়ক জ্ঞানার্জন অপরিহার্য একটি বিষয়। প্রতিটি কাজের আগে একজন মুসলিমকে ভাবতে হয়—কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ না অবৈধ? এর জন্য আল্লাহর কাছ থেকে আমি প্রতিদান পাব না শাস্তি? ড. ইউসুফ কারযাবির হালাল-হারামের বিধান এ বিষয়ে দিকনির্দেশক, বহুল পঠিত ও সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ।

বইটির গুরুত্ব ও অবস্থান বোঝা যায় আরববিশ্বের প্রখ্যাত আলিম আব্দুল আযিফ ইবনু বায রাহিমাহুল্লাহর একটি চিঠি ও তার উত্তরে প্রদত্ত গ্রন্থকার কারযাবি রাহিমাহুল্লাহর চিঠির কিছু অংশ থেকে—

...সৌদি আরবের তথ্যমন্ত্রণালয় পক্ষ থেকে ‘গবেষণা, ইফতা, দাওয়াহ ও ইরশাদ পরিষদে’ আপনার হালাল-হারাম বইয়ের একটি কপি (নবম সংস্করণ—১৯৭৫) পাঠানো হয়েছে।

যাচাই-বাছাইয়ের পর পরিষদের কাছে মনে হয়েছে, আধুনিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়ে আপনি আলোচনা করেছেন। রচনাটির পেছনে আপনি যে বিপুল

হালাল-হারামের বিধান

শ্রম ও দীর্ঘ সময় দিয়েছেন তা সত্যি খুব প্রশংসাযোগ্য।

আমাদের গবেষণা পরিষদ আপনার বইটির বেশ কিছু কপি কিনতে ইচ্ছুক। এতে কল্যাণের প্রচার প্রসারের পাশাপাশি প্রকাশনা বাবদ খরচের বোৰা লাঘবেও আমরা আপনার অংশীদার হতে পারব। তবে নিম্নে উল্লিখিত মাসআলাগুলো পুনর্বিবেচনার পরই সেটা হতে পারে—

এক. অমুসলিমদের সঙ্গে বন্ধুত্বের বৈধতা। দুই. ধূমপান হারাম নয়। তিনি. দাড়ি মুণ্ডানো বিষয়ে মাকরুহের মতকে প্রাধান্য দান এবং পূর্ববর্তীদের বিষয়ে এই দাবি— তারা দাড়ি রেখেছেন অভ্যাসবশত, আবশ্যক হিসেবে নয়। চারি. বৈদ্যুতিক শকে মারা যাওয়া প্রাণীর আমদানীকৃত মাংসের বৈধতা। পাঁচ. গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে নারীর চেহারা উন্মোচন। ছয়. চেহারা ও হাত খোলা রাখার বৈধতা। সাত. গান ও বাদ্যযন্ত্রের বৈধতা। আট. দাবা খেলার বৈধতা।

পাশাপাশি জানিয়ে রাখছি, উল্লিখিত আটটি বিষয়ের সবগুলোকে আমি হারাম বলে বিশ্বাস করি। অতএব আমি মনে করি, বিষয়গুলো নিয়ে আরো গবেষণা এবং প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি বিশ্লেষণে আরো সময় দেওয়া অপরিহার্য। আপনার অবগতি এবং শরিয়তের প্রমাণাদির আলোকে ভুলগুলো সংশোধনে সহায়তার জন্য এই বিষয়ে শাইখ সালেহ আল-ফাওয়ানের লেখা একটি বইও আপনার কাছে পাঠানো হচ্ছে।

আপনার রচনার গুরুত্ব ও ভালো দিক অনেক। কারণ এখানে তথ্যের সঙ্গে দিকনির্দেশনাও যুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি আমি দ্বিনের প্রতি আপনাদের আবেগ এবং দাওয়াতের দূরদৃশ্য ভারসাম্যের কথাও জানি। তাই যত দ্রুত সম্ভব পরিমার্জিত ও প্রয়োজনীয় সংযোজনসহ দশম সংস্করণটি হাতে পাব বলে আশা করছি। এতে আমরা বিশালসংখ্যক বই কেনায় অংশ নিয়ে কল্যাণের প্রচার প্রসারের সহযোগী হতে পারব, ইনশাআল্লাহ [১]

এর উত্তরে সংক্ষিপ্ত চিঠিতে জবাব দিয়েছেন ড. ইউসুফ কারযাবি রাহিমাহুল্লাহ। আমরা সেখান থেকেও কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। তাহলে বইটি রচনার প্রেক্ষাপট ও কাদের জন্য লেখা হয়েছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

[১] আল হালালু ও ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা : ৪১১-৪১২

অনুবাদকের কথা

৯

...এই আটটি মাসআলায় ভিন্নমতকে প্রধান্য দেওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হলো
বহুটি লেখা হয়েছে মূলত অমুসলিম দেশের প্রবাসী এবং সেখানকার নওমুসলিমদের
জন্য। তাই ইসলামের প্রতি তাদের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য আমি যথাসম্ভব শিথিলতা
বজায় রেখেছি।

তাছাড়া আমি আধুনিক ফিল্ম, দীন পালনের বাধা-বিপত্তিগুলো দেখেছি। বহু মানুষ
বিশেষত, যাদেরকে উচ্চশিক্ষিত বলা হয়, তাদের অধিকাংশই দীন থেকে বেরিয়ে
যাচ্ছে। এজন্য আমি মৌলিক বিষয়ে কঠোর কিন্তু শাখাগত বিষয়ে শিথিলপন্থি।
বিশেষত যেসব বিষয় বহুল প্রচলিত।

...এর দ্বারা আমি বোঝাতে চেয়েছি, যেখানে দুটি মত রয়েছে। একটি সতর্কতামূলক
অন্যটি শিথিল। সেখানে আমি শিথিল মতটিই গ্রহণ করেছি...।

...আপনাদের কাছে আমার চাওয়া এতটুকু—আপনাদের মন্তব্য যেন আমার বহুটি
সৌদি আরবে প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। আসলে দুনিয়াতে মানবরচিত
কোনো বই-ই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। প্রতিটি মানুষের কথাই কিছু গ্রহণীয় আর
কিছু বর্জনীয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো দৃষ্টিভঙ্গির শুধুতা। আর সমালোচনার দুয়ার তো
সবার জন্যই খোলা।

চিঠি ও তার উত্তর থেকে আমরা কিছু বিষয় জানতে পারলাম—

» এই বহুটিতে কিছু মাসআলায় সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যাগুলো সংশোধন করে
নিলে সেটা আরো উপকারী হবে।

» বহুটি গুরুত্বপূর্ণ এবং এখান থেকে নেওয়ার অনেক কিছু আছে।

» ইউসুফ কারযাবি রাহিমাহুল্লাহ বহুটি লিখেছেন ইউরোপ-আমেরিকায় প্রবাসী,
নওমুসলিম ও শিথিল মনোভাবের উচ্চশিক্ষিত দীনদারদের জন্য।

» তাই তিনি বিভিন্ন মাসআলায় শিথিল মতটি গ্রহণ করেছেন।

» কিন্তু তিনিই আবার সৌদির মতো রক্ষণশীল অঞ্চলেও বহুটির প্রচার-প্রসার
কামনা করছেন!

এই বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখলে হালাল-হারাম বহুটি নিয়ে আমাদের
পদক্ষেপগুলো বোঝা সহজ হবে, ইনশাআল্লাহ!

হালাল-হারামের বিধান

বাংলাদেশকে ইসলাম পালনের দিক থেকে একটি রক্ষণশীল দেশ বলেই আমরা মনে করি। এখানে অধিকাংশ মানুষ ধর্মে শিথিলতা পছন্দ করে না। আলিমদের সঠিক দিকনির্দেশনা মেনেই তারা দ্বীন পালন করে থাকেন। সমকালীন প্রকাশন লিঃ একটি ইসলামি প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান। অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে তারা এ দেশে লেখনীর মাধ্যমে দ্বীন প্রচারের কাজটি করে যাচ্ছেন। ইসলামের সঠিক বার্তাগুলো স্থান-কাল-পাত্রের কথা মাথায় রেখেই এখান থেকে প্রচার করা হয়। হালাল-হারাম বইয়ের ক্ষেত্রেও একই পন্থা অনুসরণ করা হয়েছে।

গ্রন্থকার ইউসুফ কারযাবি রাহিমাহুল্লাহ একজন বিদ্বৎ আলিম। মুজতাহিদ ইমামদের মতামত বাহাই করে সেই অনুযায়ী আমল করার সুযোগ ইসলামে রয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে লেখকের জন্য নির্দিষ্টভাবে মাযহাব মানার বাধ্যবাধকতা নেই। এই রচনায় তিনি সেই কাজটি করেছেন। নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুসরণ করেননি। প্রসিদ্ধ চার মাযহাব থেকে তার দৃষ্টিতে তুলনামূলক শক্তিশালী মতটি তিনি গ্রহণ করেছেন। এই সুযোগ কিন্তু অনভিজ্ঞ আলিম ও সাধারণ মানুষের জন্য নেই। বিশৃঙ্খলা এড়াতে এবং প্রবৃত্তির অনুকরণ থেকে বাঁচতে প্রসিদ্ধ চার মাযহাব থেকে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের অনুসরণই তাদের জন্য অধিক নিরাপদ।

ইবনু বায রাহিমাহুল্লাহর চিঠিতে উল্লেখিত বিষয়গুলোর জন্য এই রচনার বিরুদ্ধে আরববিশ্বে অনেক লেখালেখি হয়েছে। শাহীখ সালেহ আল-ফাওয়ান, শাহীখ আব্দুল হামিদ তাহমিয় সৃতত্ত্ব রচনা লিখেছেন। এছাড়া দারুল ইতিসাম থেকে প্রকাশিত সংস্করণটি এই বিষয়ে টীকাযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়।

এজন্য যেসব মাসআলায় তিনি অধিকাংশের মতামত বাদ দিয়ে সুন্নসংখ্যকের মতামত গ্রহণ করেছেন, সেখানে আমরা সাধ্যমত টীকা দিয়ে দিয়েছি। অধিকতর স্পর্শকাতর দু-একটি আলোচনা সতর্কতাবশত বাদ দিয়েছি।

কেউ অবশ্য বলতে পারেন দু-একটি বিষয় ছাড়া অধিকাংশ মাসআলায় পূর্ববর্তীদের কেউ না কেউ তো তার মতো মতামত পোষণ করেছেন। গ্রন্থকারও বিষয়টি ইবনু বাযের উত্তরে প্রদত্ত চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। এখানে একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বইটি লেখা হয়েছে কাদের জন্য? এটি লেখা হয়েছে সাধারণ মানুষের জন্য। আলিম বা বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়। পূর্ববর্তীদের এই বিচ্ছিন্ন মতামতগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থাকে। তাদের আয়ত্তে থাকে না। গবেষক আলিম

অনুবাদকের কথা



ছাড়া এগুলো নিয়ে কেউ তেমন একটা ঘাঁটাঘাঁটি করে না।

সহজ একটি উদাহরণ দিই, বাদ্যযন্ত্র বিষয়ে ইবনু হায়ম রাহিমাহুম্মাহর একটি ভিন্ন মত আছে। বাংলাদেশের একজন সাধারণ মুসলিম সুভাবিক অবস্থায় ‘মুহাম্মা’ খুঁজে ওই অংশ পড়তে যাবে না। কিন্তু কেউ যখন এই মতটি বই আকারে অনুবাদ করে প্রচার করবে তখন অবশ্যই সেটা একজন সাধারণ মুসলিমের হাতে পৌঁছবে। ফলে এর দ্বারা সে প্রভাবিতও হয়ে পড়তে পারে। হওয়াটাই সুভাবিক। যদিও প্রমাণের আলোকে তার মতটি দুর্বল ও অধিকাংশ আলিমদের কাছে অগ্রহণযোগ্য।

হালাল-হারামের মতো রচনার মধ্যে বিচ্ছিন্ন মতামতগুলো উল্লেখের সমস্যা এটাই। কারণ এগুলো সাধারণ মানুষের বই। এর মাধ্যমে এসব বিচ্ছিন্ন মতামত সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা টীকা-টিপ্পনিগুলো যুক্ত করেছি। এটা আমরা করেছি আমাদের ইলামি আমানত ও ইসলামি জ্ঞানচর্চার বিশুদ্ধ ধারাবাহিকতা জারি রাখার দায় থেকে।

পরিশেষে, মহান রবের নিকট প্রার্থনা, তিনি চমৎকার এই গ্রন্থটির যা কিছু কল্যাণকর তা থেকে আমাদের উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং এই বইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

আসাদুল্লাহ ফুয়াদ
৩ অক্টোবর, ২০২২



সম্পাদকীয়

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি মানুষকে সরলসঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য নায়িল করেছেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্যের মাধ্যমে উভয় জাহানে সফলতার জন্য দিয়েছেন হালাল-হারামের সুস্পষ্ট বিধান। অজস্র দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবি ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের ওপর, যাকে এ ধরণীতে প্রেরণ করা হয়েছে বিশ্বমানবতাকে চিরমুক্তির পথ দেখাতে, যার মাধ্যমে এসেছে চূড়ান্ত দীন আর পূর্ণতা পেয়েছে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থা।

ইসলাম এই মহাবিশ্বের একমাত্র অবিকৃত আসমানি দীন ও সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা। আল্লাহ তাআলার নায়িলকৃত শরিয়াহ-ব্যবস্থায় না আছে কোনো ত্রুটি আর না আছে কোনো ধরনের অপূর্ণতা। দেড় হাজার বছর ধরে এ ঐশ্বী দীন সংগীরবে মাথা উঁচু করে বিশ্বের সকল ধর্ম ও দর্শনের ওপর রাজত্ব করে আসছে। আল্লাহ তাআলার নায়িলকৃত পূর্ণাঙ্গ এ শরিয়াহ নিত্যনতুন সমস্যা ও উদ্ভৃত সব রকমের জটিলতার সবচেয়ে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ সমাধান দিয়ে যাচ্ছে। এখানেই মানবরচিত কিংবা বিকৃত আসমানি ধর্মের ওপর ইসলামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

ইসলামি শরিয়তের দুটি উৎসমূল তথা কুরআন ও সুন্নাহর বিধানগুলোর বেশিরভাগই মুহকাম তথা দ্ব্যর্থহীন। আকায়িদ, আহকাম ও ফাযায়িল—সব বিষয়েই রয়েছে ইসলামের সুস্পষ্ট ভাষ্য। ইসলামের মৌলিক বিষয়াদিতে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা ও মতানৈক্য নেই। তবে হ্যাঁ, শাখাগতভাবে দ্ব্যর্থবোধক কিছু বিষয় রয়েছে, যেখানে

সম্পাদকীয়



মতানৈকের সুযোগ আছে। অন্ন কিছু জায়গায় মতানৈকের এ সুযোগ রাখা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবেই। যেন মানুষের জন্য এসব ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কঠোরতার পরিবর্তে কিছুটা ছাড় থাকে।

হাদিস থেকেও এ কথাটির প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে যা কিছু হালাল করেছেন তা হালাল আর যা কিছু হারাম করেছেন তা হারাম। আর যা কিছু সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন সেগুলো হলো ছাড়। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তাআলার ছাড় গ্রহণ করো, কারণ আল্লাহ তাআলা বিস্মৃতিপ্রবণ নন। তারপর তিনি কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيئًا ([১]) (আর আপনার রব বিস্মৃত হন না)।’

মেটকথা, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেই কিছু বিধানের ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, কিছু বিষয়ের ব্যাপারে অস্পষ্টতা রেখেছেন। বস্তুত এটা বান্দাদের জন্য আল্লাহ তাআলার বিশেষ ছাড় ও অনুগ্রহ। এ ধরনের অস্পষ্ট বিষয়াদিতে বিজ্ঞ সাহাবি থেকে শুরু করে ইমামদের সময় পর্যন্ত প্রত্যেকেই ইজতিহাদ করে বিভিন্ন মত দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এসব বিষয়ে তাদের মাঝে মতানৈক্য হয়েছে। আর সাধারণ লোকেরা এসব মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলায় তাদের আস্থাভাজন ইমামদের অনুসরণ করেছে। প্রথমদিকে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও পরবর্তী সময়ে সবাই সুশৃঙ্খলভাবে নির্দিষ্ট একটি মাযহাব মেনে চলেছে।

মুজতাহিদ ইমামগণ ইসলামের বিধিবিধানকে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করার জন্য এবং মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলা-মাসায়িলকে সুদৃঢ় মূলনীতির আলোকে বিন্যস্ত করার জন্য বিস্তর গবেষণা করেছেন। যুগে যুগে অনেক বিজ্ঞ ফকিহ ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে কাজ করলেও এ ব্যাপারে সর্বজনীন সৌন্দর্য এবং ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন চারজন। তারা হলেন ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ। পরিভাষায় এ মহান চার ইমামকে বলা হয় ‘আইম্মায়ে আরবাআ’ বা অনুসরণীয় চার ইমাম। বর্তমান মুসলিমবিশ্বে সামগ্রিকভাবে কেবল এ চার ইমামের অনুসারীই বিদ্যমান।

[১] মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৩৪১৯; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৯৭২৪; হাদিসটি হাসান।

হালাল-হারামের বিধান

বর্তমান সময়ে পুরো বিশ্বে যখন আধুনিকতা ও বিজ্ঞানের জয়জয়কার, সর্বক্ষেত্রে যখন কেবল বস্তুবাদি চিন্তা-চেতনার আধিক্য, যখন ইনশ্মন্যতায় ভোগা একদল মুসলিম পশ্চিমাদের অনুকরণে নিজেদের ইসলামি আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে কিংবা অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে ইসলামকে বিকৃতভাবে পালন করছে, তখন মুসলিম উম্মাহর জন্য সঠিকভাবে ইসলামকে বোঝা এবং অবিকৃতভাবে হালাল-হারামের বিধিবিধান জানা অবশ্যকর্তব্য ও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। আর এ দায়িত্ব একমাত্র উম্মাহর আলিমরাই আঞ্জাম দিতে পারেন।

এ রূট বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেই মিশরের বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহ্যবাহী জামিয়া আয়হারের ইসলামি সাংস্কৃতিক পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল—সহজ আরবি ভাষায় কিছু প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনা করে সেগুলোকে ইংরেজি-সহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে পুরো মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। বিশেষ করে ইংরেজি ভাষাভাষী পশ্চিমা মুসলিমদের মধ্যে, যাতে তারা সঠিক ইসলামি শিক্ষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হতে পারে, অন্যদিকে অমুসলিমরাও যেন ইসলাম সম্পর্কে সঠিকভাবে জেনে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে।

এ প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল হালাল-হারাম-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা। অনেক চিন্তাভাবনা করার পর শাহখুল আয়হার এসংক্রান্ত গ্রন্থ রচনার জন্য নির্বাচিত করেন মুসলিমবিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি স্কলার শাইখ ড. ইউসুফ কারযাবিকে। তিনি দীর্ঘ সময় ব্যয় করে হালাল-হারামের ওপর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এতে ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল-হারামের ওপর তিনি অত্যন্ত সুন্দর আলোচনা করেছেন। এসংক্রান্ত ফিকহি মূলনীতি উল্লেখ করে সে ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যাও উল্লেখ করেছেন।

সার্বিক বিবেচনায় বলা যায় তার রচিত এ বইটি অত্যন্ত উপকারী ও সাধারণদের জন্য পাঠযোগ্য। বর্তমান মুসলিমবিশ্বের অধিকাংশ দেশেই এ বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বের অনেক সুনামধন্য স্কলার ও অসংখ্য আলিম এ বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসন করেছেন। পাশাপাশি মুসলিমসমাজে এ বইটির গ্রহণযোগ্যতা ও পাঠকপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। এর কারণ সন্তুষ্ট এটা যে, শুধু হালাল-হারামের ওপর রচিত এমন সৃতত্ত্ব বই ইতিঃপূর্বে কখনো রচনা করা হয়নি। তাই সংগত কারণেই মুসলিমসমাজে বইটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এই গ্রন্থ রচনায় তিনি হালাল-হারামের বিধানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো মাযহাব অনুসরণ করেননি। এ ব্যাপারে তিনি প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের মতগুলোর মধ্যে তার দৃষ্টিতে তুলনামূলক শক্তিশালী মত গ্রহণ করেছেন। যদিও বিজ্ঞ বড় আলিমদের জন্য নির্দিষ্টভাবে মাযহাব মানার বাধ্যবাধকতা নেই; বরং তারা মুজতাহিদ ইমামদের মতগুলো থেকে তুলনামূলক শক্তিশালী মত গ্রহণ করতে পারেন; কিন্তু সাধারণ আলিম ও সাধারণ মানুষের জন্য এমনটা করার কোনো সুযোগ নেই। বিশুদ্ধলা এড়াতে এবং প্রবৃত্তির অনুকরণ থেকে বাঁচতে তাদের জন্য প্রসিদ্ধ চার মাযহাব থেকে নির্দিষ্ট একটি মাযহাব অনুসরণ করা অপরিহার্য।

হাতেগোনা কিছু মাসআলায় গ্রন্থকার চার মাযহাবের বাইরে গিয়ে ভিন্নমত গ্রহণ করেছেন এবং কিছু মাসআলায় তিনি শিথিলতা দেখিয়েছেন। সেসব স্থানে আমরা টীকার মাধ্যমে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতের কথা উল্লেখ করে দিয়েছি। আর পাঠকদের ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা থাকায় হাতেগোনা দুয়েকটি আলোচনা আমরা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করিনি।

গ্রন্থটির বিভিন্ন স্থানে সংযুক্ত টীকাগুলো খুবই গুরুতপূর্ণ। টীকাগুলোতে আমরা ফিকহের বিভিন্ন মত উল্লেখের ক্ষেত্রে যেমন নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির উদ্ধৃতি পেশ করেছি, তেমনি গ্রন্থে থাকা হাদিসগুলোর তাখরিজের ক্ষেত্রেও আমরা হাদিসের মৌলিক গ্রন্থসমূহ থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছি। পাশাপাশি হাদিসগুলোর মানও উল্লেখ করে দিয়েছি। কোথাও হাদিসের সনদের মাননির্ণয়ে জটিলতা থাকলে সেখানে শাস্ত্রীয়ভাবে ‘দিরাসাতু আসানিদিল হাদিস’—এর মাধ্যমে বিশদ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। মতভেদ থাকলে যথাসন্ত্ব বিশুদ্ধ মত গ্রহণের চেষ্টা করেছি।

কোনো হাদিসের তাখরিজে সহিতুল বুখারি কিংবা সহিহ মুসলিমের নাম থাকলে সে হাদিসটি সুনিশ্চিত ‘সহিহ’ বা ‘হাসান’ স্তরের হওয়ায় সেখানে আমরা নতুন করে আর হাদিসের মান উল্লেখ করিনি। অন্যান্য গ্রন্থের হাদিসের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে হাদিসের মান উল্লেখ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাখরিজের ক্ষেত্রে আমরা সর্বনিম্ন দুটি হাদিসগ্রন্থের নাম এবং তুলনামূলকভাবে প্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থের রেফারেন্স দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যদিও ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনবশত দুর্ভ গ্রন্থের নামও দেওয়া হয়েছে।

হালাল-হারামের বিধান

যাহোক, ফিকহি মতের উল্লেখ, হাদিসের মান-নির্ণয়, সংশোধনীমূলক বিভিন্ন টীকা সংযোজন ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছি। এতৎসত্ত্বেও আমাদের অগোচরে কোনো ভুল বা অসংগতি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সচেতন পাঠকের চোখে এ বইয়ের কোনো অসংগতি ধরা পড়লে তা প্রকাশক সমীপে জানানোর বিনোদ অনুরোধ রইল। আল্লাহ তাআলা আমাদের ভুলগুটি ক্ষমা করুন এবং এ বইয়ের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উভয় জাহানে উত্তম বিনিময় দান করুন।





সূচিপত্র

ঐশ্বী আলোকবর্তিকা	২৯
শুরুর কথা	৩০
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা	৩২
গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংজ্ঞা	৮৮
প্রথম অধ্যায়	
হালাল-হারামের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি	
প্রথম মূলনীতি : বস্তুর মূল হলো বৈধ হওয়া	৪৮
দ্বিতীয় মূলনীতি : বিধান-প্রণয়নকারী একমাত্র আল্লাহ	৫৫
তৃতীয় মূলনীতি : হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করা শিরক	৬০
চতুর্থ মূলনীতি : নিষিদ্ধতার কারণ নিকৃষ্টতা ও ক্ষতি	৬৫
পঞ্চম মূলনীতি : হালালের মধ্যে হারামের বিকল্প	৭০
ষষ্ঠ মূলনীতি : যা হারামের দরজা খুলে দেয় তা-ও হারাম	৭১
সপ্তম মূলনীতি : হারাম কাজে কৌশল করাও হারাম	৭২
অষ্টম মূলনীতি : ভালো নিয়তে করলেও হারাম কাজ হারামই	৭৩

নবম মূলনীতি : সংশয়পূর্ণ বিষয় থেকে দূরে থাকুন	৭৭
দশম মূলনীতি : নিষিদ্ধ বিষয় সবার জন্যই হারাম	৭৯
একাদশ মূলনীতি : বিকল্প না থাকলে নিষিদ্ধ বিষয় বৈধ হতে পারে	৮৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

দৈনন্দিন জীবনে হালাল-হারাম

খাবার ও পানীয়	৮৬
ব্রাহ্মণদের মতে পশু জবাই ও ভক্ষণ	৮৬
ইহুদি-খ্রিস্টানদের কাছে নিষিদ্ধ প্রাণী	৮৭
প্রাক-ইসলামি যুগে প্রাণীহত্যা ও অন্যান্য	৮৮
প্রাণীহত্যার ব্যাপারে ইসলাম কী বলে	৮৯
মৃত জন্মুর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ও কারণসমূহ	৯১
প্রবাহিত রুক্ত খাওয়া হারাম ও তার কারণ	৯২
শুকরের মাংস	৯৩
আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত প্রাণী	৯৪
মৃত জন্মুর প্রকারভেদ	৯৪
কতিপয় প্রাণী হারাম হওয়ার কারণ	৯৬
পূজার বেদীতে বলি দেওয়া জন্মু	৯৭
পঞ্জাপাল ও জলজ প্রাণীর ব্যাপারে ব্যতিক্রমী বিধান	৯৭
মৃত জন্মুর চামড়া, হাড় ও পশম	৯৯
বিশেষ পরিস্থিতির কথা ভিন্ন	১০১
চিকিৎসার প্রয়োজনে নিষিদ্ধ বস্তুর ব্যবহার	১০৩
কারো কাছে অতিরিক্ত খাবার থাকলে হারাম বস্তু খাওয়া জায়িয় নয়	১০৪
সামুদ্রিক সকল প্রাণীই হালাল	১০৬
নিষিদ্ধ যেসব স্থলজ প্রাণী	১০৭

সূচিপত্র


 ৪৯

গৃহপালিত প্রাণীর জন্য জবাই বাধ্যতামূলক	১১০
শারয়ি জবাইয়ের শর্তসমূহ	১১০
জবাইয়ের রহস্য ও কারণ	১১৪
কেন জবাইয়ের শুরুতে আল্লাহর নাম নিতে হবে?	১১৬
ইহুদি ও খ্রিস্টানদের জবাইকৃত প্রাণী	১১৬
গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়	১১৮
গির্জায় ও খ্রিস্টানদের উৎসবে জবাইকৃত প্রাণীর বিধান	১১৮
অগ্নিপূজারির হাতে জবাইকৃত প্রাণীর বিধান	১২০
অমূলক সংশয়ে কোনো অনুসন্ধান নয়	১২১
শিকারের ব্যাপারে ইসলামের বিধান	১২২
শিকারির জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি	১২৩
শিকারকৃত প্রাণীর ব্যাপারে শারয়ি বিধান	১২৫
শিকারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ	১২৬
ধারালো অস্ত্রের মাধ্যমে শিকার	১২৭
পশুপাখির মাধ্যমে শিকার	১২৯
মৃত শিকারের ব্যাপারে করণীয়	১৩২
মদের ব্যাপারে ইসলাম যা বলে	১৩৩
প্রত্যেক নেশাজাতীয় দ্রব্যই মদ	১৩৬
যা প্রচুর পানে নেশা হয়, তার সামান্যও হারাম	১৩৭
মদের ব্যবসা	১৩৭
কাউকে মদ উপহার দেওয়া হারাম	১৩৮
মদের আসর বর্জন করুন	১৩৯
মদ কোনো গুরুত্ব নয়, রবং একটি ব্যাধি	১৪০
নেশাজাতীয় বস্তু	১৪৩



হালাল-হারামের বিধান

ক্ষতিকর সকল বস্তুই হারাম	১৪৫
<hr/>	
পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা	১৪৭
<hr/>	
পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের ধর্ম ইসলাম	১৪৯
<hr/>	
পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় ও সৃণ হারাম	১৫২
<hr/>	
রেশমি কাপড় ও সৃণ পুরুষের জন্য হারাম কেন?	১৫৬
<hr/>	
নারীদের জন্য সৃণালংকার বৈধ কেন?	১৫৭
<hr/>	
কেমন হবে মুসলিম নারীদের পোশাক?	১৫৮
<hr/>	
বিপরীত লিঙ্গের বেশভূষা গ্রহণের বিধান	১৬০
<hr/>	
অহংকারবশত পোশাক পরিধান	১৬১
<hr/>	
স্রষ্টাপ্রদত্ত আকৃতির পরিবর্তন	১৬৩
<hr/>	
ট্যাটু আঁকা, দাঁত সরু করা ও প্লাস্টিক সার্জারি	১৬৩
<hr/>	
ভু প্লাক করা	১৬৫
<hr/>	
কৃত্রিম চুলের ব্যবহার	১৬৭
<hr/>	
সাদা চুল	১৭০
<hr/>	
দাঢ়ি বড় হতে দিন	১৭২
<hr/>	
ঘর-বাড়ি-বাসস্থান	১৭৭
<hr/>	
বিলাসিতা ও পৌত্রলিকতা	১৭৮
<hr/>	
সোনা-রূপার পাত্র	১৮০
<hr/>	
প্রতিকৃতির ব্যবহার হারাম	১৮৩
<hr/>	
ছবি-প্রতিকৃতির ব্যবহার নিষিদ্ধ কেন?	১৮৪
<hr/>	
সম্মান প্রদর্শনে অতিরঞ্জন বর্জনীয়	১৮৭
<hr/>	
অসম্পূর্ণ মূর্তির ব্যাপারে বিধান	১৯৫
<hr/>	
দেহবিহীন চিত্রের বিধান	১৯৬
<hr/>	
যেসব স্থানে চিত্রের ব্যবহার বৈধ	২১৩

সূচিপত্র

ডিজিটাল ছবির ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?	২১৫
আধুনিক ছবি ও তার বিষয়বস্তু	২১৭
চিত্র এবং চিত্রশিল্পীর ব্যাপারে শারয়ি বিধান	২১৯
বিনা কারণে কুকুর পালন	২২২
প্রয়োজনের খাতিরে কুকুর পোষা বৈধ	২২৩
কুকুর পোষার ব্যাপারে বিজ্ঞান কী বলে?	২২৫
উপার্জন ও পেশা	২২৮
কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য কাজ করা বাধ্যতামূলক	২২৮
ভিক্ষা কখন বৈধ?	২৩০
পেশা ও শ্রমের মর্যাদা	২৩২
চাষবাসের মাধ্যমে উপার্জন	২৩৩
নিষিদ্ধ চাষবাস	২৩৭
শিল্প ও অন্যান্য পেশা	২৩৮
যেসব পেশা সম্পূর্ণ হারাম	২৪৬
পতিতাবৃত্তি	২৪৬
অল্লীল শিল্পকর্ম ও তার বিধান	২৪৭
চিত্রশিল্পী, কুশ ও ভাস্কর্য নির্মাণকারী	২৪৮
মাদকের সাথে জড়িত সবার ওপর লানত	২৪৯
ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ	২৫০
ব্যবসার ব্যাপারে গির্জার অবস্থান	২৫১
কোন কোন ব্যবসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ?	২৬০
পেশা যখন চাকরি	২৬৩
যেসব চাকরি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ	২৬৬
জীবিকার মূলনীতি	২৬৮



তৃতীয় অধ্যায়

পারিবারিক ও দাম্পত্যজীবনে হালাল-হারাম

জৈবিক চাহিদা	২৭০
ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না	২৭২
গায়রে মাহরাম নারীর সাথে একান্তে অবস্থান	২৭২
বিপরীত লিঙ্গের কারো প্রতি কামনাপূর্ণ দৃষ্টি	২৭৬
সবার জন্য উমুন্ত গোসলখানায় নারীদের প্রবেশ	২৭৯
নারীদের সৌন্দর্য-প্রদর্শন হারাম	২৮২
তাবাররুজ (সৌন্দর্য প্রদর্শন)	২৮৩
নারীদের পর্দানশিন হওয়ার উপায়	২৮৪
পোশাকের ব্যাপারে শারয়ি নির্দেশনা	২৮৫
বিকৃত যৌনতা ইসলামে জন্ম্যন্তভাবে নিষিদ্ধ	২৯৩
হস্তমৈথুনের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?	২৯৫
 বিয়ে	২৯৭
ইসলামে বৈরাগ্যের কোনো স্থান নেই	২৯৭
বিয়ের জন্য নারীদের দেখা যাবে কি?	৩০২
বিয়ের প্রস্তাব যখন হারাম	৩০৫
বিয়েতে কুমারি মেয়ের সম্মতি নেওয়া বাধ্যতামূলক	৩০৭
মাহরাম নারীগণ	৩০৯
রস্তসম্পর্কীয় মাহরাম নারীগণ	৩১০
মাহরাম নারীদের বিয়ে করা হারাম কেন?	৩১০
দুধ-সম্পর্কিত কারণে মাহরাম নারীগণ	৩১২
বিয়ে-সম্পর্কিত কারণে মাহরাম নারীগণ	৩১৩
দুই বোনের একই স্বামী	৩১৪
অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী	৩১৫

সূচিপত্র

মুশরিক নারী	৩১৮
কিতাবি নারীদেরকে বিয়ে	৩১৯
কিতাবি নারীদের বিয়েতে শর্তসমূহ	৩২১
অমুসলিম পুরুষের সঙ্গে মুসলিম নারীর বিয়ে	৩২২
পতিতা নারী	৩২৪
মুতআ বিয়ে	৩২৮
একাধিক স্ত্রী গ্রহণ	৩৩০
একাধিক বিয়েতে সমতা বাধ্যতামূলক	৩৩২
একাধিক বিয়ের বৈধতা বনাম যৌনিকতা	৩৩৪
দাম্পত্য সম্পর্ক	৩৩৫
স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্ক	৩৩৬
সহবাসে মলদ্বার ব্যবহার নিষিদ্ধ	৩৩৮
স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা	৩৪১
জন্মনিয়ন্ত্রণ	৩৪৩
জন্মনিরোধ বৈধ হওয়ার কারণগুলো	৩৪৭
গর্ভপাত	৩৫২
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার	৩৫৪
দম্পতির পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা	৩৫৭
স্ত্রী অবাধ্য হলে করণীয়	৩৫৮
তালাকের বৈধতা	৩৬২
ইসলামপূর্ব যুগে বিবাহ-বিচ্ছেদ	৩৬৩
ইহুদি ধর্মে বিবাহ-বিচ্ছেদ	৩৬৩
খ্রিস্টধর্মে বিবাহ-বিচ্ছেদ	৩৬৪
তালাকের ব্যাপারে খ্রিস্টানদের মতভেদ	৩৬৫
খ্রিস্টধর্মে তালাক বিষয়ক কঠোরতার পরিণতি	৩৬৬

সাময়িকের জন্য খিটীয় নিষেধাজ্ঞা	৩৬৭
তালাক হ্রাসে শারয়ি বিধিনিষেধ	৩৬৯
হায়ি বা নিফাসের সময় তালাক নিষিদ্ধ	৩৭০
নিষিদ্ধ সময়ে তালাকের বিধান	৩৭২
তালাকের নামে শপথ হারাম	৩৭৩
ইদত পালনের সময় স্ত্রী কোথায় থাকবে?	৩৭৫
তালাক হবে তিন বারে	৩৭৬
ইদতের পর কী করণীয়?	৩৭৯
তালাকপ্রাপ্তা নারী পছন্দমতো বিয়ে করতে পারবে কি?	৩৮০
নাখোশ স্ত্রী কি স্বামীকে তালাক দিতে পারবে?	৩৮১
স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়া হারাম	৩৮২
স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগের শপথ বৈধ নয়	৩৮৩
 পিতামাতা ও সন্তান	৩৮৬
ইসলাম বংশ-সংরক্ষণের পক্ষে	৩৮৬
স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের ব্যাপারে শারয়ি বিধান	৩৮৭
দণ্ডক সন্তান কি আপন সন্তানের সীকৃতি পাবে?	৩৮৮
জাহিলি দণ্ডকের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান	৩৮৯
মৌখিক ঘোষণা এবং বাস্তবায়ন	৩৯২
লালনপালন ও দেখভালের জন্য দণ্ডক-গ্রহণ	৩৯৪
কৃত্রিম প্রজননের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?	৩৯৫
আপন বাবা ছাড়া অন্যকে বাবা বলা যাবে কি?	৩৯৬
সন্তানদের হত্যা কোরো না	৩৯৭
সন্তানদের মাঝে সমতা বাধ্যতামূলক	৪০০
মিরাস বণ্টনে শারয়ি বিধান	৪০২
পিতামাতার অবাধ্যতা কবিরা গুনাহ	৪০৮

সূচিপত্র



পিতামাতার সম্মানহানি করা কবিরা গুনাহ	৪০৮
পিতামাতার অনুমতি ছাড়া নফল জিহাদে যাওয়া যাবে কি?	৪০৮
পিতামাতা মুশরিক হলে করণীয়	৪১১

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক জীবনে হালাল-হারাম

আকিদা ও বিশ্বাস	৪১৩
সবার ওপরে ইসলাম	৪১৩
ভিত্তিহীন কথার বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধ	৪১৪
জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস করা কুফুরি	৪১৬
তিরের মাধ্যমে ভাগ্য-পরীক্ষা	৪১৮
জাদুবিদ্যা	৪১৯
তাবিজ ব্যবহার কর্তৃকৃ শরিয়তসম্মত?	৪২৩
অশুভ লক্ষণ	৪৩০
জাহিলি রীতিনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ	৪৩৪
ইসলামে গোত্র-প্রীতির কোনো স্থান নেই	৪৩৪
বর্ণ-গোত্রের বিচারে সবাই সমান	৪৩৮
মৃতদের জন্য বিলাপ করা যাবে কি?	৪৪১
পারস্পরিক লেনদেন	৪৪৪
নিষিদ্ধ বস্তু কেনাবেচা হারাম	৪৪৫
প্রতারণাপূর্ণ বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ	৪৪৬
দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ	৪৪৯
মজুতকারীদের ওপর লানত!	৪৫১
দালালের কারণে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি	৪৫৪
দালালি বা মধ্যস্থতা করা কি বৈধ?	৪৫৭

বাণিজ্যিক কাজে সুযোগসন্ধান ও প্রতারণা হারাম	৪৫৮
কোনো প্রতারক ব্যক্তি নবিজির উন্মত নয়	৪৬০
অতিরিক্ত শপথ বৈধ নয়	৪৬২
ওজনে কমে দেওয়ার পরিণতি	৪৬২
চোরাই ও ছিনতাইকৃত পণ্য কেনা বৈধ নয়	৪৬৪
সুদ একটি জঘন্য অপরাধ	৪৬৫
সুদ কেন এত বেশি ভয়াবহ?	৪৬৭
সুদের সাথে জড়িতদের ওপর আল্লাহর লানত!	৪৬৯
ঝণ থেকে পানাহ চাইতেন নবিজি	৪৭০
বাকির পণ্য অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করা কি বৈধ?	৪৭৩
আকদে সালাম—আগে মূল্য, পরে পণ্য	৪৭৪
মুদারাবা—একজনের শ্রম, আরেকজনের পুঁজি	৪৭৫
শিরকত—যৌথভাবে পুঁজি বিনিয়োগ	৪৭৭
তা'মিন—ইন্সুরেন্স বা বীমা	৪৭৮
ইন্সুরেন্স কোম্পানি কি ইসলাম-সম্মত?	৪৮০
ইন্সুরেন্সকে বৈধ করা করার উপায়	৪৮১
ইসলামে ইন্সুরেন্স-ব্যবস্থা	৪৮২
আবাদি জমি কাজে লাগানো	৪৮৩
জমি কাজে লাগানোর বিভিন্ন পদ্ধতি	৪৮৩
জমি ইজারা দেয়া কি বৈধ?	৪৯৬
পশুপালনে শরিকানা বৈধ কি?	৫০২
 খেলাধুলা ও বিনোদন	৫০৮
কিছু সময় দুনিয়া ও আখিরাতের চিন্তা	৫০৫
নবিজি ও একজন মানুষ	৫০৬
অন্তরও ক্লান্ত হয়	৫০৮

সূচিপত্র



হালাল খেলাধুলা	৫১০
দৌড় প্রতিযোগিতা	৫১০
কুস্তি লড়াই	৫১১
তিরন্দাজি	৫১২
বর্ণা নিষ্কেপণ	৫১৪
অশ্বারোহণ ও ঘোড়দৌড়	৫১৮
শিকার	৫২২
পাশা খেলা	৫২৪
মদের সঙ্গী জুয়া	৫২৬
লটারি এক ধরনের জুয়া	৫২৯
 সামাজিক সম্পর্ক	৫২৯
মুসলিম ভাইয়ের সাথে বিচ্ছেদ বৈধ নয়	৫৩১
বিবদমান ব্যক্তিদের মধ্যে মীমাংসা	৫৩৭
ঠাট্টা-বিদ্রুপ গুনাহের কাজ	৫৩৮
দোষারোপ করা ও খোঁচা দেওয়া	৫৪০
কাউকে মন্দ নামে ডাকা	৫৪১
কারো প্রতি কুধারণা করা	৫৪১
অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানো	৫৪৩
গিবত একটি জঘন্য অপরাধ	৫৪৮
কোন কোন ক্ষেত্রে গিবত করা জাইয়ি/ বৈধ?	৫৫১
চোগলখোর ব্যক্তি জানাতে প্রবেশ করবে না	৫৫৫
মান-সম্মান হিফায়ত করা	৫৫৮
মানবহত্যা মারাত্মক গুনাহ	৫৬১
হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি দুঃজনেই জাহান্নামি	৫৬৪
নির্বিচারে হত্যা কখনো বৈধ নয়	৫৬৬

কোন কোন ক্ষেত্রে মানবহত্যা বৈধ?	৫৬৮
আত্মহত্যা মহাপাপ	৫৭১
মুমিন কি সম্পদশালী হতে পারবে?	৫৭৩
যুবদাতা ও যুবগ্রহীতার ওপর নবিজির লানত	৫৭৫
বিচারকদের জন্য জনগণের উপহার	৫৭৮
জুলুম থেকে বাঁচার জন্য ঘূষ দেওয়া কি বৈধ?	৫৮০
ব্যক্তিগত সম্পদের অপচয় নিষিদ্ধ	৫৮১
অমুসলিমের সঙ্গে মুসলিমের সম্পর্ক	৫৮৫
ইহুদি-খ্রিস্টানদের বিশেষ কিছু আলোচনা	৫৮৮
আহলে কিতাব যখন চুক্তিবদ্ধ	৫৯১
অমুসলিমদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা কি বৈধ?	৫৯৩
অমুসলিম থেকে সহায়তা গ্রহণ	৫৯৭
ইসলামের দয়া সর্বজনীন	৬০১
পরিশিক্ষ	৬০৫
লেখক পরিচিত	৬১৭
গ্রন্থপঞ্জি	৬১৮





ঐশ্বী আলোকবর্তিকা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

فُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيَّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ فُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكَذِلِكَ تُفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَغْلَمُونَ ۝

(হে নবি,) আপনি বলুন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব সৌন্দর্যোপকরণ ও উৎকৃষ্ট জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন, কে তা হারাম করেছে? বলুন, পার্থিব জীবনে এগুলো মুমিনদের জন্যও বৈধ; আর কিয়ামতের দিন তো এগুলো কেবলই তাদের। যারা জ্ঞানকে কাজে লাগায়, তাদের জন্য এভাবেই আমি সবিস্তারে আয়াতসমূহ বর্ণনা করি। [সুরা আরাফ, আয়াত : ৩২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

فُلْ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِعِنْدِ الرَّحْقِ وَأَنْ شَرِكُوا
بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

(হে নবি,) আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ ও গোপন অশ্লীলতা, পাপ, অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন, কোনো কিছুকে আল্লাহর অংশীদার করা—যার কোনো প্রমাণ তিনি নায়িল করেননি এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা তোমরা জানো না। [সুরা আরাফ, আয়াত : ৩৩]



শুরুর কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম, তার সাহাবিগণ, পরিবার-পরিজন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত তার সকল অনুসারীর ওপর।

এটি এই বইয়ের সত্ত্বরোধৰ্ষ সংস্করণ। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন লেখক, প্রকাশক ও পাঠক সবাইকে এর মাধ্যমে উপকৃত করেন এবং পাঠকগণ যেন ভ্রান্ত চিন্তা, ভুল মতবাদ ও পরিত্যাজ্য মতামত উপেক্ষা করে সর্বদা সঠিক বিধান অনুসারে তাদের জীবন পরিচালনা করতে পারেন।

এ ধরনের বই প্রকাশে উদ্যোগের গুরুত্ব ও মূল্য আরো বেড়ে যায়, যখন আমরা দেখি, ইসলাম বিরোধীদের পক্ষ থেকে প্রচুর শ্রম ব্যয়িত হচ্ছে, বিশাল অঙ্গের টাকা খরচ করা হচ্ছে, অসংখ্য শয়তানি শক্তি এদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে; নানা উপায়ে, নিত্যনতুন পন্থায়, বিভিন্ন মোড়কে ও পোশাকে এই দ্বীনকে দমিয়ে রাখতে, দাওয়াতি কর্মকাণ্ডে বাধা দিতে, দাঙ্গদের পথ বুন্ধ করতে, দ্বীন সম্পর্কে সংশয় ও সন্দেহের বীজ বপনে, আকিদা, বিধিবিধান, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকৃতিতে তারা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

চারদিকে শয়তানি কর্মকাণ্ডের জয়জয়কার। মুসলিমদের কীভাবে কুফরে লিপ্ত করা যায়, সেজন্য নানা কার্যক্রম তীব্র বেগে ধাবমান। ঠিক সেই মুহূর্তে এই বইটি প্রকাশনা জগতে ও বিভিন্ন বুকসেলিং সাইটে দীর্ঘ সময় ধরে বেস্ট সেলার হিসেবে তার স্থান

শুরুর কথা

৩

ধরে রাখতে পেরেছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও প্রচারমাধ্যম থেকে এই তথ্য জানতে পেরে আমরা ভীষণরকম আনন্দিত। এজন্য মনের গভীর থেকে আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করি। বহু রচনা ও সংকলন রয়েছে, যার প্রচার-প্রসারে এবং বিক্রি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সংগঠনের পক্ষ থেকে হাজার হাজার, লাখ লাখ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে, তবু বাজার তাদের অনুকূলে যায়নি এবং পাঠকের সমাদর তাদের ভাগ্যে জোটেনি।

এ কথা অনসুবিকার্য যে, এই গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, যার শুকরিয়া আদায় করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। পাশাপাশি এর মাধ্যমে আমরা এ তথ্যও পেলাম যে, আমাদের মুসলিম ভাইবোনেরা এখনো কল্যাণের মধ্যেই আছেন; অন্যায়-অনাচার ও অবিচার কেবল শাসক ও নেতৃবৃন্দের মধ্যেই সীমিত, যারা মূলত সাধারণ মুমিনদের কাঁধে চেপে বসেছে। আর অবশ্যই এরা একদিন ধ্বংস হবে।

আমার কাছে আরো ভালো লেগেছে, পাকিস্তান ও তুরস্কের কিছু ভাই বইটি অনুবাদের অনুমতি চেয়ে পত্র পাঠিয়েছেন; বিনা দ্বিধায় আমি তাদের অনুমতি দিয়েছি। কারণ আমার চিন্তা হলো, ভাষা যেন মুসলিম ভাইদের পরস্পরের ভাবনা-চিন্তা আদান-প্রদানে কখনোই বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। মুসলিমদের একের পথে এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম উপায় হলো, ভাষার এই সীমাবন্ধতা দূর করা।

সুতরাং, সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন। তিনি যদি আমাদের হিদায়াত প্রদান না করতেন তাহলে আমরা হিদায়াত পেতাম না।

رَبِّنَا لَا تُنْعِنُّ فُلُوبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا وَهُنَّ أَنْتَ الْوَهَابُ

হে আমাদের পালনকর্তা, সরল পথ প্রদর্শনের পর, আপনি আমাদের অন্তরকে বক্র করে দেবেন না এবং আপনার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন; নিশ্চয়ই আপনি পুরুষান্বয় দাতা।^[১]

ইউসুফ আল-কারয়াবি

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৮



প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আয়তার ইসলামি সাংস্কৃতিক পরিষদ একটি নতুন প্রকল্প হাতে নেয়। প্রকল্পটি ছিল—সহজ ভাষায় কিছু বই ও ছোট পুস্তিকা লেখা, যেগুলো আবার ইংরেজিতে ভাষান্তর হবে; যেন ইংরেজি ভাষাভাষী মুসলিমরা ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে, অন্যদিকে অমুসলিমরাও ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে। সাংস্কৃতিক পরিষদ কার্যালয়ের পত্র মারফত জানতে পারি, এই প্রকল্পে আমার যোগদান বিষয়ে আয়তারের প্রধান শাহীখ নিজ থেকে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

সত্য কথা হলো, এ জাতীয় বই ও ছোট ছোট পুস্তিকা লেখার প্রকল্প ও উদ্যোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। এসব কাজ আরো বহু আগেই শুরু হওয়া দরকার ছিল। ইসলাম সম্পর্কে ইউরোপ-আমেরিকার মুসলিমগণের জানাশোনা খুবই কম; তারা যা জানে তাও বিকৃতি আর ভুলে ভরা।

কিছুদিন আগের কথা। আয়তার ইউনিভার্সিটির ছাত্র আমার এক বন্ধু যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করে আসে। সে চিঠি লিখে জানাল, সেখানকার অধিকাংশ মুসলিম মদের দোকান ও বারগুলোতে কাজ করে। তাদের কোনো ধারণাই নেই, ইসলামে জ্ঞান্যতম নিষিদ্ধ কাজগুলোর একটি হলো—মদের ব্যবসা। সে আরো লিখেছে, মুসলিম পুরুষেরা ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ক্ষেত্রবিশেষ মুর্তিপূজারিদের সঙ্গেও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে ইত্যাদি।

এই যদি হয় মুসলিমদের হাল, তাহলে অমুসলিমদের অবস্থা আরো সহজে

অনুমেয়। ইসলাম ও ইসলামের নবি সম্পর্কে বিকৃত ও কল্যাণিত চিত্রই তাদের কাছে পৌঁছেছে। এই চিত্র ফুটিয়ে তোলার পেছনে কলকাঠি নেড়েছে খ্রিষ্টধর্ম-প্রচারক ও উপনিবেশিক শক্তিগুলো। যত উপায়ে ইসলাম সম্পর্কে ঘৃণা ছড়ানো সম্ভব তারা ছড়িয়েছে, এক্ষেত্রে কোনো সুযোগই তারা হাতছাড়া করেনি; অথচ আমরা তাদের কর্মকাণ্ড ও কার্যক্রম সম্পর্কেও অসচেতন ও উদাসীন।

যাহোক, অবশ্যে এই প্রকল্পে কাজের সময় ঘনিয়ে এলো। এ ধরনের প্রকল্প মূলত দাওয়াতি কাজের জন্য অপরিহার্য। তাছাড়া এটি একটি বরকতময় উদ্যোগ; জামিয়া আয়হারের ভেতরে ও বাইরে যারা এত সুন্দর একটি উদ্যোগ নিয়েছেন এবং সেটি বাস্তবায়নে কাজ করেছেন, তাদের সবাইকে আমরা অভিনন্দন ও শুকরিয়া জানাই। দুআ করি, তারা যেন এ ধরনের মহত্ব উদ্যোগ আরো বেশি বেশি নিতে পারেন এবং আল্লাহর তাওফিক সদা তাদের সঙ্গেই থাকে।

সংস্কৃতি পরিষদ থেকে আমার জন্য নির্বাচিত বিষয় ছিল—‘ইসলামে হালাল ও হারাম’। তারা চিঠিতে অনুরোধ জানিয়েছেন, রচনাটি যেন হয় সহজ-সাবলীল এবং ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে তুলনামূলক সরল বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ।

হালাল-হারাম-বিষয়ক রচনা, এ আর কঠিন কী? প্রথমবার শুনলে এমনই মনে হয়, কিন্তু বিষয়টি এত সহজ নয়; কারণ এর আগে পরে এই বিষয়ে সুতপ্রভাবে এখন পর্যন্ত কেউ কলম ধরেনি। চাইলেই সংকলক সাহেব ছড়ানো-ছিটানো তথ্যগুলো একত্র করে দেবেন আর বই প্রস্তুত হয়ে যাবে, এমন কোনো সুযোগ এখানে নেই।

মূলত, এসব তথ্য ফিকহ, তাফসির ও হাদিসের রচনাবলির সুবিশাল জগতজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেখান থেকে সংকলক সেগুলো সংগ্রহ করবেন। যেসব মাসআলায় পূর্ববর্তীদের মতামত বিরোধপূর্ণ; মূল কার্যকারণ উদয়টিনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীদের সাথে পরবর্তীদের মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে, এসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি মতামত প্রাধান্য দেওয়ার দায়িত্ব সংকলকের কাঁধেই চাপে।

হালাল-হারামের মাসআলায় এসে দুটি বিপরীতমূখী মতামত থেকে কোনো একটি প্রাধান্য দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ; প্রথমে আল্লাহ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করতে হয়, সঠিক সিদ্ধান্তে আসার জন্য আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়; ধীরস্থির চিন্তাভাবনা এবং দীর্ঘ গবেষণা ও যাচাই-বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

অধুনা ইসলামি গবেষক ও আলোচকদের অধিকাংশ দুটি দলে বিভক্ত। তাদের একদল পাশ্চাত্য চেতনায় পুরোপুরি গা ভাসিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমা চিন্তাচেতনা তাদের কাছে মূর্তির মতো পূজনীয়। পশ্চিমা চিন্তাচেতনার সামনে লেজ নাড়িয়ে নিজেদের বিপুল আনুগত্য প্রকাশ করে। তাদের দৃষ্টি থাকে অবনত, আর হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

এদের মতে পশ্চিমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নিয়মনীতি সকল সমালোচনা-আপত্তির উর্ধ্বে, এর বিরোধিতা সমর্থনযোগ্য নয়; এদের কোনো কিছু যদি ইসলামের সঙ্গে মিলে যায়, সেটা খুবই সমাদরযোগ্য এবং ঘটা করে প্রচারের বিষয়, কিন্তু কোনো বিষয় যদি ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে এরা ইসলামের বিধানকে দুমড়ে-মুচড়ে পাশ্চাত্যের ছাঁচে ঢেলে সাজায়, নয়তো সেকেলে বলে ছুড়ে ফেলে দেয়। তার সুযোগ না থাকলে সরাসরি অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির আশ্রয় নেয়। অবস্থাটা এমন, যেন ইসলাম এসেছে পশ্চিমা সভ্যতা ও দর্শনের সামনে নত হওয়ার জন্যেই।

মূর্তি-ভাস্কর্য, লটারি, সুদ, গায়রে মাহরাম নারীর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ, ফেমিনিজম এবং পুরুষের জন্য সৃণালংকার পরিধানের মতো হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়ে আলোচনার সময় তাদের কাচুমাচুভাব চোখে পড়ার মতো।

তালাক ও একাধিক বিয়ের মতো ইসলাম-অনুমোদিত বিষয়সংশ্লিষ্ট বস্তবে তাদের দাসত্ত্বপূর্ণ মানসিকতার আঁচ পাওয়া যায়। তাদের দৃষ্টিতে হালাল সেটাই, যেটা পশ্চিমারা হালাল করেছে। হারাম সেটাই, যেটা পশ্চিমারা হারাম করেছে। তারা ভুলে যায়, ইসলাম হলো আল্লাহর দেওয়া বিধান আর তাঁর বিধানই সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। ইসলাম এসেছে অনুসৃত হওয়ার জন্য, অনুসরণের জন্য নয়। ইসলাম এসেছে ওপরে ওঠার জন্য, নিচে নামার জন্য নয়। মালিক কীভাবে দাসের অনুগত হতে পারে, স্বৃষ্টা কী করে সৃষ্টির চাহিদার অনুগামী হয়?

وَلِيَأْتِيَ الْحَقُّ أَهْوَاءُهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ⑥

আর সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হতো, তবে আসমানসমূহ
ও জমিন এবং এর মধ্যবর্তী সবই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত [১]

[১] সুরা মুমিনুন, আয়াত : ৭১

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

৩৫

**فُلْ هَلْ مِنْ شَرْكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ فُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ
أَحَقُّ أَنْ يُتَبَعَ أَمْنَ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٢٥﴾**

আপনি জিজ্ঞেস করুন, আছে কি কেউ তোমাদের শরিকদের মধ্যে, যে সত্যপথ প্রদর্শন করবে? বলুন, আল্লাহই সত্যপথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং, যে সঠিক পথ দেখাতে পারে তার অনুসরণ উত্তম, নাকি যে নিজেই পথ খুঁজে পায় না, যদি না তাকে পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়—তার অনুসরণ উত্তম? তারপর কী হলো তোমাদের, তোমরা কেমন বিচার করছ? [১]

এ হলো একটি দল। আর দ্বিতীয় আরেকটি দলের অভ্যাস হলো, তারা হালাল-হারামের মাসআলায় কোনো একজন ইমাম বা ফিকহি গ্রন্থের নির্দিষ্ট কিছু মতামত আঁকড়ে ধরে আছে, নিজ মতামত থেকে একচুল পরিমাণও তারা নড়তে নারাজ। তারা মাযহাবের প্রমাণ বা মতামতকে কখনো অন্যদের প্রমাণ ও মতামতের সাথে তুলনা করে সিদ্ধান্তে আসতে রাজি নয়। তারা ভাবে, নিজেদের মতামত ও ইমামের বক্তব্য আঁকড়ে ধরার নামই ইসলাম।

আমি চেষ্টা করেছি, দুই দলের কোনো দলেই অন্তর্ভুক্ত না হতে; আল্লাহ তাআলাকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসুল হিসেবে গ্রহণের পর পশ্চিমকে মাঝুদ মনোনীত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সব মাসআলায় ও সিদ্ধান্তে ভুল হোক বা ঠিক হোক—নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের তাকলিদ বা অনুসরণ আমার পক্ষে সম্ভব নয় [২] কারণ মুকালিদ—যেমনটা ইবনুল

[১] সুরা ইউনুস, আয়াত : ৩৫

[২] সম্ভাগতভাবে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলই হলেন একমাত্র অনুসরণীয়। যখন আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের কথা বুঝতে গিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হবে এবং তাদের কথার ব্যাখ্যায় একাধিক সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে, তখন কোনটা অধিক শক্তিশালী ও সম্ভাব্য সঠিক মত, তা নির্ণয় করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে সুভাবিকভাবেই সালাফে সালিহিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। এজন্যই বিষ্ণু আলিমগণ সাধারণ মানুষদের জন্য উশ্মাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য চার ইমামের যেকোনো এক ইমামের অনুসরণ করে তাঁর মতামত মেনে চলার কথা বলেছেন।

আর যেসব আলিম কুরআন-সুন্নাহর দলিল-প্রমাণ বোঝার সক্ষমতা রাখেন এবং শক্তিশালী দলিল ও দুর্বল দলিল ভাসোভাবে চিহ্নিত করতে পারেন তাদের জন্য দলিলভিত্তিক যেকোনো মত গ্রহণ করার অবকাশ

জাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তার অনুসৃত বিষয়ে অনিশ্চিত থাকে। তাছাড়া তাকলিদের দ্বারা বিবেচনা শক্তি নষ্ট হয়। কারণ বিবেচনা শক্তি দেওয়াই হয়েছে চিন্তা-ফিকিরের জন্য। বাতি দেওয়া হয়েছে পথ চলার জন্য, কিন্তু কেউ যদি বাতি নিভিয়ে পথ চলতে শুরু করে, তাকে কেউ বুধিমান বলবে না।[১]

প্রচলিত কোনো মাযহাবের শৃঙ্খলে আমি নিজেকে বেঁধে রাখতে চাইনি। কারণ, বিশুদ্ধতা নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবে সীমাবদ্ধ নয়।[২] তাছাড়া অনুসৃত ইমামগণও নিজেদেরকে ভুলের উর্ধ্বে বলে দাবি করেননি। তারা সঠিক সিদ্ধান্ত অনুসন্ধানের চেষ্টা চালিয়েছেন। যদি ভুল হয় তাহলে তারা একটি সাওয়াব পাবেন, আর যদি ঠিক হয় তাহলে দুটি সাওয়াব পাবেন।[৩]

আছে। প্রত্নির অনুকরণ ও দলপ্রীতি পরিহার করে প্রমাণের বিচারে যে মতটি অধিক শক্তিশালী, সেটাকে প্রাধান্য দিয়ে তার জন্য সে অনুযায়ী আমল করার অনুমতি আছে। এমন ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের গান্ধিতে আবদ্ধ থাকাটা অপরিহার্য নয়।

[১] তালবিসু ইবলিস, পৃষ্ঠা : ৭৪

[২] প্রথকার ড. ইউসুফ কারযাবি রাহিমাহুল্লাহ নিজেকে মাযহাবের গান্ধিতে কেন সীমাবদ্ধ করেননি, এখানে তার কারণ উল্লেখ করেছেন। তার মতে, মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের সঠিকতা নিশ্চিত নয়; বরং দলিলের বিচারে একেক সময় একেক মাযহাবের মত সঠিক হয়ে থাকে, তাই তিনি নির্দিষ্ট মাযহাবের গান্ধিতে সীমাবদ্ধ না থেকে দলিলের বিচারে যেটা অধিক শক্তিশালী সেটিই গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু আমরা ইতিঃপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, এটা সবার জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য নয়। বরং দলিলের শক্তিমন্ত্বার ভিত্তিতে কোনো একটি মত গ্রহণ করার অবকাশ কেবল সেসব আলিমদেরই থাকে, যারা ইলমি যোগ্যতা ও ইজতিহাদি চিন্তার ক্ষেত্রে এতটা উত্তীর্ণ হন যে, বিভিন্ন মাযহাবের দলিলের শক্তিমন্ত্বা ও দুর্বলতা বুঝে তারা যেকোনো মতকে প্রাধান্য দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। তাই প্রথকারের এ কথাটি সাধারণ মানুষ ও সাধারণ স্তরের আলিমদের জন্য প্রযোজ্য হবে না; বরং তাদের জন্য উম্মাহর অনুসৃত চার মাযহাবের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে কোনো একটি মাযহাব অনুসরণ করাই অধিক নিরাপদ ও অপরিহার্য।

[৩] এ কথাটি মূলত হাদিস থেকে নেওয়া হয়েছে। হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—‘বিচারক যখন বিচার করতে গিয়ে ইজতিহাদ করবে, তারপর সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছবে তখন তার জন্য থাকবে দুটি পুরস্কার। আর বিচারক যখন বিচার করতে গিয়ে ইজতিহাদ করবে, তারপর ভুল করবে তখন তার জন্য থাকবে একটি পুরস্কার।’ [সহিতুল বুখারি : ৭৩৫২; সহিহ মুসলিম : ১৭১৬]

এ হাদিসের ভিত্তিতে আলিমগণ বলেন, বিচারক বা শাসক বা বিজ্ঞ আলিম যখন শারয়ি কোনো বিষয়ে ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তখন ভুল করলে তার ইজতিহাদের পরিশ্রমের কারণে একটি সাওয়াব পাবে; আর সঠিক ইজতিহাদ করলে দুটি সাওয়াব পাবে—একটি ইজতিহাদের পরিশ্রমের জন্য এবং অন্যটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য।

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া প্রত্যেকের কাজই কিছু গ্রহণীয় আর কিছু বর্জনীয়।’^[১]

ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘আমার মতামত ঠিক আছে, তবে সেটা ভুলও হতে পারে। আর অন্যদের মতামত ভুল, তবে সেটা শুধুও হতে পারে।’^[২]

একজন আলিম, যার মধ্যে প্রমাণাদি তুলনা ও যাচাইয়ের যোগ্যতা আছে, তার জন্য নির্দিষ্ট একটি মাযহাব বা নির্দিষ্ট একজন ফকিহের মতামত অনুসরণের গভিতে আবশ্য হয়ে থাকা শোভনীয় নয়। তার উচিত প্রমাণ ও দলিলের অনুসরণ করা। যার প্রমাণ ও দলিল শক্তিশালী হবে, সেটাই অনুসরণ করবেন। আর যার প্রমাণ ও দলিল দুর্বল হবে, সেটা প্রত্যাখ্যাত হবে সেই মতামতের প্রবক্তা যেই হোক না কেন।^[৩] বহু আগেই আলি রায়িয়াল্লাহু আনহু বলে গিয়েছেন, ‘ব্যক্তি দ্বারা কখনো সত্য চেনা যায় না। তুমি সত্যটা চিনে নাও, তাহলে তুমি সত্যের অনুসারীকে সহজেই চিনতে পারবে।’^[৪]

কর্তৃপক্ষ আমার কাছে যেভাবে কাজের আবেদন জানিয়েছে, যথাসম্ভব সেভাবে কাজটি সম্পাদনের চেষ্টা আমি করেছি। আধুনিক চিন্তা-গবেষণা ও সিদ্ধান্তের সাহায্যে অনেক বিষয়ে প্রামাণিক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণও এখানে উঠে এসেছে। আলহামদুলিল্লাহ, সব সময় ইসলামই অধিকতর উজ্জ্বল ছিল, তার পক্ষেই ছিল স্পষ্ট ও শক্তিশালী যত দলিল। ইসলাম হলো চিরস্থায়ী মানবতার দ্বীন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

صَنْعَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِنْعَةً
©

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৯৩

[২] আল-খিলাফু আসবাবুহু ওয়া আদাবুহু পৃষ্ঠা : ২৪

[৩] এ কথটি সাধারণভাবে সব শ্রেণির আলিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়; বরং এটা কেবল তাদের জন্য, যারা শরিয়তের নুসুম ও উসুলে এতটা বৃৎপত্তি অর্জন করেছেন যে, তারা ইমামদের মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলায় দলিলের শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা যাচাই করে তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী মত চিহ্নিত করতে পারেন। গ্রন্থকার ড. ইউসুফ কারযাবিও এটাকে সমর্থন করেছেন। এজন্যই তিনি কথাটির শুরুতে বলে দিয়েছেন, ‘যার মধ্যে প্রমাণাদি তুলনা ও যাচাইয়ের যোগ্যতা আছে।’

[৪] তালবিসু ইবলিস, পৃষ্ঠা : ৭৪

হালাল-হারামের বিধান

আমরা আল্লাহর রংয়ে রঙিন হয়েছি। আর আল্লাহর রঙের চাইতে উত্তম রং
আর কার হতে পারে? [১]

গ্রায় সব জাতিসভার মধ্যেই প্রাচীন কাল থেকে বৈধ-অবৈধের ধারণা প্রচলিত ছিল। [২] যদিও নিষিদ্ধ বিষয়, তার প্রকার ও কারণ নির্ণয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল বা এখনো আছে এবং এসব নিষিদ্ধ বিষয়ের অনেকগুলোই হয়তো গ্রাম্য ধ্যানধারণা, অলীক কল্পনা ও নিছক পুরাকীর্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

এরপর এসেছে ঐশ্বী বড় বড় ধর্ম। [৩] বৈধতা-অবৈধতা সম্পর্কে বিভিন্ন আইন-কানুন (শরিয়ত) ও নির্দেশনা দিয়ে মানুষকে অলীক ও পুরাকীর্তি-গোত্রীয় জীবনযাত্রা থেকে টেনে একজন সভ্য ও সুন্দর মানুষের স্তরে নিয়ে এসেছে। যেহেতু শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হালাল-হারামের মধ্যেও সময়, যুগ ও পরিবেশের চাহিদা কার্যকর ছিল, তাই সেগুলো পরিস্থিতি, সময় ও মানুষের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে পরিবর্তিত ও ধীরে ধীরে উন্নত হয়েছে।

উদাহরণসূর্য বলা যায়, ইহুদিদের মধ্যে কিছু সাময়িক নিষিদ্ধ বিষয় ছিল, বনি ইসরাইলের ওপর আল্লাহ তাআলা যেগুলো চাপিয়ে দিয়েছিলেন তাদের সীমালঙ্ঘনের শাস্তি হিসেবে। এগুলো মূলত কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ চিরস্থায়ী কোনো বিধান ছিল না। এ কারণে কুরআনে বনি ইসরাইলের উদ্দেশে ঈসা আলাইহিস সালামের উদ্ধৃত বক্তব্যে আমরা দেখতে পাই, তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন; কুরআনের ভাবায়—

[১] সুরা বাকারা, আরাত : ১৩৮

[২] ইসলাম বলে, এ পৃথিবীতে প্রথম মানুষ হলেন আদম আলাইহিস সালাম। তিনি যেহেতু নবি ছিলেন তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, মানুষ বৈধ-অবৈধ ও ভালো-মন্দের ধারণা প্রথমে নবির মাধ্যমেই জেনেছে। অর্থাৎ এসব বিষয় ওহির মাধ্যমেই নির্ধারিত হতো, মানুষের বুদ্ধি-বিবেকের মাধ্যমে নয়। পরবর্তী সময়ে মানুষ নফসের প্ররোচনা ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে বিভিন্নভাবে শরিয়তের বিধানে বিকৃতি সাধন করে তাতে অনাদুরক্ষ পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সংযোজন-বিয়োজন ঘটিয়েছে।

[৩] ঐশ্বী বড় বড় ধর্ম আসার পূর্বেও শরিয়ত ছিল এবং তখনো বৈধ-অবৈধ বিভিন্ন বিষয়ে শরিয়তের স্পষ্ট বিদ্যমান ছিল। তবে মানুষ শয়তানের ধোঁকায় ও নফসের প্ররোচনায় নবিদের আহ্বানে ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়েছিল। তাই বড় বড় ধর্ম আসার আগে ঐশ্বী বিধানের প্রচার-প্রসার তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে এবং পৃথির অক্ষ পরিমাপ মানুষটি নবিগণের ডাকে সাড়া দিয়েছে। এজন্য তখন মানুষের মাঝে বিভিন্ন অলীক ও অনন্ধরচিত ধারণাই অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

وَمُصَدِّقًا لِمَا يَنْ يَدِي مِنَ التَّوْزِعَةِ وَلَا حِلٌّ لَكُمْ بَغْضَ الَّذِي حُرِمَ عَلَيْكُمْ [১]

আর আমি (প্রেরিত হয়েছি) আমার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সত্যায়নকারী হিসেবে এবং তোমাদের জন্য হারামকৃত কিছু বিষয় হালাল করে দেওয়ার জন্য [১]

ইসলাম আসতে আসতে মানুষ তার বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। এখন তাদের ওপর আল্লাহ তাআলা তাঁর সর্বশেষ বাণী প্রেরণ করতে পারেন, তারা এরও উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। ঠিক তখনই মহান আল্লাহ তাঁর শাশ্঵ত ও চূড়ান্ত শরিয়ত ইসলাম প্রেরণের মাধ্যমে নতুন শরিয়তের সিলসিলা বন্ধ করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে সুরা মায়দাতে ‘অবৈধ খাদ্যের তালিকা’ উল্লেখের পরে উন্ধৃত মহান আল্লাহর বাণীটি আমরা পাঠ করতে পারি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا... [২]

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিলাম। পূর্ণ করে দিলাম তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম ইসলাম [২]

বৈধতা ও অবৈধতার ধারণা ইসলামে খুবই স্পষ্ট ও সরল; এটি সেই আমানত—গুরু দায়িত্বের অংশ; আসমান, জমিন ও পর্বতমালা ভীত হয়ে যেই দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, বিপরীতে মানুষ সেই দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছে।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের ওপর আরোপিত দায়িত্ব হলো—জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করা; এই দায়িত্বের ওপর ভিত্তি করেই মূলত মানুষ প্রতিদিন বা শাস্তি পাবে। এজন্যই মানুষকে বিবেক ও ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয়েছে, রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন, গ্রীষ্মী গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে; যাতে তার এই প্রশ্নের সুযোগ না থাকে—হালাল-হারামের সীমারেখা কেন বেঁধে দেওয়া হয়েছে? আমাকে লাগামহীন

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৫০

[২] সুরা মায়দা, আয়াত : ৫

কেন ছেড়ে দেওয়া হয়নি?

এই বিধানগুলো হলো—মানুষ ও জিন জাতির জন্য একটি পরীক্ষা। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির এই বিশেষ দুই শ্রেণির সাথেই বিধি-নিষেধগুলো সীমাবদ্ধ। এই শ্রেণি দুটি ফেরেশতাদের মতো নিষ্কলুষও নয়, আবার হিংস্র পশুদের মতো বর্বরও নয়। এরা হলো—একটি মধ্যম শ্রেণির সৃষ্টি, যারা আত্মিক উন্নতি ঘটাতে ঘটাতে ফেরেশতাদের মতো বা তাদের চেয়েও উন্নত হতে পারে। আবার নিচে নামতে নামতে পশুর মতো বা তাদের চেয়েও হীন হতে পারে।

অন্যদিক থেকে বলা যেতে পারে, ইসলামি আইনের বৈধ-অবৈধ বিষয়গুলোর মূল উদ্দেশ্যই হলো, সামগ্রিক মানব-কল্যাণের নিশ্চয়তা প্রদান, তাদের বিপদাপদ ও সমস্যার সমাধান এবং জীবনকে কীভাবে সহজ করা যায়, তার একটি প্রচেষ্টা।

এর আরেকটি উদ্দেশ্য হলো—মানুষ ও সমাজ উভয়ের যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও কল্যাণ সাধন। মানুষ বলতে তার শরীর, আত্মা, চেতনা সবই এখানে মুখ্য। সমাজের মধ্যে ধনী-গরিব, শাসক-প্রজা, নারী-পুরুষ, কাছের-দূরের, আগত-অনাগত-সহ সকল প্রজন্ম ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই এর আওতাভুক্ত।

মানব সভ্যতা বিকাশের চূড়ান্ত সময়ে আল্লাহ তাআলার বান্দাদের জন্য এই দ্বীন এসেছে বিশাল এক রহমত হিসেবে। আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টি তাঁর প্রিয় রাসুলের মাধ্যমেই সমগ্র মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
[১]

আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবলই রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি [১]

সুয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নিজের ব্যাপারে এমন কথা বলেছেন। আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১] সূরা আলিয়া, আয়াত : ১০৭

إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدِيٌّ

| আমি তো কেবল (তোমাদের জন্য) উপহার হিসেবে প্রদত্ত রহমত।^[১]

এই রহমতের ধারাবাহিকতা হিসেবে আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ এই উম্মাহ থেকে, সব ধরনের কঠোরতা ও কড়াকড়ির বোৰা সরিয়ে নিয়েছেন। অন্যদিকে মুশরিক ও আহলে কিতাবগণ অনৈতিক পাইকারি বৈধতার নীতি চর্চার মাধ্যমে উত্তম জিনিসকে হারাম এবং অনুত্তম জিনিসকে হালালের যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিল, সেই আবর্জনাকেও আল্লাহ তাআলা হটিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَرَحْمَتِي وَسَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْمِنُونَ إِلَزْكَاهَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ
⑯

আর সবকিছু ঘিরে আছে আমার রহমত। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেবো, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়তসমূহের ওপর বিশ্বাস রাখে।^[২]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمِيَّ الَّذِي يَجْدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَابَيْثَ وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ...
⑯

সে সমস্ত লোক, যারা অনুসরণ করে রাসুল—উম্মি নবির, যার সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইন্ডিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বাধা দেন অসৎকর্ম থেকে, তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম

[১] মুস্তাদ্বাকুল হাকিম : ১০০; মুজাম ইবনিল আরাবি : ২৪৫২; হাদিসটি সহিহ।

[২] সুন্না আবাব, আয়াত : ১৫৬



হালাল-হারামের বিধান

বস্তুসমূহ এবং তাদের ওপর থেকে সে বোরা ও শৃঙ্খল সরিয়ে ফেলেন, যা
তাদের ওপর বিদ্যমান ছিল [১]

বইয়ের শুরুতে উল্লিখিত আয়াতদুটিই বিধিনির্বেধ সংশ্লিষ্ট আইন-কানুনের
প্রতিনিধিত্বের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন—

**فُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ فُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَغْلَمُونَ ⑤**

(হে নবি,) আপনি বলুন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব সৌন্দর্যোপকরণ
ও উৎকৃষ্ট জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন, কে তা হারাম করেছে? বলুন,
পার্থিব জীবনে এগুলো মুমিনদের জন্যও বৈধ; আর কিয়ামতের দিন তো
এগুলো কেবলই তাদের। যারা জ্ঞানকে কাজে লাগায়, তাদের জন্য এভাবেই
আমি সবিস্তারে আয়াতসমূহ বর্ণনা করি [২]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

**فُلْ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا
بِإِلَهٍ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ③**

(হে নবি,) আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও
গোপন অশ্লীলতা, পাপ, অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন, কোনো কিছুকে আল্লাহর
অংশীদার করা, যার কোনো প্রমাণ তিনি নাফিল করেননি এবং আল্লাহ
সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা তোমরা জানো না [৩]

যাহোক, বহুটি আকারে ছোট, তবু আমি বিশ্বাস রাখি, হালাল-হারামের গুরুত্বের
কারণে এটি সহজেই সামসময়িক ইসলামি বইয়ের জগতে একটি বড় শূন্যস্থান

[১]সূরা আরাফ, আয়াত : ১৫৭

[২]সূরা আরাফ, আয়াত : ৩২

[৩]সূরা আরাফ, আয়াত : ৩৩

পূরণকারী রচনা হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা এতে প্রতিটি মুসলিমের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবনসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে; তাছাড়া একজন মুসলিমের মনে বিভিন্ন সময় হালাল-হারাম সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জাগে যে, আমার জন্য কোনটা হালাল, কোনটা হারাম? এইটা হারাম, কিন্তু ওইটা হালাল হওয়ার কারণ কী? সে সম্পর্কেও আলোচনা এখানে এসেছে।

ভূমিকার শেষ প্রান্তে এসে, জামিয়া আযহারের প্রধান শাইখ এবং ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের পরিচালনা পরিষদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করে পারছি না। আমার প্রতি আস্থার ফলে, তারা এমন একটি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রচনা ও শূন্যস্থান পূরণের জন্য আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আশা করি, এই রচনা তাদের আস্থার ঝণ পরিশোধ করবে এবং তাদের প্রকল্পের কাঞ্চিত লক্ষ্যও অর্জনে সক্ষম হবে।

প্রার্থনা করি, আল্লাহ তাআলা এই রচনাকে সবার জন্য উপকারী বানান, আমাদের কথায় ও কাজে বিশুদ্ধতা দেন, চিন্তা ও লেখার ভাস্তি থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করুন, সকল কাজে তিনি আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেন; তিনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ।

ইউসুফ আল-কারয়াবি

সফরুল খাইর, ১৩৮০ হিজরি

~~~~~



## গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংজ্ঞা

### হালাল (বৈধ)

এমন বৈধ কাজ, যাতে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি এবং শরিয়ত-প্রণেতা এর অনুমতি দিয়েছেন।

### হারাম (অবৈধ)

শরিয়ত-প্রণেতা যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এই নিষেধের সীমালঙ্ঘনে বাস্তা আখিরাতে আল্লাহ তাআলার শাস্তির সম্মুখীন হবে। কখনো কখনো দুনিয়াতেও শারয়ি শাস্তির মুখোমুখি হতে পারে।

### মাকরুহ (ঝূঢ়ি)

শরিয়ত-প্রণেতা কোনো বিষয় থেকে বারণ করেছেন, কিন্তু বারণের মধ্যে কঠোরতা আরোপ করেননি, একে বলা হয় মাকরুহ। নিষিদ্ধতার বিবেচনায় এটি হারাম থেকে কিছুটা কম, এতে জড়ানোর শাস্তি হারামের মতো নয়, তবে অতিরিক্ত মাকরুহে জড়ালে এবং একে হালকাভাবে নেওয়ার প্রবণতা হারাম কাজের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

— সুব্রত চৌধুরী —



## প্রথম অধ্যায়

# হালাল-হারামের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি

জাহিলি যুগে যেসব ক্ষেত্রে চরম বিভ্রান্তি ও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল, হালাল-হারাম ছিল তার অন্যতম। ক্ষতিকর অনেক হারাম জিনিসকে হালাল আর উপকারী অনেক হালালকে হারাম বানিয়ে বসেছিল তারা। এই ধরনের কাজ মূর্তিপূজকরা যেমন করেছে, আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিস্টানরাও করেছে।

পৃথিবীর চতুর্দিকে এই বিকৃতি-বিচুতি ও ভুল-বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। ডানপন্থিদের মধ্যে নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণবাদ ও খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসবাদ ইত্যাদির প্রচার লাভ করেছিল। এই দুটি দল ছাড়াও আরো বহু দল ছিল, যাদের মধ্যে সংযমের কঠোর ধ্যানধারণা ছড়িয়ে পড়েছিল। সংযমের মূলকথা ছিল, দৈহিক কষ্ট করতে হবে, ভালো খাবারদাবার ও সাজসজ্জা ত্যাগের মাধ্যমে যাবতীয় সুখ বর্জন করতে হবে।

ধীরে ধীরে মধ্যযুগে এসে খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসবাদ তার সুর্ণশিখের উপনীত হয়। হাজার হাজার সন্ন্যাসীদের কাছে সংযমের ধারণা ও সুখভোগের নিষিদ্ধতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। কেউ কেউ তো পা ধোয়াকেও মনে করত গুনাহের কাজ। তাদের মতে গোসলখানায় গেলেই তাওবা করা অপরিহার্য।

অন্যদিকে বামপন্থিদের মধ্যে আমরা পারস্যে মাযদাক মতাদর্শের দার্শনিকদের দেখা পাই, যারা চরম স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তাদের মতে মানুষ যা ইচ্ছা তা-ই

## হালাল-হারামের বিধান

করতে পারবে, কেনো কিছুই মানুষের জন্য নিষিদ্ধ নয়। এমনকি মানুষের সম্মান ও ইজত-আবুর মধ্যে হস্তক্ষেপ করাও তাদের মতে বৈধ।<sup>[১]</sup>

বিভিন্ন বস্তু ও বিষয় বৈধ-অবৈধকরণে, প্রাক-ইসলামি আরবদের মানদণ্ডের অন্তি, মানুষের নির্ধারিত মানদণ্ড বিচ্যুতির একটি আদর্শ উদাহরণ হতে পারে মদ, চক্রহারে সুদ ও নারী নির্যাতনের ব্যাপারে আরবদের মতামত। তাদের কাছে এগুলো সবই ছিল বৈধ। সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার ছিল, মানুষ ও জিন শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে নিজেদের কলিজার টুকরা সন্তানের প্রাণনাশেও তাদের হাত কাঁপত না। এতে তাদের পিতৃহৃদয়ে কোনো মায়া-মমতা জাগ্রত হতো না। জাহিলি যুগে তাদের এই যৃণ্য অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءً وَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلَيَأْلِسُوا عَلَيْهِمْ  
ۖ دِينَهُمْ

আর এভাবে অনেক মুশরিকের জন্য তাদের শরিকরা (দেব-দেবীরা) তাদের  
সত্তানদের হত্যা করাকে শোভিত করেছে, যাতে তারা তাদেরকে ধংস  
করতে পারে এবং তাদের নিকট তাদের দীনকে সংশয়পূর্ণ করতে পারে।<sup>11</sup>

এই ‘দেব-দেবীরা’ সন্তান হত্যার পক্ষে দারিদ্র্যভীতি, কন্যাসন্তান জন্মের কলঙ্ক, সন্তান উৎসর্গের মাধ্যমে (বাতিল) উপাস্যদের নৈকট্য অর্জনের মতো বিভিন্ন যুক্তি দাঁড় করিয়েছিল। অন্তুত ব্যাপার হলো, তাদের দৃষ্টিতে জীবন্ত পুঁতে ফেলা বা সন্তান হত্যা ছিল বৈধ, অথচ বিভিন্ন হালাল প্রাণী ও ফসল খাওয়া ছিল অবৈধ। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো—তারা এগুলো আল্লাহর প্রদত্ত বিধান হিসেবে মানত। অথচ আল্লাহ তাআলা এমন বিধান কখনোই তাদের ওপর চাপিয়ে দেননি। পবিত্র কুরআনে তাদের এই মিথ্যাচারের মূলোৎপাটনের জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءَ بِرَغْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا  
وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيَهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৭৭ [ইয়াম ইবনুল আসির জ্যায়ারি রাহিমাতুল্লাহ তার  
আল-কামিল ফিত-তারিখ গ্রন্থে মাযদাক ও মতাদর্শের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।]

[২] সুরা আনআম, আয়ত : ১৩৭

আর তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী বলে, এসব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ; আমরা যাকে ইচ্ছে করি সে ছাড়া কেউ এসব খেতে পারবে না; এবং (তারা আরো বলে,) কিছুসংখ্যক গবাদি পশুর পিঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কিছুসংখ্যক পশু জবেহ করার সময় তারা আল্লাহর নাম নেয় না। এসবকিছুই তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রটনার উদ্দেশ্যে বলে; তাদের এ মিথ্যা রটনার প্রতিফল তিনি অচিরেই তাদেরকে দেবেন [১]

তাদের হালালকে হারাম এবং হারামকে হালালকরণের এই অন্তুত কর্মকাণ্ডের বিচুতি, নিন্দা ও নিকৃষ্ট পরিণতির কথা কুরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أُولَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْتَرَاءَ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلَّوْا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

অবশ্যই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নির্বুদ্ধিতার জন্য ও অজ্ঞাতবশত নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করেছে এবং আল্লাহর ওপর মিথ্যা রটনা করে আল্লাহ-প্রদত্ত জীবিকাকে নিষিদ্ধ গণ্য করেছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না [২]

হালাল-হারামের মানদণ্ডে তাদের এমন স্বেচ্ছাচারিতা ও ভ্রান্তি দেখে ইসলাম প্রথমে এই দিকটি সংশোধনের জন্য কিছু মূলনীতি ঘোষণা করেছে; পরবর্তী সময়ে হালাল-হারামের যাবতীয় বিধান প্রদত্ত হয়েছে মূলত এই মূলনীতিকে ঘিরেই।

প্রতিটি বিষয় ও বস্তু যথাস্থানে স্থাপন, ন্যায়ের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা, হালাল-হারামের ন্যায্যতা ও সমতা বিধানের মধ্য দিয়ে মুসলিম জাতি পরিণত হয়েছে মধ্যমপন্থি শ্রেষ্ঠ জাতিতে। উম্মতে মুহাম্মাদির এ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন—

كُنْثُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ... ﴿١٧﴾

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ১৩৮

[২] সুরা আনআম, আয়াত : ১৪০

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উন্নত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উক্তব ঘটানো হয়েছে [১]

### প্রথম মূলনীতি : বস্তুর মূল হলো বৈধ হওয়া

প্রথম মূলনীতি হলো—আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি উপকারী বিষয় ও জিনিসপত্র সবই বৈধ [২] শরিয়ত-প্রণেতার পক্ষ থেকে প্রমাণিত দ্ব্যর্থহীন বিশুদ্ধ বস্তু ছাড়া কিছুই হারাম সাব্যস্ত হবে না। শরিয়ত-প্রণেতার বস্তু পাওয়া গেল, কিন্তু সূত্র বিশুদ্ধ নয় বা বস্তু দ্ব্যর্থবোধক, তাহলে এর দ্বারাও কোনো কিছু হারাম বলার সুযোগ থাকবে না।

বস্তুর মূল হলো বৈধতা—এই মূলনীতির পক্ষে প্রমাণ হিসেবে ইসলামি আইন বিশেবজ্ঞরা (ফকিহগণ) কুরআনের বেশ কিছু স্পষ্ট আয়াত উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً...  
⑪

তিনিই জমিনে যা কিছু আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন [৩]

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ১১০

[২] ‘বস্তুর মূল বৈধ হওয়া’ মূলনীতিটি খাবারদাবার, পেশাক-পরিচ্ছেদ, ওষুধ-পথ্য, আসবাবপত্র ও বিভিন্ন কাঞ্জ-কর্মের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, যতক্ষণ না হারাম হওয়ার দলিল পাওয়া যায়। তবে এ মূলনীতিটি একেবারে সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক নয়; বরং এখানে কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যেমন : ইবাদতের ক্ষেত্রে মূল হলো তাওয়াককুফ বা স্থগিত হওয়া। সুতরাং কেউ কোনো ইবাদতের কথা বললে সেটাকে যেমন একবাক্যে মেনেও নেওয়া যাবে না, আবার একবাক্যে অসীকারও করা যাবে না; বরং দেখতে হবে, এ ব্যাপারে শরিয়তের কোনো দলিল আছে কি না। সুতরাং সুস্পষ্ট দলিল থাকলে ইবাদতটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, নয়তো তা অত্যাখ্যাত হবে। আর পশু ও জবেহের ক্ষেত্রে মূল হলো হারাম হওয়া। সুতরাং কোনো পশু ও জবেহকৃত গোশত ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল বলে সাব্যস্ত হবে না, যতক্ষণ না একথা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত পশু শরিয়তে হালাল এবং তার জবেহ শরিয়তসম্মত পথ্য সম্পন্ন হয়েছে। অনুরূপ নারী সন্তোগের ক্ষেত্রেও মূল হলো হারাম হওয়া। সুতরাং কোনো নারীর সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত সহবাস করা হালাল হবে না, যতক্ষণ না সঠিক পদ্ধতিতে তাকে বিয়ে করা হবে কিংবা সে দাসী হলে তার শপর মালিকের পূর্ণাঙ্গ মালিকানা সাব্যস্ত হবে।

[৩] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৯

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

﴿٣﴾ وَسَخْرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আসমানসমূহ ও  
জমিনের সমস্ত কিছু [১]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

أَلَمْ تَرَوْ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً  
وَبَاطِئَةً... ﴿٤﴾

তোমরা কি দেখো না যে, নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু  
আছে সবকিছুই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের  
প্রতি তাঁর প্রকাশ ও অপ্রকাশ অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন? [২]

বোৰা গেল, পৃথিবীর সবকিছু মানুষের সেবায় নিবেদিত। বান্দাদের প্রতি এগুলো  
আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ, এ কথা তিনি নিজেই বলেছেন। এগুলোর  
ব্যবহারের বৈধতাই যদি না থাকে, তাহলে সেগুলো অনুগ্রহ হিসেবে বলার কী  
আছে? প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন কারণে তিনি কিছু বস্তু হারাম করেছেন, সেটা ভিন্ন  
বিষয়, সেগুলো সম্পর্কে আমরা সামনে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

এজন্য আমরা দেখি, ইসলামি শরিয়তে হারামের গতি খুবই সীমিত, অপরদিকে  
হালালের পরিধি অনেক বিস্তৃত। হারামের বিধান-সংক্রান্ত বিশুদ্ধ ও দ্যর্থহীন  
বস্তব্য খুবই কম। যেসব ক্ষেত্রে হালাল বা হারামের ব্যাপারে কোনো বস্তব্য নেই,  
সেগুলো বৈধ এবং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক অনুমোদিত বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে  
আবু দারদা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১] সূরা জাসিয়া, আয়াত : ১৩

[২] সূরা লুকমান, আয়াত : ২০

## হালাল-হারামের বিধান

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ غَافِيَةٌ ، فَاقْبِلُوا  
مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَّسِيئًا . تُمْ تَلَاهُدِهِ أَلَا يَهُ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَّسِيئًا} ﴿٤﴾

আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল, যা হারাম করেছেন তা হারাম, আর যা কিছু সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন সেগুলো হলো ছাড়। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তাআলার ছাড় গ্রহণ করো, কারণ আল্লাহ তাআলা বিস্মৃতি-প্রবণ নন। তারপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, **وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَّسِيئًا** অর্থাৎ আর আপনার রব বিস্মৃত হন না।<sup>[১]</sup>

সালমান ফারসি রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالجُبْنِ وَالفِرَاءِ ، فَقَالَ: الْخَلَالُ مَا  
أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَالحَرَامُ مَا حَرَمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘৃত, পনির ও পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, হালাল হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন। আর হারাম হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে যা হারাম করেছেন, আর যে বিষয়ে তিনি নীরব থেকেছেন সেটা হলো এমন বিষয়, যা তিনি তোমাদের জন্য ছাড় হিসেবে রেখেছেন।<sup>[২]</sup>

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব ছোটখাটো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, তাদেরকে একটি মূলনীতি বলে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তারা হালাল-হারাম যাচাই

[১] মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৩৪১৯; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৯৭২৪; হাদিসটি হাসান; সুরা মারইয়াম : ৬৪

[২] জামিউত তিরমিয়ি : ১৭২৬; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৩৬৭; হাদিসটির সনদ যইফ। তবে এটা মাওকুফ তথা সালমান ফারসি রায়িয়াল্লাহু আনহুর বন্ধব হিসেবে প্রমাণিত; যেমনটি ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাল্লাহ বলেছেন। অবশ্য তিনি মারফু হওয়ার সম্ভাবনার কথাও বলেছেন। [মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ৩৫, পৃষ্ঠা : ২১৬] ইমাম বুখারি রাহিমাল্লাহও এটাকে মাওকুফ বলে অভিহিত করেছেন। [আল-ইলালুল কাবির, তিরমিয়ি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৮১] ইমাম আবু হাতিম আর-রায়ি রাহিমাল্লাহ এটাকে মুরসাল হিসেবে অভিহিত করেছেন। [ইলালুল হাদিস, ইবনু আবি হাতিম, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৮৬] শাহীখ শুআইব আরনাউত রাহিমাল্লাহ বলেছেন, এটা মাওকুফ হওয়ার মতটিই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। [তাখরিজু শারহি মুশাকিলিল আসার, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২২৭]

## হালাল-হারামের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি



করতে পারবে। তারা যদি কেবল হারাম বিষয়াদি সম্পর্কে জানে, তাহলেই যথেষ্ট। এরপর যে বিষয়ে হারামের প্রমাণ না পাওয়া যাবে, সেগুলো সবই হালাল বলে বিবেচিত হবে। তিনি বলেন—

إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَقَرَأْتَنِي لَكُمْ فَلَا تُضِيقُوهَا وَحَرَمَ أَشْيَاءً فَلَا  
 تَنْهِكُوهَا وَتَرَكَ أَشْيَاءً مِنْ عَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رِتْكُمْ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْهُ لَكُمْ فَاقْبِلُوهَا وَلَا  
 تَبْخَثُوا فِيهَا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কিছু সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, অতএব তোমরা সেগুলো অতিক্রম কোরো না। তিনি তোমাদের জন্য কিছু কাজ ফরজ করেছেন, কাজেই তোমরা সেগুলো নষ্ট কোরো না। তিনি কতগুলো বিষয় হারাম করেছেন, সুতরাং তোমরা সেগুলো লঙ্ঘন কোরো না। আর তিনি বিস্মৃত না হয়ে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহবশত কিছু বিষয় ছেড়ে দিয়েছেন, তাই তোমরা তাঁর সেসব ছাড়কে গ্রহণ করো, এ ব্যাপারে (আগ বেড়ে অতিরিক্ত) অনুসন্ধান করতে যেয়ো না।<sup>[১]</sup>

মনে হচ্ছে একটি বিষয় স্পষ্ট থাকা অত্যন্ত জরুরি। সবকিছুর মূল হলো বৈধতা—এই মূলনীতি শুধু বস্তু ও সামগ্ৰীৰ মধ্যে সীমিত নয়; বৱাং ইবাদত ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় কাৰ্যক্ৰম ও আচাৰ-আচৱণের ক্ষেত্ৰেও এটি প্ৰযোজ্য। ফিকহেৱ পৱিভাষায় এগুলো আচাৰ-অভ্যাস (মুআশাৱা) ও লেনদেন (মুআমালা) নামে পৱিচিত। এক্ষেত্ৰেও সাধাৱণ বিধান হলো শৰ্তহীন বৈধতা। তবে যেসব ব্যাপারে শ্ৰিয়ত-প্ৰণেতাৱ নিষেধাজ্ঞা চলে আসবে, সেগুলোৱ বিধান ভিন্ন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿...وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ...﴾

আৱ তিনি তোমাদেৱ জন্য ওইসব বিষয় স্পষ্টভাৱে বৰ্ণনা কৱে দিয়েছেন,  
যেগুলো তোমাদেৱ ওপৰ হারাম কৱেছেন।<sup>[২]</sup>

[১] মুস্তাদৱাকুল হাকিম : ৭১১৪; মুসলাদুশ শামিলিন : ৩৪৯২; হাদিসটি হাসান।

[২] সুৱা আনআম, আয়াত : ১১৯

## হালাল-হারামের বিধান

এই স্পষ্টতা বস্তু ও কার্যক্রম সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে ইবাদতের বিষয়টি সৃতন্ত্র। কারণ এটি হলো দ্বীনের মূল বিষয়। তাই ওহির নির্দেশনা ছাড়া কিছুই ইবাদত হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

**مَنْ أَخْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ**

| দ্বীনের অংশ নয় এমন কোনো কিছু আমাদের দ্বীনের মধ্যে কেউ উদ্ভাবন ঘটালে,  
| তা হবে প্রত্যাখ্যাত [১]

ওহির নির্দেশনা ছাড়া কোনো কাজই ইবাদত হতে পারে না। দ্বীনের একেবারে গোড়ার মৌলিক বিষয় দুটি—এক. আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারো ইবাদত করা যাবে না। দুই. আল্লাহ তাআলা যেভাবে ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন, কেবল সেভাবেই তাঁর ইবাদত করতে হবে। তাই কেউ যদি নতুন কোনো ইবাদত আবিষ্কার করে, তাহলে সেটা হবে প্রত্যাখ্যাত ও বর্জনীয়। আবিষ্কারক যেই হোক না কেন; ইবাদত ও তার পদ্ধতি প্রণয়নের অধিকার শরিয়ত-প্রণেতার জন্যই কেবল সংরক্ষিত [২]

দৈনন্দিন জীবনের আচার-ব্যবহার ও লেনদেনের বিষয়গুলো শরিয়ত-প্রণেতার সৃষ্টি নয়; মানুষ সেগুলো আবিষ্কার করেছে, এর মাধ্যমে লেনদেন করেছে, শরিয়ত-প্রণেতা তার মধ্যে কিছু সংশোধনী, সংস্কার ও পরিবর্তন এনেছেন; যেসব লেনদেন ও আচার-আচরণে কোনো সমস্যা ও ত্রুটি নেই, সেগুলোকে তিনি বহাল তবিয়তে রেখে দিয়েছেন।

[১] সহিল বুখারি : ২৬৯৭; সহিহ মুসলিম : ১৭১৮

[২] এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন যে, যেসব বিধি-নিয়েধ কুরআনে নেই; বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকে প্রমাণিত, সেগুলোও মূলত আল্লাহ তাআলা কর্তৃকই অনুমোদিত। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরিয়ত-বিষয়ক কোনো কথা বা কাজ আল্লাহ তাআলার অনুমতি ছাড়া করেন না। বস্তুত দ্বীন-বিষয়ক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা-কাজই ওহির অঙ্গৰুস্ত। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে—

**وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ۚ**

অর্থাৎ আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। সেটা তার কথাবার্তা তো কেবলই ওহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। [সুরা নাজর, আয়াত : ৩-৪]

## হালাল-হারামের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি

৫০

শাহিখুল ইসলাম ইবনু তাহিমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘মানুষের কথাবার্তা ও কার্যক্রম-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়গুলো দুটি ভাগে বিভক্ত। এক. ইবাদত, যার মাধ্যমে মানুষ দ্বীনচর্চা করে। দুই. দুনিয়াতে প্রয়োজনীয় জীবিকা নির্বাহ-সংশ্লিষ্ট দৈনন্দিন লেনদেন ও বিচার-আচার। শরিয়তের মূলনীতি নিয়ে গভীর অনুসন্ধানের পরে আমরা জানতে পেরেছি, আবশ্যকীয় বা উৎসাহযোগ্য ইবাদত সরাসরি শরিয়ত-প্রণেতার অনুমোদন ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তবে প্রাত্যক্ষিক লেনদেন ও আচার-আচরণ, দৈনন্দিন জীবনে আমরা যার সম্মুখীন হই, সেক্ষেত্রে মূলকথা হলো—সেগুলো সবই বৈধ; তবে যে ব্যাপারে শরিয়তের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, শুধু সেগুলোই হারাম হবে। কারণ, আদেশ-নিষেধ দুটোই শরিয়তের অংশ। ইবাদতমাত্রই ইবাদত হয়ে ওঠার জন্য শরিয়তের পক্ষ থেকে অনুমোদন আবশ্যক; যতক্ষণ অনুমোদন পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ সেটা ইবাদত হতে পারবে না; ঠিক তেমনিভাবে দৈনন্দিন কার্যক্রমের তালিকাভুক্ত প্রতিটি কাজই বৈধ, তাই কোনো কাজকে নিষিদ্ধ বলতে হলেও শরিয়তের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা লাগবে।

এ কারণে ইবাদতের ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ-সহ অন্যান্য কিছু মুহাদিস ফকিরের মতামত হলো—ইবাদত কেবল ওহির সূত্রে প্রাপ্ত। তাই শুধু সেগুলোই শরিয়তের বিধান বলে বিবেচিত হবে, যেগুলো আল্লাহ তাআলা শরিয়তসিদ্ধ করেছেন। অন্যথায় আমরা আল্লাহ তাআলার এই উক্তির মধ্যে পড়ে যাবো—

⑥...أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ

তাদের জন্য কি এমন কিছু শরিক (উপাস্য) আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? [১]

দৈনন্দিন লেনদেন ও সাধারণ কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে বৈধ। তাই কোনো লেনদেন অবৈধ বলতে হলে সেখানে হারাম হওয়ার প্রমাণ লাগবে। এর ব্যতিক্রম হলে তা আল্লাহ তাআলার এই হুঁশিয়ারির আওতায় পড়বে—

⑦...فَلْ أَرَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا

[১] সুরা শুরা, আয়াত : ২১

বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিয়িক অবতীর্ণ করেছেন, তারপর তোমরা তার কিছুকে বানিয়েছ হারাম আর কিছুকে বানিয়েছ হালাল [১]

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় একটি মূলনীতি। এর ভিত্তিতে বলা যায়, খাওয়া-দাওয়া, কেনাবেচা ও ভাড়া ইত্যাদি মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজনে আমরা যেসব লেনদেন করে থাকি, তার প্রায় সবই শরিয়তে বৈধ। কিন্তু এর ভেতর ক্ষতিকর ও অনিষ্টকর লেনদেনগুলো আবার শরিয়তে হারাম। আমাদের একান্ত জরুরি বিষয়গুলো এখানে অপরিহার্য ঘোষিত হয়েছে। অনুচিত বিষয়াদি হয়েছে মাকরুহ। যার মধ্যে ভালো কোনো দিক রয়েছে, তাকে মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় বলা হয়েছে। এই হালাল-হারাম, মাকরুহ বা মুস্তাহাবের বিধানগুলো চুক্তি, তার ধরন, পরিমাণ ও পরিমাপ সব ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই শরিয়ত-অনুমোদিত যেকোনো জিনিসের লেনদেনই মানুষ করতে পারে, যেভাবে শরিয়ত-অনুমোদিত জিনিসসমূহ তারা খেতে ও পান করতে পারে। খাবার-পানীয়ের মধ্যে কিছু মুস্তাহাব বা মাকরুহ থাকতে পারে; তবে যতক্ষণ শরিয়ত কোনো সীমা নির্ধারণ করে না দেবে, ততক্ষণ এগুলো বৈধ হিসেবেই বহাল থাকবে।’[২]

এই মূলনীতি আরো শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হওয়ার পক্ষে একটি হাদিস পাওয়া যায়, যা বর্ণিত হয়েছে সহিহ মুসলিমে। জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রায়য়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

كُنْتَ نَغْزِلُ ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنْهَا نَعْنَهُ الْقُرْآنُ

আমরা আফল[৩] করতাম আর তখন কুরআন নায়িল হতো। এতে যদি নিষেধ করার মতো কিছু থাকত, তবে কুরআন আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করে দিত।[৪]

[১] সুরা ইউনুস, আয়াত : ৫৯

[২] আল-কাওয়াইদুন নুরানিয়াহ, পৃষ্ঠা : ১৬৩-১৬৫

[৩] স্ত্রী সহবাসের সময় বীর্য বা শুক্রানু যৌনির বাহিরে ফেলাকে আফল বলে। [রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৩০; পৃষ্ঠা : ১৭৬]

[৪] সহিহ মুসলিম : ১৪৪০; মুসামাফু ইবনি আবি শাইবা : ১৬৮৫৬

এই হাদিস থেকে বোঝা গেল, ওহি যে ব্যাপারে চুপ থাকে, সে ব্যাপারটি হারাম বা নিষিদ্ধ হয় না। যতক্ষণ নিষিদ্ধতা ও বারণবিষয়ক স্পষ্ট কোনো বক্তব্য না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত এমন কাজে লিপ্ত হওয়ার বৈধতা সবার জন্য রয়েছে। এটা হলো সাহাবিদের চিন্তাগত পরিপক্ততার বহিঃপ্রকাশ। এই আলোচনার মাধ্যমে আমাদের কাছে একটি মূলনীতি স্পষ্ট হলো—‘আল্লাহ-প্রদত্ত নির্দেশিত বিধান ছাড়া কোনো ইবাদত বিধিবদ্ধ হবে না এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা ছাড়া কোনো লেনদেন হারাম হবে না।’

### দ্বিতীয় মূলনীতি : বিধান-প্রণয়নকারী একমাত্র আল্লাহ

ইসলামে হালাল-হারাম-বিষয়ক আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর [১] কারো মর্যাদা খুব উঁচু হয়ে গেলে বা ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে, সেটা ধর্মীয় কিংবা রাষ্ট্রীয় যে দৃষ্টিতেই হোক না কেন, কোনো কিছু হালাল বা হারাম করার অধিকার তাদের কারো নেই; এই অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই সংরক্ষিত ও নিবেদিত। ধর্মীয় গুরু, পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, পির-শাহীখ, রাজা-বাদশা কেউই মানুষের জন্য কোনো কিছু হারাম করতে পারে না। কেউ যদি এমন কিছু করে, তাহলে বুরাতে হবে, সে সীমালঙ্ঘন করেছে, আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে সে হস্তক্ষেপের চেষ্টা চালাচ্ছে। এ ধরনের কাজে যারা খুশি হবে, এদেরকে অনুসরণীয় বানাবে, তারা

[১] হালাল-হারাম প্রণয়নের মূল ক্ষমতা তো আল্লাহ তাআলারই, এখানে অন্য কারো কোনোরূপ অংশীদারিত্ব নেই। তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু বিষয়ে হালাল-হারাম করার অনুমতি দিয়েছিলেন। শরিয়ত-বিষয়ক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল কথা ও কাজই যেহেতু ওহির আলোকেই হয়ে থাকে; যেমনটি কুরআনে বলা হয়েছে, তাই তাঁর সকল আদেশ-নিষেধও ওহি বলেই সাব্যস্ত হবে এবং কুরআন দ্বারা যেমন হালাল-হারাম সাব্যস্ত হয়, তেমনই হাদিস দ্বারাও হালাল-হারাম সাব্যস্ত হবে। এ ব্যাপারে হাদিসে স্পষ্ট ভাষ্য এসেছে।

ইমাম তিরমিয়ি রাহিমাহুল্লাহ সহিহ সনদে মিকদাম ইবনু মাদিকারিব রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাবধান! খুব শীঘ্ৰই এমন ব্যক্তির আগমন ঘটবে, যে তার সুসজ্জিত গদিতে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। তারপর তার নিকট আমার কোনো হাদিস পৌছলে সে বলবে, আমাদের ও তোমাদের সামনে তো আল্লাহ তাআলার কিতাবই আছে। আমরা তাতে যেগুলো হালাল পাব সেগুলোকে হালাল বলে মেনে নেবো এবং যেগুলো হারাম পাব সেগুলোকে হারাম বলে মেনে নেব। সাবধান! মনে রেখো, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা হারাম ঘোষণা করেছেন তা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হারামকৃত বস্তুর মতোই হারাম। [জামিউত তিরমিয়ি : ২৬৬৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কিছু বিষয় হারাম ও ওয়াজিব ঘোষণা করেছেন, যার বর্ণনা কুরআনে নেই। যেমন, গৃহপালিত গাঢ়া, ছেদন দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র পশু ভক্ষণ হালাল না হওয়া।

মূলত আল্লাহ তাআলা'র অংশীদার সাব্যস্ত করে ফেলল এবং তাদের এই অনুসরণ শিরক বলে বিবেচিত হবে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা' বলেন—

۱۵) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ

তাদের জন্য কি এমন কিছু শরিক (উপাস্য) আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? [১]

কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের নিন্দা জানিয়েছেন, কারণ পাদরিদের হাতে তারা হালাল-হারামের কর্তৃত্ব দিয়ে রেখেছিল। আল্লাহ তাআলা সুরা তাওবাতে বলেন—

اَتَخْذُوا اَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ اُبْنَ مَرْيَمَ وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَغْبُدُوا  
۱۶) إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ اِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

তারা (খ্রিস্টানরা) আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী এবং মরিয়ম-পুত্রকে প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একক মাবুদের ইবাদতের জন্য; তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তারা (আল্লাহর সাথে) যে শরিক সাব্যস্ত করে তা থেকে তিনি পবিত্র। [২]

আদি ইবনু হাতিম রায়িয়াল্লাহু আনহু, ইসলাম গ্রহণের আগে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলে তাকে এ আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনলাম—

اَتَخْذُوا اَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ اُبْنَ مَرْيَمَ وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَغْبُدُوا  
۱۷) إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ اِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী এবং মরিয়ম-পুত্রকে প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একক মাবুদের ইবাদতের

[১] সুরা শুঁয়া, আয়াত : ২১

[২] সুরা তাওবা, আয়াত : ৩১

## হালাল-হারামের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি



ছে

জন্য; তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তারা যে শরিক সাধ্যস্ত করে তা থেকে তিনি পবিত্র [১]

---

তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল, তারা (খ্রিস্টানরা) তো পাদরিদের পূজা করে না।’ তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, (সরাসরি তো পূজা করে না ঠিক আছে) কিন্তু তারা (ধর্মীয় গুরুরা) তাদের জন্য হালাল বস্তুকে হারাম করলে তারা (সাধারণ খ্রিস্টানরাও) সেটাকেও হারাম হিসেবে গ্রহণ করেছে, আর তারা (ধর্মীয় গুরুরা) তাদের জন্য হারাম বস্তুকে হালাল করলে তারাও (সাধারণ খ্রিস্টানরাও) সেটাকে হালাল বলে মেনে নিয়েছে। সুতরাং এটাই হলো তাদের (সাধারণ খ্রিস্টানদের) জন্য তাদের (ধর্মীয় গুরুদের) ইবাদততুল্য [২]

আরেক বর্ণনায় এসেছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে বলেন—

**أَمَّا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحْلُوْهُ ، وَإِذَا حَرَّمْوْهُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ**

শোনো, তারা (সাধারণ খ্রিস্টানরা) অবশ্য তাদের (ধর্মীয় গুরুদের) সরাসরি উপাসনা করত না। তবে তারা কোনো জিনিসকে যখন তাদের জন্য হালাল বলত তখন সেটাকে তারা হালাল বলে মেনে নিত। আবার তারা কোনো জিনিসকে যখন তাদের জন্য হারাম বলত তখন তারা নিজেদের জন্য সেটাকে হারাম বলে মেনে নিত [৩]

খ্রিস্টানদের একটা শ্রেণি বিশ্বাস করে, ঈসা আলাইহিস সালাম আকাশে উঠে যাওয়ার সময় তার শিষ্যদেরকে পূর্ণ কর্তৃত দিয়ে দিয়েছেন, তারা যা ইচ্ছা তা হালাল ও হারাম করতে পারবে। যেমন : মথির ইঞ্জিলে (১৮ : ১৮) এসেছে—

[১] সুরা তাওবা, আয়াত : ৩১

[২] আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ২০৩৫০; আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি, খড় : ১৭, পৃষ্ঠা : ২২, হাদিস : ২১৮; হাদিসটি হাসান।

[৩] জামিউত তিরমিয়ি : ৩০৯৫; আল-মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা, বাইহাকি : ২৫৯; হাদিসটি হাসান।

## ৩

আমি তোমাদের কাছে সত্যিই বলছি, তোমরা দুনিয়ায় যা বাঁধবে (হারাম করবে) তা বেহেশতেও বেঁধে রাখা হবে, আর যা খুলবে (হালাল করবে) বেহেশতেও তা খুলে দেওয়া হবে।

এমনিভাবে মক্কার মুশরিকরা নিজেদের ইচ্ছেমতো বৈধতা-অবৈধতার ঘোষণা দিত, তার নিম্না জানিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

فُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا فُلْ آللَّهُ أَذْنَ لَكُمْ أُمُّ عَلَى اللَّهِ تَفَتَّرُونَ ﴿٦﴾

আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযিক হিসেবে যা অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনোটাকে হারাম আর কোনোটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? বলুন, তোমাদের কি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর ওপর মিথ্যাচার করছ?<sup>[১]</sup>

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصْفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفَتَّرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١﴾

আর তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে, তাই বলে আল্লাহ তাআলার প্রতি মিথ্যা রঁটনা করার জন্য একথা বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহ তাআলার ওপর মিথ্যা রঁটনা করে, তারা সফলকাম হবে না<sup>[২]</sup>

এই সকল দ্ব্যর্থহীন আয়াত ও হাদিস দ্বারা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, হালাল-হারাম-বিষয়ক বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সেই

[১] সুরা ইউনুস, আয়াত : ৫৯

[২] সুরা নাহল, আয়াত : ১১৬

## হালাল-হারামের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি



৫৪

বিধান আসতে পারে তাঁর ঐশী গ্রন্থে কিংবা তাঁর রাসুলের জবানে। আর ফকিরগণ, তাদের দায়িত্ব কেবল হালাল-হারামের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার বিধান জানিয়ে দেওয়া। বিধান-প্রণয়ন তাদের দায়িত্ব নয়। বড় বড় ইমামগণ মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও ফাতওয়া দিতে ভয় পেতেন; একজনের কাছে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করলে, ভুল হওয়ার ভয়ে তিনি প্রশ্নকারীকে আরেকজনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ কিতাবুল উম্ম-এ কায়ি আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘বিজ্ঞ অনেক শাইখকে দেখেছি, কুরআন ও হাদিসে উল্লেখিত স্পষ্ট হালাল ও হারাম ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে ফাতওয়া দেওয়ার সময় সরাসরি কোনো কিছু সম্পর্কে ‘হালাল-হারাম’ শব্দ প্রয়োগ করতে অপছন্দ করতেন।’ রবি ইবনু খাইসাম রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন প্রথম সারির তাবিয়ি। ইবনুস সায়িব রাহিমাহুল্লাহ তার সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ‘তোমরা তার মতো হয়ে না, যে বলে, আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টি হালাল করেছেন বা পছন্দ করেছেন, তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি এটি হালাল করিনি এবং তাতে সন্তুষ্টও নই’; কিংবা সে বলে, আল্লাহ তাআলা এটি হারাম করেছেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, আমি এটি হারাম করিনি এবং এ ব্যাপারে নিয়েধও করিনি।’ (ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন,) এক সঙ্গী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ‘সালাফে সালিহিন ইজতিহাদি কোনো বিষয়ে বৈধতা বা অবৈধতার ফাতওয়া দিতে হলে বলতেন, এটি মাকরুহ কিংবা এতে কোনো সমস্যা নেই; আর আমরা যে বলি—‘এটি হালাল, আর এটি হারাম’ তা বড়ই গর্হিত কাজ।’<sup>[১]</sup>

এই তথ্যগুলো ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ পূর্ববর্তী ফকিরদের কর্মপন্থা হিসেবে বিবৃত করেছেন, সেগুলোকে ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ উন্ধৃত করে, তার সঙ্গে একমত্য প্রকাশ করলেন। এদিকে ইবনু মুফলিহ রাহিমাহুল্লাহ শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ থেকে উন্ধৃত করেন, তিনি বলেন, ‘সালাফে সালিহিন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হারাম ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে হারাম শব্দ ব্যবহারের অনুমতি দিতেন না।’<sup>[২]</sup>

[১] কিতাবুল-উম্ম, শাফিয়ি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৭১

[২] আল-আদাবুশ শারিয়াহ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০৮

## হালাল-হারামের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি

১৯

বিধান আসতে পারে তাঁর ঐশ্বী গ্রন্থে কিংবা তাঁর রাসুলের জবানে। আর ফকিরগণ, তাদের দায়িত্ব কেবল হালাল-হারামের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার বিধান জানিয়ে দেওয়া। বিধান-প্রণয়ন তাদের দায়িত্ব নয়। বড় বড় ইমামগণ মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও ফাতওয়া দিতে ভয় পেতেন; একজনের কাছে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করলে, ভুল হওয়ার ভয়ে তিনি প্রশ্নকারীকে আরেকজনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ কিতাবুল উম্ম-এ কাফি আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘বিজ্ঞ অনেক শাইখকে দেখেছি, কুরআন ও হাদিসে উল্লেখিত স্পষ্ট হালাল ও হারাম ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে ফাতওয়া দেওয়ার সময় সরাসরি কোনো কিছু সম্পর্কে ‘হালাল-হারাম’ শব্দ প্রয়োগ করতে অপচন্দ করতেন।’ রবি ইবনু খাইসাম রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন প্রথম সারির তাবিয়ি। ইবনুস সায়িব রাহিমাহুল্লাহ তার সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ‘তোমরা তার মতো হয়ে না, যে বলে, আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টি হালাল করেছেন বা পছন্দ করেছেন, তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি এটি হালাল করিনি এবং তাতে সন্তুষ্টও নই’; কিংবা সে বলে, আল্লাহ তাআলা এটি হারাম করেছেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, আমি এটি হারাম করিনি এবং এ ব্যাপারে নিষেধও করিনি।’ (ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন,) এক সঙ্গী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ‘সালাফে সালিহিন ইজতিহাদি কোনো বিষয়ে বৈধতা বা অবৈধতার ফাতওয়া দিতে হলে বলতেন, এটি মাকরুহ কিংবা এতে কোনো সমস্যা নেই; আর আমরা যে বলি—‘এটি হালাল, আর এটি হারাম’ তা বড়ই গর্হিত কাজ।’<sup>[১]</sup>

এই তথ্যগুলো ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ পূর্ববর্তী ফকিরদের কর্মপন্থা হিসেবে বিবৃত করেছেন, সেগুলোকে ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ উন্ধৃত করে, তার সঙ্গে একমত্য প্রকাশ করলেন। এদিকে ইবনু মুফলিহ রাহিমাহুল্লাহ শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ থেকে উন্ধৃত করেন, তিনি বলেন, ‘সালাফে সালিহিন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হারাম ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে হারাম শব্দ ব্যবহারের অনুমতি দিতেন না।’<sup>[২]</sup>

[১] কিতাবুল-উম্ম, শাফিয়ি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৭১

[২] আল-আদাবুল শারিয়াহ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০৮

## হালাল-হারামের বিধান

ইমাম আহমাদ ইবনু হাস্বল রাহিমাহুল্লাহ কোনো বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হলে বলতেন, ‘আমি এটা অপছন্দ করি’, অথবা বলতেন, ‘আমার কাছে এটা ভালো লাগে না’ বা বলতেন, ‘আমি এটা পছন্দ করি না’ কিংবা বলতেন, ‘আমি এটা ভালো মনে করি না’। এ জাতীয় মন্তব্য ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ, আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-সহ বাকি অন্যান্য ইমামের থেকেও পাওয়া যায়। রাহিমাহুল্লাহ!

### তৃতীয় মূলনীতি : হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করা শিরক

হালালকে হারামকারী আর হারামকে হালালকারী, দুই দলের কর্মকাণ্ডেরই কঠোর নিন্দা বর্ণিত হয়েছে কুরআনে। তবে তুলনামূলকভাবে অধিকতর কঠোর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে হালালকে হারামকারীর নিন্দার ক্ষেত্রে। কারণ, কোনো কিছু হারাম করলেই আমাদের জীবনে বিভিন্ন সংকট ও সংক্রীণতা সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত দীনদারগণ ক্ষেত্রবিশেষ এই ধরনের সংক্রীণতা সৃষ্টির পায়তারা চালায়। তাই এক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়েছে।

দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত অপছন্দ ছিল। এর প্রতিরোধকল্পে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টাও চালিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

**أَلَا هُنَّ الْمُنْتَطَعُونَ ، أَلَا هُنَّ الْمُنْتَطَعُونَ**

শুনে রাখো, অতিরিক্ত বাড়াবাড়িকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। অতিরিক্ত বাড়াবাড়িকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। অতিরিক্ত বাড়াবাড়িকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে।<sup>[১]</sup>

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রিসালাতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ঘোষণা দিতে গিয়ে বলেন—

**إِنِّي أَرْسَلْتُ بِحَنِيفِيَّةَ سَمْحَةٍ**

নিশ্চয় আমি সঠিক ধর্মমত ও উদারতার সঙ্গে প্রেরিত হয়েছি।<sup>[২]</sup>

[১] সহিহ মুসলিম : ২৬৭০; সুনানু আবি দাউদ : ৪৬০৮

[২] সুনানু আহমাদ : ২৪৮৫৫; হাদিসুস সাররাজ : ২১৪৮; হাদিসতি হাসান।

## হালাল-হারামের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি



সুতরাং এই দ্বীন আকিন্দা ও তাওহিদের ব্যাপারে সুদৃঢ় এবং আমল ও শারয়ি বিধানের ক্ষেত্রে উদার ও সহজ। আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক ও হালালকে হারামকরণ এই দ্বীনের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। একটি হাদিসে কুদসিতে এই দুটি জিনিস একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুয়ং বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي خَنَفَاءَ كُلُّهُمْ ، وَإِنَّهُمْ أَتَتُهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ ،  
 وَحَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَقْتُ لَهُمْ ، وَأَمْرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا

আমি আমার সকল বাল্দাদেরকে একনিষ্ঠ (মুসলিম) হিসেবে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাদের কাছে শয়তান এসে তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে সরিয়ে দেয়। আমি যে সমস্ত জিনিস তাদের জন্য হালাল করেছিলাম সে তা হারাম করে দেয়। শুধু তা-ই নয়, সে তাদেরকে আমার সাথে শরিক (অংশীদার) সাব্যস্ত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে, যে বিষয়ে আমি কোনো প্রমাণ পাঠাইনি।[১]

হালালকে হারাম বলা শিরকের মতো জঘন্য কাজ। মুশরিকদের মতে বাহিরা (বিদীর্ঘ কানবিশিষ্ট উক্তী), সায়িবা (মুস্ত-স্বাধীন উক্তী), অসিলাহ (পরপর দুবার মাদি বাচ্চা প্রসবকারী উক্তী), হামি (প্রজননের জন্য ব্যবহৃত উট)-এর মতো বিভিন্ন হালাল প্রাণী খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। অথচ আল্লাহ তাআলার বিধানে এগুলো কখনোই নিষিদ্ধ ছিল না। শিরকের মতো এ ধরনের (হালালকে হারামকরণ) কর্মকাণ্ডেরও কঠোর নিষ্পা জানিয়েছেন মহান আল্লাহ।

কোনো উটের পাঁচটি বাচ্চা হয়েছে। শেষ বাচ্চাটি হয়েছে মাদি। তাহলে নিয়ম ছিল সেই উটের কান কেটে উপাস্যদের নামে ছেড়ে দিতে হবে। এরপর এই উটের জবাই, তাতে আরোহণ ও বোৰা বহন সবই নিষিদ্ধ। এই উটের পানি পানে বা ঘাস খেতে বাধা দেওয়া গুনাহের কাজ। তারা একে বলত বাহিরা, যার অর্থ ‘কান-কাটা’।

কেউ সফর থেকে ফিরলে বা রোগমুস্ত হলে কিংবা বড়সড় বিপদ থেকে মুক্তি পেলে আরবের লোকেরা উপাস্যদের নামে উট উৎসর্গ করত। উৎসর্গিত প্রাণীকে তারা বলত সাইবা। অর্থাৎ যাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

[১] সহিহ মুসলিম : ২৮৬৫; সহিহ ইবনি হিবান : ৬৫৩, ৬৫৪

## হালাল-হারামের বিধান

বকরি মাদি বাচ্চা জন্ম দিলে মুশরিকরা সেটাকে নিজেদের জন্য রাখত। আর নর বাচ্চা জন্ম নিলে, সেটা তারা উপাস্যদের জন্য জবাই করত। কোনো বকরি থেকে মাদি ও নর দুটোই এক সঙ্গে জন্ম নিলে তখন তারা বলত, মাদি বাচ্চা নর বাচ্চার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ফলে তারা নর বাচ্চাটাকে আর তাদের উপাস্যদের জন্য জবাই করত না। এই নর বাচ্চাটির নাম রাখা হতো ‘অসিলাহ’।

বড় উট নিজের বাচ্চার বাচ্চার সঙ্গে সংগমে লিপ্ত হলে, তারা বলত, এটি পিঠ রক্ষা করে ফেলেছে। তাই এতে চড়া বা বোঝা বহনের অনুমতি নেই। তাদের ভাষায় এর নাম ছিল ‘হামি’। এই শব্দগুলোর অর্থ সম্পর্কে আরো অনেক ধরনের মতামত ও ব্যাখ্যা আছে।<sup>[১]</sup>

যাহোক, কুরআনে এই অবৈধকরণ প্রক্রিয়ার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে কঠোর ভাষায়। এ ধরনের বিচুতির ক্ষেত্রে বাপ-দাদার অনুসরণও নিষিদ্ধ। কুরআন বলছে—

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا حَامِ لَوْلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ بِمَا أَكْتَرُهُمْ لَا يَغْقِلُونَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ ۝ قَالُوا حَسِبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا حَوْلَ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝

আল্লাহ বাহিরা, সায়িবা, অসিলা ও হামি বিধিবদ্ধ করেননি। কিন্তু যারা কুফরি করেছে, তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকে। বস্তুত

[১] এ শব্দগুলোর ব্যাখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। তবে সহিল বুখারিতে যে ব্যাখ্যা এসেছে, সেটাই অধিক বিশুদ্ধ। বর্ণনাটি সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব রাহিমাহুমাহর উপরি হিসেবে বর্ণিত হলেও শেষে ইমাম সহিল বুখারি রাহিমাহুমাহ ভিন্ন সনদে উল্লেখ করেছেন যে, এ ব্যাখ্যা তিনি আবু হুরায়রা রায়িয়ামাহ আনহু সূত্রে নথিতি সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম থেকে শুনেছেন। বর্ণনাটি নিম্নরূপ—

সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব রাহিমাহুমাহ বলেছেন, বাহিরা البحيرة অস্তুর স্তন প্রতিমার উদ্দেশে সংরক্ষিত থাকে কেউ তা দোহন করে না। সায়িবা الصبيبة যে অস্তু তারা তাদের উপাস্যদের নামে ছেড়ে দিত এবং তা দিয়ে বোঝা বহন করা হতো না। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা রায়িয়ামাহ আনহু বলেন যে, রাসুলুমাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, আমি আমর ইবনু আগির খুয়ায়িকে জাহানামের মধ্যে দেখেছি, সে তার নাড়ির্ঢ়ি টানছে। সে-ই অথবা ব্যক্তি, যে ‘সায়িবা’ প্রথা চালু করে। অসিলা الوصيلة যে উক্তি অথবারে মাদি বাচ্চা প্রসব করে এবং পিতৃযুবারেও মাদি বাচ্চা প্রসব করে, এই উক্তিকে তারা তাদের উপাস্যদের উদ্দেশে ছেড়ে দিত। হামি الحامي নর উট, যা দাঙা কয়েকবার প্রজনন কার্য সম্পন্ন করা হয়। প্রজনন কার্য সমাপ্ত হলে সেটাকে তারা তাদের উপাস্যদের জন্য ছেড়ে দেয় এবং বোঝা বহন থেকে উটাকে মুক্তি দেয়। সেটির ওপর কোনো কিন্তু বহন করা হয় না। এটাকে তারা ‘হাম’ নামে অভিহিত করত। [সহিল বুখারি : ৪৬২৩]

তাদের অধিকাংশ বোঝে না। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রাসুলের দিকে এসো, তখন তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যেটাতে পেয়েছি, সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ (সঠিক ধর্মের) কিছুই জানত না এবং সংপথপ্রাপ্তও ছিল না, তবু? [১]

মুশরিকদের মতে উট, গাড়ী, ভেড়া-বকরিসহ বিভিন্ন পশু হারাম ছিল। তাদের এ ধরনের অঙ্গুত কর্মকাণ্ডের সমালোচনায় ঠাট্টার সুরে কিন্তু লা-জাওয়াব ভাষায় আল্লাহ তাআলা বলেন—

شَهَادَةُ أَزْوَاجٍ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَمِنَ الْمَغْرِبِ الْثَّيْنِ ۖ قُلْ أَذْكُرْنِ حَرَمَ أُمِّ الْأَنْثَيْنِ أَمَا  
اشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ تَسْتُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١﴾ وَمِنَ الْإِبْلِ الْأَنْثَيْنِ وَمِنَ  
الْبَقَرِ الْأَنْثَيْنِ ۖ قُلْ أَذْكُرْنِ حَرَمَ أُمِّ الْأَنْثَيْنِ أَمَا اشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ أُمِّ كُنْتُمْ  
شُهَدَاءٍ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلِّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢﴾

(তিনি সৃষ্টি করেছেন) ৮ প্রকারের জোড়া। মেষ থেকে দুটি, ছাগল থেকে দুটি। আপনি বলুন, নরদুটিকে তিনি হারাম করেছেন নাকি মাদিদুটিকে? নাকি তা, যা মাদিদুটির পেটে আছে? তোমরা প্রমাণসহ আমাকে অবহিত করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। আর উট থেকে দুটি এবং গাড়ী থেকে দুটি। আপনি বলুন, নরদুটিকে তিনি হারাম করেছেন নাকি মাদিদুটিকে? নাকি তা, যা মাদিদুটির পেটে আছে? অথবা তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছিলেন? সুতরাং তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে না জেনে মানুষকে বিদ্রোহ করার জন্য আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত করেন না [২]

সুরা আরাফে আরেকটি সমালোচনা রয়েছে। ওখানে আল্লাহ তাআলা অবৈধকারীদের কাজের নিদার পাশাপাশি নিষিদ্ধতার নিরসন মূলনীতি বলে দিয়েছেন—

[১] সুরা মায়দা, আয়াত : ১০৩-১০৪

[২] সুরা আনআম, আয়াত : ১৪৩-১৪৪

فُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ فُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ ۱۵۴ فُلْ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّي  
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيُ يُغَيِّرُ الْحَقَّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ  
بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ۱۵۵

আপনি বলুন, আল্লাহর শোভা-সৌন্দর্য, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহ কে হারাম করেছে? আপনি বলুন, পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এসব তাদের জন্য, যারা সীমান আনে। এমনিভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি। আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপ, অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন, কোনো কিছুকে আল্লাহর অংশীদার করা—যার কোনো প্রমাণ তিনি নায়িল করেননি এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা তোমরা জানো না [১]

এসব সমালোচনা ও বিতর্ক প্রায় সব মাকি সুরাতেই এসেছে। মাকি সুরাগুলোর মধ্যে সাধারণত গুরুত্ব পেয়েছে আকিদা, একত্ববাদ ও পরকালীন বিষয়াবলি। এতে বোঝা যায়, কুরআনের দৃষ্টিতে এগুলো আসলে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কোনো শাখাগত বা ছোটখাটো বিষয় নয় মৌটেও।

মাদানি জীবনে এসে আমরা দেখি, কিছু মুমিন কঠোরতা, বৈরাগ্য ও বৈধ জিনিসের মধ্যে সীমাবন্ধতার দিকে ঝুঁকতে চেয়েছিলেন। তাদেরকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ তাআলা দ্যর্থহীন ভাষায় কিছু আয়াত অবর্তীর্ণ করলেন। ফলে তারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পথে ফিরে এসেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَغْنِدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُغْنِدِينَ ۝ ۱۵۶ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ خَلَالًا طَيِّبًا وَأَنْقُوا اللَّهُ الَّذِي أَنْشَمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

হে মুমিনগণ, আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন সেগুলোকে তোমরা হারাম কোরো না এবং সীমালঙ্ঘন কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ৩২-৩৩

হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে খাও এবং আল্লাহর তাকওয়া  
অবলম্বন করো, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী [১]

### চতুর্থ মূলনীতি : নিষিদ্ধতার কারণ নিকৃষ্টতা ও ক্ষতি

আল্লাহ তাআলা হলেন মানবজাতির স্বষ্টি, তাদের প্রতি অফুরন্ত নিয়ামত বর্ণকারী।  
হালাল-হারাম তাঁর ইচ্ছে অনুসারেই নির্ধারিত হয়। কোনো ইবাদত ফরজ বা  
অপরিহার্য করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার। তাঁর কোনো বিধানে আপনি  
উত্থাপন কিংবা নির্দেশের অবাধ্য হওয়ার অধিকার কারো নেই, কিন্তু আল্লাহ  
তাআলা বান্দাদের প্রতি করুণাবশত প্রতিটি জিনিসের পেছনে যুক্তিসংগত কারণ  
রেখেছেন, মানুষের কল্যাণের বিষয় বিবেচনায় নিয়েছেন, ফলে তিনি উপকারী ও  
কল্যাণকর ছাড়া কিছুই হালাল করেননি এবং ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক উপাদান ছাড়া  
কিছুই হারাম করেননি।

এ কথা সত্য, আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের জন্য অনেক বৈধ জিনিসও হারাম করে  
রেখেছিলেন। তবে এগুলো সবই ছিল সাময়িক ও তাদের অবাধ্যতার শাস্তিসূরূপ।  
আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنِيمِ حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا  
حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَابِيَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظِيمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ⑯

ইহুদিদের জন্য আমি নখরযুক্ত সমস্ত জন্ম হারাম করেছিলাম। তাদের জন্য  
আরও হারাম করেছিলাম গরু ও ছাগলের চর্বি। তবে এগুলোর পিঠ, ভুঁড়ি ও  
হাড়সংলগ্ন চর্বি ছিল এর ব্যতিক্রম। তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম তাদেরই  
অবাধ্যতার কারণে। নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী [২]

তাদের অবাধ্যতার বিবরণ এসেছে কুরআনের অন্য আরেকটি আয়াতে। আল্লাহ  
তাআলা বলেন—

[১] সুরা মায়দা, আয়াত : ৮৭-৮৮

[২] সুরা আনআম, আয়াত : ১৪৬

فِيظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أَحِلَتْ لَهُمْ وَبَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا  
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَغْنَيْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ  
عَذَابًا أَلِيمًا

পূর্বে বৈধ করা হয়েছিল এমন অনেক ভালো জিনিস আমি ইহুদিদের জন্য অবৈধ করে দিয়েছি তাদের সীমালঞ্চনের কারণে এবং আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দেওয়ার কারণে। নিষেধ করা সত্ত্বেও সুদগ্রহণের কারণে এবং অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভোগ করার কারণে। আর তাদের মধ্যে যারা কাফির, তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি [১]

পরিশেষে সমগ্র পৃথিবীর রাসুল হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে পাঠালেন চিরস্তন ধর্ম ইসলাম দিয়ে। ইহুদিদের জন্য সাময়িক নিষিদ্ধ বস্তুগুলো আবার তাদের এবং সকলের জন্য করে দিলেন হালাল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَبَيْحُلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ  
عَلَيْهِمْ ...

যারা অনুসরণ করে এই রাসুলের অর্থাৎ উম্মি নবির, যার উল্লেখ তারা দেখতে পায় নিজেদের কাছে থাকা তাওরাত ও ইঙ্গিলে, যে তাদেরকে ভালোকাজ করতে বলে এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং যে তাদেরকে ভার ও শৃঙ্খলমুক্ত করে। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান ও সাহায্য করে এবং অনুসরণ করে তার সাথে প্রেরিত আলোর, তারাই সফলকাম [২]

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ১৬০-১৬১

[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৫৭

## হালাল-হারামের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি



গুনাহ মাফের জন্য হালাল জিনিস হারাম করার পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য তাওবার দরজা খুলে দিয়েছেন। পানি ঢাললে যেভাবে ময়লা পরিষ্কার হয়, আন্তরিক তাওবা দ্বারাও সেভাবে গুনাহ মুছে যায়। পুণ্য পাপকে দূর করে, পানির মতো সাদাকা গুনাহের আগুন নিভিয়ে দেয়, বিভিন্ন বালা-মুসিবত ও বিপদাপদের কারণে শীতকালীন গাছের পাতার মতো আমাদের গুনাহগুলো বরে পড়ে যায়।

এথেকে একটি মূলনীতি স্পষ্ট হলো—হারামের পেছনে কারণ হলো অনিষ্ট ও ক্ষতি। সুতরাং যে বস্তু নিরেট ক্ষতিকর, সেটা হারাম; যেটা স্বেফ কল্যাণকর, সেটা হালাল। আর যার অকল্যাণ কল্যাণের চেয়ে গুরুতর, সেটাও হারাম; আর যার উপকার অপকারের চেয়ে অনেক বেশি, সেটাও হালাল। এই বিষয়টি পবিত্র কুরআনে মদ ও জুয়ার আলোচনায় খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ... [১]

তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এ দুটির মধ্যে রয়েছে মহাপাপ, আবার মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে।

তবে এর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অধিক গুরুতর [১]

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, ইসলামে হালাল কী? উত্তর হিসেবে বলা যেতে পারে, ‘উত্তম বস্তুসমূহ’। কোনো অভ্যাস বা রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ছাড়া সবার কাছে যা ভালো লাগে এবং একজন সুস্থ-বিবেকসম্পন্ন মানুষের কাছে যা উত্তম মনে হয়, তা-ই হালাল। যেমন কুরআনে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَسْأَلُونَكُمْ مَاذَا أَحِلٌ لَهُمْ قُلْ أَحِلٌ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ... [২]

তারা আপনার কাছে জানাতে চায়, তাদের জন্য কী হালাল? আপনি বলে দিন, তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। [২]

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২১৯

[২] সুরা মায়দা, আয়াত : ৪

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

الْيَوْمَ أَجِلٌ لِّكُمُ الطُّبُّابُ...  
◎

আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হলো।<sup>[১]</sup>

যেকোনো বস্তু হারাম হওয়ার পেছনে কী ধরনের ক্ষতি বা অকল্যাণ আছে, হারামকে হারাম হিসেবে মানার জন্য সেটা জানা জরুরি কিছু নয়। হতে পারে একটি বস্তু হারামের কারণ একজনের কাছে স্পষ্ট, কিন্তু অন্যজনের কাছে সেটা স্পষ্ট নয়। আবার কখনো একটি বস্তুর ক্ষতিকর দিকটি এক যুগে স্পষ্ট হয়নি, পরের যুগে এসে স্পষ্ট হয়েছে। তাই মুমিনের কর্তব্য হলো—সে সবসময় বলবে, ‘আমরা শুনলাম ও মানলাম।’

শূকরের মাংস হারাম। কিন্তু প্রথম যুগের মুমিনদের কাছে শূকর হারামের কারণ স্পষ্ট ছিল না, তবে তাদের ধারণা ছিল ঘৃণ্যতার কারণে শূকর হারাম হয়েছে। অনেক পরে এসে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, শূকরের মধ্যে মারাত্মক ক্ষতিকর জীবাণু ও ভয়ংকর সব ব্যাকটেরিয়া রয়েছে! যদি বিজ্ঞান এসব জিনিস আবিষ্কার নাও করত কিংবা এর চেয়ে ভয়ানক কিছু আবিষ্কার করত, সর্বাবস্থায় একজন প্রকৃত মুমিন তার বিশ্বাসে অটল থাকত যে, শূকর একটি অপবিত্র ও হারাম প্রাণী।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞামূলক দিক-নির্দেশনায় আমরা একই ধরনের বিষয় দেখতে পাই। বিভিন্ন বিষয়ে তার নিষেধাজ্ঞার কারণ এক সময় অস্পষ্ট থাকলেও পরবর্তী সময়ে এসে তা একেবারে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবিদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

أَنْقُوا الْلَّعَانِينَ قَالُوا: وَمَا الْلَّعَانِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّ فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ

তোমরা অভিসম্পাতের দুটি কারণ থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, অভিসম্পাতের সে দুটি কারণ কী, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন,

[১] সুরা মায়দা, আয়াত : ৫

## হালাল-হারামের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি

৬৯

মানুষের যাতায়াতের রাস্তায় অথবা তাদের (বিশ্রাম নেওয়ার) ছায়ায় প্রস্রাব-পায়খানা করা।[১]

অন্য বর্ণনায় মুআয ইবনু জাবাল রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

**أَقْوِ الْمَلَائِكَةُ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةُ الْطَّرِيقِ، وَالظَّلَّ**

তোমরা তিনটি অভিশপ্ত কাজ থেকে বেঁচে থাকো। সেগুলো হচ্ছে পানি নেওয়ার স্থানে, চলাচলের পথে ও ছায়াবিশিষ্ট জায়গায় মলত্যাগ করা।[২]

কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত সবাই মনে করত, এগুলো খুবই নেংরা কাজ, সুস্থ রুচির মানুষমাত্রই একে ঘৃণা করে, তাই ইসলামেও এগুলো হারাম। কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কার থেকে আমরা জানতে পারলাম, এসব স্থানে মলত্যাগ করা সামগ্রিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর। প্রধানত, এর মাধ্যমেই অ্যানাইলোস্টোমা ও বিলহার্জিয়ার মতো সংক্রামক শিশু-রোগগুলো ছড়ায়।

এভাবে বিজ্ঞানের উন্নতি ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, ইসলামি বিধানের পেছনে কারণ ও কল্যাণ সম্পর্কে আমরা জানতে পারছি এবং ভবিষ্যতে আরো জানতে পারব। আর এটাই স্বাভাবিক, কারণ এই বিধানগুলো সবই প্রজ্ঞাবান দয়াময় ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

.....  
⑩...وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا غَنِثَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আল্লাহ জানেন কে উপকারকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আর আল্লাহ ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অবশ্যই কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।[৩]

[১] সহিহ মুসলিম : ২৬৯; শারহুস সুনাহ, বাগাবি : ১৯১

[২] সুনানু আবি দাউদ : ২৬; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩২৮; হাদিসটি হাসান।

[৩] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২০

## হালাল-হারামের বিধান

### পঞ্চম মূলনীতি : হালালের মধ্যে হারামের বিকল্প

ইসলামে কিছু হারাম হলে, বিকল্প হিসেবে তার থেকে উত্তম কিছু দেওয়া হয়, যার দ্বারা সেই প্রয়োজন আরো সুন্দরভাবে পূরণ হয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তির দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা হারাম করে তার পরিবর্তে ইসতিখারা করার বিধান দেওয়া হয়েছে; সুদ হারাম করে ব্যবসা বৈধ করা হয়েছে; জুয়া হারাম করে উট-ঘোড়া ও তিরন্দাজি ইত্যাদি উপকারী খেলার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে (জ্যোতীন) পুরস্কার অর্জনের বিধান দেওয়া হয়েছে; রেশম হারাম করে বিকল্প হিসেবে অন্যান্য সকল কাপড় সুতি, কাতান, পশমি সব বৈধ করা হয়েছে; ব্যভিচার ও সমকামিতা হারাম করে বিয়ে হালাল করা হয়েছে; নেশাজাতীয় দ্রব্য হারাম করে বিভিন্ন সুস্বাদু জুস ও ফলের রস বৈধ করা হয়েছে; ক্ষতিকর খাদ্যদ্রব্য নিষিদ্ধ করে উপকারী ও স্বাস্থ্যকর বস্তুকে হালাল করা হয়েছে।<sup>[১]</sup>

এভাবে ইসলামের বিধানাবলির প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকালেই আমরা দেখতে পাব, আল্লাহ তাআলা বান্দাদের ওপর একদিকে কঠোরতা আরোপ করলে অন্যদিকে অবশ্যই প্রশস্ততা দিয়েছেন; আল্লাহ তাআলা বান্দাদের ওপর কখনোই কোনো কষ্ট, বোৰা কিংবা কঠোরতা চাপিয়ে দিতে চান না; বরং তাদের জন্য তিনি চান—সহজতা, কল্যাণ, হিদায়াত ও দয়া। মহান করুণাময় আল্লাহ তাআলা বলেন—

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُئَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْنِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  
 ⑩ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْنِكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَبَعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مِنْ لَا عَظِيمًا  
 ⑪ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخْفِفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ⑫

[১] তবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে, পৃথিবীর সব হারামের বিকল্প রাখা হয়নি। বরং যেসব বিষয় মানুষের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর কেবল সেসব ক্ষেত্রেই আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য হারামের বিকল্প কোনো হালাল ব্যবস্থা রেখেছেন। সূতরাং দুনিয়ার যেকোনো হারামের বিকল্প হিসেবে হালাল খোঁজার মানসিকতা রাখলে দেখা যাবে, দীন-শরিয়তকে বিকৃত করে একসময় মানুষ হারামকে বিভিন্ন অপব্যাখ্যার সাহায্যে হালাল করে নেবে; অথচ এটা কখনো শরিয়তের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। তাই সকল হারামের বিপরীতে হালাল খোঁজার মানসিকতা বন্ধ করতে হবে। বস্তুত যেটায় মানুষের উপকার আছে, আল্লাহ সেখানে অবশ্যই হালাল ব্যবস্থা রেখেছেন, আর যেখানে কোনো কল্যাণ নেই সেখানে কেবল নিজের প্রবৃত্তির খাহেসাত পূরণের জন্য হারামের বিকল্প খোঁজা মূলত শয়তানের ধোঁকা বৈ কিছু নয়। বিষয়টি খুবই সূক্ষ্ম ও অনুরূপি, তাই এ ব্যাপারে আমাদের খুব সচেতন থাকা কর্তব্য।

## হালাল-হারামের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি

৩১

আল্লাহ ইচ্ছে করেন তোমাদের কাছে বিশদভাবে বিবৃত করতে, পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি তোমাদেরকে অবহিত করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান, আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায়, তোমরা ভীষণভাবে পথচায়ত হয়ে পড়ো। আল্লাহ তোমাদের ভার কমাতে চান; আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলরূপে।<sup>[১]</sup>

### ষষ্ঠ মূলনীতি : যা হারামের দরজা খুলে দেয় তা-ও হারাম

ইসলামের অন্যতম একটি মূলনীতি হলো—যখন কোনো বিষয় নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হয়, তখন সেই কাজে উক্ষে দেয় এমন উপসর্গও ইসলামে হারাম হয়ে যায়, সেই কাজে লিপ্ত হওয়ার সকল দরজা বন্ধ করার জন্য। যেমন : ব্যভিচার হারাম। ব্যভিচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল উপসর্গ ও প্ররোচনার উপায়—নারীদের নির্লজ্জ প্রদর্শনী, নারী-পুরুষ একান্তে সময় কাটানো, অবাধ মেলামেশা, পর্নোগ্রাফি, যৌন সুড়সুড়িমূলক সাহিত্য ও অশ্লীল গান ইত্যাদিও হারাম করা হয়েছে।

এখান থেকে ফিকহ বিশেষজ্ঞগণ মূলনীতি দাঁড় করিয়েছেন, যা হারামের দিকে টেনে নিয়ে যায়, সেটাও হারাম। এমন আরেকটি বিধান হলো সুদের বিধান। সুদ গ্রহণের গুনাহ কেবল গ্রহীতার ওপর সীমাবন্ধ নয়, এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলের ওপরেই গুনাহের দায় চাপবে, প্রতেকেই তার অংশগ্রহণের অনুপাতে গুনাহের ভাগীদার হবে। মদের ক্ষেত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদ পানকারী, মদ প্রস্তুতকারী, মদ বহনকারী, মদের ক্রেতা ও বিক্রেতাসহ সবাইকে অভিসম্পাত করেছেন।

সুদের ক্ষেত্রে, সুদখোর, সুদদাতা, সুদের হিসাবরক্ষক ও সাক্ষীদ্বয় সবাইকে অভিসম্পাত করেছেন। এগুলো সবই হারাম কাজের সহযোগী হিসেবে হারাম হয়েছে। কোনো হারাম কাজে সহযোগীমাত্রাই সে পাপের ভাগীদার।

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ২৬-২৮



## হালাল-হারামের বিধান

### সপ্তম মূলনীতি : হারাম কাজে কৌশল করাও হারাম

হারামের দিকে টেনে নিয়ে যায় এমন প্রকাশ্য ও বাহ্যিক কারণ ও উপসর্গ যেমন ইসলামে হারাম, তেমনি গোপন ও শয়তানি উপায়ের মাধ্যমেও যেন হারামকে কৌশলে হালাল বানানো না যায়, তাই এ ধরনের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগও হারাম। ইহুদিরা বিভিন্ন সময় কৌশলে হারামকে হালাল বানিয়ে নিয়েছিল, আল্লাহ তাআলা কঠোর ভাষায় তাদের এসব কাজের নিম্না জানিয়েছেন।

আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا تَرْتَكِبُوا مَا أَرْتَكَبْتُ إِلَيْهِمْ دُدُّ، فَقَسْتَ حِلْوًا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَذْنِي الْجِيلِ

| ইহুদিরা যেভাবে অপরাধে জড়িয়ে পড়েছিল তোমরা সেভাবে অপরাধে জড়িয়ে পোড়ো না; যার কারণে সামান্য কুটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে তোমরা আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল বানিয়ে ফেলবে।[১]

আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের জন্য শনিবার মৎস-শিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন, কিন্তু সেদিনই সাধারণত মাছ বেশি আসত। তাই তারা কৌশল করল যে, শুক্রবার গর্ত খুঁড়ে রাখবে। এরপর শনিবার মাছ এসে তাদের পাতা ফাঁদে আটকা পড়লে রবিবার তারা মাছগুলো ধরবে। এটা কৌশলীদের কাছে হয়তো বৈধ, কিন্তু ইসলামি আইন-বিশারদদের কাছে এগুলো সবই হারাম। কেননা এখানে মূল উদ্দেশ্যই হলো শিকার থেকে বিরত রাখা, সেই শিকার যেভাবেই হোক না কেন।

আরেকটি অসৎ কৌশল বা প্রতারণার মাধ্যম হলো, হারাম বস্তুটিকে ভিন্ন একটি নাম দেওয়া। অর্থাৎ মূল জিনিস বহাল তবিয়তে রেখে কেবল প্যাকেট বা বোতল পাল্টানো। মনে রাখতে হবে, বস্তু হারাম হলে তার নাম ও পদ্ধতি পরিবর্তন কিংবা পরিশীলন তা হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বিবেচনায় আসবে না।

সুদ বা মদ নতুন কোনো নাম বা রূপে বাজারজাত করলেও সুদ বা মদ গ্রহণের

[১] ইবতালুল হিয়াল, ইবনু বাত্তাহ, পৃষ্ঠা : ৪৬; হাদিসটি হাসান।

## হালাল-হারামের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি

৭৩

নিষিদ্ধতা ও গুনাহ যথারীতি বহাল ত্বিয়তে থাকবে।

আবু মালিক আল-আশআরি রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

**لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا**

|      আমার উচ্চতের একদল লোক মদ পান করবে এবং তারা একে ভিন্ন নামে  
|      অভিহিত করবে।<sup>[১]</sup>

ইমাম আওয়ায়ি রাহিমাহুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম বলেছেন—

**يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُسْتَحَلُّ فِيهِ الرِّبَا بِالْبَيْعِ**

|      মানুষের জন্য এমন একটি সময় আসবে, যখন ব্যবসার নামে সুদকে হালাল  
|      মনে করা হবে।<sup>[২]</sup>

আশর্ফের বিষয় হলো, আমাদের সময়ে এসে অশ্লীল নাচ-গান হয়ে গিয়েছে শিঙ্গ,  
মদ হয়ে গিয়েছে প্রাণসঞ্চারক পানীয়, আর সুদ হয়ে গিয়েছে ইন্টারেস্ট বা লভ্যাংশ।

### অষ্টম মূলনীতি : ভালো নিয়তে করলেও হারাম কাজ হারামই

ইসলামি শরিয়তে আইন-কানুন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মনের সুচ্ছতা, সদিচ্ছা ও নিয়তের  
সততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। আর ইসলাম একে যথাযথ মূল্যায়নও

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৩৬৮৮; সুনানুন নাসায়ি : ৫৬৫৮; হাদিসটি সহিহ।

[২] গারিবুল হাদিস, খাত্তাবি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১৮; তাহফিবুস সুনান, ইবনুল কাইয়িম, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৬৪৬; হাদিসটি মুরসাল। ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এ হাদিসটিকে মুরসাল আখ্যা দিয়ে বলেন, ফকিহগণের সকলের ঐকমত্যে মুরসাল সহায়ক হাদিস হিসেবে গ্রহণযোগ্য। [আল-ফাতাওয়াল কুবরা, ইবনু  
তাইমিয়া, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪১] ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ হাদিসটি যদিও মুরসাল, কিন্তু  
সবাই ঐকমত্যে সহায়ক হিসেবে তা গ্রহণযোগ্য। এটার সমর্থনের অনেক মুসলিম হাদিস রয়েছে, যেগুলো  
এটার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। [ইগাসাতুল লাহফান, পৃষ্ঠা : ৩৫২] হাফিয়ুল হাদিস সাখাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,  
এ মুরসাল হাদিসটি গ্রহণ করার উপযুক্ত। উপরন্তু এটার মাধ্যমে মুসলিম হাদিস আরো শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হয়।  
[আল-আজভিবাতুল মারযিয়াহ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১৪]

করেছে। যেমন উমার ইবনুল খাতাব রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ افْرِئٍ مَا نَوَى

| আমলসমূহ (এর প্রাপ্তি) নিয়তের সাথেই সম্পৃক্ত। আর প্রত্যেক মানুষ তার নিয়ত অনুসারেই প্রতিফল পাবে।[১]

এরই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখি, নিয়তের মাধ্যমে বিভিন্ন বৈধ সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-আচরণও সাওয়াব ও পুণ্যের কাজ এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়।

জীবনধারণ ও শরীর ঠিক রাখার জন্য একজন মুসলিম খাবার গ্রহণ করল, সঙ্গে নিয়ত করে নিল, সে যেন তার ওপর আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির পক্ষ থেকে আরোপিত কর্তব্যগুলোকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পালন করতে পারে, তাহলে তার এই খাদ্য-পানীয় গ্রহণও পুণ্যের কাজ বলে গণ্য হবে।

এমনিভাবে কেউ নেকসন্তান লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা নিজের ও স্ত্রীর চরিত্র সংরক্ষণের নিয়তে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলো, তাহলেও সে এর মাধ্যমে পুণ্যের অধিকারী হবে। এ ব্যাপারে আবু যর রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

وَقَوْيَ بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْ أَتَيْ أَحَدُنَا شَهْوَةً وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

| আর তোমাদের লজ্জাস্থানের ক্ষেত্রেও সাদাকা রয়েছে। (অর্থাৎ আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সাদাকা।) সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের কেউ তার কাম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে, তবু কি এতে তার সাওয়াব হবে? তিনি বললেন, তোমরা বলো তো দেখি, যদি তোমাদের কেউ হারাম পথে নিজের কাম চাহিদা মেটাত (অর্থাৎ যিনা করত) তাহলে কি তার

[১] সহিহুল বুখারি : ১; সহিহ মুসলিম : ১৯০৭

## হালাল-হারামের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি

৭৫

| গুনাহ হতো না? অনুরূপভাবে যখন সে হালাল পথে নিজের ঘোনচাহিদা পূরণ  
করবে তাতে তার সাওয়াব হবে।<sup>[১]</sup>

আরেক হাদিসে আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

**مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِغْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَسَعَيَّا عَلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَعْطُفًا عَلَىٰ جَارِهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ**

| যে ব্যক্তি ভিক্ষা থেকে বিরত থাকতে, পরিবারের ভরণ-পোষণ আদায় করতে,  
প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহের নিয়তে হালাল রিয়িক তালাশ করে, সে (কিয়ামতের  
দিন) আল্লাহ তাআলার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার চেহারা  
পূর্ণিমার চাঁদের মতো বালমল করতে থাকবে।<sup>[২]</sup>

এভাবে একজন মুমিন বৈধ ঘেকোনো কাজ নিয়তের মাধ্যমে ইবাদতে রূপান্তর করে  
ফেলতে পারে।

কিন্তু বিপরীতে একটি হারাম সর্বদা হারামই থাকবে। হারাম কাজ সম্পাদনকারীর  
নিয়ত যত ভালোই থাকুক, তার উদ্দেশ্য যত উঁচুই হোক, তার লক্ষ্য যতই মহৎ  
হোক না কেন, ইসলাম কখনোই পুণ্য ও সাওয়াব অর্জনের জন্য হারামকে মাধ্যম  
হিসেবে গ্রহণের অনুমতি দেয় না। কারণ, ইসলাম মহৎ লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গে  
নিষ্কলুষ কর্মপন্থা নিশ্চিত করতে চায়। ‘লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবকিছুই বৈধ’ কিংবা  
‘মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা’—এ ধরনের মূলনীতি ইসলাম কখনোই  
সমর্থন করে না। ইসলামের নির্দেশ হলো—শুধু সত্যের মধ্য দিয়েই সত্যের কাছে  
পৌঁছতে হবে।

মসজিদ নির্মাণ, জনকল্যাণমূলক কাজ বা আরো মহৎ কিছুর জন্য কেউ সুদ, জুয়া,  
অবৈধ খেলাধুলা কিংবা অন্য কোনো নিষিদ্ধ উপায়কে উপর্যন্তের মাধ্যম হিসেবে  
গ্রহণ করলে কি ইসলাম তার কাজের সমর্থন করবে? কখনোই না, ইসলামের কাছে

[১] সহিহ মুসলিম : ১০০৬; সহিহ ইবনি হিবান : ৪১৬৭

[২] শুআবুল ইমান : ৯৮৮৯, ৯৮৯০; মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ২২৬২৫; হাদিসটির সনদ যইফ।

এর কানাকড়ি মূল্য নেই। মহৎ উদ্দেশ্যের ফলে হারাম কাজ যেমন বৈধ হবে না, তেমনি নিষিদ্ধ কাজে জড়ানোর গুনাহও মাফ হবে না; কারণ হারাম কাজের মধ্যে মহৎ উদ্দেশ্য বা নিয়ত কোনো প্রভাবই ফেলতে পারে না।

এটাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যখন তিনি বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبُلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ، وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُمْ طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ، يَمْدُدُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، يَا رَبِّ ، يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرُبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَّ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ؟

আল্লাহ তাআলা পবিত্র, তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলদেরকে যে হুকুম দিয়েছেন মুমিনদেরকেও সে হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘হে রাসুলগণ, তোমরা পবিত্র জিনিস আহার করো এবং ভালো কাজ করো।’<sup>[১]</sup> এবং আল্লাহ তাআলা (মুমিনদেরকেও অনুরূপ আদেশ দিয়ে) বলেন, ‘হে মুমিনগণ, আমি তোমাদের যেসব পবিত্র জিনিস রিযিক হিসেবে দিয়েছি তা থেকে আহার করো।’<sup>[২]</sup> তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দূর-দূরাত্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সফর করে। ফলে সে ধূলিধূসরিত রূক্ষ কেশধারী হয়ে পড়ে। তারপর সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলতে থাকে, ‘হে আমার রব, হে আমার রব!’ অর্থচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং আহার্যও হারাম। কাজেই তার দুআ কী করে কবুল হতে পারে?<sup>[৩]</sup>

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন—

مَنْ جَمَعَ مَا لَا حَرَامًا ثُمَّ نَصَدَقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ ، وَكَانَ إِصْرَهُ عَلَيْهِ

[১] সুরা মুমিনুন, আয়াত : ৫১

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৭২

[৩] সহিহ মুসলিম : ১০১৫; মুসনাদু আহমাদ : ৮৩৪৮

## হালাল-হারামের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি

যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ সঞ্চয় করল, তারপর (সাওয়াবের নিয়তে) তা দান করল, সেক্ষেত্রে সে প্রতিদান তো পাবেই না; বরং তার কাঁধে আরো গুনাহের বোঝা চাপবে।[১]

وَلَا يَكْسِبُ عَنْدَ مَا لَا مِنْ حَرَامٍ ، فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارِكَ لَهُ فِيهِ ، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ ،  
 وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَفَرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَةً إِلَى النَّارِ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمْحُو السَّيِّئَةَ بِالْسَّيِّئَةِ ،  
 وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ ، إِنَّ الْخَيْثَ لَا يَمْحُو الْخَيْثَ

বান্দা হারামভাবে উপার্জিত সম্পদ থেকে ব্যয় করলে তাতে কোনো বারাকাহ হয় না এবং সে সম্পদ সাদাকা করলে তা কবুল হয় না। আর মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত (হারাম) সম্পত্তি তার জন্য হয় জাহানামের উপকরণ। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা গুনাহ দ্বারা গুনাহকে নির্মূল করেন না, তবে নেক কাজের দ্বারা গুনাহকে মিটিয়ে দেন। নিশ্চয়ই মন্দ জিনিস কখনো মন্দকে নির্মূল করতে পারে না।[২]

### নবম মূলনীতি : সংশয়পূর্ণ বিষয় থেকে দূরে থাকুন

আল্লাহ তাআলা বান্দাদের প্রতি করুণাবশত তাদেরকে হালাল-হারাম বিষয়ে অস্পষ্টতা ও ধোঁয়াশার মধ্যে রাখেননি; বরং হালাল-হারামের বিধানগুলো স্পষ্ট ভাষায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ ...  
৩

তিনি তোমাদের জন্য যা কিছু হারাম করেছেন, সেগুলো তিনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন।[৩]

বৈধ কাজের মধ্যে যা কিছু স্পষ্ট, তা পালনে কোনো বাধা নেই, তেমনি অবৈধ কাজের মধ্যে যা কিছু স্পষ্ট, তাতে লিপ্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

[১] সহিল ইবনি হিবান : ৩৩৬৭; মুস্তাদরাকুল হাকিম : ১৪৪০; হাদিসটি হাসান।

[২] মুসলাদু আহমাদ : ৩৬৭২; শুআবুল ঈমান : ৫১৩৬; হাদিসটির সনদ যইফ।

[৩]সুরা আনআম, আয়াত : ১১৯



## হালাল-হারামের বিধান

হালাল ও হারামের মাঝেও কিছু স্তর আছে, শরিয়তের পরিভাষায় যাকে বলে সংশয়ের স্তর। এই স্তরে কারো কাছে হালালটি হারামের সঙ্গে মিশে কিছুটা ধোঁয়াশাপূর্ণ ও অস্পষ্ট মনে হতে পাবে। অস্পষ্টতার নানা কারণ থাকতে পারে, প্রমাণের অস্পষ্টতা, বিশেষ কোনো ঘটনায় শারয়ি বস্তবের প্রয়োগ-পদ্ধতি স্পষ্ট না থাকা বা বস্তুটির প্রকৃতরূপ বা হাকিকত যথাযথভাবে জাহির না হওয়া।

এমন অবস্থায় ইসলামের দৃষ্টিতে তাকওয়ার দাবি হলো—এই সংশয়বৃক্ষ কাজ থেকে বিরত থাকা, অন্যথায় এ ধরনের কাজ ব্যক্তিকে সরাসরি হারাম কাজের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। একে হারামের ছিদ্র বন্ধের একটি উপায় বলা যেতে পারে। হারামের ছিদ্র বন্ধের মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা পেছনে গিয়েছে। সৃষ্টির নাড়িনক্ষত্র আল্লাহ তাআলার নখদর্পণে। তাদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের উজ্জ্বল একটি দৃষ্টান্ত হলো এটি।

এই মূলনীতিটির উৎস হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস—

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَهَىٰتٌ ، لَا يَذْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ  
 الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ ، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ وَعِزْرِيهِ فَقَدْ سَلِيمَ ، وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا  
 مِنْهَا ، يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْغُى حَوْلَ الْحِمَىِ ، يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ ، أَلَا  
 وَإِنْ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىٰ ، أَلَا وَإِنْ حِمَىَ اللَّهُ مَحَارِمٌ

হালালও স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট আর এ দুইয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়, অনেকেই জানে না তা হালালের অন্তর্ভুক্ত নাকি হারামের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি সুয়ি দ্বীন ও সম্মান বাঁচাতে গিয়ে তা পরিত্যাগ করল, সে নিরাপদ হলো। আর যে ব্যক্তি এর কিছু অংশেও জড়িয়ে পড়ল, আশঙ্কা হয়, সে হারামে জড়িয়ে পড়বে। যেমন কেউ (বাদশাহর জন্য) সংরক্ষিত নিষিদ্ধ এলাকার আশপাশে পশু চরালে আশঙ্কা আছে, সে সংরক্ষিত নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করবে। সাবধান! জেনে রেখো, প্রত্যেক বাদশাহর সংরক্ষিত নিষিদ্ধ এলাকা থাকে। সাবধান! মনে রেখো, আল্লাহ তাআলার সংরক্ষিত নিষিদ্ধ এলাকা হলো হারামকৃত বিষয়সমূহ।<sup>[১]</sup>

[১] জামিউত তিরমিয়ি : ১২০৫; মুসনাদু আহমাদ : ১৮৩৬৮; হাদিসটি সহিহ।

## দশম মূলনীতি : নিষিদ্ধ বিষয় সবার জন্যই হারাম

ইসলামি শরিয়তে হারাম সবার জন্য সমান। এখানে এমন কোনো বিষয় নেই—আরবদের জন্য হালাল, কিন্তু অনারবদের জন্য হারাম; কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য হারাম, কিন্তু খ্রেতাঙ্গদের জন্য হালাল। নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণি বা দলের জন্য বিশেষভাবে কোনো কিছুর বৈধতা বা অতিরিক্ত ছাড় নেই। জ্যোতিষী, ধর্মীয় গুরু, ক্ষমতাধর বা সন্তুষ্ট ব্যক্তি, যারা নিজেদেরকে বিশেষ শ্রেণির পরিচয় দিয়ে ইচ্ছেমতো কোনো কিছু হালাল বা হারাম করে নেবে, এই সুযোগ ইসলাম কারো জন্য রাখেনি।

সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলা হলেন আমাদের সবার প্রতিপালক, আর তাঁর দেওয়া শরিয়ত হলো সবার নিয়ন্ত্রক। আল্লাহ তাআলা তাঁর শরিয়তের মাধ্যমে যা হালাল করেছেন, তা সর্বস্তরের মানুষের জন্যই হালাল; আর যা তিনি হারাম করেছেন, তা-ও সবার জন্যই হারাম। কিয়ামত পর্যন্ত এতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধনের সুযোগ নেই।

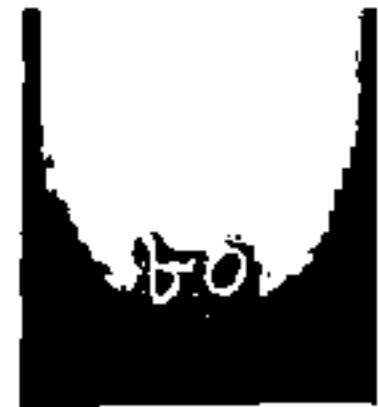
উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, চুরি করা হারাম। চোর মুসলিম হোক বা অমুসলিম, যার থেকে চুরি করা হয়েছে, সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম। চোরের শাস্তি ও অবধারিত, সে যেই হোক না কেন, তার বংশমর্যাদা যতই উঁচু হোক না কেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে চোরের শাস্তি বাস্তবায়ন করেছেন এবং ঘোষণা দিয়ে বলেছেন—

وَإِنْمَا لَوْأَنْ فَاطِمَةُ بُنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطْفَتْ يَدَهَا

আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত, তবু আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম! [১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন্দশায় একটি চুরির ঘটনা ঘটেছিল। দুজনের দিকে সন্দেহের তির ঘনীভূত হচ্ছিল। তাদের একজন ছিল ইহুদি, অপরজন ছিল মুমিন। কিছু কিছু আলামত দেখে মুসলিমগণ মুমিন থেকে অপবাদের দৃষ্টি সরিয়ে ইহুদির বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছিল। আসলে অপরাধী ছিল মুমিন

[১] সহিল বুখারি : ৩৪৭৫; সহিহ মুসলিম : ১৬৮৮



## হালাল-হারামের বিধান

ব্যক্তিটি। এমনকি নবিজিও তার দোষমুক্তির বিষয়টি মেনে নিয়ে প্রায় সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলছিলেন। তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহি নাযিল হলো।<sup>[১]</sup> প্রতারকের মুখোশ উন্মোচন করে ইহুদির দোষমুক্তির ঘোষণা দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সতর্ক করে এবং যথার্থ সত্য প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন—

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ  
 حَسِيبًا ⑯٥٠ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ مَنِ اتَّهَىَ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ⑯٥١ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ  
 أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أُثِيمًا ⑯٥٢ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ  
 مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعْهُمْ إِذْ يُبَيِّثُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ⑯٥٣ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَغْمَلُونَ مُحِيطًا ⑯٥٤  
 هَا أَنْتُمْ هُوَ لَأَعْ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلْ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ  
 يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ⑯٥٥

আমি তো আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ আপনাকে যা জানিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করতে পারেন। আর আপনি বিশ্বাসভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করবেন

[১] আয়াতগুলোর শানে নুজুল সম্পর্কে বলা হয়েছে, আনসারদের যাফার গোত্রের বাশির ইবনু উবাইরিক নামক এক ব্যক্তি রিফাআ ইবনু যাইদ নামক অপর এক আনসারি সাহাবির বর্ম চুরি করে নেয়। যখন সে অনুভব করতে লাগল, তার চুরির কথা ফাঁস হয়ে যাবে, তখন সে তার চুরি করা বর্মটা গোপনে এক ইহুদির বাড়িতে রেখে আসে। এরপর সে যাফার গোত্রের কিছু লোককে সাথে নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হলো। সকলে মিলে বলল, বর্মটা অমুক ইহুদি লাবিদ ইবনু সাহল চুরি করেছিল। সেই ইহুদিও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, বাশির বর্ম চুরি করে আমার বাড়িতে ফেলে দিয়েছিল। যাফার গোত্রের লোকেরা বাশির ইবনু উবাইরিক ও তার সজ্ঞীরা প্রথম থেকেই সতর্ক ছিল। তারা নবিজিকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে, চোর ইহুদিই; বাশিরের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের চমৎকার ও চতুরতাপূর্ণ কথাবার্তায় প্রভাবিত হয়ে যান এবং বাশিরকে চুরির অপবাদ থেকে মুক্ত ঘোষণা করে ইহুদিকে চুরির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করতে যাবেন, ঠিক তখনই মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন। এ থেকে যে বিষয়গুলো জানা গেল তা হলো, প্রথমত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ, বিধায় তিনি কোনো ঘটনায় প্রাথমিকভাবে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হতে পারেন। দ্বিতীয়ত, তিনি গাইব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখতেন না। গাইবের খবর জানলে তিনি সত্ত্ব তাদের প্রকৃত ব্যাপার জেনে নিতেন। তৃতীয়ত, মহান আল্লাহ সীয়া রাসুলের হিফায়ত করেন। তাই কখনোও যদি প্রকৃত ব্যাপার গুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে নবির দ্বারা সত্যের বিপরীত কিছু হয়ে যাওয়ার পর্যায়ে পৌঁছাত, সঙ্গে সঙ্গেই মহান আল্লাহ সে ব্যাপারে নবিকে সতর্ক করে তার সংশোধন করে দিতেন। আর এটাই হলো নবিদের নিষ্পাপ হওয়ার দাবি। এটা এমন এক উচ্চ মর্যাদা, যা নবিগণ ব্যতীত আর কেউই লাভ করতে পারে না। [তাফসিরে আহসানুল বাযান, ঈষৎ পরিমার্জিত ও সম্পাদিত]

## হালাল-হারামের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি

৮১

না। আর আপনি আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে, আপনি তাদের পক্ষে বিতর্ক করবেন না, নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসভঙ্গকারী পাপীকে পছন্দ করেন না। তারা মানুষের কাছ থেকে লুকাতে চায়, আর আল্লাহর কাছ থেকে লুকাতে চায় না। অথচ তিনি তাদের সাথেই থাকেন যখন তারা রাতে এমন কথার পরিকল্পনা করে, যা তিনি পছন্দ করেন না। আর তারা যা করে আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন। দেখো, তোমরাই পার্থিব জীবনে তাদের সৃপক্ষে বিতর্ক করেছ, কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে কে তাদের সৃপক্ষে কথা বলবে অথবা কে তাদের উকিল হবে? [১]

বিকৃত ইহুদি ধর্মের অনুসারীদের বিশ্বাস হলো, ইহুদি যখন আরেক ইহুদিকে ঝণ দেবে, তখন তাদের জন্য সুদ হারাম, কিন্তু অ-ইহুদিকে ঝণ দিলে তার সুদ হারাম নয়; দ্বিতীয় বিবরণ (২৩ : ১৯)-এ বলা হয়েছে—

॥

তোমরা কোনো (ইসরাইলি) ভাইয়ের কাছ থেকে সুদ নেবে না, সেই সুদ টাকা পয়সার ওপরেই হোক বা খাবার জিনিসের ওপরেই হোক কিংবা অন্য যেকোনো জিনিসের ওপরেই হোক; অন্য কোনো জাতির থেকে তোমরা সুদ নিতে পারো, তবে তোমার ভাই থেকে নয়।

ইহুদিদের মতে, অ-ইহুদিদের সঙ্গে প্রতারণা ও ধোঁকা বৈধ, তাদের কাছে এগুলো কোনো অপরাধই নয়; তাদের এই মানসিকতার কথা কুরআনও স্পষ্ট করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقَنْطَارٍ يُؤْدِهِ إِلَيْنَاكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤْدِهِ  
 إِلَيْنَا إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنَسْ عَلَيْنَا فِي الْأَقْرَبَيْنَ سَيِّلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى  
 اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ⑯

কিতাবিদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে, তার কাছে বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও (চাওয়ামাত্র) সে ফেরত দেবে। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার নিকট একটি দিনার (সুর্ণমুদ্রা) ও আমানত রাখলে তার

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ১০৫-১০৯

## হালাল-হারামের বিধান

পেছনে লেগে না থাকলে সে তা ফেরত দেবে না। কারণ, তারা বলে যে, ‘নিরক্ষরদের (অর্থাৎ অ-ইহুদিদের) অধিকার নষ্ট করার ব্যাপারে আমাদের কোনো পাপ নেই।’ বস্তুত তারা জেনে-শুনে আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে।<sup>[১]</sup>

ইহুদিরা নিশ্চিতই আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে মিথ্যা রঁটায়। কারণ, শরিয়ত সবার জন্যই সমান; এর বিধান সম্প্রদায় ভেদে কখনো ভিন্ন হতে পারে না। এছাড়াও সকল নবি-রাসূলই খিয়ানত ও প্রতারণাকে হারাম ঘোষণা দিয়ে গিয়েছেন।

দুঃখজনক হলেও সত্য, নিজের জাতি ভাইয়ের জন্য এক বিধান, আর জাতি ভাই ছাড়া অন্যের জন্য ভিন্ন বিধান—এই দ্বিচারিতা ইসরাইলিদের অসভ্যতা ও বর্বর মানিসকতাই জাহির করে। এগুলো কখনোই কোনো ঐশ্বী ধর্মের বিধান হতে পারে না। সর্বজনীন শিষ্টাচার বা সত্যিকারের ঐশ্বী বিধান মানেই হলো—সেটি সবার জন্য সমান হবে, সেখানে কোনো দ্বিচারিতা থাকবে না।

বর্বরদের এবং আমাদের মধ্যে নৈতিকতার জায়গা থেকে যে ব্যবধান, সেটি নৈতিক বিধান থাকা না থাকা নিয়ে নয়। বিষয় হলো—আমাদের কাছে শিষ্টাচার মানে হলো—সেটি সর্বজনীন হবে, সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। অপরদিকে তাদের কাছে নৈতিকতার সংজ্ঞা সীমিত। যেমন বিশ্বস্ততা তাদের কাছেও একটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য; তবে এটি কেবল তাদের গোত্রের নিজস্ব লোকদের মধ্যে সীমিত, কিন্তু তাদের মতে গোত্রের বাইরের লোকদের সঙ্গে প্রতারণা বৈধ, ক্ষেত্রবিশেষ পছন্দনীয় ও অপরিহার্য!

স্টোরি অব সিভিলাইজেশনের গ্রন্থকার বলেন, ‘মানবজাতির প্রায় প্রতিটি গোষ্ঠীই বিশ্বাস করে, তারা অন্যান্য জাতি থেকে শ্রেষ্ঠ; রেড ইন্ডিয়ানরা মনে করত, তারা হলো স্বৃষ্টির মনোনীত জাতি; পবিত্র আত্মার হাতে তাদের সৃষ্টি—যেন তারা হতে পারে মানব জাতির জন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ইন্ডিয়ান একটি গোত্রের দাবি হলো—তারাই একমাত্র মানুষ, আরেক দল মনে করত, তারা হলো শ্রেষ্ঠ মানব, অন্যদিকে ক্যারিবীয়দের দাবি—মানুষ তো কেবল আমরাই। ফলে দেখা যায়, একজন আদিম লোক সুগোত্রের মধ্যকার ব্যাবহারিক জীবনে কিছু নৈতিক বিষয় মেনে চলে, কিন্তু অন্য গোত্রের লোকদের সঙ্গে লেনদেনের সময় সেগুলো সে কখনো ভাবে না। সে

[১] সুন্না আলি-ইমরান, আয়াত : ৭৫

বিশ্বাস করে, নেতৃত্ব বৈশিষ্ট্যাবলি তার গোদ্রের শক্তি জোগায়, সমৃদ্ধ করে; তাই  
এগুলো কেবল তার গোদ্রের লোকদের মধ্যেই সীমিত রাখতে হবে। অন্য গোদ্রের  
লোকেরা যদি তার মেহমান হয়, তাহলে ভিন্ন কথা; অন্যথায় তার ক্ষতির জন্য যা  
ইচ্ছা সে করতে পারে।’

একাদশ মূলনীতি : বিকল্প না থাকলে নিয়ন্ত্রণ বিষয় বৈধ হতে পারে

ইসলামি শরিয়তে হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয় (হালালের তুলনায়) অঙ্গ, তবে কোনো বিষয়কে হারাম করার পর সেখানে কঠোরতা আরোপিত হয়েছে চূড়ান্তরূপে। হারামে জড়ানোর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব পথ ইসলাম বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি যা কিছু হারামের দিকে টেনে নিয়ে যায়, তা-ও হারাম; হারামের সহায়ক বস্তু হারাম; হারামের জন্য কৌশল অবলম্বনও হারাম ইত্যাদি। সেসব মূলনীতি ও কারণ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতির কথা ভিন্ন। কখনো হতে পারে মানুষ নিরূপায়, অবৈধ খাদ্য ছাড়া খাওয়ার কিছু নেই, সেই মুহূর্তের অসহায়ত্বের কথা শরিয়ত ভুলে যায়নি। অসহায়ত্বের পরিমাপ নির্ধারণে শরিয়তের আলাদা নিষ্ঠি রয়েছে, অক্ষমতার মাত্রাও সেখানে নির্ধারিত হয়েছে। এরপর বিধান এসেছে, জীবনধারণের জন্য যতটুকু না-হলেই নয়, ততটুকু পরিমাণ হারাম বস্তু গ্রহণের অনুমতি থাকবে। মৃত জন্ম, প্রবাহিত রস্ত ও শূকরের মাংসের নিষিদ্ধতা ঘোষণার পরপরই আলাহ তাআলা বলেছেন—

...فَمَنِ اضْطُرَّ عَيْنَرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

অবশ্য যে লোক নিরূপায় হয়ে পড়ে, অথচ সে নাফরমান নয় এবং সীমালঙ্ঘনকারীও নয়, তার জন্য (এসব হারাম বস্তু প্রহণে) কোনো পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু [১]

কুরআনের চারটি সুরার মধ্যে এই কথাগুলো চারবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে; এই আয়াতগুলো  
এবং এর মতো আরো বিভিন্ন প্রমাণের ভিত্তিতে ফকিহগণ একটি মূলনীতি দাঁড়

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৭৩

করিয়েছেন—‘বিশেষ পরিস্থিতিতে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বৈধ হতে পারে’।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়—অনন্যোপায় ব্যক্তির সঙ্গে দুটি শর্ত মুক্ত হয়েছে, একটি হলো নাফরমান বা অবাধ্য না হওয়া, অন্যটি সীমালঙ্ঘনকারী না হওয়া। এর ব্যাখ্যা হলো—নিষিদ্ধ বস্তু আগ্রহ ও তৃপ্তি নিয়ে খাওয়া যাবে না। এই দুটি শর্ত থেকে ফকিহগণ আরেকটি মূলনীতি দাঁড় করিয়েছেন—‘প্রয়োজনের খাতিরে যা বৈধ, তা প্রয়োজন পরিমাণই কেবল বৈধ।’

বিশেষ পরিস্থিতিতে নিষিদ্ধ বস্তুর ভক্ষণ জায়িয়, কিন্তু পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে এতে অভ্যস্ত হওয়া কিংবা নিশ্চিন্ত মনে নিষিদ্ধ বস্তু খেতে থাকা ঠিক হবে না। সর্বদা বিকল্প হালাল খাদ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে; যাতে হারাম বস্তু দিয়ে তৃপ্তি লাভ কিংবা হারামকে হালকাভাবে দেখার প্রবণতা মনের মধ্যে তৈরি না হয়।

ইসলাম ধর্মের প্রকৃত চরিত্র ও অনুভবের প্রকাশ ঘটেছে বিশেষ মুহূর্তে নিষিদ্ধ বস্তু বৈধতার মধ্য দিয়ে। ইসলামের একটি মৌলিক বিষয় হলো সহজতা এবং অনর্থক কঠোরতা থেকে দূরত্ব বজায় রাখা। পূর্বেকার বিভিন্ন জাতির কাঁধে নানা ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা ছিল। মুসলিম জাতি সেগুলো থেকে পুরোপুরি মুক্ত। আল্লাহ তাআলা যথার্থই বলেছেন—

(১৫) ...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না [১]

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرُكُمْ وَلَيَتَمَّ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

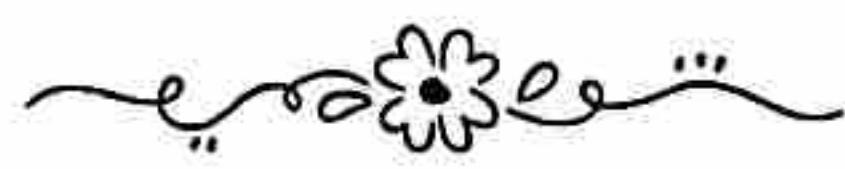
আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনো সংক্রীণতা চাপিয়ে দিতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামত সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো [২]

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫

[২] সুরা মায়দা, আয়াত : ৬

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٦﴾

আল্লাহ তোমাদের ভার কমাতে চান; আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে  
দুর্বলরূপে [১]



[১] সুরা নিসা, আয়াত : ২৮



## দ্বিতীয় অধ্যায়

# দৈনন্দিন জীবনে হালাল-হারাম

## খাবার ও পানীয়

মানুষ কী খাবে আর কী খাবে না, তা নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই নানা ধরনের মতামত চলে আসছে। তাদের জন্য কী খাওয়া বৈধ আর কী খাওয়া অবৈধ, বিশেষ করে প্রাণীজ মাংসের ব্যাপারে মতানৈক্য তো অনেক পুরোনো।

তবে মাংস ছাড়া অন্যান্য উদ্ভিদ ও উদ্ভিদ থেকে আহরিত পানীয় বিষয়ে, খুব বেশি মতানৈক্য আসলে নেই। এসব খাবার থেকে যেটা মদ বা নেশাজাতীয় হবে সেটাই ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম, চাই সেটা পানীয় আঙুর, খেজুর, ঘৰ বা অন্য কিছু থেকে আহরিত হোক। এ ছাড়া বাকি সব পানীয় ইসলামে হালাল।

এমনিভাবে চেতনা-নাশক, অবসন্নতা সৃষ্টিকারক বা শরীরের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্যাদি সবই হারাম। এ সম্পর্কে আমরা সামনে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ। তবে প্রাণীর মাংস নিয়ে যেহেতু অনেক মতভেদ রয়েছে, তাই সে সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করে নিই।

## ব্রাহ্মণদের মতে পশু জবাই ও ভক্ষণ

ব্রাহ্মণ ও কিছু নিরামিয়াশী নিজেদেরকে পশু জবাই ও খাওয়া থেকে নিবৃত্ত রাখে।

## দৈনন্দিন জীবনে হালাল-হারাম

সাধারণত তাদের খাদ্য হয়ে থাকে উত্তিদজাতীয় খাদ্যদ্রব্য। তাদের মতে, প্রাণী খাওয়ার অর্থ হলো একটি প্রাণী (মানুষ) তারই মতো আরেকটি প্রাণীকে (পশুকে) নির্দয়ভাবে মেরে খেয়ে ফেলছে। অথচ সেই প্রাণীরও তাদের মতোই বেঁচে থাকার অধিকার আছে।

কিন্তু সৃষ্টিজগৎ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমরা দেখি, এসব প্রাণী সৃষ্টির বিশেষ কোনো লক্ষ্য নেই, এজন্য এসব প্রাণীর নিজস্ব কোনো বিচার-বুদ্ধি নেই। তাছাড়া এই প্রাণীগুলোর সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য থেকে স্পষ্ট—এরা মানুষের সেবার জন্যই নিবেদিত। মানুষ এসব প্রাণী থেকে জীবিত অবস্থায় যেভাবে উপকার লাভ করে, সেভাবে তাদেরকে জবাই করে তাদের থেকে উপকৃত হলে আশ্চর্যের কী আছে!

এমনিভাবে সৃষ্টিজীবের মধ্যে আল্লাহ তাআলার একটি নীতি হলো—নিম্ন শ্রেণির প্রাণী উঁচু শ্রেণির জন্য নিবেদিত থাকে। প্রাণীদের খাদ্যের জন্য উত্তিদ ও তরু-লতা কাটা হয়, আর মানুষের খাদ্যের জন্য প্রাণীদের জবাই করা হয়। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল মানুষের নিরাপত্তা ও কল্যাণের স্বার্থে মানুষের প্রাণহরণও বৈধ হয়ে যায়।

প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকলেও তো এগুলো মৃত্য ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় না। হয়তো এসব প্রাণী হিংস্র প্রাণীদের হাতে নিহত হবে কিংবা এমনিই বুড়ো হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মারা যাবে। এই মৃত্য তো ধারালো ছুরির আঘাতে মৃত্যুর চেয়ে অধিক কষ্টকর।

### ইহুদি-খ্রিস্টানদের কাছে নিষিদ্ধ প্রাণী

আসমানি বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, ইহুদিদের জন্য অনেক প্রাণী ও খাদ্য নিষিদ্ধ ছিল। এগুলোর বিবরণ জানার জন্য ওল্ড টেস্টামেন্ট—লেবিয়ো পুস্তকের একাদশ অধ্যায় দেখা যেতে পারে। নিষিদ্ধ বস্তু-সম্পর্কিত কিছু বর্ণনা কুরআনেও উল্লেখিত হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার কারণ ছিল, ইহুদিদেরকে তাদের অবাধ্যতা ও দ্রোহের শাস্তি প্রদান, যে সম্পর্কে আমরা ইতিঃপূর্বেই আলোচনা করেছি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا كُلَّ ذِي طَفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنِمِ حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَابِيَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظِيمٍ ذَلِكَ جَزِئُنَا هُمْ يَنْفِعُهُمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١﴾

## হালাল-হারামের বিধান

ইহুদিদের জন্য আমি প্রত্যেক নখ-বিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম এবং ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম। কিন্তু ওই চর্বি, যা পৃষ্ঠে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা হাড়ের সাথে মিলিত থাকে তা ব্যতীত। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী।<sup>[১]</sup>

এই নিষেধাজ্ঞা ইহুদিদের ওপর আরোপের স্বাভাবিক দাবি হলো—এই নিষেধাজ্ঞাটি খ্রিস্টানদের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। কারণ ইঞ্জিলে বর্ণিত হয়েছে, ঈসা আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তের পূর্ণতা দেওয়ার জন্য এসেছেন, তাকে রহিত করার জন্য নয়। যাহোক খ্রিস্টানরা তাওরাতের নিষেধাজ্ঞাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সবকিছু হালাল বানিয়ে ফেলেছে, যদিও তাওরাতের বিধান রহিত করার কোনো কথা সেখানে উল্লেখিত হয়নি। খ্রিস্টানরা সেন্ট পলের দীক্ষা অনুসরণ করেছে। সেন্ট পল (তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ণিত হোক) বলেছে, ‘মূর্তির জন্য উৎসর্গিত প্রাণী ছাড়া বাকি সকল খাবার ও পানীয় হালাল।’

সেন্ট পল বৈধতার কারণ দর্শাতে গিয়ে বলেছে, ‘পবিত্রাত্মাদের জন্য প্রতিটি বস্তুই পবিত্র। মুখ দিয়ে যা কিছু প্রবেশ করে, সেগুলো মুখকে অপবিত্র করে না, তবে তা থেকে যা বের হয়ে যায়, সেটা হলো অপবিত্র।’ এই বক্তব্যের ফলে খ্রিস্টানদের কাছে শূকরের মাংসও বৈধ হয়ে গিয়েছে, যদিও শূকর নিষিদ্ধতার বিষয়ে তাওরাতের স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে।

### প্রাক-ইসলামি যুগে প্রাণীহত্যা ও অন্যান্য

ইসলামপূর্ব যুগের লোকদের কাছে নির্দিষ্ট কিছু প্রাণী হারাম ছিল। এর কিছু ছিল অপরিচ্ছন্নতার কারণে আর কিছু ছিল মূর্তি ও উপাস্যদের জন্য উৎসর্গিত থাকার কারণে। যেমন : বাহিরা, সায়িবা, অসিলা, হামি—যার ব্যাখ্যা আমরা ইতিঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। এর বিপরীতে অনেক ঘৃণ্য বস্তু, যেমন : মৃত প্রাণী ও প্রবাহিত রক্ত তাদের মতে খাওয়া বৈধ ছিল।

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ১৪৬

## প্রাণীহত্যার ব্যাপারে ইসলাম কী বলে

ইসলাম আগমনের সময়ে প্রাণীজ খাদ্যের ব্যাপারে পৃথিবীর অবস্থা ছিল এমনই দ্বিভাবিতভাবে। কারো বাড়াবাড়ি খাওয়ার ক্ষেত্রে, আর কারো সীমালঙ্ঘন বর্জনের ক্ষেত্রে। তাই আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবজাতিকে সঙ্গেধন করে বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَشْيُعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَذْوٌ  
مُّبِينٌ ﴿١﴾

হে লোক সকল, পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে, তা থেকে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঞ্চক অনুসরণ কোরো না,  
নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু [১]

আল্লাহ তাআলা সবাইকে বলছেন উত্তম বস্তু খেতে, যেগুলো তিনি এই ভূমি নামক দস্তরখানে মানুষের জন্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছেন; আর নিষেধ করেছেন শয়তানের পদাঞ্চক অনুসরণ করতে, কারণ সে বিভাস্তি ছড়ানো ও মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিচ্ছুরিত করার জন্য উসকানি দেয়—হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল বানাতে।

এরপর আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বিশেষভাবে বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا  
حَرَمٌ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ  
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢﴾

হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে আমি যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে খাও এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো; যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করে থাকো। তিনি তো তোমাদের জন্য শুধু মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোশত এবং যেসব জন্মুর ওপরে (জবাইয়ের সময়) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে, তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। অবশ্য যে লোক নিরূপায় হয়ে পড়ে, অথচ সে নাফরমান নয় এবং সীমালঙ্ঘনকারীও নয়,

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৬৮



## হালাল-হারামের বিধান

তার জন্য (এসব হারাম বস্তু গ্রহণে) কোনো পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ<sup>[১]</sup>  
অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু<sup>[১]</sup>

---

এই বিশেষ সঙ্গের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন,  
তারা যেন আল্লাহ-প্রদত্ত উত্তম রিয়িক থেকে খায় এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে।  
এরপর তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ৪ প্রকার খাদ্য ছাড়া অন্য কোনো কিছু তিনি  
হারাম করেননি।<sup>[২]</sup> যেগুলো এই আয়াত ও অন্যান্য আরো আয়াতে বর্ণিত হয়েছে;  
নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য এই চারটার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ হলো—

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا  
أَوْ لَحْمَ حِنْزِيرٍ فِإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
[১০]

---

আপনি বলুন, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে, তাতে আহারকারী যা  
আহার করে, তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না। তবে মৃতপ্রাণী,  
বহমান রক্ত ও শূকরের গোশত; কেননা তা অপবিত্র। অথবা (জবেহকালে)  
আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেওয়ার কারণে যা অবৈধ। তবে যে কেউ অবাধ্য  
না হয়ে এবং সীমালঙ্ঘন না করে তা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, তবে নিশ্চয়ই

আপনার প্রতিপালক বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু<sup>[৩]</sup>

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৭৩

[২] এই আয়াতে চারটি হারামকৃত জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এখানে [মা] শব্দ দ্বারা সীমিতকরণে  
এই সন্দেহের সূচিত হয় যে, হারাম কেবল এই চারটি জিনিসই। অর্থাত শরিয়তে এ ছাড়াও আরো অনেক  
জিনিস হারাম আছে। তাই প্রথমত এটা বুঝে নিতে হবে যে, এই সীমিতকরণ বিশেষ কথা প্রসঙ্গে  
এসেছে। অর্থাৎ, মুশরিকরা হালাল জানোয়ারকেও হারাম করে নিত। তাই মহান আল্লাহ বললেন, হারাম  
কেবল এইগুলো। কাজেই এই সীমিতকরণ তুলনামূলক। অর্থাৎ, এছাড়াও আরো হারাম জিনিস আছে, যা  
এখানে উল্লেখিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, হাদিসে প্রাণীর হালাল-হারাম-সংক্রান্ত দুটি মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে।  
সেটাকে আয়াতের সঠিক তাফসির হিসেবে সামনে রাখা উচিত। হিংস্র পশুর মধ্যে শিকারী দাঁতবিশিষ্ট  
পশু এবং পাখির মধ্যে শিকারী নখবিশিষ্ট পাখি হারাম। তৃতীয়ত, যেসব পশুর হারাম হওয়ার কথা হাদিস  
দ্বারা প্রমাণিত; যেমন গৃহপালিত গাধা, কুকুর ইত্যাদি সেগুলোও হারাম। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়  
যে, হাদিসও কুরআনের মতো দীনের উৎস এবং শরিয়তের দলিল। কুরআন ও হাদিস উভয়টিকে মেনে  
নিলে তবেই দীন পরিপূর্ণ হবে, শুধু কুরআন মানলে ও হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করলে দীন পরিপূর্ণ হবে না।  
[তাফসিরে আহসানুল বায়ান, দ্বিতীয় পরিমার্জিত]

[৩] সুরা আনআম, আয়াত : ১৪৫

## দৈনন্দিন জীবনে হালাল-হারাম

১১

সুরা মায়িদার মধ্যে এই চার প্রকার খাদ্য আরো বিস্তৃতভাবে উল্লেখিত হয়েছে;  
আল্লাহ তাআলা বলেন—

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ  
 وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ وَمَا ذَبَحَ عَلَى النُّصُبِ...  
 ③

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্ম, রস্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত পশু, শ্বাসরোধে মৃত জন্ম, প্রহারে মৃত জন্ম, ওপর থেকে পড়ে মারা যাওয়া জন্ম, অন্য প্রাণীর শিংয়ের আঘাতে মৃত জন্ম এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্ম; তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছ তা ব্যতীত, এবং মূর্তিপূজার বেদীতে বলী দেওয়া জন্ম [১]

এই আয়াতে নিষিদ্ধ প্রাণী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে দশ প্রকার, আর পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে ৪ প্রকার। দুই আয়াতের মধ্যে মূলত কোনো বিরোধ নেই, কারণ পরের আয়াতে প্রথম আয়াতের বিষয়গুলো আরেকটু বিস্তৃত আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। শ্বাসরোধে মৃত জন্ম, প্রহারে মৃত জন্ম, ওপর থেকে পড়ে মারা যাওয়া জন্ম, শিংয়ের আঘাতে মৃত জন্ম এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্ম সবই মৃত প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। মৃত প্রাণী কী কী হতে পারে, তার একটি বিবরণ এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এমনিভাবে মূর্তিপূজার বেদীতে বলি দেওয়া জন্ম আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গিত জন্মের আওতাভুক্ত। মোটকথা, নিষিদ্ধ প্রাণী বিস্তারিত বললে হয় ১০ প্রকার আর সংক্ষেপে দাঁড়ায় ৪ প্রকার [২]

### মৃত জন্মের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ও কারণসমূহ

খাদ্যের মধ্যে হারাম হিসেবে উল্লেখিত প্রথম প্রকারটি হলো—মৃত জন্ম, হোক তা

[১] সুরা মায়িদা, আয়াত : ৩

[২] পূর্বের একটি টীকায় বলা হয়েছে, ইসলামে নিষিদ্ধ প্রাণী কেবল এই চার প্রকারেই সীমাবন্ধ নয়। এগুলো ছাড়াও কুকুর, গৃহপালিত গাধা, শিকারী দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী, শিকারী নখবিশিষ্ট পাখি ইত্যাদিও হারাম, যা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং বাহ্যিকভাবে এ আয়াতটিকে দেখে এটা ভাবার কোনো সুযোগ নেই যে, ইসলামে এই ৪ ধরনের প্রাণী ছাড়া সকল প্রাণী হালাল। এখানে বিশেষ একটি প্রেক্ষাপটে ৪ শ্রেণীর প্রাণীকে হারাম বলা হয়েছে, নয়তো হারাম প্রাণীর প্রকার আরো রয়েছে, যার বিবরণ পাওয়া যায় রাসুলুল্লাহ সাল্লামাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসসমূহে।

## হালাল-হারামের বিধান

চতুর্ক্ষণ জন্তু কিংবা পাখি। মৃত জন্তু বলতে বোঝানো হয়েছে, যা শিকার বা জবাই তথা মানুষের কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বাভাবিকভাবে মারা যায়।

বর্তমান সময়ে মানুষের মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, মৃত জন্তু হারাম করে সেটাকে না খেয়ে ফেলে দেওয়ার কারণ কী? উত্তরে আমরা বলতে পারি, মৃত জন্তু নিষিদ্ধ হওয়ার পেছনে নানা কারণ আছে। উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ হলো—

» একজন সুস্থ রুচির মানুষের কাছে মৃত জন্তু ঘৃণ্য ও অপছন্দনীয়। এজন্য সকল আসমানি ধর্মেই মৃত জন্তু নিষিদ্ধ। জবাইকৃত জন্তু ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী খাওয়ার অনুমতি সেখানে মেলে না।

» ইসলাম চায় একজন মুসলিমের সকল কাজ হবে তার নিয়ত ও সংকল্প অনুসারে। কিছু পেতে হলে বা লাভ করতে হলে বিশুদ্ধ নিয়ত ও ইচ্ছা লাগবে। জবাই অর্থ হলো—খাওয়ার নিয়তে একটি প্রাণীর প্রাণনাশ। একজন মুমিন কোনো ইচ্ছা ও সংকল্প ছাড়াই কিছু খেয়ে ফেলবে, সেটা আল্লাহ তাআলার পছন্দ নয়। যেহেতু জবাইকৃত ও শিকারকৃত প্রাণীর মধ্যে মানুষের খাওয়ার ইচ্ছা ও সংকল্প পাওয়া যায়, তাই সেটি হালাল।

» প্রাকৃতিকভাবে মরা পশুর মৃত্যুর পেছনে নানা কারণ থাকতে পারে। অধিক সম্ভাব্য কারণগুলো হলো—অতিরিক্ত বয়স, আকস্মিক রোগব্যাধি, বিষাক্ত উদ্ভিদ ভক্ষণ বা এ জাতীয় কোনো বিষয়। এসব মরা জন্তুগুলো মানুষের জন্য হতে পারে ভয়াবহ বিপজ্জনক।

» মৃত জন্তু মানুষের জন্য হারাম হওয়ার ফলে বন্য জন্তুরা সেগুলো খেতে পারছে; অন্যথায় তারা কী খেত। তারাও তো আমাদের মতো আল্লাহর একটি সৃষ্টি। উন্মুক্ত প্রান্তরের মৃত প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটা স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

» মানুষ যেন তার মালিকানাধীন জন্তুর ব্যাপারে যত্নশীল থাকে, সতর্ক থাকে এগুলোর রোগ-শোক বিষয়ে। শুধু তা-ই নয়, সে যেন দ্রুত একে চিকিৎসা-সেবা দেয় বা জবাই করে তার আঘাতে কষ্ট দেওয়া থেকে মুক্ত করে দেয়।

**প্রবাহিত রন্ত খাওয়া হারাম ও তার কারণ**

নিষিদ্ধ খাদ্যের দ্বিতীয় পকার হলো—প্রবাহিত রন্ত। আবুল্লাহ ইবনু আবাস

রায়িয়াল্লাহু আনহুকে প্লীহা<sup>[১]</sup> খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেছেন, তোমরা এটি খাও। তারা বলল, এটি তো রস্ত থেকে গঠিত। তিনি বললেন, তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে প্রবাহিত রস্ত।

রস্ত খাওয়ার প্রতি সুস্থ মানুষের জন্মগত অনাগ্রহ ও ঘৃণা। তাছাড়া এর মধ্যেও মৃত জন্মুর মতো ক্ষতির শঙ্কা তো আছেই। প্রাক-ইসলামি যুগে কেউ অতিরিক্ত ক্ষুধার্ত হলে একটি ধারালো হাড় দিয়ে উট বা যেকোনো প্রাণীর রস্ত বের করে পান করত। এ বিষয়ে কবি আ'শা বলেন—

তুমি মৃত জন্মু থেকে দূরে থাকো, তার কাছেও যেয়ো না,  
রস্ত ঝরানোর জন্য ধারালো কোনো হাড়ও নিয়ো না।

যেহেতু এভাবে রস্ত ঝরালে প্রাণীর কষ্ট হয় ও প্রাণী দুর্বল হয়ে পড়ে, তাই আল্লাহ তাআলা একে হারাম করে দিয়েছেন।

### শূকরের মাংস

নিষিদ্ধ খাদ্য তালিকার তৃতীয় উপাদান হলো শূকরের মাংস। শূকর সবসময় ময়লা, আবর্জনা ও অপবিত্র বস্তু থেরে থাকে। স্বাভাবিক সুস্থ রুচির মানুষের কাছে শূকর খুবই ঘৃণিত একটি প্রাণী। তাছাড়া সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি, শূকর সব অঞ্চলের লোকদের স্বাস্থ্যের পক্ষেই ক্ষতিকর, বিশেষ করে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষের জন্য বেশি ক্ষতিকর। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদেরকে আরো জানাচ্ছে, শূকরের মধ্যে মারাত্মক ধরনের পরজীবী কীট (ট্রিচিনা)-সহ নানা ভয়ানক কীট আছে। কে জানে, অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের কাছ থেকে আমরা হয়তো আরো ভয়ানক কোনো তথ্য পাব, যার জন্য আল্লাহ তাআলা এই প্রাণীটিকে হারাম করেছেন। নবিজির কর্ম-তালিকা দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা যথার্থেই বলেছেন—

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَابَاتِ...  
১০৭

[১] অধিকাংশ মেরুদণ্ডী প্রাণীর পাকস্থলীর নিচে বাঁদিকে অবিস্থিত ডিষ্টাক্সি উদরীয় অঙ্গবিশেষ যা রস্ত শোধন ও রস্তকণিকার আধাররূপে কাজ করে এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাঢ়ায়। এটাকে পিলা বা পিলেও বলা হয়। ইংরেজিতে বলে Spleen।

## হালাল-হারামের বিধান

আর তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করেন এবং অপবিত্র ও ঘৃণিত বস্তুসমূহ হারাম করেন।<sup>[১]</sup>

কিছু কিছু গবেষকের দাবি, নিয়মিত শূকরের মাংস গ্রহণে মানুষের সৃভাবজাত ঘৃণার অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়।

### আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত প্রাণী

চতুর্থ নিষিদ্ধ খাবার হলো—আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত প্রাণী। আরবের লোকেরা পশু জবাইয়ের সময় লাত-উজ্জাসহ বিভিন্ন দেবতার নাম উচ্চারণ করত। যেহেতু এর মাধ্যমে গাহরুল্লাহর ইবাদত হয়, আল্লাহ তাআলা বাদে অন্যের নৈকট্য লাভের মতো ব্যাপার ঘটে, তাই এটি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তবে এই নিষিদ্ধতা সম্পূর্ণই দীনি-ধর্মীয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে একত্বাদে আবৃত থাকা, আকিদা-বিশ্বাসকে কল্যাণতামুক্ত রাখা, শিরক ও পৌত্রলিকতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্যই মূলত এই নিষেধাজ্ঞা।

আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। জন্ম-জানোয়ার-সহ পৃথিবীর সবকিছুকে তাঁর অনুগত করে দিয়েছেন। প্রয়োজনে এসব প্রাণীর জীবননাশের অনুমতিও তাঁর আছে। তবে প্রাণহরণ যেহেতু আল্লাহ তাআলার অনুমতি সাপেক্ষে হচ্ছে, তাই শর্ত হলো—জবাইয়ের সময় তাঁর নাম নিতে হবে। যাতে স্পষ্ট হয় যে, এই জীবিত প্রাণীটি স্বর্তার অনুমতিক্রমেই জবাই হচ্ছে। জবাইয়ের সময় আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্যের নাম নেওয়ামাত্রই সেই অনুমতি রহিত হয়ে যায় এবং সে এই প্রাণী থেকে উপকার গ্রহণের অধিকার হারিয়ে ফেলে।

### মৃত জন্মুর প্রকারভেদ

নিষিদ্ধ খাদ্যশ্রেণির সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচনা হলো এতক্ষণ। সুরা মায়দাতে এই নিষিদ্ধ খাদ্যশ্রেণি কিছুটা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে, সেখানে মৃত জন্মুর প্রকার উল্লেখিত হয়েছে দশটি। সেগুলো হলো—

[১] সুরা আদ্রাফ, আয়াত : ১৫৭

১. শাসরোধে মৃত জন্ম : যে প্রাণীর গলায় রশি ইত্যাদি আটকে দমবন্ধ হয়ে কিংবা বন্ধ জায়গায় আটকে মারা যায়।

২. প্রহারে মৃত জন্ম : যে প্রাণীকে লাঠি ইত্যাদি ভারী ও শক্ত কিছু দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়।

৩. ওপর থেকে পড়ে মারা যাওয়া জন্ম : যে প্রাণী কোনো উঁচু স্থান থেকে বা গভীর কৃপে পড়ে মারা যায়।

৪. অন্য প্রাণীর শিংয়ের আঘাতে মৃত জন্ম : যে প্রাণী প্রতিযোগিতা বা মারামারির সময় অন্য প্রাণীর শিংয়ের আঘাতে মারা যায়।

৫. হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্ম : যে প্রাণীকে বাঘ, সিংহ বা হিংস্র কোনো প্রাণী আংশিক খেয়ে ফেলার পর মারা যায়।

এই পাঁচটি প্রকার উল্লেখের পর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছ তা ব্যতীত।’ অর্থাৎ এই প্রাণীগুলোর মাঝে যেগুলো জীবিত থাকবে এবং (জীবিত থাকাকালীনই) তোমরা জবাই করতে পারবে সেগুলো তোমাদের জন্য খাওয়া হালাল হবে। এ বিষয়ে আমরা সামনে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

উল্লিখিত কোনো জন্ম আহত হওয়ার পর তার মধ্যে যদি সামান্য প্রাণস্পন্দন থাকে এবং তৎক্ষণাৎ পশুটি জবাই করা হয়, তাহলে সেটি খাওয়া হালাল হবে।<sup>[১]</sup> এই বন্ধবের শুধুতার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে আলি রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসটি দলিল হতে পারে। আলি রায়িয়াল্লাহু আনহু বলেন—

إِذَا أَذْرَكْتَ ذَكَاءَ الْمَوْقُوذَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ وَهِيَ تُحَرِّكٌ يَدًا أَوْ رِجْلًا فَكُلْهَا

প্রহারে আঘাতপ্রাপ্ত, পতনে আহত এবং শৃঙ্গাঘাতে আহত জন্মকে যদি হাত-পা নাড়ানো অবস্থায় (অর্থাৎ জীবিত থাকাবস্থায়) জবাই করার অবকাশ পাও তাহলে তুমি সেটি খেতে পারো।<sup>[২]</sup>

[১] অবশ্য কোনো কোনো ফকির মনে করেন, প্রাণীর মধ্যে প্রাণের স্থিতি থাকতে হবে। আর প্রাণের স্থিতির নির্দেশন হলো—জবাই করলে রক্ত প্রবাহিত হওয়া এবং জবাইয়ের সময় জ্বরে ঝাঁকুনি দেওয়া।

[২] তাফসিলিন তাবারিঃ, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৫০৩

বিখ্যাত তাবিয়ি যাহহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ هَذَا، فَحَرَمَ اللَّهُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا مَا ذُكِّيَ مِنْهُ، فَمَا أَذْرَكَ فَتَحْرِكَ  
مِنْهُ رِجْلٌ أَوْ ذَنْبٌ أَوْ طَرْفٌ فَذُكِّيَ، فَهُوَ حَلَالٌ

প্রাক-ইসলামি যুগের লোকেরা এসব আঘাতপ্রাপ্ত জন্ম (জবাই করা ছাড়াই) খেতো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ইসলামি বিধানে সেগুলো খেতে নিষেধ করেছেন। তবে এর মধ্যে যেগুলো এমন অবস্থায় পাওয়া যাবে—যার পা, লেজ বা চোখ নাড়াচাড়া করছে, তখন সেটি জবাই করলে খাওয়া হালাল হবে।<sup>[১]</sup>

### কতিপয় প্রাণী হারাম হওয়ার কারণ

এ জাতীয় প্রাণী নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ তো তাই, যা আমরা স্বাভাবিক মৃত জন্মুর ক্ষেত্রে বলে এসেছি। তবে সম্ভাব্য ক্ষতিগুলো এখানে থাকবে না। শেষ কারণটি এখানেও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছেন— এসব জন্মুর যথাযথ যত্ন নিতে, তাদের প্রতি দয়ার্দ হতে। এতটা উদাসীন ও অমনোযোগী হওয়া উচিত নয় যে, এরা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে কিংবা ওপর থেকে পড়ে মারা যাবে। তাছাড়া এদের এভাবে ছেড়ে দেওয়া যাবে না যে, তারা মারামারি করতে করতে একটি আরেকটিকে শিং দিয়ে গুতিয়ে মেরে ফেলবে। আর কোনো প্রাণীকে পিটিয়ে মেরে ফেলা তো জায়িয়ই নয়। অনেক সময় রাখালেরা, বিশেষ করে টাকার বিনিময়ে শ্রম দেওয়া লোকেরা এ কাজ করে থাকে। এমনিভাবে অনেক সময় গৃহপালিত জন্মুর মধ্যে অনেকে লড়াই লাগায়। ষাড় বা দুষ্প্রাপ্ত মধ্যে লড়াই হয়। সেখানে একটি আরেকটিকে গুতিয়ে মেরে ফেলে, এগুলো কোনোটাই জায়িয় নয়।

শিংয়ের আঘাতে নিহত প্রাণীর রক্ত বের হলেও আলিমগণ এ ধরনের নিহত প্রাণীকে নিষিদ্ধ বলেন। এমনকি যদি জবাইয়ের স্থান দিয়ে রক্ত বের হয়, তবু সেটি হারাম। কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে—পশুর লড়াই থেকে লোকজনকে বিরত রাখার জন্য শাস্তি হিসেবে এটা নিষিদ্ধ হয়েছে। [আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।]

হিংস্র জন্মুর খাওয়া প্রাণী নিষিদ্ধ হওয়ার প্রথম কারণ, মানুষ সম্মানিত। হিংস্র

[১] তাফসিরুত তাবারি, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৫০৪

পশুর উচ্ছিষ্ট খাওয়া তার জন্য শোভনীয় নয়। এ থেকে তাকে বিরত রাখার জন্য এটি হারাম করা হয়েছে। হিংস্র পশুর উচ্ছিষ্ট হিসেবে বকরি, উট, গরু ইত্যাদি প্রাক-ইসলামি যুগের লোকেরা খেতো, কিন্তু আল্লাহ তাআলা সেগুলো মুমিনদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন।

### পূজার বেদীতে বলি দেওয়া জন্ম

বিস্তারিতভাবে বর্ণিত নিষিদ্ধ জন্মের মধ্যে দশম প্রকারটি হলো পূজার বেদীতে বলি দেওয়া জন্ম। ইসলামপূর্ব আরবরা পূজার বেদীতে বিভিন্ন জন্ম জবাই করত। এটি আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত প্রাণীর শ্রেণিভূক্ত। কারণ, পূজার বেদীতে জবাই আর গাইরুল্লাহর নামে জবাই উভয় ক্ষেত্রে শয়তানকে সম্মান জানানো হয়। তবে এই দুটির মধ্যে পার্থক্য হলো—কখনো মূর্তি এবং মূর্তির বেদী থেকে দূরেও মূর্তির নামে প্রাণী জবাই হতে পারে। অন্যদিকে ‘পূজার বেদীতে জবাইকৃত জন্ম’—এর অর্থ হলো প্রাণীটি বেদীতে জবাই হয়েছে, কিন্তু জবাইয়ের সময় নাম নেওয়া হয়েছে আল্লাহ তাআলার।

যেহেতু কাবার চতুর্পার্শে অনেকগুলো বেদী ছিল, যে কেউ ধারণা করতে পারে, হয়তো বেদীতে কোনো প্রাণী জবাইয়ের দ্বারা আল্লাহ তাআলার প্রতি সম্মান জানানো হয়। কুরআনে এই ভুল ধারণাকে স্পষ্টভাবে প্রতিহত করে আয়াত অবর্তীণ হয়েছে। যদিও এই বিষয়টি **بِ لَغْيِرِ أَهْلِ مَاءٍ** (আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যা জবাই করা হয়েছে) বাক্যের দ্বারাই বুঝে আসে।

### পঙ্গপাল ও জলজ প্রাণীর ব্যাপারে ব্যক্তিক্রমী বিধান

মাছ-সহ আরও নানা ধরনের জলজ প্রাণী মৃত জন্ম-সংশ্লিষ্ট নিষেধের আওতার বাইরে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমুদ্রের পানির পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন—

**هُوَ الطَّهُورُ مَاؤْهُ الْحِلْلُ مَيْتَةٌ**

| এর পানি পবিত্র এবং এর মৃত জন্ম হালাল [১]

[১] সুনান আবি দাউদ : ৮৩; জামিউত তিরমিয়ি : ৬৯; হাদিসটি সহিহ।

## হালাল-হারামের বিধান

আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَحِلٌّ لِكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ...  
[১]

তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তার খাদ্য হালাল করা হয়েছে [১]

উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু বলেন—

صَيْدُهُ مَا اصْطَبِدَ ، وَ طَعَامُهُ مَا رَمَى بِهِ

| সমুদ্রের শিকার মানে যা সমুদ্র থেকে ধরা হয়, আর সমুদ্রের খাদ্যের অর্থ হলো  
| সমুদ্র যা (মৃত মাছ) তীরে নিষ্কেপ করে। [২]

ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে—

طَعَامُهُ مَيْتَةٌ ، إِلَّا مَا قَذَرْتَ مِنْهَا

| সমুদ্রের খাবার অর্থ হলো সমুদ্রের মৃত জন্ম, তবে যা নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে  
| গেছে তা ব্যতীত। [৩]

জবির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ ، وَأَمْرَأُبُو عَبَيْدَةَ فَجَعْنَا جُوَاعًا شَدِيدًا ، فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيْتًا لَمْ تَرِ  
مِثْلَهُ ، يَقَالُ لَهُ الْقَنْبَرُ ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ ، فَأَخَذَ أَبُو عَبَيْدَةَ عَظِيمًا مِنْ عِظَامِهِ ، فَمَرَّ  
الرَّاكِبُ تَحْتَهُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيرُ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : قَالَ أَبُو عَبَيْدَةَ : كُلُوا فَلَمَّا قَدِمْنَا  
الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلثَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كُلُوا ، رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ ، أَطْعِمُونَا  
إِنْ كَانَ مَعَكُمْ فَأَتَاهُ بَغْضُهُمْ فَأَكَلَهُ

| আমরা জাইশুল খাবাতের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, আর আবু উবাইদা  
| রায়িয়াল্লাহু আনহুকে আমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল। পথে আমরা ভীষণ

[১] সূরা মায়দা, আয়াত : ৯৬

[২] তালিকু সহিল বুখারি, খণ্ড : ৭; পৃষ্ঠা : ৮৯; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৮৯৮২

[৩] তালিকু সহিল বুখারি, খণ্ড : ৭; পৃষ্ঠা : ৮৯; তাফসিলুত তাবারি, খণ্ড : ১১; পৃষ্ঠা : ৬৩

ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ি। তখন সমুদ্র আমাদের জন্য একটি মৃত মাছ তীরে নিক্ষেপ করে দিলো। এত বড় মাছ আমরা আর কখনো দেখিনি, একে ‘আমবার’ বলা হয়। এরপর মাছটি থেকে আমরা অর্ধমাস আহার করলাম। একবার আবু উবাইদা রায়িয়াল্লাহু আনহু মাছটির হাড়গুলোর একটি হাড় তুলে ধরলেন আর সওয়ারীর পিঠে চড়ে একজন হাড়টির নিচ দিয়ে অতিক্রম করল। (বর্ণনাকারী ইবনু জুরাইজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,) আবু যুবাইর রাহিমাহুল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি জাবির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনেছেন, ওই সময় আবু উবাইদা রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমরা মাছটি আহার করো। এরপর আমরা মদিনা ফিরে এলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষয়টি অবগত করলাম। তিনি বললেন, খাও। এটি তোমাদের জন্য রিযিক, যা আল্লাহ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর তোমাদের কাছে কিছু অবশিষ্ট থাকলে আমাদেরকেও খাওয়াও। তারপর মাছটির কিছু অংশ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এনে দেওয়া হলে তিনি তা খেলেন।[১]

সমুদ্রের মৃত জন্তুর মতো মৃত পঙ্গপালও হালাল। এগুলোর জবাই অসম্ভব, তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত পঙ্গপাল খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইবনু আবি আউফা রায়িয়াল্লাহু আনহু বলেন—

غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًا، كُلَّا نَأْكُلُ مَعْهُ الْجَرَادَ

আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাতটি কিংবা ছয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। (যুদ্ধ চলাকালীন) আমরা তার সঙ্গে পঙ্গপাল খেতাম।[২]

### মৃত জন্তুর চামড়া, হাড় ও পশম

মৃত জন্তু হারাম হওয়ার অর্থ হলো—তা খাওয়া হারাম। কিন্তু এর চামড়া, শিং, হাড় ও পশম ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই; বরং এর ব্যবহারই কাম্য। চামড়া, শিং, হাড় ও পশম তো মূল্যবান সম্পদ, তাই অনর্থক এগুলো বিনষ্ট হতে দেওয়া ঠিক হবে না।

[১] সহিল বুখারি : ৪৩৬২; সহিহ মুসলিম : ১৯৩৫

[২] সহিল বুখারি : ৫৪৯৫; সহিহ মুসলিম : ১৯৫২

## হালাল-হারামের বিধান

ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاءَ مَيْتَةً ، أَغْطِيشُهَا مَوْلَةً لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلَا أَنْتَفَعْتُمْ بِجَلِدِهَا ؟ قَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ : قَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا

মাইমুনা রায়িয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক আযাদকৃত এক দাসীকে সাদাকাস্বরূপ প্রদত্ত একটি বকরিকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা এর চামড়া থেকে ফায়দা নিছ না কেন? তারা বললেন, এটা তো মৃত। তিনি বললেন, এর তো কেবল ভক্ষণ হারাম করা হয়েছে।<sup>[১]</sup>

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত জন্মুর চামড়া পবিত্র করার উপায় বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর সেটা হলো চামড়াকে পাককরণ। যেমন একটি হাদিসে তিনি বলেন—

إِنْ دِبَاغَ الْأَدِيمَ طَهُورَةٌ

| নিশ্চয়ই প্রক্রিয়াজাতকরণ হলো চামড়ার পবিত্রতা।<sup>[২]</sup> |

অর্থাৎ, বকরি ইত্যাদি যেমন জবাইয়ের দ্বারা হালাল হয়, মৃত জন্মুর চামড়া ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করলেই তা পবিত্র হয়ে যায়। অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنْ دِبَاغَهُ قَذْ أَذْهَبَ بِخَبِيثِهِ ، أَوْ رِجْسِهِ ، أَوْ نَجَسِهِ

নিশ্চয়ই চামড়া-প্রক্রিয়াজাতকরণ চামড়ার ময়লা, আবর্জনা ও অপবিত্রতা দূর করে দেয়।<sup>[৩]</sup>

সহিহ মুসলিম-সহ একাধিক গ্রন্থে এসেছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১] সহিহুল বুখারি : ১৪৯২; সহিহ মুসলিম : ৩৬৩

[২] মুসনাদু আহমাদ : ৩৫২১; মুসনাদুল বাজ্জার : ৫২০৩; হাদিসটি সহিহ।

[৩] মুসনাদু আহমাদ : ২১১৭; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ৫০; হাদিসটি হাসান।

إِذْ دُبَغَ الْأَلْهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

| যখন চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হয় তখন সেটি পবিত্র হয়ে যায়। [১]

মৃত জঙ্গুর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করলে সেটি পবিত্র হয়ে যায়। এর মধ্যে সব প্রাণীর চামড়াই অন্তর্ভুক্ত, এমনকি কুকুর ও শূকরের চামড়াও।<sup>[২]</sup> যাহিরি মাযহাবের বক্তব্য এমনই। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর শাগরিদ ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ থেকেও এ ধরনের একটি (অগ্রহণযোগ্য) মত পাওয়া যায়। ইমাম শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

উম্মুল মুমিনিন সাওদা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

مَا تَنْهَى شَاءَ ، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ، ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنَّاً

| একবার আমাদের একটি বকরি মরে গেল। আমরা এর চামড়া দাবাগাত (প্রক্রিয়াজাত) করে নিলাম। এরপর থেকে তাতে সর্বদাই আমরা নাবিজ (খুরমা-খেজুর ভিজানো শরবত) প্রস্তুত করতাম। শেষ পর্যন্ত ওটা পুরাতন মশকে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।<sup>[৩]</sup>

### বিশেষ পরিস্থিতির কথা ভিন্ন

উল্লিখিত বস্তুগুলো নিষিদ্ধ থাকবে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতির কথা ভিন্ন। যার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মহান আল্লাহ বলেন—

...وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرْتُمْ إِلَيْهِ ...

[১] সহিহ মুসলিম : ৩৬৬; সুনানু আবি দাউদ : ৪১২৩

[২] চার মাযহাব-সহ অন্যান্য অধিকাংশ আলিমের মত হলো, শূকরের চামড়া পাকাকরণের দ্বারাও পবিত্র হয় না। কেননা, শূকর সন্তানভাবে পুরোটাই নাপাক, তাই কোনোভাবেই তার চামড়া পবিত্র করার উপায় নেই। আর শাফিয়ি মাযহাবে শূকরের পাশাপাশি কুকুরের চামড়াও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পবিত্র হয় না। আর ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হাসান রাহিমাহুল্লাহর মতে শূকরের পাশাপাশি হাতির চামড়াও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পবিত্র হয় না। [আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়াহ, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২২৯-২৩০]

[৩] সহিহুল বুখারি : ৬৬৮৬; শারহু মাআনিল আসার : ২৭০৪

আর আল্লাহ সেসব জন্তুর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, যেগুলোকে তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তবে যদি তোমরা নিরূপায় হয়ে যাও, তাহলে ভিন্ন কথা (অর্থাৎ সেক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বস্তু তত্ত্বকু খেতে পারো, যত্ত্বকু খেলে প্রাণ বাঁচানো যায়) [১]

মৃত জন্তু ও রক্তের নিষিদ্ধতা বয়ানের পরে আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

অবশ্য যে লোক নিরূপায় হয়ে পড়ে, অথচ সে নাফরমান নয় এবং সীমালজ্ঞনকারীও নয়, তার জন্য (এসব হারাম বস্তু গ্রহণে) কোনো পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু [২]

সর্বসম্মতিক্রমে বিশেষ পরিস্থিতি বলতে চরম পর্যায়ে খাবারের অভাব বোঝানো হয়েছে। কোনো কোনো ফকির নিকট খাবারের অভাবের সীমাও নির্ধারিত— একদিন-একরাত বা ২৪ ঘণ্টা। টানা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খাওয়ার মতো কারো কাছে হারাম খাবার ছাড়া যদি কিছু না থাকে, তাহলে সে ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ নিষিদ্ধ বস্তু খেয়ে জীবন বাঁচাতে পারবে।

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োজন পরিমাণের সীমা হলো, তৃপ্তিসহ খাওয়া এবং হালাল বিকল্প পাওয়া পর্যন্ত হারাম খাবার সংরক্ষণ করে রাখা।’

তবে অন্যান্য ফকিরগণ বলেন, ‘নিষিদ্ধ খাবার ক্ষুধা নিবারণের অতিরিক্ত গ্রহণ বৈধ নয়।’ কুরআনের বাণী— ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾— (অবশ্য যে ব্যক্তি নিরূপায় হয়ে পড়ে, অথচ সে নাফরমান নয় এবং সীমালজ্ঞনকারীও নয়) থেকে দ্বিতীয় মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। বিশেষ পরিস্থিতির অভাবের সীমা কুরআনেই স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে—

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ১১৯

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৭৩

فَمِنْ أَضْطَرَ فِي مَخْمَصَةٍ عَيْنَ مُتَجَانِفٍ لَا إِنِّي لِلَّهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ  
②

অতএব যে ব্যক্তি পাপ করার প্রবণতা ব্যতীত ক্ষুধার তাড়নায় (নিষিদ্ধ জিনিস খেতে) বাধ্য হয়, তাহলে (তার জন্য) আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল,  
পরম দয়ালু [১]

### চিকিৎসার প্রয়োজনে নিষিদ্ধ বস্তুর ব্যবহার

নিষিদ্ধ বস্তুর বিকল্প চিকিৎসা উপাদান না থাকলে করণীয় বিষয়ে ফকিরগণের দুই ধরনের মতামত রয়েছে। একদলের মতামত, চিকিৎসা খাদ্যের মতো অপরিহার্য কোনো বিষয় নয়, তাই এর জন্য নিষিদ্ধ বস্তুর ব্যবহার বৈধ নয়। প্রমাণ হিসেবে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস পেশ করে থাকেন। হাদিসটি হলো—

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءً كُمْ فِي حَرَامٍ

| নিচ্যই আল্লাহ তাআলা হারাম জিনিসের মধ্যে তোমাদের আরোগ্য রাখেননি [২]

আরেকদলের মতামত হলো, চিকিৎসা খাদ্যের মতোই প্রয়োজনীয় বিষয়। দুটিই মানুষের বাঁচা ও টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য। এই মতের প্রবক্তাদের দলিল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস। হাদিসটি বুখারি-মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, আনাস রায়িয়াল্লাহু আনহু বলেন—

رَحْمَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيرِ وَعَنْدِ الرَّحْمَنِ فِي لِبْسِ الْحَرِيرِ، لِحِكَةٍ بِهِمَا

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম চর্মরোগ-জাতীয় সমস্যার জন্য আবুর রহমান ইবনু আউফ রায়িয়াল্লাহু আনহু এবং যুবাইর ইবনুল আওয়াম রায়িয়াল্লাহু আনহুকে রেশমি কাপড় পরার অনুমতি দিয়েছিলেন [৩]

[১] সুরা মায়দা, আয়াত : ৩

[২] সহিল ইবনি হিবান : ১৩৯১; মুসনাদু আবি ইয়ালা : ৬৯৬৬; হাদিসটি হাসান।

[৩] সহিলুল বুখারি : ৫৮৩৯; সহিহ মুসলিম : ২০৭৬

অথচ রেশমি কাপড়ের নিষিদ্ধতা-বিষয়ক ঘোষণা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম নিজেই দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তার থেকে কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে।

প্রতিটি আইন-কানুন ও উপদেশের মধ্যে মানুষের জীবনের যে অনিঃশেষ গুরুত্ব ইসলামে এসেছে, তাতে এই দ্বিতীয় বক্তব্যটি ইসলামি চিন্তাধারার সাথে অধিক জুতসই বা সমীচীন মনে হয়।

তবে নিষিদ্ধ বস্তুর মিশ্রণে তৈরি ওষুধ খাওয়ার বৈধতার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে—

» নিষিদ্ধ বস্তু মিশ্রিত ওষুধ প্রহণ না করলে শারীরিক ক্ষতির বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে।

» বিকল্প কোনো হালাল ওষুধ নেই, এমন হতে হবে।

» চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে অভিজ্ঞ আস্থাভাজন একজন দীনদার চিকিৎসকের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে হবে।

বাস্তবতার নিরিখে নির্ভরযোগ্য চিকিৎসকদের বক্তব্য থেকে আমরা নিশ্চিত হয়েছি, চিকিৎসাবিজ্ঞানে এমন কোনো রোগ এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি, যার জন্য ওষুধ হিসেবে হারাম কিছুর ব্যবহার অপরিহার্য। তবু সতর্কতাবশত মূলনীতি-বিষয়ক আলোচনা আমরা এখানে করে রাখলাম, হয়তো পৃথিবীর কোথাও কারো জন্য কোনো মুহূর্তে হারাম-মিশ্রিত ওষুধ ছাড়া আর কোনো চিকিৎসা-উপকরণ না-ও থাকতে পারে।

কারো কাছে অতিরিক্ত খাবার থাকলে হারাম বস্তু খাওয়া জায়িয় নয় নিজের মালিকানাধীন হালাল সম্পদ না থাকলেই হারাম জিনিস খাওয়া যাবে, বিষয়টি এমন নয়। সমাজের কারো কাছে অভাবী ব্যক্তির ক্ষুধা নিবারণের মতো অতিরিক্ত খাবার থাকলে হারাম জিনিস খাওয়ার সুযোগ নেই। কারণ, ইসলামি সমাজ হলো সহযোগিতাপূর্ণ ও পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল সমাজ। এই সমাজের সদস্যরা হলো একটি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো। এখানে একজন অপরজনের সহযোগী। তাই সমাজে কারো ব্যক্তিগত পর্যায়ে অভাব থাকলেই তার জন্য হারাম জিনিস খাওয়া বৈধ হয়ে যায় না।

ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক দায়িত্বশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ইমাম ইবনু হায়ম রাহিমাল্লাহ বেশ চমৎকার উপস্থাপনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন, ‘সমাজের অন্য কারো কাছে—হোক সে মুসলিম বা যিন্মি—প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য মজুদ থাকলে একজন মুসলিমের জন্য মৃত জঙ্গু বা শূকরের মাংস খাওয়ার সুযোগ নেই। যার কাছে অতিরিক্ত খাবার আছে, তার জন্য আবশ্যিক হলো ক্ষুধার্তকে খাবার দেওয়া।<sup>[১]</sup> সে খাবার দিলে অভাবী আর মৃত জঙ্গু বা শূকরের মাংসের মতো হারাম কোনো খাবার খেতে বাধ্য হবে না। খাবারের মালিক না দিলে অভাবী তার সঙ্গে লড়াই করতে পারবে। লড়াই করতে গিয়ে যদি সে (অভাবী) নিহত হয়, তাহলে হত্যাকারীর ওপর মৃত্যুদণ্ড আরোপিত হবে। আর যদি বাধাদানকারী নিহত হয়, তাহলে তার ওপর আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত বর্ষিত হবে। কারণ সে আরেকজনকে তার প্রাপ্ত অধিকার থেকে বণ্ণিত করেছে। তাই সে সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তাআলা সীমালঙ্ঘনকারীদের ব্যাপারে বলেছেন—

❶ فَإِنْ بَغَتْ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ...  
.....

তারপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।<sup>[২]</sup>  
.....

এখানে বাধাদানকারী লোকটি অভাবীকে তার (খাবার পাওয়ার) অধিকার থেকে বণ্ণিত করেছে। আর এ কারণেই আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আনহু যাকাত দিতে অসীকারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।<sup>[৩]</sup>

[১] একটি সহিহ হাদিস থেকেও এ কথাটির প্রমাণ পাওয়া যায়। সুনানু আবি দাউদে সহিহ সনদে মিকদাম ইবনু মাদিকারিব রায়িয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘... আর যখন কোনো লোক কোনো সম্প্রদায়ের নিকট আগস্তুক হিসেবে পৌঁছে তখন তাদের কর্তব্য হলো তার মেহমানদারি করা। যদি তারা তাদের কর্তব্য পালন না করে, তাহলে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে হলোও তার মেহমানদারির পরিমাণ জিনিস আদায় করার অধিকার তার আছে।’ [সুনানু আবি দাউদ : ৪৬০৪]

[২] সুরা হুজুরাত, আয়াত : ৯

[৩] আল-মুহাম্মদ, ইবনু হায়ম, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৮৪

## হালাল-হারামের বিধান

### সামুদ্রিক সকল প্রাণীই হালাল

বসবাসের জায়গা হিসেবে প্রাণী দুই প্রকার—এক. সামুদ্রিক। দুই. স্থলজ। সামুদ্রিক প্রাণী (যে সকল প্রাণীর বসবাস পানিতে, পানি ছাড়া তারা বাঁচতে পারে না, সেগুলো সবই এখানে উদ্দেশ্য) সবই হালাল। এসব প্রাণী মৃত ধরা হোক বা জীবিত, ভেসে উঠুক বা না উঠুক, এতে মাছ ও মাছ-জাতীয় সব জলজ প্রাণী বরাবর। সমুদ্রের কুকুর বা শূকর সবই হালাল। শিকারি অমুসলিম হলেও হালাল। আল্লাহ তাআলা হালাল করেছেন সমুদ্রের যাবতীয় জলজ প্রাণী, কোনো জলজ প্রাণীই তাঁর কাছে হারাম নয়।<sup>[১]</sup> এগুলো হালাল হওয়ার জন্য জবাই-জাতীয় কোনো শর্তও নেই। কোনো নিষ্ঠুরতা ছাড়া মানুষ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে প্রয়োজনীয় জলজ প্রাণী ধরতে পারে। এটি বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার অনেক বড় অনুগ্রহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

**وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيفًا...<sup>[২]</sup>**

আর তিনিই সমুদ্রকে তোমাদের অধীন বানিয়েছেন, যাতে সেখান থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পারো।<sup>[২]</sup>

[১] এটাই জমহুর তথা অধিকাংশ ফকিহগণের মাযহাব। বেশিরভাগ ফকিহের মতে, সকল জলজ প্রাণীই হালাল। চাই তা মাছ হোক বা অন্য কিছু। অবশ্য তাদের মধ্যে কেউ কেউ সামুদ্রিক কুকুর, সামুদ্রিক শূকর ও ব্যাঙ্গসহ দু-চারটি প্রাণী খাওয়াকে নিষিদ্ধ বলেছেন। তবে, এর বিপরীতে হানাফি মাযহাবের মত হলো, জলজ প্রাণীর মধ্যে কেবল মাছই হালাল, অন্য কোনো প্রাণী নয়। সুতরাং মৎসশিকারী বা স্থানীয়রা যেটাকে মাছ বলে সুন্নতি দেয় সেটা খাওয়া যাবে, এটা বাদে অন্য কোনো জলজ প্রাণী খাওয়া জায়িয নয়। হানাফি ফকিহগণ একেব্রে দলিল পেশ করেন কুরআনের অন্য একটি আয়াত দ্বারা। আয়াতটি হলো—

**وَيُحَلِّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَابَ**

আর তিনি (নবি) তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে হালাল করে এবং অপবিত্র ও নোংরা বস্তুসমূহকে হারাম করেন। [সুরা আরাফ, আয়াত : ১৫৭]

এ আয়াতের ভিত্তিতে তারা বলেন, সমুদ্রে মাছ ছাড়া যা আছে সব খবিশ তথা নোংরা ও অবুচিকর প্রাণী। তাই সেগুলো খাওয়া বৈধ হবে না। এছাড়াও হানাফি ফকিহগণ আরো বলেন, যে মাছ পানিতে অজ্ঞাত কারণে মরে যায়, যার মৃত্যুর বাহ্যিক কোনো কারণ জানা যায় না সে মাছও খাওয়া যাবে না। এ-সংক্রান্ত একাধিক হাদিস পাওয়া যায়, যেগুলো বর্ণিত হয়েছে সুনানু আবি দাউদ, সুনানু ইবনি মাজাহ-সহ বিভিন্ন হাদিসগুলো। তবে এসব হাদিসের বিশুদ্ধতা নিয়ে বিতর্ক আছে। এছাড়াও ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ এ-সংক্রান্ত হাদিসটিকে মাওকুফ হাদিস বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাআলা-ই ভালো জানেন। [বিস্তারিত দেখুন, আল-মাওসুআতুল ফিলহিয়াহ, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১২৭-১২৯]

[২] মূল নাহল, আয়াত : ১৪

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

﴿٦﴾ أَحِلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلصَّيْرَةِ ...

তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তার খাবার হালাল করা হয়েছে,  
তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য। [১]

কুরআনে সমুদ্রে খাদ্যে কোনো সীমা ও শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়নি। এখানে হারাম  
কিছু থাকলে আল্লাহ তাআলা তা বলে দিতেন। আল্লাহ তাআলা কোনো কিছুই ভুলে  
যান না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿٦﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيئًا ...

আর আপনার পালনকর্তা বিস্মৃত হওয়ার নন। [২]

### নিষিদ্ধ যেসব স্থলজ প্রাণী

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট সামুদ্রিক সকল প্রাণীই হালাল ও খাওয়া বৈধ।  
তাহলে স্থলজ প্রাণীর বিধান কী? পূর্বেই আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে, কুরআনে  
স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে শূকরের মাংস, মৃত জন্তু, প্রবাহিত রস্ত এবং গাইরুল্লাহর  
নামে উৎসর্গিত প্রাণী হারাম।

কিন্তু কুরআনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা  
বলেছেন—

﴿٦﴾ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

আর তিনি (অর্থাৎ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের জন্য  
পবিত্র বস্তুসমূহকে হালাল করেন এবং অপবিত্র ও নোংরা বস্তুসমূহকে  
হারাম করেন। [৩]

[১] সুরা মাযিদা, আয়াত : ৯৬

[২] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৬৪

[৩] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৫৭

## হালাল-হারামের বিধান

অধিকাংশ মানুষের নিকট ঘৃণিত বস্তুই নিকৃষ্ট বস্তু, হতে পারে কিছু লোকের কাছে তা পছন্দনীয়। একটি হাদিসে এসেছে, আলি রায়িয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—

**أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْرٍ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ  
الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ**

| রাম্জুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবার যুদ্ধের দিন মহিলাদের সাথে নিকাহে মুতআ<sup>[১]</sup> করা থেকে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন<sup>[২]</sup>

এ ধরনের আরেকটি হাদিস এসেছে, আবু সা'লাবা রায়িয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ  
الْطَّيْرِ**

| নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক শিকারী দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী ও প্রত্যেক শিকারী নখবিশিষ্ট পাখি খেতে নিষেধ করেছেন<sup>[৩]</sup>

হিংস্র প্রাণী বলতে সিংহ, বাঘ, নেকড়ে ইত্যাদি প্রাণী বোঝানো হয়। যেগুলো গায়ের শক্তি ব্যয় করে শিকার করে বেড়ায়। শিকারী নখবিশিষ্ট পাখি বলতে বাজপাখি বা ঈগল, শকুন, চিল প্রভৃতি পাখি উদ্দেশ্য।

হাদিস ইত্যাদির মাধ্যমে প্রমাণিত হারাম বিষয়গুলোর ব্যাপারে ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহুর মতামত (অন্যান্য সকলের বিপরীতে) কিছুটা ভিন্ন। তার মত

[১] নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিয়য়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো নারীর সাথে সাময়িক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে নিকাহে মুতআ বলা হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ক্ষেত্র বিশেষে, যেমন যুদ্ধকালীন কিংবা সফরে এ ধরনের সাময়িক বিয়ে বৈধ ছিল। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় এ ধরনের বিয়ে বৈধ ছিল না। পরে খাইবারের যুদ্ধের সময় এ ধরনের বিয়েকে সর্বাবস্থার জন্যই হারাম ঘোষণা করা হয়। তারপর অষ্টম হিজরিতে মক্কাবিজয়ের সময় মাত্র ৩ দিনের জন্য তা বৈধ করা হয়েছিল। এরপর তা কিয়ামত পর্যন্ত চিরতরে হারাম ঘোষণা করা হয়।

[২] সহিল বুখারি : ৪২১৬; সহিহ মুসলিম : ১৪০৭

[৩] সহিল বুখারি : ৫৫৩০; সহিহ মুসলিম : ১৯৩২

হলো—কুরআনে উল্লেখিত চারটি বিষয় ছাড়া আর কোনো কিছুই হারাম নয়। তার বস্তু থেকে মনে হয়, তার মতে হিংস্র পশু ইত্যাদির নিষেধাজ্ঞা মাকরুহ স্তরের হবে অথবা এগুলো নিষেধের সংবাদ তার কাছে পৌঁছায়নি।

ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءً وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءً تَقْذِيرًا ، فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيًّا ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ ، وَحَرَمَ حَرَامَهُ ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا حَرَمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ غَفُورٌ وَتَلَا { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } إِلَى آخر الآية

প্রাক-ইসলামি যুগের আরবরা অনেক কিছু খেতো, আবার অনেক কিছু ঘৃণাবশত বর্জন করত। তারপর আল্লাহ তাআলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর কিতাব আল-কুরআন অবতীর্ণ করলেন। তারা হালালকে হালাল করলেন, আর হারামকে হারাম করলেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেছেন তা হালাল, তিনি যা হারাম করেছেন তা হারাম, আর যে সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন তা বুখসত বা ছাড়। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন—

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا  
أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فِي إِنْهٰءٍ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

আপনি বলুন, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে, তাতে আহারকারী যা আহার করে, তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না। তবে মৃতপ্রাণী, বহমান রস্ত ও শূকরের গোশত; কেননা তা অপবিত্র। অথবা (জবাইকালে) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেওয়ার কারণে যা অবৈধ। তবে যেকেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালঙ্ঘন না করে তা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, তবে নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।<sup>[১]</sup>

সুরা আনআমের এই আয়াতের ভিত্তিতে ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্ত

[১] সুনানু আবি দাউদ: ৩৮০০; মুস্তাদরাকুল হাকিম: ৭১১৩; হাদিসটি সহিহ। সুরা আনআম, আয়াত: ১৪৫।

ছিল—‘গৃহপালিত গাধার মাংস হালাল।’[১]

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর অবস্থান থেকে বোঝা যায় যে, তিনিও ইবনু আবাস  
রায়িয়াল্লাহু আনহুর মতের পক্ষে। তাই তার মতে হিংস্র জন্তু ইত্যাদি হারাম নয়;  
বরং মাক্রুহ।[২]

জবাই দ্বারা নিষিদ্ধ পশুর মাংস বৈধ হয় না, তবে এতে তার চামড়া পবিত্র হয়ে যায়।  
এক্ষেত্রে চামড়া-প্রক্রিয়াজাতকরণের কোনো শর্ত নেই; এটা ছাড়াই কেবল জবাইয়ের  
দ্বারাই তা পবিত্র বলে গণ্য হয়।

### গৃহপালিত প্রাণীর জন্য জবাই বাধ্যতামূলক

বৈধ স্থলজ প্রাণীর মধ্যে দুটি শ্রেণি আছে—একটি শ্রেণি, যেগুলো মানুষের  
আয়ত্তাধীন থাকে। এগুলোর জবাই প্রক্রিয়া খুবই সহজ। যেমন : উট, গরু, মহিষ,  
ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত প্রাণী। আরেকটি শ্রেণি হলো, যেগুলো মানুষের আয়ত্তাধীন  
নয়। এগুলোর জবাইও অনেকটা কঠিন। প্রথম শ্রেণির প্রাণী খাওয়া বৈধ হওয়ার  
জন্য শারয়ি জবাই অপরিহার্য।

### শারয়ি জবাইয়ের শর্তসমূহ

[এক] জবাই এবং নহর (উটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) হবে ধারালো কিছু দিয়ে, যাতে  
সহজেই রস্ত ঝরে যায়, কাটা হয়ে যায় প্রয়োজনীয় রগ ও নালিগুলো। ধারালো  
জিনিসটি পাথর বা কাঠও হতে পারে, এতে কোনো সমস্যা নেই। আদি ইবনু হাতিম

[১] সহিল বুখারিতে ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহুর ঘটনাটি আমর রাহিমাহুল্লাহ থেকে এভাবে বর্ণিত  
হয়েছে, তিনি (অর্থাৎ আমর রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আমি জাবির ইবনু যাইদ রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস  
করলাম, লোকেরা ধারণা করে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহপালিত গাধার গোশত থেকে  
নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন, হাকাম ইবনু আমর গিফারি রায়িয়াল্লাহু আনহুও বসরায় আমাদের কাছে এ  
কথা বলতেন। কিন্তু জ্ঞানের সাগর ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু এই ব্যাপারটি অসীকার করেছেন। তারপর  
তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেন—

فَلَا أَجِدُ فِي مَا أُوتِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ بَطْعَةً

আপনি বলুন, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে, তাতে আহারকারী যা আহার করে, তার মধ্যে আমি কিছুই  
নিষিদ্ধ পাই না। [সুরা আনআম, আয়াত : ১৪৫] [সহিল বুখারি : ৫৫২৯]

[২] আল-মুদাউলাতুল কুবরা, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৫০

## দৈনন্দিন জীবনে হালাল-হারাম

রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

**قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَصِيدُ الصَّيْدَ، فَلَا تَجِدُ سِكِّينًا إِلَّا الظِّرَارَ وَشِفَةً الْغَصَّا، فَقَالَ:**  
**أَمِيرَ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَادْعُ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ**

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা তো শিকার করি, কখনো আমাদের কাছে ছুরি বলতে তীক্ষ্ণ পাথর এবং লাঠির অংশ (বাঁশ) ছাড়া আর কিছুই থাকে না! তিনি বললেন, যা দিয়ে পারো রস্ত ঝরাও এবং আল্লাহর নাম নাও।<sup>[১]</sup>

[দুই] জবাইয়ের জন্য কাটতে হবে কষ্টনালি। আর নহর হবে বুকের উপরিভাগে (নহর শুধু উটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। কষ্টনালি বা বুকের উপরিভাগ এমনভাবে কাটতে হবে, যাতে কষ্টনালি বা বুকের উপরিভাগ কাটার কারণেই প্রাণীটি মারা যায়। আর জবাইয়ের সর্বোত্তম পন্থা হলো শ্বাসনালি, খাদ্যনালি এবং ঘাড়ের দুটি রগ কেটে দেওয়া।<sup>[২]</sup>

কোনো ক্ষেত্রে শারীরি পন্থায় স্বাভাবিক জবাই প্রক্রিয়া কঠিন হয়ে পড়ে, তখন এসব শর্ত কিছুই লাগবে না। যেমন কোনো প্রাণী মাথা নিচে দিয়ে, কুপের মধ্যে পড়ে গেল, তার গলা বা বুকের উপরিভাগ কিছুই নাগাল পাওয়া গেল না কিংবা গৃহপালিত প্রাণী আচমকা পালিয়ে গেল বা বন্য হয়ে উঠল, তখন তার সাথে শিকারি প্রাণীর মতোই আচরণ করতে হবে। শরীরের যেকোনো জায়গায় ধারালো কিছু দিয়ে ক্ষত তৈরি করে রস্ত ঝরাতে পারলেই তার জবাই পূর্ণ হয়ে যাবে।

সহিতুল বুখারি ও সহিহ মুসলিমে রাফি ইবনু খদিজ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

**كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ مِّنْ إِبْلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهِذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَخْشِيِّ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعُلُوا بِهِ هَكَذَا**

[১] সুনানু আবি দাউদ : ২৮২৪; মুসনাদু আহমাদ : ১৮২৫০; হাদিসটি সহিহ।

[২] তবে, হানফি মাযহাব অনুসারে জবাই বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য মেট চারটি বা কমপক্ষে তিনটি জিনিস কাটতে হবে, যথা শ্বাসনালি, খাদ্যনালি ও ঘাড়ের দুটি রগ। এ চারটির মধ্যে দুটি বা একটি কাটা হলে জবাই বিশুদ্ধ হবে না এবং সে প্রাণীর গোশতও হালাল হবে না।

## হালাল-হারামের বিধান

একবার আমরা এক সফরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ আমাদের একটি উট বাঁধন ছিড়ে পালিয়ে যেতে লাগল। কাফেলার সঙ্গে কোনো ঘোড়া ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে উটটিকে লক্ষ্য করে তির ছোড়া হলে, উটটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বন্য পশুদের মতো এ (গৃহপালিত) জন্মগুলোর মধ্যে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এগুলোর মধ্য থেকে যদি কোনোটি এমন করে, তাহলে ওদের সঙ্গে এই ব্যক্তি যা করেছে তোমরাও তা-ই করবে।<sup>[১]</sup>

[তিন] প্রাণী জবাইয়ের সময় আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো নাম নেওয়া যাবে না; এটি সর্বসম্মত মতামত। যেহেতু প্রাক-ইসলামি আরবগণ দু-ভাবে প্রাণী জবাই করে দেব-দেবীর নৈকট্য অর্জন করত; তাদের একটি রীতি ছিল—পশু জবাইয়ের সময় দেব-দেবীর নাম নেওয়া। আরেকটি রীতি ছিল মূর্তির বেদীতে পশু জবাই। ইসলামে এসবই হারাম ঘোষিত হয়েছে। যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, مَنْ ذَبَحَ عَلَى النُّصُبِ (আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত জন্ম) <sup>[২]</sup> أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ (পূজার বেদীতে বলি দেওয়া জন্ম)।<sup>[৩]</sup>

[চার] জবাইয়ের সময় আল্লাহ তাআলার নাম নিতে হবে, এই বিষয়টি কুরআন ও হাদিস থেকে প্রমাণিত। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿১﴾

সুতরাং তোমরা আহার করো তা থেকে, যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, যদি তোমরা তাঁর আয়াতসমূহের ব্যাপারে বিশ্঵াসী হয়ে থাকো।<sup>[৪]</sup>

তিনি আরো বলেন—

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لِفِسْقٌ ... ﴿১﴾

[১] সহিল বুখারি : ৫৫৪৪; সহিহ মুসলিম : ১৯৬৮

[২] সুরা মায়দা, আয়াত : ৩

[৩] আগুন্ত

[৪] সুরা আনআম, আয়াত : ১১৮

আর তোমরা তা থেকে আহার কোরো না, যার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ  
করা হয়নি এবং নিশ্চয়ই তা গর্হিত [১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

مَا أَنْهَرَ الدَّمْ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنَنُ وَالظُّفَرُ

| যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং তাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তা খাও। তবে দাঁত  
ও নখ দিয়ে (জবাই করলে তা খাওয়া হালাল) নয় [২]

বহু বিশুদ্ধ হাদিস, যেসব হাদিসে শিকার ও তির নিক্ষেপের সময় বা প্রশিক্ষিত  
কুকুরকে প্রেরণের আগে ‘বিসমিল্লাহ’ পড়তে বলা হয়েছে। সেখান থেকে  
এই শর্তটি আবশ্যিকীয় হওয়ার সমর্থন পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে সামনে আরো  
আলোচনা আসছে।

একদল আলিম বলেন, ‘আল্লাহর নাম নেওয়া আবশ্যিক, তবে সেটা জবাইয়ের সময়  
হতে হবে এমন কিছু নয়। খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম নিলেই যথেষ্ট।’ তাদের  
যুক্তি হলো—খাওয়ার সময় নাম নিলেও সেটা আল্লাহর নাম নেওয়া বস্তুই হলো।  
সেক্ষেত্রে খাবার গ্রহণকারী আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি এমন বস্তু খেয়েছে বলে  
বিবেচিত হবে না। সহিলুল বুখারিতে এসেছে, আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে  
বর্ণিত, তিনি বলেন—

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا أَقْوَامًا حَدَّيْتُ عَهْدُهُمْ بِشِرَكٍ ، يَأْتُونَا بِلُحْمَانٍ لَا نَذْرِي  
يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا ، قَالَ: اذْكُرُوا أَنْتُمْ اسْمَ اللَّهِ ، وَكُلُوا

| সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, এখানে এমন কিছু সম্প্রদায় আছে,  
যারা সবেমাত্র শিরক ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা আমাদের কাছে  
গোশত নিয়ে আসে। সেগুলো জবাই করার কালে তারা আল্লাহ তাআলার নাম

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ১২১

[২] সহিলুল বুখারি : ৫৪৯৮; সহিহ মুসলিম : ১৯৬৮

নেয় কি না তা আমরা জানি না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,  
তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তা ভক্ষণ করো।<sup>[১]</sup>

### জবাইয়ের রহস্য ও কারণ

শারয়ি জবাইয়ের মূল বিষয় হলো (যেমনটা আমাদের কাছে মনে হয়েছে) — প্রাণীকে  
অতিরিক্ত কষ্ট না দিয়ে যত সহজে ও দ্রুত উপায়ে সন্তুষ্ট তার প্রাণ মুক্ত করে দেওয়া।  
এ জন্য শরিয়তের নির্দেশনা হলো—জবাইয়ে ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে  
ও গলা কাটতে হবে। ধারালো অস্ত্রের ব্যবহারে দ্রুত জবাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়,  
অন্যদিকে গলা কাটলে সহজেই তার আঘাত বের হয়ে অধিক শাস্তি পাওয়া থেকে  
সে মুক্তি পায়।

নখ, দাঁত ইত্যাদি দিয়ে জবাই করা নিষেধ; কারণ এগুলো দিয়ে জবাই করতে  
গেলে প্রাণী মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়া সাল্লাম জবাইয়ের অস্ত্র শাশিত করতে এবং প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়ার নির্দেশ  
দিয়ে বলেন—

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِخْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأْخِسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأْخِسِنُوا  
الذِّنْجَ وَلْيُحِدْ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ فَلْيُرِخْ ذَبِيجَتَهُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের ওপর ইহসান করাকে  
অত্যাবশ্যক করেছেন। অতএব তোমরা যখন (মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত) কাউকে হত্যা  
করবে, দয়ার্দতার সঙ্গে হত্যা করবে; আর যখন জবাই করবে তখন দয়ার  
সঙ্গে জবাই করবে। আর তোমাদের কেউ (জবাই করতে গেলে সে যেন) তার  
ছুরি ধার দিয়ে নেয় এবং তার জবাইকৃত জন্মকে একটু আরাম দেয়।<sup>[২]</sup>

এ ধরনের সুন্দর আচরণের একটি নির্দশন ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে  
বর্ণিত একটি বর্ণনাতেও দেখা যায়। সেখানে এসেছে যে, তিনি বলেছেন—

[১] সহিহুল বুখারি : ৫৫০৭; সুনানুল নাসারি : ৪৪৩৬

[২] সহিহ সুসলিম : ১৯৫৫; সুনানু আবি দাউদ : ২৮১৫

## দৈনন্দিন জীবনে হালাল-হারাম

أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشَّفَّارِ، وَأَنْ ثُواَرَى عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ أَحَدَكُمْ، فَلْيُجْهِزْ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অস্ত্র শান্তি করতে এবং সেগুলো চতুর্ষিদ জন্ম থেকে গোপন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি আরো বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ যখন জবাই করে, সে যেন দ্রুত কাজ সম্পন্ন করে।’<sup>[১]</sup>

ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنْ رَجُلًا أَضْجَعَ شَاهَ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا وَهُوَ يَحْدُثُ شَفْرَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتًا هَلَا حَدَّدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا

এক ব্যক্তি জবাই করার উদ্দেশ্যে একটি বকরিকে শুইয়ে রেখে ছুরি ধার দিচ্ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি তাকে কয়েকবার মারতে চাও? তুমি একে শুইয়ে রাখার আগে তোমার ছুরি ধার দিলে না কেন?<sup>[২]</sup>

উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে—

رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابَ رَجُلًا يَسْحَبُ شَاهَ بِرِجْلِهَا لِيَذْبَحَهَا، فَقَالَ لَهُ: وَيْلَكَ قُدْهَا إِلَى الْمَوْتِ قَوْدًا جَمِيلًا.

উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে একটি বকরিকে পা ধরে টেনে-হিচড়ে জবাইয়ের জন্য নিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার ধূঃস হোক! তুমি একে সুন্দরভাবে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাও।<sup>[৩]</sup>

জবাইয়ের ক্ষেত্রে ইসলামের একটি সাধারণ নিয়ম ও নির্দেশনা হলো—অবলা প্রাণীদের প্রতি দয়ার্দ হওয়া। তাদের ওপর কোনো রকম জুলুম বৈধ নয়। যথাসম্ভব কষ্ট না দিয়ে এসব প্রাণী জবাই করতে হবে।

[১] সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩১৭২; মুসনাদু আহমাদ : ৫৮৬৪; হাদিসটির সনদ যইফ।

[২] মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৭৫৬৩; আস-সুনানুল কুবরা, বাহিহাকি : ১৯১৪১; হাদিসটি সহিহ।

[৩] মুসাম্মাফু আব্দির রাজ্জাক : ৮৬০৫; আত-তারিফি ওয়াত-তারহির, মুনফিরি : ১৬৭৪; আসারাতির সনদ দুর্বল।

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবরা জীবিত উটের কুঁজের মাংস কেটে কেটে খেতো, জীবিত বকরির পেছনের মাংস কেটে ফেলত। এতে এসব প্রাণীদের সীমাহীন কষ্ট হতো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের কাজের ব্যাপারে পরিপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন এবং কর্তিত অংশ খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন। তিনি বলেন—

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ

| জীবিত চতুর্ক্ষণ জন্ম থেকে কর্তিত অংশ হলো মৃত জন্ম মতো।<sup>[১]</sup>

**কেন জবাইয়ের শুরুতে আল্লাহর নাম নিতে হবে?**

জবাইয়ের সময় আল্লাহ তাআলার নাম উল্লেখের পেছনে সুপ্ত কয়েকটি কারণ রয়েছে, এ সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা দরকার। একটি কারণ তো হলো—মৃত্তিপূজারি ও পৌত্রলিকরা জবাইয়ের সময় তাদের দেব-দেবীর নাম নিত, তাদের বিরোধিতার জন্য একত্রবাদীরা আল্লাহ তাআলার নাম নেবে। তাছাড়াও একজন মুশরিক যদি জবাইয়ের সময় তাদের অক্ষম দেবতার নাম নিতে পারে, তাহলে একজন মুমিনের জন্য তার সর্বশক্তিমান প্রতিপালকের নাম নিতে সমস্যা কোথায়?

আরেকটি কারণ হলো—এসব প্রাণী মানুষের মতোই আল্লাহ তাআলার একটি সৃষ্টি। মানুষের মতো তাদেরও প্রাণ আছে। তাহলে কোন অধিকার বলে মানুষ এদের প্রাণনাশ করবে? জবাবে বলা যেতে পারে, আল্লাহ তাআলা মানুষ ও অন্যান্য সকল সৃষ্টির স্বষ্টা। তিনিই সবকিছুর মালিক। তিনি নিজেই মানুষকে এসব প্রাণী থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। জবাইয়ের সময় আল্লাহ তাআলার নাম নেওয়ার দ্বারা আমরা তাঁরই অনুমতির ঘোষণা দিচ্ছি, যেন জবাইকারী বলছে, ‘আমি এই কাজ, এসব সৃষ্টির প্রতি বাঢ়াবাঢ়ি বা শক্তিমত্তা জাহিরের উদ্দেশ্যে করছি না; আমি বরং আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে জবাই করছি, তাঁর নামে শিকার করছি এবং তাঁর নাম নিয়েই খাচ্ছি।’

**ইহুদি ও খ্রিস্টানদের জবাইকৃত প্রাণী**

ইসলামে প্রাণী জবাই-বিষয়ক মাসআলা অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়েছে। এ বিষয়ে কিছু

[১] মুলানু আবি দাউদ : ২৮৫৮; জামিউত তিরমিয়ি : ১৪৮০; হাদিসটি সহিহ।

কঠোরতাও আরোপিত হয়েছে। এর কারণ হলো—আরবের মুশরিকরা এবং অন্যান্য গোত্রের লোকজন জবাইয়ের কাজটিকে আকিদা, দীনের মৌলিক বিষয় বা ইবাদতের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। জবাইয়ের কাজটাই তাদের দৃষ্টিতে দেবতাদের পূজার মতো একটি ব্যাপার ছিল। তাছাড়া পশু নজরানা সেগুলো তো ছিলই। কিন্তু ইসলামে এ ধরনের যাবতীয় কার্যক্রমই নিষিদ্ধ। জবাইয়ের সময় আল্লাহ তাআলার নাম নেওয়া অপরিহার্য, পাশাপাশি বেদীতে উৎসর্গিত কিংবা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো নামে জবাইকৃত প্রাণী এখানে সম্পূর্ণ হারাম।

ইহুদি-খ্রিস্টানরা মূলত ছিল একত্রবাদে বিশ্বাসী। সময়ে সময়ে নানা ধরনের বিচ্যুতির হাত ধরে তাদের মধ্যে শিরক জঁকে বসেছে। যেহেতু তাদের মধ্যে শিরকের কিছু আভাস রয়েছে, তাই কোনো কোনো মুসলিমের ধারণা হতে পারে, ইহুদি-খ্রিস্টানদের জবাইকৃত প্রাণী হয়তো মুশরিকদের মতোই হারাম; আল্লাহ তাআলা তাদের সে ভুল ধারণা অপনোদনের জন্য সুরা মায়দার মধ্যে বললেন—

الْيَوْمَ أُجْلِلُ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الدِّينِ أُوتُوا الْكِتَابَ جِلْ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جِلْ لَهُمْ...  
.....

আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পবিত্র জিনিস হালাল করা হলো। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের (জবাইকৃত পশু ও তাদের তৈরিকৃত অন্যান্য হালাল) খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের (জবাইকৃত পশু ও তোমাদের তৈরিকৃত অন্যান্য হালাল)  
খাদ্যদ্রব্যও তাদের জন্য হালাল [১]  
.....

কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ হওয়া আয়াতগুলোর একটি এটি। সংক্ষেপে এই আয়াতের মর্ম যা দাঁড়ায়, তা হলো—‘আজ তোমাদের জন্য যাবতীয় উভয় বস্তু হালাল করে দেওয়া হলো; বাহিরা, সায়িবা, অসিলা, হামি বলতে কিছু নেই। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের তৈরিকৃত ও জবাইকৃত খাবার তোমাদের জন্য হালাল। আগেও এগুলো হালাল ছিল; আল্লাহ কখনোই এগুলো তোমাদের জন্য হারাম করেননি। তোমাদের তৈরিকৃত ও জবাইকৃত খাবার তাদের জন্যও হালাল। তারা যা জবাই করে বা শিকার করে, সেগুলো তোমরা খেতে পারবে; তোমরা যা জবাই করো বা শিকার করো, সেগুলো তারা খেতে পারবে।

[১] সুরা মায়দা, আয়াত : ৫

## হালাল-হারামের বিধান

মুশরিকদের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর। বিপরীতে কিতাবিদের ব্যাপারে কিছুটা শিথিল। কারণ ওহি, নবুওয়াত, দীনের মৌলিক বিষয়গুলো তাদের মতেও সীকৃত। বিশ্বাসের দিক থেকে তারা মুমিনদের অনেক নিকটবর্তী। তাই তাদের সঙ্গে একসাথে খাওয়া-দাওয়া, তাদের (মেয়েদের) সাথে বিয়েশাদি, ভালো ব্যবহার, সুন্দর লেনদেন সবই ইসলামে বৈধ। তাদের সঙ্গে আমাদের আকিন্দাগত দূরত্ব (অন্যদের তুলনায়) অনেক কম। আমাদের সঙ্গে তাদের ওঠাবসার সুযোগ হলে জ্ঞানগত, আচরণগত ও কর্মগত আচরণের মধ্য দিয়ে আমাদের যাপিত জীবনকে কাছ থেকে দেখলে তারা বুঝতে পারবে, তাদের ধর্মই মূলত আমাদের ধর্ম; কিন্তু আমাদের ধর্ম আরো পরিশীলিত, উন্নত, সৃচ্ছ, বিদ্যায়াত-ভাস্তি ও পৌত্রলিঙ্গতা থেকে মুক্ত।

‘আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের (জবাইকৃত) খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল’—এখানে খাদ্যদ্রব্য শব্দটি শর্তমুক্ত। তাই সব ধরনের খাবার এতে অন্তর্ভুক্ত হবে। তাদের জবাইকৃত প্রাণী, খাদ্য-শস্য সবই আমাদের জন্য হালাল। তবে নিরেট হারাম বস্তু, যেমন : মৃত জন্ম, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস হলে ভিন্ন ব্যাপার। এগুলো একজন মুসলিমের জন্য কখনোই বৈধ হতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে কিতাবি তো দূরের কথা, কোনো মুসলিমও এসব খাবার পরিবেশন করলে তা খাওয়া যাবে না।

### গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

#### গির্জায় ও খ্রিস্টানদের উৎসবে জবাইকৃত প্রাণীর বিধান

কিতাবিদের জবাইকৃত প্রাণী খাওয়া আমাদের জন্য বৈধ, কিন্তু নিশ্চিত সূত্রে জানা যায়, তারা জবাইয়ের সময় সৈসা আলাইহিস সালাম, উষাইর আলাইহিস সালাম বা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো নাম নিয়েছে, তাহলে একদল ফকিহ বলেন, ‘সেটা হারাম’; কারণ এটি আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত প্রাণীর শ্রেণিভুক্ত হয়ে গিয়েছে। আরেক দল বলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য তাদের খাদ্য হালাল করেছেন; তারা কী বলে না বলে, সে ব্যাপারে তিনি সর্বাধিক অবগত [১]

[১] হানাফি ফকিহগণের মতে, কিতাবি তথা ইহুদি-খ্রিস্টানদের জবাইকৃত প্রাণী দুই অবস্থায় খাওয়া যাবে। এক. তাদের জবাই করার সময় তারা তারা শুধু আল্লাহ তাআলার নাম নিয়ে জবাই করেছে, সেখানে অন্য কোনো নথি বা কারো নাম নেয়নি। এটা যদি নিশ্চিত জানা যায় বা সেখানে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ করা যায় তাহলে তাদের জবাইকৃত প্রাণী খাওয়া যাবে। দুই. তাদের জবাই করার সময় তারা কী বলেছে তা জানা

আবুল আসওয়াদ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন—

عَمَيْرٌ بْنُ الْأَسْوَدِ: أَتَهُ سَأَلَ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ كَبْشٍ ذُبَحَ لِكَنِيسَةٍ يُقَالُ لَهَا جِرْجِشُ أَهْدُوهُ  
لَهَا، أَنَا كُلُّ مِنْهُ؟ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: اللَّهُمَّ عَفْواً، إِنَّهُمْ هُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، طَعَامُهُمْ حِلٌّ لَّنَا  
وَطَعَامُنَا حِلٌّ لَّهُمْ. وَأَمْرَهُ بِأَكْلِهِ

উমাইর ইবনু আসওয়াদ রাহিমাহুল্লাহ আবু দারদা রায়িয়াল্লাহু আনহুর কাছে জানতে চাইলেন যে, জারজিস নামক গির্জায় একটি দুষ্প্রাপ্ত জবাই করা হয়েছে, যা তারা গির্জায় দান করেছিল; আমরা কি তার মাংস খেতে পারব? তখন আবু দারদা রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ ক্ষমা করুন! এরা হলো আহলে কিতাব। তাদের (জবাইকৃত পশু ও অন্যান্য সকল হালাল) খাবার আমাদের জন্য হালাল এবং আমাদের (জবাইকৃত পশু ও অন্যান্য সকল হালাল) খাবারও তাদের জন্য হালাল। এরপর তিনি সেটা খাওয়ার আদেশ দিলেন [১]

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহকে কিতাবিদের উৎসব এবং গির্জার জন্য জবাইকৃত প্রাণী সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, ‘আমার মতে এটি মাকরুহ, কিন্তু হারাম নয়।’

মাকরুহ বলার কারণ হলো—সম্ভাবনা আছে এই প্রাণী গাইরুল্লাহর নামে জবাইকৃত প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। তার মত অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত কেবল সেগুলোই হবে, যেগুলো তারা তাদের উপাস্যদের জন্য তাদের নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে গির্জায় উৎসর্গ করে, কিন্তু নিজেরা খায় না। পক্ষান্তরে যেগুলো গির্জায় জবাই করে নিজেরা খায়, সেগুলো তাদের খাবার; আর তাদের খাবার তো আমাদের জন্য হালাল, তাই সেটা (কিছুটা সন্দেহজনক হওয়ায়

যায়নি এবং সেখানে কেনো মুসলিম উপস্থিতও ছিল না। এক্ষেত্রেও সুধারণাবশত এটাই বিবেচনা করা হবে যে, তারা আল্লাহ তাআলার নাম নিয়েই প্রাণীটি জবাই করেছে। সুতরাং তাদের জবাইকৃত প্রাণীটি খাওয়া যাবে। আর যদি এটা জানা যায় যে, তারা জবাই করার সময় মুসা আলাইহিস সালাম বা উযাইর আলাইহিস সালাম কিংবা ঈসা আলাইহিস সালামের নাম উচ্চারণ করেছে অথবা আল্লাহ তাআলার নামের পাশাপাশি অন্য কোনো নবি বা কোনো কিছুর নাম উচ্চারণ করেছে তাহলে তাদের জবাইকৃত প্রাণী খাওয়া যাবে না। কেননা, সেক্ষেত্রে তা গাইরুল্লাহর নামে জবাইকৃত প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যা কুরআনে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। [বাদায়িউস সানায়ি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৬]

[১] তাফসিলুত তাবারি, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৫৭৯; আলবানি রাহিমাহুল্লাহ গয়াতুল মারাম গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিত বলেছেন।

## হালাল-হারামের বিধান

মাকরুহ হলেও হারাম হবে না; বরং) হালাল হবে। যেমন : আল্লাহ তাআলা  
বলেছেন—

**الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّهُمْ...  
①**

আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পবিত্র জিনিস হালাল করা হলো। আর যাদেরকে  
কিটাব দেওয়া হয়েছে, তাদের (জবাইকৃত পশু ও তাদের তৈরিকৃত অন্যান্য  
হালাল) খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের (জবাইকৃত পশু  
ও তোমাদের তৈরিকৃত অন্যান্য হালাল) খাদ্যদ্রব্যও তাদের জন্য হালাল।<sup>[১]</sup>

### অগ্নিপূজারির হাতে জবাইকৃত প্রাণীর বিধান

অগ্নিপূজকদের জবাইকৃত প্রাণীর ব্যাপারে আলিমদের মতানৈক্য রয়েছে। অধিকাংশ  
ফকিহগণ তাদের জবাইকৃত প্রাণী খাওয়া নিষেধাজ্ঞার পক্ষে। কারণ তারা মুশরিক।  
আর অন্ন কিছু ফকির বলেন, তাদের জবাইকৃত প্রাণী হালাল।<sup>[২]</sup> কারণ, আব্দুর  
রহমান ইবনু আউফ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস  
সালাম বলেছেন—

**شُؤْلَا بِهِمْ سَنَةً أَهْلِ الْكِتَابِ**

তাদের (অর্থাৎ অগ্নিপূজকদের) সঙ্গে আহলে কিটাবদের মতো আচার-আচরণ  
করো।<sup>[৩]</sup>

এছাড়াও বর্ণিত হয়েছে—

**شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرِ**

[১] সুরা মায়দা, আয়াত : ৫

[২] উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ ফকিহগণের মতই অধিক শক্তিশালী। বেশিরভাগ আলিমগণ যেহেতু অগ্নিপূজকদের  
জবাইকৃত প্রাণীর গোশতকে হালাল বলেন না, তাই আমাদের জন্য অগ্নিপূজকদের জবাইকৃত প্রাণীর গোশত  
খাওয়ার কোনো অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে আমাদের দৃঢ়ভাবে সতর্ক থাকতে হবে।

[৩] মুসাল্লাফু ইবনি আবি শাইবা : ১০৮৭০, ৩৩৩১৮; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৮৬৫৪;  
হাদিসটির সনদ যষ্ঠিফ।

## দৈনন্দিন জীবনে হালাল-হারাম

আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রায়িয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজার এলাকার অধিপূজকদের নিকট থেকে জিজিয়া (কর) গ্রহণ করেছেন।<sup>[১]</sup>

ইমাম ইবনু হায়ম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, অধিপূজকরা হলো আহলে কিতাব। সুতরাং তাদের বিধান সকল ক্ষেত্রে আহলে কিতাবদের মতোই হবে।<sup>[২]</sup>

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর মতে সবিগণও আহলে কিতাব।<sup>[৩]</sup>

**[মূলনীতি] অমূলক সংশয়ে কোনো অনুসন্ধান নয়**

বিনা কারণে জবাই সম্পর্কে সংশয় তৈরি হলে জিজ্ঞাসা করা যাবে না যে, পশুটি জবাইয়ের পন্থা কী ছিল, জবাইয়ের শর্ত পূরণ হয়েছে কি হয়নি? আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে কি হয়নি? প্রতিটি মুসলিমের জবাইকৃত প্রাণী হালাল, হোক সে মুর্খ বা ফাসিক; এমনিভাবে কিতাবির জবাইকৃত প্রাণীও হালাল।

আমরা পূর্বেই সহিলুল বুখারির একটি হাদিস উল্লেখ করেছি, আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

*أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَذِرِي أَذْكِرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا ، فَقَالَ: سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْثُمْ وَكُلُوا*

[১] সহিলুল বুখারি : ৩১৫৭; সুনানু আবি দাউদ : ৩০৪৩

[২] আল-মুহাম্মাদ, ইবনু হায়ম, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৪৬

[৩] ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর মতে সবিদের জবাইকৃত প্রাণী খাওয়া যাবে, কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহর মতে তাদের জবাইকৃত প্রাণী খাওয়া যাবে না। এ মতান্তিক্র্যের মূলভিত্তি হলো সবির সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ। [বাদায়িউস সানায়ি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৬]

সুতরাং ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর মতে সবি বলা হয় এমন এক সম্প্রদায়কে, যারা নবি ও আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করে। তারা তারকারাজির পূজা করে না; বরং সেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, যেভাবে মুসলিমরা কাবাকে সম্মান করে। সুতরাং তারা কিতাবিদের অন্তর্ভুক্ত। এরা মূলত ইস্লাম আলাইহিস সালামকে নবি হিসেবে আর যাবুরকে কিতাব হিসেবে সৌকার করে। সম্ভবত এরা খ্রিস্টানদের একটি উপদল। আর ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহর মতে, সবি বলা হয় এমন এক সম্প্রদায়কে, যারা তারকারাজির পূজা করে। সুতরাং এরা কিতাবি নয়; বরং মূর্তিপূজকদের অন্তর্গত। [বাদায়িউস সানায়ি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭১; আল-ইখতিয়ার লি-তালিলিল মুখতার, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮৮; রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৬]

## হালাল-হারামের বিধান

একদল লোক নবিজিকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের কাছে একদল লোক মাংস নিয়ে আসে। কিন্তু আমরা জানি না, তাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে কি হয়নি। তখন নবিজি বললেন, তোমরা এতে আল্লাহর নাম নাও এবং খেতে থাকো।<sup>[১]</sup>

এই হাদিসের দলিল দিয়ে আলিমগণ বলেন, মানুষের কর্ম, পদ্ধতি, উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সবই সঠিক ও বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। সেগুলো বাতিল ও অশুদ্ধ বলতে হলে অবশ্যই সেটার পক্ষে প্রমাণ লাগবে।

## শিকারের ব্যাপারে ইসলামের বিধান

আরব-অন্যারব বহু জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যেই প্রাচীনকাল থেকে শিকার-নির্ভর জীবন প্রচলিত ছিল। তাই কুরআন, হাদিস এবং ফিকহশাস্ত্রে শিকার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। ফকিহগণের রচনাবলিতে এটার জন্য সৃতত্ত্ব অধ্যায় নির্ধারিত হয়েছে। সেখানে শিকার-সংশ্লিষ্ট হালাল-হারাম, ওয়াজিব-মুস্তাহাব ইত্যাদি বিধান বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

আমাদের চতুর্পাশে এমন অনেক জন্ম ও পাখি আছে, যার মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু, কিন্তু এগুলো বন্য প্রাণী হওয়ায় সাধারণত এরা মানুষের আয়ত্তের বাইরে থাকে, সহজে এদেরকে ধরা যায় না। ইসলামে এসব প্রাণী হালাল হওয়ার জন্য গৃহপালিত প্রাণীর মতো জবাইয়ের কঠোর কোনো শর্ত আরোপিত হয়নি। শিকারের বিষয়টি সহজ রাখার জন্য স্বাভাবিক শিকারের প্রক্রিয়াই বৈধ, তবে এতে ইসলামি আকিদা ও রীতিনীতির প্রতি খেয়াল রেখে কিছু নিয়ম-কানুন ও শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে অন্যান্য সকল কাজের মতোই শিকারের মধ্যেও একটি ইসলামি রং লাগানো হয়েছে। এসব শর্তের কিছু হলো শিকারির জন্য, কিছু শিকারের জন্য আর কিছু হলো শিকারের অস্ত্র-সংশ্লিষ্ট।

এসব কথাবার্তা সবই হলো স্থলজ প্রাণীর জন্য প্রযোজ্য। বাকি সামুদ্রিক প্রাণী শিকারের আলোচনা আগেই অতিবাহিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা শর্তহীনভাবে সব জলজ প্রাণীই হালাল করেছেন, যেমনটি সুরা মায়িদার ৯৬ নম্বর আয়াত থেকে বোঝা যায়।

[১] সহিল বুখারি : ৫৫০৭; সুনান নাসাই : ৪৪৩৬

## শিকারির জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি

জবাইকারীর মধ্যে যে সকল শর্ত থাকা দরকার সেসব শর্ত শিকারির মধ্যেও থাকতে হবে। যেমন : শিকারি মুসলিম, কিতাবি অথবা কিতাবির হুকুমভূক্ত অগ্নিপূজারি বা সাবি হতে হবে।<sup>[১]</sup>

খাওয়া কিংবা কোনো প্রয়োজন ছাড়া অনর্থক বা শখের বশে কোনো প্রাণী শিকার বৈধ নয়। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ قُتِلَ عَصْفُورًا عَبَثًا، عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهُ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنْ فُلَانًا قَتَلْنِي  
عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ

যে ব্যক্তি কোনো চড়ুই পাখিকে অনর্থক হত্যা করবে সেটি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে বিচার দিয়ে বলবে, হে আমার প্রতিপালক, অমুক আমাকে অযথাই হত্যা করেছে। সে কোনো উপকার লাভের জন্য আমাকে হত্যা করেনি।<sup>[২]</sup>

অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَا مِنْ إِنْسَانٍ قُتِلَ عَصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِعَيْنِ حَقِّهَا، إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا، قِيلَ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا حَقِّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا

[১] ইতিঃপূর্বে আমরা সংশ্লিষ্ট মাসআলার টীকায় আলোচনা করে এসেছি যে, জবাইকারী কেবল মুসলিম বা কিতাবি হলেই তার জবাইকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, অন্যথায় নয়। অগ্নিপূজকদের ব্যাপারে হানাফি মাযহাবের ফকিহগণসহ অধিকাংশ ফকিহের মত হলো, তাদের জবাইকৃত প্রাণী হালাল নয়। আর ‘সাবি’ শব্দটির সংজ্ঞা নিয়ে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহ এবং তার দুই ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাল্লাহ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাল্লাহর মাঝে মতানৈক্য আছে; যেমনটি পূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহর মতে যেহেতু সাবিরা আল্লাহ, তাঁর কিতাব ও নবি বিশ্বাস করে, পাশাপাশি তারা তারকারাজির পূজা করে না, তাই তারা কিতাবি হিসেবে বিবেচিত এবং তাদের জবাইকৃত প্রাণী খাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাল্লাহ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাল্লাহর মতে, যেহেতু সাবিরা তারকারাজির পূজা করে, তাই তারা কিতাবি নয়; বরং মূর্তিপূজক, সূতরাং তাদের জবাইকৃত প্রাণী খাওয়া যাবে না। লেখক এখানে অগ্নিপূজারিদের জবাইকৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ হওয়ার যে মত পেশ করেছেন তা অন্ত কিছু ফকিহের মত, যা অধিকাংশ ফকিহের মতানুসারে গ্রহণযোগ্য মত নয়। তাই এ ব্যাপারে সতর্কতা কাম্য।

[২] মুসলাদু আহমাদ : ১৯৪৭০; সহিলু ইবনি হিবান : ৫৮৯৪; হাদিসটি হাসান।

## হালাল-হারামের বিধান

যে ব্যক্তি চড়ুই অথবা তা থেকে বড় কোনো জন্ম অকারণে হত্যা করবে, আল্লাহ্  
তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা  
করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এর ন্যায্যতা কী? তিনি বললেন, এর ন্যায্যতা এই  
যে, একে আল্লাহ তাআলার নামে জবাই করে খাবে এবং এর মাথা কেটে ফেলে  
দেবে না।<sup>[১]</sup>

শিকারির জন্য আরেকটি শর্ত হচ্ছে—হজ বা উমরার ইহরাম অবস্থায় না থাকা।  
ইহরামের সময় একজন মুসলিম পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানের প্রতিশুভ্রতিতে  
আবধ থাকে। এই প্রতিশুভ্রতির মধ্যে পশুপাখি-সহ সবার নিরাপত্তাই অন্তর্ভুক্ত।  
এমনকি শিকার যদি তার আয়ত্তের মধ্যেও চলে আসে তবু সেটি ধরা যাবে না।  
ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। এতে তার সৈমানের দৃঢ়তার যাচাই হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ ثُمَّ إِنَّمَا حُكْمُ مَا لَمْ يَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ  
يَحْفَظُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ<sup>⑩</sup>

হে মুমিনগণ, আল্লাহ তোমাদেরকে এমন কিছু শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা  
করবেন, যা তোমাদের হাত ও বর্শার নাগালে সহজেই এসে পড়বে, যাতে  
আল্লাহ জেনে নেন যে, কে তাঁকে না দেখে ভয় করে। অতএব, যে ব্যক্তি  
এরপরও সীমা অতিক্রম করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।<sup>[২]</sup>

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْثِمْ حُرُمٌ...<sup>⑪</sup>

হে মুমিনগণ, তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ কোরো না।<sup>[৩]</sup>

[১] সুনানুন নাসাই : ৪৩৪৯; মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৭৫৭৪; হাদিসটি হাসান।

[২] সুরা মায়দা, আয়াত : ১৪

[৩] সুরা মায়দা, আয়াত : ১৫

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

﴿١١﴾ حُرْمَةَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُفِئَمْ حُرْمًا...

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে স্থলজ শিকার, যতক্ষণ তোমরা ইহরাম  
অবস্থায় থাকো [১]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

﴿١﴾ ...غَيْرَ مُحِلٍّ الصَّيْدٌ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

কিন্তু ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তোমরা শিকারকে হালাল মনে কোরো না [২]

### শিকারকৃত প্রাণীর ব্যাপারে শারয়ি বিধান

গৃহপালিত প্রাণীর ক্ষেত্রে সাধারণত শিকারের বিধান প্রযোজ্য নয়। শিকারের বিধান প্রযোজ্য হওয়ার জন্য স্বাভাবিক জবাই অসম্ভব হতে হবে। স্বাভাবিক জবাই সম্ভব হলে সেক্ষেত্রে জবাই সেভাবেই করতে হবে। কারণ, এটাই হলো প্রকৃত নিয়ম আর শিকারের প্রক্রিয়া হলো ব্যক্তিগত অবস্থা।

কখনো কখনো হতে পারে তিরের আঘাতে শিকার আহত হলো বা প্রশিক্ষিত কুকুর শিকার আয়ত্তে নিয়ে এলো, কিন্তু শিকারকৃত প্রাণী তখনো জীবত তাহলে তাকে শারয়ি প্রক্রিয়ায় জবাই করতে হবে। শিকারকৃত জন্মুর মধ্যে স্থির জীবনের চিহ্ন না থাকলেও সেটি জবাই করা ভালো, কিন্তু জবাই ছাড়া রেখে দিলে যদি প্রাণীটি মারা যায়, তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই।

সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম  
বলেছেন—

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَإِذْكِرْ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكْتَ عَلَيْكَ، فَأَذْرِكَهُ حَيًّا فَأَذْبَحْهُ، وَإِنْ

[১] সূরা মায়দা, আয়াত : ৯৬

[২] সূরা মায়দা, আয়াত : ১

## হালাল-হারামের বিধান

أَذْرَكَهُ قَدْ قُتِلَ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كُلِّكَ كُلُّا غَيْرَةً ، وَقَدْ قُتِلَ فَلَا  
تَأْكُلْ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيْنُهُمَا قُتْلَهُ

যখন তুমি (শিকার ধরার উদ্দেশ্যে) তোমার কুকুর ছাড়বে তখন আল্লাহর নাম  
উচ্চারণ করবে। তারপর যদি সে তোমার জন্য শিকার ধরে রাখে এবং তুমি  
তা জীবিত পাও, তাহলে তুমি তাকে জবাই করবে। আর যদি দেখো, কুকুরটি  
তাকে মেরে ফেলেছে, কিন্তু সে এর কোনো অংশ খায়নি, তাহলে তুমি তা  
খেতে পারবে। আর যদি তোমার (প্রেরিত শিকারি) কুকুরের সাথে অন্য কুকুর  
দেখো আর (তুমি গিয়ে দেখো যে,) সে শিকারকে মেরে ফেলেছে, তাহলে তা  
খাবে না। কেননা, তুমি তো জানো না যে, কোন কুকুরটি শিকারকে মেরেছে।<sup>[১]</sup>

**শিকারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ**

**শিকারের মাধ্যম বা উপকরণ দুই ধরনের—**

[এক] ধারালো অস্ত্র। যেমন : তির, তরবারি ও বর্ষা; কুরআনে ইঙ্গিতে উল্লেখ  
করা হয়েছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَنْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَاهُ أَنْ يُدِيكُمْ وَرَمًا حَكْمٌ...  
④

হে মুমিনগণ, আল্লাহ তোমাদেরকে এমন কিছু শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা  
করবেন, যা তোমাদের হাত ও বর্ষার নাগালে সহজেই এসে পড়বে।<sup>[২]</sup>

[দুই] শিকারি জন্ম, যেগুলো শিকারের নিয়ম-কানুন শিখে শিকার করতে পারে।  
যেমন : কুকুর, চিতা বাঘ, বাজপাখি, চিল ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ قُلْ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَمَا عَلِمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ  
تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلِمْتُكُمُ اللَّهُ فَكُلُّوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْنِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ①

[১] সহিহ মুসলিম : ১৯২৯; সুনানুন নাসাই : ৪২৬৩

[২] সুরা মায়দা, আয়াত : ৯৪

তারা (লোকেরা) আপনাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী কী হালাল করা হয়েছে? বলুন, সমস্ত পবিত্র জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। আর শিকারী পশুপাখি যেগুলোকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ, যেভাবে আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলো তোমাদের জন্য যা ধরে আনে তা ভক্ষণ করো এবং (তাদেরকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময়) আল্লাহর নাম নাও। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসেব-গ্রহণকারী [১]

### ধারালো অস্ত্রের মাধ্যমে শিকার

#### ধারালো অস্ত্রের মাধ্যমে শিকারের জন্য দুটি বিষয় অপরিহার্য—

[এক] ধারালো বা তীক্ষ্ণ অস্ত্রটি জন্তুর শরীরে গেঁথে যেতে হবে, যাতে প্রাণীর মৃত্যু সম্পন্ন হয় ধারালো অস্ত্রের খোঁচায় বা শিকারি জন্তুর আঁচড়ে, অস্ত্রের ভারে যেন প্রাণীর মৃত্যু না ঘটে। আদি ইবনু হাতিম রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ الْحَذْفِ وَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَنِدًا وَلَا تَنْكَأُ  
عَذْوًا. وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নুড়িপাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, এটি শিকারের কোনো কাজে আসে না, আবার শত্রুও রোধ করে না। তবে এটি দাঁত ভাঙতে কিংবা চোখ অন্ধ করে দিতে পারে [২]

হাদিস থেকে বোঝা গেল, শিকারের ক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয় হলো শরীরে গেঁথে যাওয়া। তাই বলা যায় রাইফেল, পিস্টল বা এ জাতীয় অস্ত্রের দ্বারা হত্যাকৃত প্রাণী হালাল [৩] কারণ, এগুলো তির, বর্ণ ও তরবারির চেয়েও শরীরের ভেতরে বেশি

[১] সূরা মায়দা, আয়াত : ৪

[২] সহিলুল বুখারি : ৫৪৭৭; সহিহ মুসলিম : ১৯২৯

[৩] হানাফি ফকিহগণের মত হলো, বন্দুকের গুলিতে নিহত প্রাণী হালাল নয়। কেননা, বন্দুকের গুলি বর্ণ বা তিরের মতো ধারালো নয়। বন্দুকের গুলিতে বিষ্ফেরক ও তীব্র গতি থাকে, তাই বলা যায়, বিষ্ফেরণের আগুন ও গুলির তীব্র চাপে প্রাণী মারা যায়। এজন্য হানাফি মাযহাবের বিশেষজ্ঞ ফকিহগণ বলেন, বন্দুকের

## হালাল-হারামের বিধান

প্রবেশ করে।

মুসলিম আহমাদে আদি ইবনু হাতিম রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে,  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

**وَلَا تَأْكُلْ مِنَ الْبَنْدُقَةِ إِلَّا مَا ذَكَرْتَ**

| বন্দুকের আঘাতপ্রাপ্ত প্রাণী জবাই করা ছাড়া তোমরা খেয়ো না।<sup>[১]</sup>

ইমাম বুখারি রাহিমাল্লাহু বন্দুকের আঘাতে নিহত প্রাণীর ব্যাপারে ইবনু উমার  
রায়িয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য বর্ণনা করে বলেন—

**وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبَنْدُقَةِ : تِلْكَ الْمَوْفُوذَةُ**

| বন্দুকের গুলিতে নিহত শিকারের ব্যাপারে ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,  
এটি মাওকুয়া বা আঘাতের কারণে মৃত প্রাণী।<sup>[২]</sup>

এখানে চিন্তার বিষয় হলো—বন্দুক বলতে তখন বোঝাত মাটির তৈরি গুলালের  
বন্দুক; সেগুলোর সঙ্গে আধুনিক বন্দুকের কোনো মিল নেই।<sup>[৩]</sup> ছেট পাথরও  
তখনকার সময়ে বন্দুকের গুলির মতো ব্যবহার হতো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়া সাল্লাম ছেট পাথর নিষ্কেপ করতে নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল

গুলির বিধান বর্ণা বা তিরের বিধানের মতো হবে না। অতএব কেউ গুলি করে কোনো প্রাণীকে আহত করার  
পর যদি তাকে জবাই করতে পারে তাহলে তা খাওয়া যাবে। আর যদি জবাই করার আগেই মারা যায় কিংবা  
জীবিত নাকি মৃত সে ব্যাপারে সন্দেহ থাকে জবাই করার পর তেমন নড়াচড়া না করে ও জীবিত প্রাণীর  
মতো রক্ত প্রবাহিত না হয়, তাহলে সে প্রাণী খাওয়া হালাল হবে না। [রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা :  
৪৭১-৪৭২; তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৯১]

[১] মুসলিম আহমাদ : ১৯৩৯২; হাদিসটির সনদ যত্নক।

[২] তালিকু সহিহিল বুখারি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৮৫

[৩] মিল না থাকলেও এটা তো নিশ্চিত, আধুনিক বন্দুকের গুলিতে বিশ্ফেরক বারুদ থাকে এবং এসব গুলি  
তির-বর্ণার মতো ধারালো নয়। সুতরাং আধুনিক বন্দুকের গুলির ধারের আঘাতে প্রাণীর মৃত্যু হয় না; বরং  
বারুদের আগুন ও গুলির তীব্র চাপে প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। অতএব, আধুনিক বন্দুকের গুলি দিয়ে শিকার করা  
প্রাণী জীবিত অবস্থায় জবাই করা ছাড়া হালাল হবে না।

রায়িয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ الْخَذْفِ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَغَى بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَقْعُدُ الْعَينَ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নুড়ি-পাথর ছুড়তে নিষেধ করেছেন অথবা বর্ণনাকারী বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নুড়ি-পাথর ছোড়াকে অপচন্দ করতেন এবং বলেছেন, এর দ্বারা কোনো প্রাণী শিকার করা হয় না এবং কোনো শত্রুকেও ঘায়েল করা হয় না। তবে এটি কারো দাঁত ভেঙে ফেলতে পারে এবং চোখ ফুঁড়ে দিতে পারে।<sup>[১]</sup>

**[দুই]** তির বা বর্ণা ছুড়ে মারার সময় আল্লাহ তাআলার নাম উচ্চারণ করতে হবে, যেমনটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদি ইবনু হাতিম রায়িয়াল্লাহু আনহুকে শিক্ষা দিয়েছেন। তার থেকে বর্ণিত হাদিসগুলোই শিকার-বিষয়ক মৌলিক দলিল।

### পশুপাখির মাধ্যমে শিকার

কুকুর, বাজপাখি ইত্যাদি দিয়ে শিকার করাতে হলে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়—

» প্রাণীটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।

» শিকার হতে হবে মালিকের জন্য; প্রশিক্ষিত শিকারি প্রাণী যদি নিজের জন্য শিকার করে (যেমন : সে শিকার করে নিজেই সেখান থেকে খাওয়া শুরু করল) তাহলে সেটা মালিকের জন্য খাওয়া বৈধ হবে না।

» প্রশিক্ষিত শিকারি প্রাণীকে প্রেরণ করার সময় আল্লাহ তাআলার নাম উচ্চারণ করতে হবে।

এই শর্তগুলো সবই কুরআনুল কারিমের আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

[১] সহিতুল বুখারি : ৫৪৭৯; সহিহ মুসলিম : ১৯৫৪

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلُّ لَهُمْ فَلْ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيَّبَاتُ وَمَا عَلِمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ  
تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلِمْتُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْنَاهُ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ①

তারা (লোকেরা) আপনাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী কী হালাল করা হয়েছে? বলুন, সমস্ত পবিত্র জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। আর শিকারী পশুপাখি যেগুলোকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ; যেভাবে আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন—এগুলো তোমাদের জন্য যা ধরে আনে তা ভক্ষণ করো এবং (তাদেরকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময়) আল্লাহর নাম নাও। আর আল্লাহকে ডয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসেব-গ্রহণকারী।[১]

প্রশিক্ষিত বোঝা যাবে কীভাবে? যখন কুকুর তার মালিকের নির্দেশ অনুযায়ী চলাফেরা করে, ডাকলে কাছে আসে, শিকারের পেছনে লেলিয়ে দিলে তার পেছনে ছুটে যায়, থামতে বললে থেমে যায় তখন প্রমাণ হবে যে, কুকুর প্রশিক্ষিত হয়েছে। প্রশিক্ষিত হওয়ার আলামত ও নির্দেশন বিষয়ে ফকিহগণের মাঝে ছোটখাটো কিছু মতানৈক্য রয়েছে। এগুলো প্রচলনভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

শিকারকৃত জন্তু মালিকের জন্য না শিকারি প্রাণীর জন্য, তা বোঝা যাবে কীভাবে? এ ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعْلَمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْنَاهُ، وَإِنْ فَتَلَنَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى تَفْسِيرِ

তুমি যখন তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোকে আল্লাহ তাআলার নাম নিয়ে প্রেরণ করবে তখন তোমার জন্য তাদের রেখে দেওয়া শিকার তুমি খেতে পারো, যদিও তারা শিকারকে মেরে ফেলে। তবে কুকুর তার কিছু অংশ খেয়ে ফেললে ভিন্ন কথা। সুতরাং কুকুর যদি শিকারের কিছু খেয়ে ফেলে তাহলে তুমি তা খাবে না। কেননা, আমার আশঙ্কা হয়, সে হয়তো এ শিকার নিজের জন্যই ধরেছে।[২]

[১] সুরা মায়দা, আয়াত : ৪

[২] সহিহ মুসলিম : ১৯২৯; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩২০৮

শিকারি হিংস্র পশু, যেমন প্রশিক্ষিত কুকুর এবং শিকারি পাখি, যেমন বাজপাখি—বিধানগত দিক থেকে এ দুটির মধ্যে কতিপয় ফকিহ পার্থক্য করে থাকেন। তারা বলেন, প্রশিক্ষিত শিকারি পাখির খাওয়া জন্ম হালাল, কিন্তু প্রশিক্ষিত শিকারি হিংস্র পশুর খাওয়া জন্ম হালাল হবে না।

কুকুরের প্রশিক্ষণ এবং মালিকের জন্য শিকার, এ দুটি শর্তের কারণ—মানুষ একটি সম্মানিত ও মর্যাদাবান প্রাণী। তাই কুকুর ইত্যাদি হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্ট খাওয়া মানুষের জন্য শোভা পায় না। এটি তার জন্য মানহানিকর। কোনো অভাবী মানুষও যেন এগুলো খেতে না পারে, তাই আল্লাহ তাআলা এগুলোকে হারাম করে দিয়েছেন। কিন্তু শিকারি জন্ম যখন প্রশিক্ষিত হবে, শিকারকৃত জন্ম তার মালিকের জন্য রেখে দেবে, তখন এই প্রাণীটি তির ও বর্ণ ইত্যাদি শিকারের উপকরণের মতো নির্দোষ বলে বিবেচিত হবে।

তির, বর্ণ বা তরবারি দ্বারা শিকারের সময় যেভাবে ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে হয়, প্রশিক্ষিত শিকারি কুকুর প্রেরণের সময়ও সেভাবে ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে হবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনেই আমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন—

① ... وَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ...

আর (তাদেরকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময়) আল্লাহর নাম নাও [১]

এই নির্দেশ-সংক্রান্ত অনেক বিশুদ্ধ হাদিসও বর্ণিত হয়েছে। যেমন : আদি ইবনু হাতিম রায়িয়াল্লাহু আনহুর হাদিস।

প্রশিক্ষিত শিকারি কুকুরের সঙ্গে অন্যান্য কুকুর শিকারে অংশগ্রহণ করলে সেই শিকারকৃত জন্ম হারাম হয়ে যায়। তার দলিল, আদি ইবনু হাতিম রায়িয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন—

إِنِّي أَرْسَلْتُ كُلِّي أَجْدُ مَعْهُ كُلِّيَاً آخَرَ، لَا أَذْرِي أَيْهُمَا أَحَدَهُ. فَقَالَ لَا تَأْكُلْ قِنْمَانَمَا سَمَّيْتَ عَلَى  
كُلِّكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ

[১] সূরা মাযিদা, আয়াত : ৪

আমি আমার কুকুরকে (শিকারের জন্য) প্রেরণ করি। পরে তার সঙ্গে আরেকটি কুকুরও দেখতে পাই। আমি জানি না, উভয়ের কে শিকার ধরেছে। তখন নবিজি সাল্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তা খেয়ো না। কেননা, তুমি তো তোমার কুকুরের ওপরই 'বিসমিল্লাহ' পড়েছ, অন্যটির ওপর পড়োনি।<sup>[১]</sup>

যদি শিকারি ব্যক্তি তির নিষ্কেপের সময় কিংবা শিকারি জন্তু প্রেরণের সময় আল্লাহ তাআলার নাম নিতে ভুলে যায়, তাহলে খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে নিলেই হবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা এই উদ্ধারের বিস্মৃতির অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

### মৃত শিকারের ব্যাপারে করণীয়

কখনো এমন হতে পারে, শিকারের গায়ে তির লাগার পরে সেটি পালিয়েছে, খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরে মৃত অবস্থায় সেটি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারের ঘটনাটি কয়েক দিন পরেও হতে পারে। এই প্রাণীটি খাওয়া হালাল, তবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে—

[এক] প্রাণীটি পানিতে পড়তে পারবে না। আদি ইবনু হাতিম রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

سَأَلَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ ، قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ ، فَإِذَا كَثُرَ اسْمَ اللَّهِ ، فَإِنَّ وَجْدَتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ ، إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ ، فَإِنَّكَ لَا تَنْدِرِي الْمَاءَ قَتْلَهُ أَوْ سَهْمَكَ

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাবে তিনি বললেন, যখন তুমি তোমার তির নিষ্কেপ করবে তখন আল্লাহ তাআলার নাম উচ্চারণ করবে। এরপর যদি দেখতে পাও, (তোমার নিষ্কেপ করা) তির তাকে হত্যা করে ফেলেছে, তবে তা খেতে পারো। কিন্তু যদি শিকারকে পানিতে পাও, তবে খেয়ো না। কারণ, তুমি তো অবহিত নও যে, পানিই তাকে হত্যা করেছে, নাকি তোমার তির (তাই তা তোমার জন্য হালাল হবে না)।<sup>[২]</sup>

[১] সহিল বুখারি : ৫৪৮৬; সহিহ মুসলিম : ১৯২৯

[২] সহিহ মুসলিম : ১৯২৯; আমিউত তিরমিয়ি : ১৪৬৯

[দুই] শিকারির নিজের তির ছাড়া অন্য কারো তির শিকারের শরীরে থাকা যাবে না। যেন এটা স্পষ্ট থাকে, তার তিরের আঘাতেই শিকারকৃত প্রাণীটির মৃত্যু হয়েছে। আদি ইবনু হাতিম রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْمَي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ مِنَ الْغَدِ سَهْمِيْ؟  
قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرِ فِيهِ أَثْرَ سَبْعِ قَكْلٍ

আদি ইবনু হাতিম রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবিজিকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! শিকারের দিকে লক্ষ্য করে আমি তির নিষ্কেপ করেছিলাম। পরদিন দেখি, তাতে আমার তির বিন্দু হয়ে আছে (আমি কি সেই প্রাণীটি খেতে পারব)? তিনি বললেন, যখন তুমি নিশ্চিত হবে যে, তোমার তিরের আঘাতেই প্রাণীটি মারা গেছে এবং তাতে যদি কোনো হিংস্র প্রাণীর চিহ্ন না দেখো, তাহলে সেটা তুমি খেতে পারবে।[১]

[তিন] শিকার পঁচে দুর্গন্ধ বের হলে সেটি খাওয়া যাবে না। কারণ, সুস্থ বুচিসম্পন্ন কোনো মানুষই দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খেতে চায় না, তাছাড়া এর ক্ষতি তো আছেই। সহিহ মুসলিমে আবু সালাবা খুশানি রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন—

إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ ، فَعَابَ عَنْكَ ، فَأَدْرِكَهُ فَكُلْهُ ، مَا لَمْ يُنْتَنْ

তুমি তির নিষ্কেপের পর শিকার যদি নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এবং পরে তা পেয়ে যাও, তাহলে তুমি তা খেতে পারো; যতক্ষণ না সেটা দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়।[২]

### মন্দের ব্যাপারে ইসলাম যা বলে

নেশাজাতীয় যাবতীয় দ্রব্য আরবি ‘খমর’ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। মাদকের ফলে ব্যক্তিজীবনে মানুষের চিন্তা-চেতনা, দেহ ও ধর্ম কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; পারিবারিক জীবনে সন্তানসন্ততি ও স্ত্রীর ওপর এর প্রক্রিয়া এবং সমাজ-জীবনে আত্মিক, জাগতিক ও

[১] জামিউত তিরমিয়ি : ১৪৬৮ হাদিসটি সহিহ।

[২] সুনানু আবি দাউদ : ২৮৬১; সহিহ মুসলিম : ১৯৩১

চারিত্রিক ধসের ক্ষেত্রে এর প্রভাব নিয়ে আমরা যদি আলোচনা করি, তাহলে সেটা হবে অনেকটা সূর্যের পরিচয় তুলে ধরার মতো।

একজন চিকিৎসক একবার বলেছিলেন, মানুষের জন্য নেশাজাতীয় দ্রব্যের চেয়ে ভয়ানক আর কোনো রোগ নেই। মানসিক রোগ, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া, আঘাতের পথ বেছে নেওয়া এবং কারো প্রাণনাশ—এগুলো সব মাদকদ্রব্য গ্রহণের সুভাবিক ফলাফল। নেশা করতে করতে শ্বাসনালি, পাকস্থলির বারোটা বাজানো, হজমের সিস্টেম নষ্ট করে দেওয়া; নিজে নিঃসৃ হওয়া বা সর্বসৃ বেঁচে দেওয়ার ঘটনা তো অহরহ। নেশাজাতীয় দ্রব্যের কুফল হিসেবে এসব দুর্ঘটনার হিসেব রাখা হলে তার পরিমাণ এত বেশি হবে যে, তা দেখার পরে আমাদের জীবনের যাবতীয় মোটিভেশনই হাওয়া হয়ে যাবে।

ইসলামপূর্ব যুগে আরবরা মাদক গ্রহণে তীব্রভাবে আসন্ত ও অভ্যস্ত ছিল। তাদের কথাবার্তা ও কবিতায় সেই প্রভাব প্রবলভাবে স্পষ্ট। মদের জন্য তারা শত শত নাম রেখেছিল। কবিতার মধ্যে মদ, মদের পেয়ালা ও মদ্যপানের আসরের বর্ণনা স্থান করে নিয়েছে বিপুলভাবে।

কিন্তু ইসলাম এসে তাদের মাদক গ্রহণের দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে। নেশাদ্রব্য অবশ্য হুট করেই নিষেধ হয়নি। পর্যাক্রমে ধীরে ধীরে মাদকদ্রব্য হারাম হয়েছে। প্রথমে তাদেরকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতে যোগ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সুরা বাকারার ২১৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, মদ খাওয়ার পাপ তার উপকারের চেয়ে বেশি। মদ নিষিদ্ধ হওয়ার চূড়ান্ত আয়াত হলো, আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ يَنْتَكُمُ الْغَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ فِي  
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَلَمَّا هُنَّ مُنْتَهُونَ ﴿٧﴾

হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শরসমূহ তো কেবলই ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা সেগুলো বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্রো ঘটাতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর

স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে। অতএব তোমরা কি (মদ-সংশ্লিষ্ট সকল  
কার্যক্রম থেকে) নিবৃত্ত হবে? [১]

মদ-জুয়ার নিষিদ্ধতা চূড়ান্তভাবে এই দুই আয়াতের মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে।  
মদ-জুয়া উল্লেখিত হয়েছে মূর্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ণয়ক তিরের সঙ্গে  
এক কাতারে। এগুলোকে তিনি বলেছেন, ‘রিজস’ বা অপবিত্র ও নোংরা কাজ।  
পবিত্র কুরআনে ‘রিজস’ শব্দটি কেবল গর্হিত এবং নিকৃষ্ট কাজের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত  
হয়েছে। তাছাড়া এটি আল্লাহ তাআলার নিকট শয়তানের কাজ হিসেবে সাব্যস্ত  
হয়েছে। আর শয়তানের কাজ মানেই হলো অশ্লীল এবং নিকৃষ্ট কিছু। আল্লাহ  
তাআলা এসব জিনিস থেকে মুমিনদেরকে দূরে থাকতে বলেছেন এবং এই দূরে  
থাকাটাই হলো সাফল্য।

মদ ও জুয়ার সামাজিক ক্ষতি হলো—এর ফলে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন হয় এবং  
পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্রোহ জন্ম নেয়। আর এসব জিনিসের আত্মিক ক্ষতি হলো  
আল্লাহ তাআলার স্মরণ এবং সালাত ও দ্বিনি দায়িত্বের ব্যাপারে অবহেলা তৈরি হয়।  
এরপর আল্লাহ তাআলা মর্মভেদী ভাষায় মদ ও জুয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে  
গিয়ে বলেন, ‘অতএব তোমরা কি বিরত হবে না?’ এই নির্দেশের জবাবে সাহাবিদের  
উত্তর এসেছিল, ‘হে আমাদের রব, আমরা বিরত হয়েছি; আমরা বিরত হয়েছি! ’

এই আয়াত অবর্তীর্ণ হওয়ার পরে সাহাবিদের অবস্থা ছিল বিস্ময়কর। কেউ হয়তো  
মদ্যপানে ব্যস্ত ছিল। তার কাছে আয়াত পৌছামাত্র সে মদের পেয়ালা মুখ থেকে  
সরিয়ে নিয়েছে এবং ছুড়ে ফেলে দিয়েছে পানপাত্র।

ব্যক্তি, পরিবার ও দেশ সর্বক্ষেত্রে মদের ক্ষতির ব্যাপারটি অনেক দেশই বুঝতে  
পেরেছিল। তাদের কেউ কেউ আইন-কানুন এবং ক্ষমতা খাটিয়ে লোকজনকে এ  
থেকে বিরত রাখার উদ্যোগও নিয়েছিল, কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা নিদারুণভাবে  
ব্যর্থ হয়েছে। বিপরীতে মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ইসলাম একটিমাত্র নির্দেশ  
দিয়েছে, আর এই এক নির্দেশেই মদ তাদের জীবন থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে।

মদের ব্যাপারে খ্রিস্টধর্মের অবস্থান সম্পর্কে পাদরিদের মতানৈক্য রয়েছে। যারা  
বৈধতার কথা বলে, তারা ইঞ্জিলের একটি বন্ধবের উন্নতি দিয়ে থাকে। সেখানে

[১] সুরা মায়দা, আয়াত : ৯০-৯১

বলা হয়েছে, সামান্য পরিমাণ মদ পাকস্থলীর জন্য উপকারী। যদি ধরেও নিই, এই বন্তব্য বিশুধ্য; অল্প পরিমাণ মদ পাকস্থলীর জন্য উপকারী; তবু মদ্যপান বর্জন করা দরকার। কারণ, সামান্য মদের মাধ্যমেই ধীরে মানুষ নেশাখোর হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ইসলামে অকাট্য, স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মদ এবং মদের সহযোগী সবকিছু হারাম করা হয়েছে।

### প্রত্যেক নেশাজাতীয় দ্রব্যই মদ

মদ নিষিদ্ধের ঘাপারে প্রথম ঘোষণাতেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফলাফলের দিকে তাকিয়ে ঘোষণা দিয়েছেন। নেশাজাতীয় দ্রব্যের মূলের দিকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুক্ষেপ করেননি। কোন মদ কী থেকে তৈরি হয়েছে, তার দিকে তিনি কোনো মনোযোগ দেননি। তিনি সরাসরি ফলাফল খেয়াল করেছেন। আর সেটি হলো—নেশাগ্রস্ততা। সুতরাং যা পান করলে নেশা তৈরি হবে, সেটাই মদ। নেশাদ্রব্য যে নামেই ডাকা হোক, যে লেবেলই তাতে আঁটা হোক এবং যে উপাদান থেকেই তা তৈরি হোক, তা হারাম। এর ওপর ভিত্তি করে (বর্তমান সময়ের) বিয়ার ইত্যাদিও হারাম হবে।

মধু, গম ও যব ইত্যাদি থেকে তৈরিকৃত নেশাজাতীয় দ্রব্য সম্পর্কে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চাওয়া হলে উত্তরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত সারগর্ভ মূলনীতি বলে দিয়েছেন—

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

| প্রত্যেক নেশা-উদ্রেককারী দ্রব্যই মদ, আর সব ধরনের মদই হারাম।<sup>[১]</sup>

উমার ইবনুল খাতাব রায়িয়াল্লাহু আনহু মিশ্বারে দাঁড়িয়ে মুসলিমদের সামনে ঘোষণা করেছিলেন—

وَالْخَمْرُ مَا خَاءَرَ الْعَقْلَ

| মদ হলো যা বুদ্ধি-বিবেককে আচ্ছান্ন করে ফেলে।<sup>[২]</sup>

[১] সহিহ মুসলিম : ২০০৩; সুনানু আবি দাউদ : ৩৬৭৯

[২] সহিহুল বুখারি : ৫৫১৮; সহিহ মুসলিম : ৩০৩২

যা প্রচুর পানে নেশা হয়, তার সামান্যও হারাম

ইসলামে মদের ব্যাপারে আরো একবার দৃঢ় অবস্থান ঘোষিত হয়েছে, মদের পরিমাণ বিষয়ে। কমবেশি পরিমাণের প্রতি ইসলাম ভুক্ষেপ করেনি। মানুষ সাধারণত প্রথমে অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে তার অবনতি ঘটে আর পানের পরিমাণ বাড়তে থাকে। এক সময় সে নেশায় অন্ধ হয়ে ওঠে। কিছুতেই তার মদের পিপাসা মেটে না।

এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَا أَسْكَرَ كَثِيرٌ ، فَقَلِيلٌ حَرَامٌ

| যা প্রচুর পানে নেশা হয়, তার সামান্যও হারাম।[১]

তিনি আরো বলেছেন—

مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ قَمِيلٌ ء الْكَفَ مِنْهُ حَرَامٌ

| যে দ্রব্যের এক ফারাক (মশক) পরিমাণ (পানে) নেশা সৃষ্টি করে তার এক আজল পরিমাণও হারাম।[২]

### মদের ব্যবসা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদ হারামের মধ্যেই কেবল ক্ষান্ত থাকেননি; বরং এর ক্রয়-বিক্রয়, এমনকি অমুসলিমদের কাছেও এর বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। এজন্য কোনো মুসলিমের জন্য মদ আমদানি-রপ্তানি, মদের ব্যবসার জন্য দোকান ভাড়া প্রদান এবং মদের দোকানের কর্মচারী হওয়া কোনো কিছুই জায়িয় নেই।

হাদিসে এসেছে, ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَعِنْتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أُوْجُهٍ: بِعَيْنِهَا ، وَعَاصِرِهَا ، وَمُغْتَصِرِهَا ، وَبَائِعِهَا ، وَمُبْتَاعِهَا ،  
وَحَامِلِهَا ، وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ ، وَأَكِلِ تَهْمِينَهَا ، وَشَارِبِهَا ، وَسَاقِهَا

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৩৬৮১; জামিউত তিরমিয়ি : ১৮৬৫; হাদিসটি সহিহ।

[২] জামিউত তিরমিয়ি : ১৮৬৬; মুসলানু আহমাদ : ২৪৯৯২; হাদিসটি সহিহ।

মদের ওপর দশভাবে অভিসম্পাত করা হয়েছে। যথা : সুযং মদ, মদ উৎপাদক, মদ উৎপাদনের নির্দেশদাতা, মদ বিক্রেতা, মদের ক্রেতা, মদ বহনকারী, তা যার জন্য মদ বহন করা হয়, মদের মূল্য ভোগকারী, মদ পানকারী ও মদ পরিবেশনকারী (এদের সকলেই অভিশপ্ত) [১]

মদের নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে সুরা মাযিদার আয়াতটি যখন অবর্তীণ হয়, তখন নবিজি সাল্লামাত্তু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَذْرَكَنَّهُ هَذِهِ الْأَيْةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ، وَلَا يَبْغُ،  
قَالَ: فَاسْتَقْبِلْ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মদ হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং যার নিকট এ আয়াত পৌঁছবে এবং তার নিকট মদের কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে সে যেন তা পান না করে এবং বিক্রি না করে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন যাদের নিকট মদ ছিল, তারা সবাই তা নিয়ে মদিনার রাস্তায় নেমে এলো এবং সব চেলে ফেলে দিল [২]

### কাউকে মদ উপহার দেওয়া হারাম

একজন মুসলিমের জন্য মদ ক্রয় এবং তার মূল্য গ্রহণ যেমনি হারাম, তেমনিভাবে ইহুদি-খ্রিস্টান বা অন্য কাউকে মদ উপহার দেওয়াটাও হারাম। তাই কোনো মুসলিমের জন্য কাউকে নেশাজাতীয় দ্রব্য গিফ্ট করা বা কারো থেকে গিফ্ট গ্রহণ করা বৈধ নয়। মুসলিম মানেই হলো—সে একজন পবিত্র মানব। তাই সে শুধু পবিত্র বস্তুই উপহার হিসেবে দিতে পারে এবং পবিত্র বস্তুই উপহার হিসেবে নিতে পারে।

সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—

إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْوِيَةً خَمْرًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَمَهَا؟ قَالَ: لَا، فَسَأَرِ إِنْسَانًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ

[১] জামিউত তিগ্রমিয়ি : ১২৯৫; সুনান ইবনি মাজাহ : ৩৩৮০; মুসনাদু আহমাদ : ৪৭৮৭; হাদিসটি সহিহ।

[২] সহিহ মুসলিম : ১৫৭৮; মুসনাদু আবি ইয়ালা : ১০৫৬

## দৈনন্দিন জীবনে হালাল-হারাম

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمْ سَارَتْهُ؟ ، فَقَالَ: أَمْرُثُهُ بَيْنِعَهَا ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَمَ شُرْبَهَا  
حَرَمَ بَيْنِعَهَا

এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক মশক মদ উপহারসূরূপ নিয়ে আসে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ সেটা হারাম করে দিয়েছেন? সে বলল, না। তারপর সে এক ব্যক্তির সাথে কানে কানে কথা বলল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে গোপনে কী বললে? সে বলল, আমি তাকে এটা বিক্রি করার পরামর্শ দিয়েছি। এরপর তিনি বললেন, যিনি এটা পান করা হারাম করেছেন তিনি তার বিক্রিও হারাম করে দিয়েছেন [১]

আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আরেকটি বর্ণনায় আরো অতিরিক্ত কথা এসেছে—

قَالَ: أَفَلَا أَكَارِمُ بِهَا الْيَهُودُ؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَمَهَا حَرَمَ أَنْ يُكَارِمَ بِهَا الْيَهُودُ ، قَالَ: فَكَيْفَ  
أَصْنَعُ بِهَا؟ ، قَالَ: شُنَّهَا فِي الْبَطْحَاءِ

লোকটি বলল, তাহলে কি আমি ইহুদিদেরকে মদ উপটোকন হিসেবে দিতে পারব না? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যিনি মদ হারাম করেছেন, তিনি ইহুদিদেরকে মদ উপটোকন হিসেবে প্রদানকেও হারাম করেছেন। তখন সে বলল, তাহলে আমি এই মদ দিয়ে কী করব? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এগুলো মরুভূমিতে ফেলে দাও [২]

### মদের আসর বর্জন করুন

জীবনের সকল ক্ষেত্রে মদসংশ্লিষ্ট নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের জন্য মুমিনদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন মদের আসর থেকে দূরে থাকে, মদ্যপায়ীদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে। উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু

[১] সহিহ মুসলিম : ১৫৭৯; সুনানুন নাসারি : ৪৬৬৪

[২] মুসনাদুল হুমাইদি : ১০৬৪; আত-তাফসির মিন সুনানি সাইদ ইবনু মানসুর : ৮২২; হাদিসটির সনদ যইফ, তবে এর পক্ষে সমর্থক হাদিস আছে।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجِدُنَّ عَلَىٰ مَائِدَةٍ يُذَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ

| আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন এমন  
দস্তরখানে না বসে, যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়।<sup>[১]</sup>

মুমিনদের প্রতি নির্দেশ, তারা পাপ কাজে বাধা দেবে, বাধা দিতে সক্ষম না হলে  
পাপের বৈঠক থেকে দূরে থাকবে। উমার ইবনু আব্দিল আযিয রাহিমাহুল্লাহর  
ব্যাপারে বলা হয় যে, তিনি এমন ব্যক্তিদেরকেও শাস্তি দিতেন, যারা মদ পান  
করেনি, কিন্তু মদ্যপানকারীদের সাথে মদের আসরে উপস্থিত ছিল।

একবারের ঘটনা—‘তার কাছে একটি মদ্যপ দলকে ধরে নিয়ে আসা হলো। খলিফা  
উমার ইবনু আব্দিল আযিয রাহিমাহুল্লাহ তাদেরকে বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিলেন।  
তখন তাকে জানানো হলো, তাদের মধ্যে একজন লোক আছে, যে তখন সিয়াম  
রেখেছিল। এ কথা শুনে তিনি বললেন, ‘তাকে সবার আগে বেত্রাঘাত করো;  
তোমরা কি আল্লাহর একথা শোনোনি—

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكَفِّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا  
مَعْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ...<sup>(১)</sup>

কিতাবে তোমাদের প্রতি তো অবর্তীণ করেছেন, যখন তোমরা শুনবে  
আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন  
তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়।

অন্যথায় তোমরাও তাদেরই মতো হয়ে যাবে।<sup>[২]</sup>

**মদ কোনো ওষুধ নয়, রবং একটি ব্যাধি**

কুরআন, হাদিস ও খুলাফায়ে রাশিদিনের বক্তব্য ও কাজের দ্বারা একটি বিষয় স্পষ্ট  
হয়—ইসলামে মাদকদ্রব্যের নিষেধাজ্ঞা অত্যন্ত দৃঢ় ও কঠোর। মাদকদ্রব্য থেকে

[১] জামিউত তিরমিয়ি : ২৮০১; মুসনাদু আহমাদ : ১৪৬৫১; হাদিসটি হাসান।

[২] মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ২৮, পৃষ্ঠা : ২২১; সুরা নিসা, আয়াত : ১৪০

মানুষকে দূরে রাখা, তারা যাতে এর কাছেও না যেতে পারে সেজন্য পদে পদে বাধা প্রদান, মদ্যপানে লিপ্ত হওয়ার যাবতীয় পথ বুঝকরণ এবং তার ওপর বিশেষভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কাজ ইসলাম অত্যন্ত সচেতনভাবেই করেছে।

একজন মুসলিমের জন্য সামান্য মদ্যপানও হারাম। মদ ক্রয়, বিক্রয়, উপহার প্রদান, মদ তৈরি, ঘরে বা দোকানে মদ সংরক্ষণ, আনন্দ উৎসব বা যেকোনো অনুষ্ঠানে মদের প্রবেশ, অমুসলিম বন্ধুকে মদ গিফটসহ খাবারে বা পানীয়ের মধ্যে মদের মিশ্রণ সবই হারাম। মোটকথা, যতভাবে মদের সংস্পর্শ ঘটে, তার সবই ইসলামে নিষিদ্ধ।

একটি প্রশ্নের সম্মুখীন প্রায়শ হতে হয়—ওষুধ হিসেবে মদের ব্যবহারে করণীয় কী? এ প্রশ্নের উত্তর হাদিসেই আছে। সহিত মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে—

أَنْ طَارِقَ بْنَ شُوَيْدٍ الْجُعْفِيُّ ، سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ ، فَنَهَاهُ - أَوْ كَرِهَ  
- أَنْ يَصْنَعَهَا ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلَّدُوَاءِ ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ ، وَلَكِنَّهُ دَادٌ

তারিক ইবনু সুওয়াইদ জুফি রায়িয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মদ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি তাকে বারণ করলেন কিংবা মদ প্রস্তুত করাকে খুব জ্যন্য মনে করলেন। তিনি (তারিক রায়িয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি তো শুধু ওষুধ তৈরি করার জন্য মদ প্রস্তুত করি। তিনি বললেন, এটি তো (ব্যাধি নিরামক) ওষুধ নয়; বরং এটি নিজেই ব্যাধি।[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدُّوَاءَ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَأْوُوا وَلَا تَدَأْوُوا بِحَرَامٍ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা রোগ এবং ওষুধ অবর্তীণ করেছেন এবং প্রতিটি রোগের প্রতিবেধক সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো, তবে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ কোরো না।[২]

[১] সহিত মুসলিম : ১৯৮৪; সুনানু আবি দাউদ : ৩৮৭৩

[২] সুনানু আবি দাউদ : ৩৮৭৪; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৯৬৮১; হাদিসটির সনদ যইফ।

ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহু মাদকদ্রব্যের বিষয়ে বলেন—

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءً كُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

| আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর যা হারাম করেছেন, তার মধ্যে তিনি তোমাদের  
জন্য আরোগ্য রাখেননি [১]

ইসলামে মদ ও অন্যান্য হারাম বস্তুর মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ হারাম। কারণ, যেমনটি ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন— ‘কোনো বস্তু নিষিদ্ধ ঘোষণার অর্থই হলো, এই বস্তু থেকে মানুষ সর্বোত্তমাবে বিরত থাকতে হবে। কিন্তু নিষিদ্ধ বস্তু যদি ওষুধ হিসেবে গ্রহণের অনুমতি থাকে, তাহলে সর্বোত্তমাবে বিরত থাকা তো দূরের কথা, উল্টো নিষিদ্ধ বস্তু ব্যবহারে প্ররোচনা দেওয়া হবে, যা শরিয়ত-প্রণেতার উদ্দেশ্য পরিপন্থি।’[২]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, নিষিদ্ধ বস্তুর মাধ্যমে চিকিৎসা-গ্রহণের ব্যাপারে অনুমোদন থাকলে মানুষজন সেগুলো মাঝেমধ্যে উপভোগের জন্যও গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া যখন সে জানবে, এই উপাদানটি তার রোগের জন্য উপকারী, তখন সে এটি সানন্দে ও সাগ্রহে গ্রহণ করবে, অথচ কোনো মুমিন একটি নিষিদ্ধ বস্তু সানন্দে গ্রহণ করতে পারে না। উপরন্তু এসব নিষিদ্ধ ওষুধের মধ্যে তথাকথিত আরোগ্যের চেয়ে ক্ষতিকর উপাদান অনেক বেশি।[৩]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের প্রতি আমাদের দ্রষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেন, ওষুধের মাধ্যমে সুস্থিতা লাভ করতে হলে মানসিকভাবে তার প্রতি টান ও আস্থা থাকতে হয় যে, ওষুধে আমার উপকার হবে এবং আল্লাহ তাআলা এর মধ্যে সুস্থ থাকার নিয়ামত লুকিয়ে রেখেছেন। জানা কথা যে, হারাম বস্তুর প্রতি সাধারণত একজন মুমিন মনে মনে ঘৃণা পোষণ করে। কোনো ঘৃণ্য বস্তুর দ্বারা স্বাস্থ্যগত উপকারিতা, বারাকাহ ও তার সম্পর্কে সুধারণা রাখা এবং সেটি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা একটি অসম্ভব ব্যাপার।

[১] মুসামাফু আন্দির রাজ্ঞাক : ১৭১০২; মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৭৫০৯, ৮২৬০; হাদিসটি সহিহ।

[২] যাদুল মাআদ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৪৪

[৩] আগুন্ত

তাছাড়া ঈমান যার যত শক্তিশালী, নিষিদ্ধ ওযুধ তার কাছে তত বেশি ঘৃণাযোগ্য হবে, সে ওযুধের প্রতি তার আস্থা তত কম থাকবে। এমন বিরূপ মনোভাব নিয়ে কোনো ওযুধ গ্রহণ করলে, স্বাভাবিকভাবেই সেই ওযুধ তার জন্য আরোগ্য নয়, উল্টো রোগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।<sup>[১]</sup>

এত নিষেধাজ্ঞা থাকার পরেও, শরিয়ত বিশেষ পরিস্থিতির কথা বিভিন্নভাবে খেয়াল রেখেছে। যদি কখনো এমন পরিস্থিতি চলে আসে, যেখানে সরাসরি মদ কিংবা মদমিশ্রিত কোনো বস্তুই ভয়ানক কোনো রোগের জন্য একমাত্র ওযুধ হিসেবে নিশ্চিত হওয়া যায়; যেখানে অন্য কোনো ওযুধ কাজ করে না (আমার বিশ্বাস এমন কোনো পরিস্থিতি কখনো সৃষ্টি হতে পারে না) এবং এই বিষয়টি দ্বীন সম্পর্কে সচেতন যত্নবান অভিজ্ঞ একজন মুসলিম চিকিৎসকের সমর্থনযোগ্য হয়, তাহলে সেটা ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, শরিয়তের বিধি-বিধান সহজতা ও সমস্যা দূরীকরণের জন্যই এসেছে; এগুলোতে শরিয়তের বাধা নেই। এই পরিস্থিতিতে তখন এই আয়াতের বিধান প্রযোজ্য হবে—

﴿فَمِنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنْ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾  
[১৩]

তবে যে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালঙ্ঘন না করে তা (হারাম খাবার) গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, তাহলে (তার কোনো গুনাহ হবে না; কেননা) নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।<sup>[২]</sup>

## নেশাজাতীয় বস্তু

وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

| মদ হলো যা বুদ্ধি-বিবেককে আচ্ছন্ন করে ফেলে।<sup>[৩]</sup>

একটি ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী বস্তু, যেটি উমার উবনুল খাত্রাব রায়িয়াল্লাহু

[১] যাদুল মাআদ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৪৫

[২] সুরা আনআম, আয়াত : ১৪৫

[৩] সহিল বুখারি : ৫৫১৮; সহিল মুসলিম : ৩০৩২

আনহু মসজিদে নববির মিহারের ওপর থেকে দিয়েছিলেন। এটাই হলো নেশাদ্রব্য-বিষয়ক ইসলামের মূলকথা। মদের হাকিকত সম্পর্কে যাবতীয় প্রশ্ন এই এক বন্ধবে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। নেশাজাতীয় প্রতিটি দ্রব্য, যা মস্তিক্ষে আচ্ছন্নতা সৃষ্টি করে, সুভাবিক চিন্তা-প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করে, সেটাই নিষিদ্ধ মদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত এটা হারাম করেছেন।

আধুনিক কিছু নেশাজাতীয় দ্রব্য, যেমন : গাঁজা, কোকেন, আফিম ইত্যাদি। যারা এসব নেশা গ্রহণ করে থাকে, তাদের থেকে আমরা জানতে পারি, সাধারণত মস্তিক্ষে এবং চেতনায় এগুলো বিভিন্ন রকম প্রভাব ফেলে থাকে। নেশাগ্রহণকারী ব্যক্তি দূরের জিনিসকে কাছে আর কাছের জিনিসকে দূরে দেখে; বাস্তবতা সম্পর্কে বেখবের হয়ে যায় এবং অবাস্তব বিষয়াদি তার মাথার ভেতরে প্রবেশ করে। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি একটা কল্পরাজ্য ডুবে থাকে। এই অনুভূতি লাভের জন্যই নেশাখোররা এসব বস্তুর প্রাহক হয়। এর মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে, নিজেদের দীন-ধর্ম ও দুনিয়াকে ভুলে কল্পলোকে ভাসতে থাকে।

শারীরিক অবসাদ, মানসিক অবসন্নতা, স্বাস্থ্যগত অবনতি, আত্মিক দুর্বলতা, চারিত্রিক স্থলন, ইচ্ছাশক্তির ভঙ্গুরতা, দায়িত্বের ব্যাপারে অবহেলা ইত্যাদি বিভিন্ন নেতৃত্বাচক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তাদেরকে সমাজের জন্য অপ্রয়োজনীয় একটি অঙ্গে পরিণত করে। এসব শারীরিক-মানসিক, সামাজিক ক্ষতি ছাড়াও এতে সম্পদ নষ্ট হয় এবং সীমাহীন পারিবারিক ক্ষতি হয়। এগুলোর ব্যয়ভার বহনের জন্য অনেক সময় নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি তার পারিবারিক খাত থেকে খরচ করে, আবার কখনো নিজে খারাপ কোনো কাজে জড়িয়ে পড়ে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, নোংরামি ও ক্ষতির কারণেই সাধারণত ইসলামে বিভিন্ন বস্তু নিষিদ্ধ হয়ে থাকে। এতক্ষণের আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে— ইসলামে কেবল সেসব নোংরা বস্তুই হারাম, যার শারীরিক, আত্মিক, চারিত্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির ব্যাপারটি নিশ্চিত (চাই সে ক্ষতিটি আমাদের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেকে উপলব্ধ হোক কিংবা না হোক)।

যখনই এসব নেশাজাতীয় দ্রব্যাদি প্রকাশিত হয়েছে, তখনই সে সময়কার ফকির ও ইসলামি আইন-শাস্ত্রবিদগণ এগুলোর নিষিদ্ধতার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে খ্যাতিমান একজন ব্যক্তি হলেন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেন, ‘সবুজ পাতা (গাঁজা) খাওয়া হারাম, চাই এটা নেশা

সৃষ্টি করুক বা না করুক।...এটি পানের ফলে মদের মতোই হৃদয়-চাণ্ডল্য সৃষ্টি হয়, ঝগড়ার মনোভাব জেগে ওঠে এবং শরীর অবসাদে ছেয়ে যায়। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে চিন্তা-চেতনায় ধস নামে, ঘোনতা প্রবল হয়, নষ্ট হতে থাকে আত্মমর্যাদাবোধ। এটি মদের চেয়েও ভয়ানক। এসব নেশা মানুষ তাতারিদের কাছ থেকে পেয়েছে। কমবেশি যেকেনো পরিমাণ গ্রহণ করলেই মদ্যপানের শাস্তি—আশি অথবা চল্লিশটি বেত্রাঘাত অবধারিত হবে।...গাঁজা সেবনের বিধান মদ পানের মতোই, ক্ষেত্রবিশেষ গাঁজা মদের চেয়েও খারাপ। তাই গাঁজা সেবনের শাস্তি মদ পানের মতোই হবে।’[১]

এরপর শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ একটি মূলনীতি উল্লেখ করে বলেন, ‘শরিয়তের নীতি হলো—যেসব নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি মানুষ সাধারণত আকর্ষিত হয়, যেমন : মদ, ব্যভিচার; সেসব বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার শাস্তি হলো—হৃদ (শরিয়া-নির্ধারিত দণ্ড)। পক্ষান্তরে যেসব নিষিদ্ধ বস্তু মানুষ ঘৃণা করে, যেমন মৃত জস্তু খাওয়া; সেগুলোতে লিপ্ত হওয়ার শাস্তি হলো—তাফির (ধর্মক, তিরস্কার বা লঘু শাস্তি)। আর গাঁজা হলো এমন নিষিদ্ধ বস্তু, যার প্রতি মানুষ আকর্ষিত হয়, একে তারা সহজে ছাড়তে চায় না (তাই এর শাস্তি হবে চল্লিশটি বা আশিটি বেত্রাঘাত)। কুরআন ও হাদিসের বক্তব্য থেকে অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্য যেমন হারাম প্রমাণিত, এসব নেশাজাতীয় দ্রব্য নিষিদ্ধের বিষয়টিও পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়েছে।’[২]

### ক্ষতিকর সকল বস্তুই হারাম

ইসলামের একটি সৃতঃসিদ্ধ মূলনীতি হলো—মুমিনদের জন্য এমন কোনো খাবার, পানীয় বা বস্তু বৈধ নয়, যা তাকে ধীরে ধীরে বা আকস্মিকভাবে মেরে ফেলে কিংবা তার জন্য কোনো ক্ষতিকারক বা কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে। এমনিভাবে অতিরিক্ত মাত্রায় গ্রহণের ফলে যে খাবারে অসুস্থ হওয়ার শঙ্কা রয়েছে, তাও খাওয়া যাবে না। কারণ, মুমিনের শরীর তার মালিকানাধীন নয়, তার সবই দ্বীন ও উন্মাহর খিদমতে নিবেদিত। জীবন, সুস্থিতা ও সম্পদ এবং তার প্রতি আল্লাহ-প্রদত্ত নিয়ামত হলো তার কাছে গচ্ছিত আমানত। তাই এক্ষেত্রে কোনো বাড়াবাড়ি গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

[১] মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ৩৪, পৃষ্ঠা : ২১০-২১২

[২] মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ৩৪; পৃষ্ঠা : ২১৪

## হালাল-হারামের বিধান

﴿٦﴾ ... وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা  
তোমাদের প্রতি দয়ালু [১]

﴿١٥﴾ ... وَلَا تُلْقُوا يَأْيُدِيكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ

আর তোমরা নিজেদেরকে ধূংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না [২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارٌ

| নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং অন্যেরও ক্ষতি করবে না [৩]

এই মূলনীতি অনুসারে সিগারেট ক্ষতিকর সাব্যস্ত হলে তখন সিগারেট খাওয়াও হারাম বলে বিবেচিত হবে। বিশেষ করে ডাক্তার যদি নির্দিষ্ট কাউকে সিগারেট খেতে নিষেধ করে থাকে, তাহলে সেখানে এই বিধান আরো কঠোরভাবে প্রযোজ্য হবে। ধূমপান যদি ক্ষতিকর না-ও হতো তবু সেটা পার্থিব বা অপার্থিব কোনো প্রয়োজন ছাড়াই অনর্থক সম্পদের অপচয়। আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পদের অপচয় করতে বারণ করেছেন। মুগিরা রায়িয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—

... وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكُثْرَةُ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ

| আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করতেন অনর্থক বাদানুবাদ,  
অধিক প্রশ্ন এবং সম্পদের অপচয় করা থেকে... [৪]

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ৩৯

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৯৫

[৩] সুনান ইবনি মাজাহ : ২৩৪১; মুসনাদ আহমাদ : ২৮৬৫; হাদিসটি হাসান।

[৪] সহিতুল বুখারি : ৬৪৭৩; সহিহ মুসলিম : ৫৯৩

এই নিষেধাজ্ঞা আরো জোরদার ও কঠোর হবে, যদি এসব বস্তুর পেছনে ব্যক্তি টাকা নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় টাকা হয়।

### পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা

সুন্দর পোশাক, সজ্জিত বেশভূষা ইসলামে শুধু বৈধই নয়, উৎসাহযোগ্য বিষয়। এর মাধ্যমে বান্দার প্রতি আল্লাহ-প্রদত্ত নিয়ামতের প্রকাশ ঘটে। ইসলামে পোশাক পরার উদ্দেশ্য মূলত দুটি। এক. লজ্জাস্থান আবৃত রাখা; দুই. সজ্জা প্রহণ। এজন্য মানবজাতির জন্য পরিচ্ছদ ও পোশাক প্রদানকে তাদের প্রতি বিশাল অনুগ্রহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে কুরআনে। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سُوءَاتِكُمْ وَرِيشًا...  
⑥

হে বনি আদম, আমি তো তোমাদের জন্য পোশাক অবর্তীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবে এবং যা (তোমাদের জন্য) সৌন্দর্যসুরূপ [১]

দেহাবরণ ও সাজ-সজ্জার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের অর্থ ইসলামের দেখানো পথ ছেড়ে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ। উল্লিখিত আয়াতের পরের আয়াতেই আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَقْتِنُوكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزَعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهِمَا  
سُوءَاتِهِمَا...  
⑦

হে আদম সন্তানেরা, শয়তান যেন তোমাদের কিছুতেই প্রলুক্ষ করতে না পারে—যেভাবে তোমাদের পিতামাতাকে জাগ্রাত থেকে বহিকৃত করেছিল, তাদেরকে বিবস্ত্র করেছিল, তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য [২]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ২৬

[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ২৭

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا مِنْكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشْرُبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [১]

হে বনি আদম, প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক গ্রহণ করো। আর খাও এবং পান করো, কিন্তু অপচয় কোরো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। [১]

লজ্জাস্থান টেকে রাখা একজন মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। সুভাবিকভাবে একজন মানুষ শরীরের যতটুকু অন্যের কাছে প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করে, ততটুকুই লজ্জাস্থান। এতে বোঝা যায়, মানুষ পশু থেকে উন্নত ও সৃতন্ত্র একটি প্রাণী। দূরে কোথাও একাকী থাকলেও সুভাবজাত এই বৈশিষ্ট্যের ফলে সে ভূষণ গ্রহণে উদ্বৃদ্ধ হয়। একসময় এই লজ্জাবোধ তার বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

عَنْ بَهْرَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتَى مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ احْفَظْ عَوْرَاتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكْتَ يَمِينَكَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَغْضُهُمْ فِي بَغْضٍ؟ قَالَ: إِنِّي أَسْتَطَعْتُ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًّا؟ قَالَ: اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَخْبِي مِنْهُ مِنَ النَّاسِ

বাহয় ইবনু হাকিম রাহিমাহুল্লাহ তার পিতার সুত্রে দাদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের টেকে রাখার অঙ্গসমূহ কার সামনে আবৃত রাখব এবং কার সামনে অনাবৃত করব? তিনি বললেন, তোমার স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত সকলের সামনে তা আবৃত রাখো। বর্ণনাকারী সাহাবি বলেন, আমি আবার প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, দলের লোকেরা কখনো একত্রে থাকলে (তখন কী করণীয়)? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তখনও যতটুকু সম্ভব সতর টেকে রাখবে। বর্ণনাকারী সাহাবি বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের কেউ যখন নির্জনে থাকে (তখন কি বিবস্ত্র হওয়া যাবে)? তিনি বললেন, লজ্জার ব্যাপারে মানুষের চেয়ে আল্লাহ তাআলাই অধিক হকদার। [২]

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ৩১

[২] সুনান আবি দাউদ : ৪০১৭; জামিউত তিরমিয়ি : ২৭৯৪; হাদিসটি হাসান।

## পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের ধর্ম ইসলাম

সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যেরও আগে হলো পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব ইসলামে ব্যাপক ও বিপুল। কারণ, পরিচ্ছন্নতাই হলো সকল শোভা ও সৌন্দর্যের মূল। বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

**إِلَّا سَلَامٌ نَظِيفٌ فَتَنَظُّفُوا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَظِيفٌ**

| ইসলাম পরিচ্ছন্ন ধর্ম, তাই তোমরা পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করো। কারণ, জান্মাতে  
| কেবল পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিই প্রবেশ করবে।[১]

অন্য বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

**تَخَلَّلُوا ، فَإِنَّهُ نَظَافَةٌ ، وَالنَّظَافَةُ تَدْعُو إِلَى الْإِيمَانِ ، وَالْإِيمَانُ مَعَ صَاحِبِهِ فِي الْجَنَّةِ**

| তোমরা (দাঁত) খিলাল করো; কেননা এটা হলো পরিচ্ছন্নতা। আর পরিচ্ছন্নতা  
| ঈমানের প্রতি উদ্বৃত্ত করো। আর ঈমান তার সঙ্গীর সাথে জান্মাতে থাকবে।[২]

আমাদের দাঁত, হাত-মুখ, মাথাসহ সারা শরীর, কাপড়চোপড়, ঘরবাড়ি ও পথঘাট ইত্যাদি পরিষ্কার রাখার জন্য বিপুলভাবে উদ্বৃত্ত ও উৎসাহিত করেছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। বিস্ময়ের কিছু নেই, ইসলামে ইবাদতের জন্য সর্বপ্রথম অপরিহার্য শর্ত হলো—পবিত্রতা। শরীর-কাপড়, সালাতের স্থান পবিত্র না হলে সালাত গ্রহণযোগ্যই বিবেচিত হবে না। এই পবিত্রতা ছাড়াও শরীরে ধুলাবালি লেগে থাকলে সেগুলোও পরিষ্কার করা উচিত। তাছাড়া সারা শরীরের জন্য অপরিহার্য গোসল-জাতীয় পবিত্রতা তো থাকতেই হবে।

যেহেতু আরবদের পরিবেশ ছিল অনেকটা মরুভূমি ও গ্রামীণ প্রধান। তাই সেখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা-বিষয়ক শিথিলতা ছিল প্রবল। তাদের মধ্যে পরিষ্কার-

[১] আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৪৮৯৩; হাদিসটি অত্যন্ত দুর্বল।

[২] আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৭৩১১; হাদিসটি অত্যন্ত দুর্বল। অবশ্য এটি ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য হিসেবে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত।

পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য নবিজি নানা সময় তাদেরকে পরিচ্ছন্নতা-সংশ্লিষ্ট নানা নির্দেশনা দিতেন। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার ধারণা ও নানা সুন্দর অভ্যাস গড়ে উঠেছে। সব রকমের হীনতা ও দীনতা হেড়ে তারা এগিয়ে গিয়েছে ভারসাম্যপূর্ণ সৌন্দর্যের পথে।

আতা ইবনু ইয়াসার রাহিমাল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ ،  
فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ اخْرُجْ ، فَأَصْلَحَ رَأْسَكَ وَلَحْيَتَكَ فَفَعَلَ ،  
لَمْ رَجَعْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يُلْقَى أَحَدُكُمْ ثَائِرَ  
الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ؟

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববিতে বসে ছিলেন। তখন এলোমেলো চুল-দাঢ়িওয়ালা এক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইশারা করে বললেন, বের হয়ে আগে চুল-দাঢ়ি ঠিক করো। সে আদেশমতো চুল-দাঢ়ি ঠিক করে (মসজিদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট) ফিরে এলো। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের কেউ শয়তানের মতো এলোমেলো চুল নিয়ে চলার চেয়ে এটাই (অর্থাৎ এমন পরিপাটি চুল রাখাই) কি উত্তম নয়? [১]

জাবির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى رَجُلًا شَعِيْثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَغْرُهُ فَقَالَ : أَمَا كَانَ  
يَجِدُ هَذَا مَا يُسْكِنُ بِهِ شَغْرَهُ ، وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَّةٌ ، فَقَالَ أَمَا كَانَ هَذَا  
يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثُوْبَهُ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) আমাদের এখানে এসে এক বিক্ষিপ্ত চুলওয়ালাকে দেখে বললেন, লোকটি কি তার চুলগুলো আচড়ানোর

[১] মুআত্তা মালিক : ৭; শুআবুল ঈমান : ৬০৪৩; হাদিসটির সনদ সহিহ, তবে মুরসাল।

জন্য কিছু পায় না? তারপর তিনি ময়লা কাপড় পরিহিত অপর ব্যক্তিকে দেখে বললেন, লোকটি কি তার কাপড় ধোয়ার জন্য কিছু পায় না? [১]

আবুল আহমেদ আউফ ইবনু মালিক রাহিমাল্লাহু তার পিতা মালিক রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—

رَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَطْمَاعٌ ، قَالَ: هَلْ لَكَ مَالٌ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ،  
قَالَ: مِنْ أَيِّ الْمَالِ ؟ قُلْتُ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ ، قَدْ آتَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الشَّاءِ ، وَإِلَيْلٍ ،  
قَالَ: فَلُتَرْ نِعَمْ اللَّهُ ، وَكَرَامَتُهُ عَلَيْكَ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে পেলেন, যখন আমার গায়ে ছিল ছেঁড়া কাপড়। তখন তিনি বললেন, তোমার কি ধন-সম্পদ আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী ধরনের সম্পদ আছে? আমি বললাম, ছাগল, উট-সহ সব ধরনের সৃষ্টিই আল্লাহু তাআলা আমাকে দান করেছেন। তখন তিনি বললেন, তাহলে তো তোমার চলাফেরায় তাঁর দেওয়া নিয়ামত ও সম্মানের প্রকাশ ঘটানো উচিত। [২]

তাহাড়া নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামাজিক অনুষ্ঠান ও একত্র হওয়ার স্থানে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর কাপড় পরার প্রতি জোর তাগিদ দিয়েছেন। যেমন : জুমুআ ও ঈদের দিনের ব্যাপারে হাদিসে এসেছে, নবিজি বলেছেন—

مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ - أَوْ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ - أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ،  
سَوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ

তোমাদের কেউ বা তোমরা যদি সচরাচর কাজকর্মের জন্য পরিহিত কাপড় ছাড়া জুমুআর দিনে পরার জন্য পৃথক একজোড়া কাপড় সংগ্রহ করতে পারো তবে তাই করো। [৩]

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৪০৬২; সহিহু ইবনি হিবান : ৫৪৮৩; হাদিসটি সহিহ।

[২] মুসলাদু আহমাদ : ১৫৮৮৭; সুনানু আবি দাউদ : ৪০৬৩; হাদিসটি সহিহ।

[৩] সুনানু আবি দাউদ : ১০৭৮; আস-সুনানুল কুবরা, বাহহাকি : ৫৯৫২; হাদিসটি সহিহ।

## পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় ও সৃণ হারাম

ইসলাম কেবল সাজসজ্জার অনুমতি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, এতে বরং উৎসাহ জুগিয়েছে। আল্লাহ-প্রদত্ত শোভা-গ্রহণকে যারা নিষিদ্ধ মনে করে, কঠোর ভাষায় কুরআনে তাদের নিম্না বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ...  
③١

আপনি বলুন, আল্লাহর সাজসজ্জাকে কে হারাম করেছে, যা তিনি নিজের বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন? [১]

তবে ইসলামে বিশেষভাবে পুরুষের জন্য দুই ধরনের সাজসজ্জা নিষিদ্ধ—এক নিরোট সৃণ বা অধিকাংশ সৃণ-বিশিষ্ট বস্তুর ব্যবহার। দুই খাঁটি রেশম ও অধিকাংশ রেশমযুক্ত পোশাক হারাম।

আলি রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

إِنَّ نَبِيًّا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِينَ حَرَامٌ عَلَى ذِكْرِ أَمْتِي

নিশ্চয়ই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেশমের কাপড় নিয়ে তার ডান হাতে রাখলেন আর সৃণ নিয়ে তার বাম হাতে রাখলেন। তারপর বললেন, নিশ্চয়ই এই দুটি বস্তু আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম। [২]

উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

لَا تَلْبِسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَيْسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبِسْهُ فِي الْآخِرَةِ

তোমরা রেশমের পোশাক পরিধান কোরো না। কারণ, যে এটি দুনিয়াতে পরবে, সে আখিরাতে এটি পরতে পারবে না। [৩]

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ৩২

[২] সুনান আবি দাউদ : ৪০৫৭; মুসনাদু আহমাদ : ১৩৫; হাদিসটি সহিহ।

[৩] সহিহ মুসলিম : ২০৬৯; মুসামাফু ইবনি আবি শাইবা : ২৪৬৫৮

## দৈনন্দিন জীবনে হালাল-হারাম

উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেশমের পোশাক সম্পর্কে বলেছেন—

**إِنَّمَا يَلْبِسُهُ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ**

| এটি হলো তাদের পোশাক, যাদের (আধিরাতে) কোনো অংশ নেই।<sup>[১]</sup>

ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

**أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ ، فَتَرَعَّهُ فَطَرَحَهُ .  
وَقَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ ، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُذْ خَاتِمَكَ اثْتَفِعْ بِهِ ، قَالَ : لَا وَاللَّهِ ، لَا أَحْذُهُ أَبَدًا وَقَدْ  
طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোকের হাতে একটি সোনার আংটি লক্ষ করে সেটি খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন, তোমাদের মাঝে কেউ কেউ আগুনের টুকরা জোগাড় করে তার হাতে রাখে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে স্থান ত্যাগ করলে লোকটিকে বলা হলো, তোমার আংটিটা উঠিয়ে নাও আর এটা থেকে (অন্যভাবে) উপকার হাসিল করো। সে বলল, না। আল্লাহর কসম! আমি কক্ষনো ওটা নিতে পারবো না, যখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ফেলে দিয়েছেন।<sup>[২]</sup>

সুর্ণের কলম, সুর্ণের ঘড়ি, সুর্ণের পেয়ালা, সুর্ণের সিগারেট প্যাকেট ইত্যাদি অনেকে শখের বশে বা বিলাসিতা-বশত ব্যবহার করে থাকে, এগুলো সবই হারাম। তবে রূপার আংটি পরা পুরুষদের জন্য জায়িয। ইমাম বুখারি রাহিমাল্লাহ ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন—

**أَتَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ، وَكَانَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي  
يَدِ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُثْمَانَ ، حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِي يَدِ  
أَرِيسَ ، نَقْشُهُ : مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ**

[১] সহিলুল বুখারি: ৫৮৪১; সহিহ মুসলিম: ২০৬৮

[২] সহিহ মুসলিম: ২০৯০; সহিলু ইবনি হিবান: ১৫

## হালাল-হারামের বিধান

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূপার একটি আংটি তৈরি করেছিলেন। সেটি তার হাতে ছিল। এরপর (তার ওফাত) পরবর্তী সময়ে তা আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আনহুর হাতে আসে। তারপর (তার মৃত্যু) পরবর্তী সময়ে তা উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুর হাতে আসে। এরপর (তার মৃত্যু) পরবর্তী সময়ে তা উসমান রায়িয়াল্লাহু আনহুর হাতে আসে। শেষ পর্যন্ত তা আরিস নামক এক কৃপের মধ্যে পড়ে যায়। তাতে **مَحْمُدْ رَسُولُ اللَّهِ**-এর নকশা অঙ্কিত ছিল।<sup>[১]</sup>

অন্যান্য খনিজ পদার্থ, যেমন : লোহা, তামা ইত্যাদির অলংকার নিষিদ্ধতার ক্ষেত্রে কোনো বস্তব্য কুরআন-হাদিসে আসেনি।<sup>[২]</sup> এর বিপরীতে বরং সহিল বুখারিতে

[১] সহিল বুখারি : ৫৮৭৩; সহিহ মুসলিম : ২০৯১

[২] পুরুষদের জন্য রূপার আংটি ছাড়া অন্য কোনো আংটি পরার অনুমতি নেই। আর রূপার আংটির ক্ষেত্রে শর্ত হলো, তার পরিমাণ চার মাশা বা ৪.৩৭৪ গ্রামের চেয়ে কম হতে হবে। এছাড়া অন্যান্য ধাতু যথা লোহ, তামা, সীসা ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত আংটি পরা বৈধ নয়। মুসলাদু আহমাদে আমর ইবনু শুআইব রাহিমাল্লাহ তার পিতা সূত্রে তার দাদা থেকে একটি বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى بَغْضٍ أَصْحَابِهِ خَائِمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَأَغْرَضَ عَنْهُ، فَأَلْقَاهُ وَأَتَخَذَ خَائِمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ: هَذَا شَرٌّ، هَذَا جِلِيلٌ أَهْلُ التَّارِ، فَأَلْقَاهُ، فَأَتَخَذَ خَائِمًا مِنْ وَرَقٍ، فَسَكَّعَ عَنْهُ**

অর্থাৎ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এক সাহাবির হাতে সুর্ণের আংটি দেখে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর সে সাহাবি আংটিটি ফেলে দিয়ে একটি লোহার আংটি বানালেন। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা তো আরো মন্দ। এটা হলো জাহানামিদের অলঙ্কার। তারপর সে সাহাবি এটাও ফেলে দিয়ে একটি রূপার আংটি বানালেন। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব রইলেন।’ [মুসলাদু আহমাদ : ৬৫১৮; আল-আদাবুল মুফরাদ : ১০২১]

এ হাদিসে লোহার আংটি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার কারণটি ব্যাপক, যা নারী এবং পুরুষ উভয়কেই শামিল করে। সুতরাং নারী হোক বা পুরুষ কারো জন্যই লোহা, তামা, সীসা ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত আংটি পরা বৈধ নয়। ফকিহগণ এসব ধাতু দ্বারা নির্মিত আংটি পরাকে মাকরুহে তাহরিমি বলে অভিহিত করেছেন। কঠোরভা বোঝাতে গিয়ে অনেকে এটাকে হারামও বলেছেন। [রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৫৯-৩৬০]

অবশ্য লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদির ওপর শরিয়ত-অনুমোদিত পরিমাণ রূপার প্রলেপ দিয়ে আংটি বানালে সেটা ব্যবহার করার অনুমতি আছে। এটার প্রমাণ পাওয়া যায় নাসাই, আবু দাউদ প্রমুখের বর্ণনা থেকে। মুআইকিব রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাসান বা প্রমাণযোগ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

**كَانَ خَائِمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيدًا مَلْوِيًّا عَلَيْهِ فِضَّةً. قَالَ: وَرَبِّمَا كَانَ فِي يَدِي فَكَانَ مُغَيْقِيبٌ عَلَى خَائِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটি ছিল লোহার, যা রূপা দ্বারা মোড়ানো ছিল। তিনি বলেন, সেটা কখনো আমার হাতেও থাকত। (বর্ণনাকারী বলেন) আর মুআইকিব রায়িয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটির জিম্মাদার।’ [সুনানুল নাসাই : ৫২০৫; সুনানু আবি

একটি হাদিস এসেছে, সাহল ইবনু সাদ রায়িয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—

أَنْ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجِنِيهَا ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ؟ قَالَ: أَذْهَبْ فَالثِّمِسْ وَلَوْ خَائِمًا مِنْ حَدِيدٍ

একজন মহিলা এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিজেকে (বিয়ের জন্য) পেশ করলে। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল, তাকে আমার সঙ্গে বিয়ে করিয়ে দিন। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার কাছে (মোহর দেওয়ার জন্য) কী আছে? সে উত্তর দিল, আমার কাছে কিছুই নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যাও, (মোহর দেওয়ার জন্য কিছু) তালাশ করো, অন্তত একটি লোহার আংটি হলেও [১]

এ হাদিসের মাধ্যমে ইমাম বুখারি রাহিমাল্লাহ মোহর হিসেবে লোহার আংটি ব্যবহারের বৈধতার[২] পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন [৩]

দার্ঢ়ি : ৪২২৪]

[১] সহিলুল বুখারি : ৫১২১; সহিহ মুসলিম : ১৪২৫

[২] এ হাদিস দ্বারাও লোহার আংটি পরার বৈধতা সাব্যস্ত হয় না। কারণ, হাদিসে বলা হয়েছে, লোহার আংটির মাধ্যমে হলেও সে যেন মোহর আদায় করে। এতে কেবল লোহার আংটি মোহর হিসেবে দেওয়ার বিষয়টিই সাব্যস্ত হয়, কিন্তু তা হাতের আঙুলে ব্যবহার করার বৈধতা প্রমাণ হয় না। হতে পারে, স্ত্রী তার মোহর বাবদ পাওয়া লোহার আংটি বিক্রি করে তার মূল্য প্রহরণ করবে কিংবা তার কোনো অমুসলিম প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিয়ে দেবে অথবা অন্য কোনোভাবে তা থেকে উপকৃত হবে। হাদিসে এমন উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়, যেখানে ব্যক্তির জন্য কোনো বস্তুর ব্যবহার বৈধ না হলেও তার মালিক হওয়ার অবকাশ আছে। যেমন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুকে রেশমের একজোড়া পোশাক হাদিয়া দিয়েছিলেন। পুরুষের জন্য রেশমের ব্যবহার হারাম হওয়া সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে রেশমের পোশাক হাদিয়া দেওয়ায় তিনি আশচর্য হয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বুবিয়ে বললেন যে, আমি তোমাকে এটা পরিধান করার জন্য হাদিয়া দিইনি; বরং এটা তোমাকে দিয়েছি, যাতে তুমি তা বিক্রি করে তার মূল্য হতে উপকৃত হতে পারো কিংবা অন্য কাউকে (অর্থাৎ কোনো নারীকে বা কোনো অমুসলিম পুরুষকে) তা পরিধান করাতে পারো। [দেখুন, সহিলুল বুখারি : ৫৮৪১] অতএব এ হাদিস থেকে বোঝা গেল, কোনো জিনিসের মালিক হওয়া এক জিনিস, আর তার ব্যবহার বৈধ হওয়া ভিন্ন আরেকটি জিনিস। কোনো জিনিসের মালিক হলেই তার ব্যবহার বৈধ হয়ে যায় না। সুতরাং হাদিসে স্ত্রীকে মোহর হিসেবে লোহার আংটি দেওয়ার কথা বলা হলেও এ থেকে তা পরিধান করার বৈধতা সাব্যস্ত হয় না।

[৩] সহিলুল বুখারি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২০, হাদিস নম্বর ৫১৫০ সংশ্লিষ্ট আলোচনা, অধ্যায় : দ্রব্যসামগ্রী ও

আর স্বাস্থ্যগত বিশেষ প্রয়োজনে রেশমের কাপড় পরা যাবে। যেমন আনাস  
রায়িয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَالزُّبَيرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ  
حَرِيرٍ ، مِنْ حِجَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا

| নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ রায়িয়াল্লাহু  
আনহু ও যুবায়র রায়িয়াল্লাহু আনহুকে তাদের শরীরে চুলকানি থাকায় রেশমি  
জামা পরিধান করতে অনুমতি দিয়েছিলেন।[১]

### রেশমি কাপড় ও সৃণ পুরুষের জন্য হারাম কেন?

এই দুটি বস্তু নিষেধের পেছনে সুউচ্চ চারিত্রিক ও নৈতিক শিক্ষার ব্যাপক অবদান  
রয়েছে। ইসলামে জিহাদ ও বীরত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। পুরুষের মধ্যে  
তার পৌরুষ ধরে রাখা, মেয়েলি সৃভাব ও দুর্বলতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকার জন্য  
সচেতন থাকা খুবই জরুরি। পুরুষকে আল্লাহ তাআলা মেয়েদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন  
গঠন ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে গড়েছেন। মেয়েরা যেমন গহনা-অলংকার ইত্যাদি নিয়ে  
প্রতিযোগিতা করে এবং পাল্লা দিয়ে বেড়ায়; পুরুষের জন্য তা শোভা পায় না।

এই নিষেধাজ্ঞার পেছনে একটি সামাজিক কারণও রয়েছে। বিলাসিতা থেকে মানুষকে  
বিরত রাখা ইসলামের মৌলিক জীবন-দর্শনের অংশ। বিলাসিতা, আরাম-প্রিয়তার  
বিরুদ্ধে ইসলামের অনন্ত যুদ্ধ জারি আছে। কেননা বিলাসিতা হলো অধঃপতন ও  
সামাজিক অবক্ষয়ের নিয়ামক। এর মাধ্যমে সামাজিক অনাচার ও অসাম্য প্রতিষ্ঠা  
পায়। ফলে দেখা যায়, এক শ্রেণির মানুষ আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়, আরেক শ্রেণি  
থেতেও পায় না। তাছাড়া বিলাস-প্রিয়রা সদা সত্য ও কল্যাণ-বিরোধী হয়ে থাকে।  
কুরআন ঘোষণা করছে—

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتْرَفِيهَا فَقَسَّوْا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَا هَا تَدْمِيرًا

সোহার আংটি দ্বারা মোহর প্রদান।

[১] সহিলুল বুখারি : ২৯১৯; সহিহ মুসলিম : ২০৭৬

আর আমি যখন কোনো জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন সেখানকার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে (সৎকাজ করতে) আদেশ করি। কিন্তু তারা সেখানে অসৎকাজ করে। তখন সেখানকার প্রতি দণ্ডাঞ্জা (আয়াবের ফয়সালা) ন্যায়সংগত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধিস্ত করি।’[১]

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُشْرِفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْنَا مِنْهُ كَافِرُونَ﴾

যখনই আমি কোনো জনপদে সতর্ককারী (নবি-রাসূল) প্রেরণ করেছি সেখানকার বিভিন্নশালী অধিবাসীরা বলেছে, তুমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।[২]

কুরআনের দাবির প্রেক্ষিতে নবিজি সাল্লাল্লাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষতিকর সব বিলাসী আসবাব-উপকরণ মুমিনদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় কেবল পুরুষদের জন্য সুর্ণ ও রেশম নিষিদ্ধের পাশাপাশি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য সুর্ণ ও রূপার পাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

এগুলো তো গেল সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ। এর সঙ্গে একটি অর্থনৈতিক ব্যাপারও জড়িত আছে। এর গুরুত্বও কোনো দিক থেকে কম নয়। সুর্ণ হলো নগদ টাকার বৈশ্বিক তহবিল। তাই ব্যবহার্য তেজসপত্র, পুরুষের অলংকার ইত্যাদির মতো অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সুর্ণের ব্যবহার আসলে যুক্তিযুক্ত নয়।

### নারীদের জন্য সুর্ণালংকার বৈধ কেন?

সুর্ণালংকার-বিষয়ক নিষেধাঞ্জা নারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাদেরকে সুর্ণালংকার ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জন্মগতভাবে নারীদের কাছে সাজসজ্জা পছন্দনীয়। এটি তার নারীত্বের স্বাভাবিক ও সৃষ্টিগত চাহিদা। ইসলাম তাই নারীর জন্য সাজুগুজুর ক্ষেত্রে সুর্ণালংকার ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। শর্ত হলো,

[১] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১৬

[২] সুরা সাবা, আয়াত : ৩৪

পর-পুরুষের আকর্ষণ ও তাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির বাসনা সৃষ্টি করা যাবে না। হাদিসে এসেছে, আবু মুসা আশআরি রায়িয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أَيْمًا امْرَأٌ أَسْتَغْطِرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لَيَجِدُوا مِنْ رِحْبَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

কোনো নারী যখন সুগন্ধি লাগিয়ে লোকদের পাশ দিয়ে যাতায়াত করে, যেন তারা তার ঘ্রাণ পায় তাহলে সে (পরোক্ষভাবে) ব্যভিচারিণী [১]

অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে সতর্ক করে বলেছেন—

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَزْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ...  
⑤

আর তারা (নারীরা) যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে [২]

কেমন হবে মুসলিম নারীদের পোশাক?

দেহের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখা যায়, শরীরের উঁচু-নিচু ভাঁজ উন্মোচিত হয়; বিশেষ করে স্তন, কোমর, নিতন্ত্রের মতো অতিরিক্ত আকর্ষণীয় অঙ্গের আকার-আকৃতি প্রদর্শিত হয়, এমন পোশাক-পরিচ্ছন্দ পরে বাইরে বের হওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ।

সহিহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

صِنَافِنِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا ، قَوْمٌ مَعْهُمْ سِيَاطٌ كَذَنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ،  
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ غَارِيَاتٌ مُهِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسِنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لَا يَدْخُلُنَّ  
الْجَنَّةَ ، وَلَا يَجِدُنَّ رِحْبَهَا ، وَإِنَّ رِحْبَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

[১] সুনানুল নাসাই : ৫১২৬; মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৩৪৯৭; হাদিসটি হাসান।

[২] সুরা নূর, আয়াত : ৩১

জাহানামিদের দুটি শ্রেণিকে আমি (এখন পর্যন্ত) দেখিনি। একদল (পুরুষ) লোক, যাদের সঙ্গে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, তা দ্বারা তারা লোকজনকে মারবে। আরেক দল হলো এমন কিছু নারী, যারা কাপড় পরিহিতা হয়েও বিবস্ত্র থাকবে। তারা (পুরুষদেরকে) আকর্ষণকারিণী হবে এবং হেলেদুলে চলবে। তাদের মাথার চুলের অবস্থা বুখতি উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। ওরা জানাতে যেতে পারবে না, এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না; অথচ এত এত (অর্থাৎ অনেক) দূর হতেও তার সুন্দর পাওয়া যায়।’<sup>[১]</sup>

তাদেরকে ‘বিবস্ত্র’ বলার কারণ—তাদের শরীরে কাপড় আছে, তবু তারা উলঙ্গের মতোই। কাপড় পরার উদ্দেশ্য হলো শরীরের আকর্ষণীয় অঙ্গগুলো আবৃত রাখা, কিন্তু তারা পাতলা আবরণের কাপড় পরে বরং আকর্ষণীয় অঙ্গগুলোকে আরো বেশি উন্মোচন করে রেখেছে, যেটা বর্তমান যুগের অধিকাংশ নারীদের অবস্থা।

‘বুখতি’ হলো এক প্রজাতির উট, যার কুঁজ সাধারণত অনেক বড় হয়। নবিজি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব নারীর মাথাকে বুখতি উটের কুঁজের সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন, কারণ তাদের চুলের ঝুঁটি মাথার মাঝাখানে কুঁজের মতো উঁচু হয়ে থাকবে। নবিজি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন গায়েবের জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের যুগ দেখতে পাচ্ছিলেন। বর্তমানে নারীরা সৌন্দর্যের জন্য, স্টাইলের জন্য নামিদামি সেলুনে ও বিউটিপার্লারে যায়। এসব সেলুন ও বিউটিপার্লার সাধারণত পুরুষরাই পরিচালনা করে। একবার চুল পরিচর্যার বিল আসে হাজার হাজার টাকা। বিষয়টি এখানেই শেষ নয়, অনেকের আবার নিজেদের চুলে মন ভরে না; নিজেদের আরো সুন্দর, কোমল ও কমনীয়তা বৃদ্ধির জন্য তারা কৃতিম চুল ব্যবহার করে। সে পুরুষের চোখে আরো বেশি আকর্ষণীয় ও আবেদনময়ী হয়ে উঠতে চায়।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এই হাদিসে একই সঙ্গে রাজনৈতিক সৈরাচার ও চারিত্রিক অবনতি, দুটি বিষয় একত্রে তুলে ধরা হয়েছে। এটি বর্তমান সময়ের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় মিলে যায়। বর্তমানে সৈরাচারী জালিম শাসকগণ বিভিন্ন ধরনের বিনোদন ও ক্রীড়া দিয়ে জনগণকে (নিজেদের জুলুম-সৈরাচারিতার কথা) ভুলিয়ে রাখে এবং ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসে মাতিয়ে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে তাদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখে।

[১] সহিহ মুসলিম : ২১২৮; সহিল্ল ইবনি হিবান : ৭৪৬।

## বিপরীত লিঙ্গের বেশভূষা গ্রহণের বিধান

নারীর জন্য পুরুষের বেশভূষা আর পুরুষের জন্য নারীর বেশভূষা গ্রহণ হারাম ও লানতযোগ্য অপরাধ। হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَلْبَسُ لِنْسَةً الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لِنْسَةً  
الرَّجُلِ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন ওই পুরুষকে, যে নারীর বেশভূষা গ্রহণ করে এবং (অভিসম্পাত করেছেন) ওই নারীকে, যে পুরুষের বেশভূষা গ্রহণ করে।<sup>[১]</sup>

ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ  
النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণকারী নারীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।<sup>[২]</sup>

অভিশাপ্ত সাদৃশ্যের মধ্যে কথা, নাড়াচাড়া, হাঁটাচলা, পোশাক-পরিচ্ছেদ সবই অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক জীবনে মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ ও ভয়াবহ ব্যাপার হলো—সুভাবজাত ও সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রের সীমালঙ্ঘন। পুরুষ ও নারী উভয়েই প্রকৃতির অংশ। প্রত্যেকের পৃথক পৃথক সুতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও সুভাব রয়েছে। পুরুষ নারীর মতো আর নারী পুরুষের মতো আচরণ করলে সেই প্রাকৃতিক নিয়ম ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। পাশাপাশি সমাজে সৃষ্টি হয় বিপুল বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদের হলুদ রঙের কাপড় পরতে নিষেধ

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৪০৯৮; মুসনাদু আহমাদ : ৮৩০৯; হাদিসটি সহিহ।

[২] সহিহুল বুখারি : ৫৮৮৫; সুনানু আবি দাউদ : ৪০৯৭

করেছেন। আলি রায়িয়াল্লাহু আনহুর বরাতে সহিহ মুসলিমে এসেছে, তিনি বলেন—

نَهَايِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخْتِيمِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنِ لِيَاسِ الْقَسْتِيِّ ، وَعَنِ  
الْقِرَاءَةِ فِي الْرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَعَنِ لِيَاسِ الْمُعْصَنَفِ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সোনার আংটি, কাসসি বস্ত্র (রেশমের মিশ্রণে তৈরি কাতানের কাপড় বিশেষ) পরিধান করতে, বুকু-সিজদায় কুরআন পাঠ করতে এবং হলুদ রংয়ের বস্ত্র পরতে বারণ করেছেন [১]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ تَوْبَيْنِ مُعَصْنَفَيْنِ ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ  
الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبِسْهُمَا

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পরিধানে হলুদ রঙের দুটি বস্ত্র দেখে বললেন, নিশ্চয়ই এগুলো কাফিরদের বস্ত্র; অতএব তুমি এসব পরিধান কোরো না [২]

### অহংকারবশত পোশাক পরিধান

খাবারদাবার, পোশাক-আশাক ইত্যাদি সবকিছু বৈধ হওয়ার একটি মৌলিক নীতি হলো—এগুলোর মধ্যে অপচয় ও দন্ত থাকতে পারবে না। অপচয় মানে হলো বৈধ কোনো জিনিসে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ও ব্যবহার। দন্তের বিষয়টি বাইরের চেয়ে নিয়ত ও মনের সঙ্গে অধিক সম্পৃক্ত। কোনো পোশাক পরার উদ্দেশ্য যদি প্রদর্শন, দন্ত ও অহংকার প্রকাশ হয়, তাহলে সেই পোশাক পরা হারাম হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ⑯

আর আল্লাহ প্রত্যেক দান্তিক ও অধিক গর্বকারীকে পছন্দ করেন না [৩]

[১] সহিহ মুসলিম : ২০৭৮; জামিউত তিরমিয়ি : ১৭৩৭

[২] সহিহ মুসলিম : ২০৭৭; সুনানুন নাসাই : ৫৩১৬

[৩]সুরা হাদিদ, আয়াত : ২৩

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

مَنْ جَرَّ ثُوبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি দণ্ডভরে নিজের পোশাক ঝুলিয়ে চলবে, আল্লাহ তার প্রতি কিয়ামতের দিন (রহমতের) দৃষ্টি দেবেন না।<sup>[১]</sup>

মুমিনকে অহংকারমুক্ত ও আড়ম্বরহীন রাখার জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘খ্যাতির পোশাক’ পরতে নিষেধ করেছেন। খ্যাতির পোশাক হলো—যা পরলে মনের মধ্যে অহংবোধ ও দণ্ড জেগে ওঠে, অনর্থক নিজেকে প্রদর্শনের মনোভাব জাগ্রত হয়। হাদিসে এসেছে—

مَنْ لِيْسَ ثُوبَ شَهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا ، أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثُوبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খ্যাতির পোশাক পরবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন, এরপর তাতে (জাহানামের প্রজ্ঞালিত) আগুন লাগিয়ে দেবেন।<sup>[২]</sup>

ইউনুস ইবনু আবি ইয়াফুর রাহিমাল্লাহ তার পিতা আবু ইয়াফুর রাহিমাল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ : مَا أَلْبَسْتُ مِنَ الشَّيْبِ ؟ قَالَ : مَا لَا يَزْدَرِيكَ فِيهِ السُّفَهَاءُ وَلَا يَعِيْبُكَ بِهِ الْحُكَمَاءُ ، قَالَ : مَا هُوَ ؟ قَالَ : مَا بَيْنَ الْخَمْسَةِ دَرَاهِمَ إِلَى الْعِشْرِينَ دَرَاهِمًا

আমি ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুকে শুনতে পেলাম, যখন তাঁর কাছে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আমি কী ধরনের কাপড় পরব? তিনি বললেন, এমন পোশাক, (সুল্ল মূল্যের ও দেখতে কদাকার হওয়ায়) যার কারণে বোকারা তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে না পারে; আবার (পোশাকের মূল্য মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার দরুন)

[১] সহিল বুখারি: ৫৭৮৪; সহিহ মুসলিম: ২০৮৫

[২] সুনান ইবনি মাজাহ: ৩৬০৭; সুনান আবি দাউদ: ৪০২৯; হাদিসটি হাসান।

বিজ্ঞরাও যেন তোমার দোষ না ধরতে পারে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, সেটা কেমন  
মূল্যের কাপড়? তিনি উত্তরে বললেন, ৫ থেকে ২০ দিরহাম মূল্যের কাপড়।<sup>[১]</sup>

### স্রষ্টাপ্রদত্ত আকৃতির পরিবর্তন

সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির কোনো অনুমতি ইসলামে নেই। অনেক সময় মেয়েরা  
সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য স্রষ্টা-প্রদত্ত নিজস্ব আকৃতিও পরিবর্তন করে ফেলে। এমনটা  
করা সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং কুরআনে একে শয়তানের প্ররোচনা বলা হয়েছে।  
কুরআনুল কারিমে শয়তানের উক্তি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে—

وَلَا مُرَأَّتُهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ...  
۱۱۹

আর আমি অবশ্যই তাদেরকে (প্ররোচনার মাধ্যমে) নির্দেশ দেবো; ফলে  
তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে<sup>[২]</sup>

### ট্যাটু আঁকা, দাঁত সরু করা ও প্লাস্টিক সার্জারি

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ-প্রদত্ত সৃষ্টির বিকৃতি সাধন সম্পূর্ণরূপে হারাম।  
শরীরে ট্যাটু করা, উক্তি আঁকা, দাঁত কেটে সরু করা-সহ সবই আল্লাহর সৃষ্টি  
বিকৃতির শামিল। যে উক্তি অঙ্কন করে, যার শরীরে উক্তি অঙ্কন করা হয়, যে দাঁত  
কেটে দাঁতের মধ্যে ফাঁক তৈরি করে, যার দাঁত কেটে ফাঁক তৈরি করা হয়—সবার  
প্রতি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু  
মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

لَعْنَ اللَّهِ الْوَاسِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَاهِصَاتِ ، وَالْمُتَقْلِبَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيْرَاتِ  
خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى ، مَالِي لَا لَعْنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আল্লাহ অভিসম্পাত বর্ষণ করেন সেসব নারীদের ওপর, যারা (অন্যদের) শরীরে  
উক্তি অঙ্কন করে দেয়, নিজেদের শরীরে উক্তি অঙ্কন করায়, যারা যারা

[১] আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ২৬২, হাদিস : ১৩০৫১; হিলইয়াতুল আউলিয়া,  
খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩০৩; হাদিসটি হাসান।

[২] সুরা নিসা, আয়াত : ১১৯

নিজেদের চুল-ভু উপত্তে ফেলে, যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত কেটে দাঁতের মধ্যে ফাঁক তৈরি করে এবং যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে। (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহু বলেন,) আমি কেন তাদেরকে অভিসম্পাত করব না, যাদেরকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন! [১]

উক্তির মাধ্যমে মূলত মুখ ও হাতের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে অনেক আবার নারীরা তাদের প্রায় সারা শরীরে উক্তি আঁকত। কেউ কেউ আবার বিভিন্ন মূর্তি, নির্দশন ও অক্ষর শরীরে আঁকিয়ে নিত। যেমন : খ্রিস্টানরা তাদের হাতে, বুকে ক্রুশের ট্যাটু আঁকায়। এসব ট্যাটু ও উক্তির শারয়ি অবৈধতা ছাড়াও শারীরিকভাবেও কষ্ট হয়। সুই দিয়ে শরীরে বারবার ছিঁড়ি করা হচ্ছে, আধুনিক সময়ে এসে দেওয়া হচ্ছে বিষাক্ত সব ক্যামিকেল; এ কারণে মূলত উক্তিকারী এবং যে উক্তি করাতে চায়, দুজনই অভিসম্পাতের উপযুক্ত।

যে দাত সরু করে এবং যে করাতে বলে তাদের সবার ওপরে নবিজির লানত। যে নারী এসব কাজ করে এবং যে করায় দুজনই অভিশপ্ত। কোনো পুরুষ এসব কাজ করলে সে আরো আগে এই অভিসম্পাতের ভাগিদার হবে।

সুচালোকারী নারীর মতো দাঁত কেটে কৃত্রিমভাবে দাঁত ফাঁকাকারীর প্রতিও আল্লাহ তাআলা অভিসম্পাত বর্ষিত হয়।

وَالْمُتَقْلِبَاتِ لِلْخُسْنِ ، الْمُغَيْرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى

(আল্লাহ অভিসম্পাত বর্ণন করেন) যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত কেটে দাঁতের মধ্যে ফাঁক তৈরি করে এবং যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে। [২]

সৃষ্টিগতভাবেই অনেক নারী এমন ফাঁকা দাঁত নিয়ে জন্মায়, আবার অনেকের দাঁত এমন ফাঁকা থাকে না। এই দ্বিতীয় শ্রেণির নারীরা কৃত্রিমভাবে তাদের দাঁত ফাঁকা করার চেষ্টা করে থাকে। এটি এক ধরনের প্রতারণা ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি। এমন প্রতারণা বা বাড়াবাড়ি কোনোটাই ইসলাম সমর্থন করে না।

[১] সহিল বুখারি : ৫৯৩১; সহিহ মুসলিম : ২১২৫

[২] সহিল বুখারি : ৫৯৩১; সহিহ মুসলিম : ২১২৫

এসব বিশুদ্ধ হাদিস থেকে সৌন্দর্য বর্ধনের নামে আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারির বিধানও স্পষ্ট হয়ে যায়। অধুনা পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতার চাপে মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যের নামে যাচ্ছেতাই করার মানসিক অসুস্থতা তুকে পড়েছে। নাক-কান, চোখ-মুখ-সহস্রন ইত্যাদির আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে সুন্দর থেকে সুন্দরতর হওয়ার এক অদ্যম বাসনা তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়ায়। অস্ত্রোপচারের পেছনে তারা কাঢ়ি কাঢ়ি টাকা খরচ করেন। এগুলো যারা করে, সবাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভিসম্পাতের আওতাভুক্ত হবে। কারণ, এমন কাজ শুধু তারাই করতে পারে, যারা মন নয়, বরং দৈহিক সৌন্দর্য নিয়ে পড়ে আছে। ভেতর নয়, বরং বাহির নিয়ে চিন্তিত। আত্মা নয়, বরং দেহ ও মুখচুবি বিষয়ে সীমাত্তিরিক্ত সচেতনতায় লিপ্ত।

তবে যদি কারো এমন বিরল রোগ থাকে, যেমন অতিরিক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং এতে বিভিন্ন সময় তার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট হয়, তাহলে এর চিকিৎসায় কোনো বাধা-নিষেধ নেই। যতদিন এটি তার জন্য কষ্টের কারণ হবে, ততদিন সে এর চিকিৎসা করাতে পারবে। দীন আমাদের জন্য কোনো বোৰা নয়, বোৰা হলো—আমাদের অসুস্থ মানসিকতা।

অতিরিক্ত আঙুল কেটে ফেলার মৌন সমর্থন পাওয়া যায় সৌন্দর্যের জন্য দাঁত ফাঁকাকারীদের প্রতি অভিসম্পাতের হাদিস থেকে। সেটা কীভাবে ব্যাখ্যা করছি—এই হাদিস থেকে বোৰা গেল, সৌন্দর্যের জন্য দাঁত ফাঁকা করা হলো নিন্দনীয়, কিন্তু অসুস্থতা বা কোনো ক্ষতিকর বিষয় থেকে বাঁচতে দাঁত ফাঁকা করা হলে সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না। আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন।

### ভু প্লাক করা

সৌন্দর্যের জন্য নিষিদ্ধ একটি কাজ হলো—ভু চিকন বা প্লাক করা। ভু চিকন করার অর্থ হলো—ভু উঁচু বা সমান বানানোর জন্য ভুর কিছু পশম কেটে ফেলা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভু চিকনকারী এবং যার ভু চিকন করা হয় উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন। আবুল্লাহ ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

لَعْنَ اللَّهُ الْوَآشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالنَّاِمَصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَقْلِبَاتِ لِلْخُسْنِ  
الْمُغَيْرَاتِ خَلْقُ اللَّهِ

আল্লাহ অভিসম্পাত বর্ষণ করুন সেসব নারীর ওপর, যারা (অন্যদের) শরীরে উল্কি অঙ্কন করে দেয় এবং যারা নিজেদের শরীরে উল্কি অঙ্কন করায়, যারা (অন্যদের) মুখের চুল-ভু তুলে দেয় এবং যারা নিজেদের মুখের চুল-ভু উপড়ে ফেলে, যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত কেটে দাঁতের মধ্যে ফাঁক তৈরি করে এবং যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে।<sup>[১]</sup>

ভু উপড়ে ফেলে তা চিকন করার নিষেধাজ্ঞা আরো অধিক কঠোর হবে, যদি এটি নির্লজ্জ, ফাসেক-ফুজ্জার ও অমুসলিম নারীদের ভূষণ হিসেবে কখনো নির্ধারিত হয়ে যায়।

হাস্তলি মাযহাবের কিছু আলিম বলেন, ভু ছাড়া মুখের অন্যান্য পশম উপড়ানো, পাউডার, ক্রিম, মেহেদি ইত্যাদি মেয়েরা ব্যবহার করতে পারবে স্বামীর অনুমতিক্রমে। কারণ, এগুলো সুভাবিক সৌন্দর্যের অংশ। মুখের পশম উপড়ানোর ক্ষেত্রে ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহর অবস্থান কিছুটা কঠোর। তার মতে মুখের পশমও উপড়ানো যাবে না। তার দৃষ্টিতে এটা ভু চিকন করার নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত। তবে ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহর ব্যাখ্যা তার এ কঠোর অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করে।

ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ এর ব্যাখ্যায় বলেন—

وَالثَّامِنَةُ: الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرْقَهُ

আর (হাদিসে উল্লেখিত) ‘নামিসা’ হলো সেই নারী, যে ভুর ওপর নকশা করে তাকে চিকন করে ফেলে।<sup>[২]</sup>

অতএব চেহারার পশম উপড়ে ফেলাটা ভু চিকন-বিষয়ক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়বে না।

আবু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহর স্ত্রী থেকে বর্ণিত—

أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ فِي وَجْهِي شَعَرَاتٍ أَفَأَنْتِفْهُنَّ أَتَزَرِّنُ بِذَلِكَ لِزَوْجِي ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمِيطِي عَنِّكِ الْأَذَى .

[১] সহিহ মুসলিম : ২১২৫; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৪৮৩৩

[২] সুনানু আবি দাউদ : ৪১৭০

তিনি আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহার কাছে উপস্থিত ছিলেন। তখন তাকে একজন নারী জিজ্ঞেস করল, হে উম্মুল মুমিনিন, আমার চেহারায় অনেক (অতিরিক্ত অবাঞ্ছিত) পশম আছে। আমি কি আমার স্বামীর জন্য সাজুগুজু করার উদ্দেশ্যে তা তুলে ফেলতে পারব? আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা বললেন, তোমার (চেহারা) থেকে এসব অবাঞ্ছিত পশম সরিয়ে ফেলো [১]

### কৃত্রিম চুলের ব্যবহার

সৌন্দর্য-সংশ্লিষ্ট নিষিদ্ধ বিষয়ের তালিকাভুক্ত আরেকটি বিষয় হলো, পরচুলা বা কৃত্রিম চুলের ব্যবহার। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম চুল উভয়টির ব্যবহারই নিষিদ্ধ। ইমাম বুখারি রাহিমাল্লাহ-সহ অনেকেই আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা, তার বোন আসমা রায়িয়াল্লাহু আনহা, ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহু, ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু ও আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু-সহ প্রমুখ সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন—

**لَعْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ**

যে নারী (অন্যের মাথায়) পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে নারী (নিজের মাথায়) পরচুলা লাগায়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সবাইকে অভিসম্পাত করেছেন [২]

যেখানে নারীদের জন্য পরচুলা বা আলগা চুল ব্যবহারের অনুমতি নেই, সেখানে পুরুষের জন্য এমন কিছুর অনুমতি দানের প্রশ্নই আসে না। পুরুষ যদি আলগা চুল লাগিয়ে দেয়, তাহলে তার তো গুনাহ হবেই, পাশাপাশি যেসব বালকরা মেয়েদের মতো হওয়ার জন্য বড় চুল ব্যবহার করে, তারা তো আরো আগে নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে।

.....

এ ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমনকি যার চুল পড়ে যাচ্ছে বা যে মেয়ে

[১] মুসামাফু আব্দির রায়ধাক : ৫১০৪; মুসলাদু ইবনিল জাদ : ৪৫১; হাদিসটির সনদ যইফ।

[২] সহিল বুখারি : ৫৯৪০; সহিহ মুসলিম : ২১২৪

## হালাল-হারামের বিধান

বিয়ের পিছিতে বসতে যাচ্ছে, তাকেও তিনি অন্যের চুল ব্যবহারের অনুমতি দেননি।

আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَرَوَجَتْ ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَطَ شَعْرُهَا ، فَأَرَادُوا أَنْ يَصْلُوهَا ،  
فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَعْنَ اللَّهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ

এক আনসারি নারীর বিয়ে হলো। এরপর সে রোগে আক্রান্ত হয়; ফলে তার চুল পড়ে গেল। লোকজন তাকে পরচুলা লাগিয়ে দেওয়ার ইচ্ছায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন ওই নারীকে, যে (নিজের মাথায়) পরচুলা লাগায় এবং যে (অন্যের মাথায়) পরচুলা লাগিয়ে দেয়।<sup>[১]</sup>

আসমা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا  
الْخَضْبَةُ ، فَأَمْرَقَ شَعْرُهَا ، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا ، أَفَأَصْلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: لَعْنَ اللَّهِ الْوَاصِلَةَ  
وَالْمَوْصُولَةَ

এক নারী নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল, হাম-গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে আমার এক মেয়ের মাথার চুল পড়ে গেছে। আমি তাকে বিয়ে দিয়েছি; এখন কি আমি তার মাথায় পরচুলা লাগিয়ে দেবো? তখন তিনি বললেন, আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন ওই নারীকে, যে (অন্যের মাথায়) পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে (নিজের মাথায়) পরচুলা লাগায়।<sup>[২]</sup>

সাইদ ইবনুল মুসাইরিব রাহিমাল্লাহ বর্ণনা করেন—

قَدِيمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ ، آخِرَ قَدْمَةِ قَدِيمَهَا ، فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ ، قَالَ: مَا كُنْتُ  
أَرِي أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ. يَعْنِي  
الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ

[১] সহিল বুখারি : ৫৯৩৪; সহিহ মুসলিম : ২১২৩

[২] সহিল বুখারি : ৫৯৪১; সহিহ মুসলিম : ২১২২

মুআবিয়া রায়িয়াল্লাহু আনহু শেষবারের মত যখন মদিনায় আসেন, তখন তিনি আমাদের সামনে খুতবা দিলেন। এরপর তিনি এক গোছা চুল বের করে বললেন, আমি ইহুদি ছাড়া অন্য কাউকে এ জিনিস ব্যবহার করতে দেখিনি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে অর্থাৎ পরচুলা ব্যবহারকারী নারীকে প্রতারক বলেছেন।[১]

হুমাইদ ইবনু আবির রহমান ইবনি আওফ রাহিমাল্লাহ থেকে বর্ণিত—

أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سَفْيَانَ ، عَامَ حَجَّ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَهُوَ يَقُولُ ، وَتَنَاؤلَ فُصَّةً  
مِنْ شَغْرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيْ : أَيْنَ عُلَمَاءُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَنْهَى عَنِ مِثْلِ هَذِهِ ، وَيَقُولُ : إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ جِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاءُهُمْ

তিনি হজের মওসুমে মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রায়িয়াল্লাহু আনহুমাকে মিস্তরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন। ওই সময় তিনি এক দেহরক্ষীর হাত থেকে একগুচ্ছ চুল নিজ হাতে নিয়ে বললেন, তোমাদের আলিমগণ কোথায়? আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ধরনের জিনিস (ব্যবহার করা) থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলতেন, বনি ইসরাইল তখনই ধ্বংস হয়েছে, যখন তাদের নারীরা এটা (পরচুলা) ব্যবহার করা আরম্ভ করেছে।'[২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পরচুলা ব্যবহারকারীকে ‘প্রতারক’ বলে অভিহিত করেছেন। এথেকে এটা ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞার কারণ স্পষ্ট হলো। পরচুলা বা আলগা চুলের ব্যবহার বস্তুত এক ধরনের প্রতারণা ও ধোঁকা। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই ইসলাম ধোঁকা ও প্রতারণার অনুমোদন দেয় না। প্রতারণামূলক সব ধরনের লেনদেন ইসলামে হারাম; সেই প্রতারণা হোক বস্তুগত বা অবস্তুগত। হাদিসে এসেছে—

وَمَنْ عَשَّنَا فَلَيْسَ مِنْا

| আর যে আমাদের সাথে প্রতারণা করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[৩]

[১] সহিলুল বুখারি : ৫৯৩৮; সহিহ মুসলিম : ২১২৭

[২] সহিলুল বুখারি : ৫৯৩২; সহিহ মুসলিম : ২১২৭

[৩] সহিহ মুসলিম : ১০১; মুস্তাদরাকুল হাকিম : ২১৫৫

বিখ্যাত হাদিস বিশারদ ও ব্যাখ্যাকার ইমাম খাতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘এসব বিষয়ে এত কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ারি আসার কারণ হলো দুটি। এক। এতে প্রতারণা ও ধোঁকার সুযোগ আছে। কোথাও যদি প্রতারণার সুযোগ বা ছাড় দেওয়া হয়, তাহলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতারণার দুয়ার খুলে যাবে। দুই। এতে সৃষ্টির বিকৃতি ঘটে। ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিসে ‘এরা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তনকারী’ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে’[১]

হাদিস থেকে বোবা গেল, চুলের সঙ্গে যদি পরচুলা বা আলগা চুল লাগানো হয়— হোক সেটা কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক—সেটা প্রতারণা ও ধোঁকার মধ্যে পড়বে। কিন্তু যদি চুলের সঙ্গে চুল ছাড়া অন্য কোনো কাপড়ের টুকরো, সুতা ইত্যাদি ব্যবহার করে, তাহলে সেটা এই নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না।

এ ব্যাপারে সাইদ ইবনু জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

لَا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ

| নারীদের জন্য রেশমি ও পশমী সুতার কৃত্রিম চুল ব্যবহারে দোষ নেই।[২]

### সাদা চুল

সৌন্দর্য-সংক্রান্ত আরেকটি বিষয় হলো—সাদা চুল বা দাঢ়ি রং করা। বর্ণিত হয়েছে, ইহুদি ও খ্রিস্টান কিতাবিগণ চুল রাঙানোকে অত্যন্ত দূরণীয় হিসেবে দেখত। তারা মনে করত, এগুলো ধার্মিকতা ও দ্বীন্দারির সাথে যায় না। তাদের পাদরি ও সন্ধ্যাসীদেরকে এভাবেই জীবনযাপন করতে দেখা যায়। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিনদেরকে তাদের আদর্শ ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে বারণ করেছেন, যাতে জীবনের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ক্ষেত্রে মুসলিমদের সুত্ত্ব বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র বজায় থাকে।

ইমাম বুখারি আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১] ফাতহুল বারি, ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩৮০

[২] সুনানু আবি দাউদ : ৪১৭১; বর্ণনাটি হাসান।

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ ، فَخَالِفُوهُمْ

| নিশ্চয়ই ইহুদি ও খ্রিস্টানরা (চুল ও দাঢ়িতে) রং লাগায় না; কাজেই তোমরা তাদের বিরোধিতা করো।[১]

এই নির্দেশটি অবশ্য মুস্তাহাব পর্যায়ের। সাহাবিদের অবস্থান থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। যেমন আবু বকর ও উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুমা প্রমুখ খিজাব লাগিয়েছেন, আবার অন্যদিকে আলি, উবাই ইবনু কাব, আনাস রায়িয়াল্লাহু আনহুম খিজাব ব্যবহার করেননি। খিজাব হিসেবে কী ব্যবহার করতে হবে? কালো খিজাব ব্যবহার করা যাবে কি?

অতিবৃদ্ধি, যার চুল-দাঢ়ি সব সাদা হয়ে গিয়েছে, তার জন্য কালো খিজাবের ব্যবহার উপযুক্ত নয়। এ কারণে মকাবিজয়ের দিন আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আনহু তার বাবা আবু কুহাফা রায়িয়াল্লাহু আনহুকে বহন করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে নিয়ে এলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাশফুলের মতো সাদা চুল-দাঢ়ির তাকিয়ে বললেন—

عَيْرُوا هَذَا بِشَيْءٍ ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

| একে (অর্থাৎ তার সাদা চুল-দাঢ়িকে) একটা কিছু দিয়ে পাল্টে দাও, তবে কালো রং থেকে দূরে থাকো।'[২]

কেউ যদি আবু কুহাফা রায়িয়াল্লাহু আনহুর বয়সি না হয়, তবে তার জন্য কালো খিজাব ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু শিহাব যুহরি রাহিমাল্লাহ বলেন, ‘যখন (আমাদের) চেহারা কঢ়ি ছিল, তখন আমরা কালো খিজাব ব্যবহার করতাম, কিন্তু যখন চেহারা শুক্র হলো ও দাঁত নড়বড়ে হয়ে গেল, তখন আমরা তা বর্জন করলাম।’[৩]

[১] সহিল বুখারি : ৫৮৯৯; সহিহ মুসলিম : ২১০৩

[২] সহিহ মুসলিম : ২১০২; সুনানু আবি দাউদ : ৪২০৪

[৩] ফাতহুল বারি, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ৩৫৫

কালো খিজাবের বৈধতার মতামত দিয়েছেন বেশ কিছু সালাফ। যেমন সাহবিদের মধ্যে সাদ ইবনু আবি ওয়াকাস, উকবাহ ইবনু আমির, হাসান, হুসাইন ও জারির রায়িয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ। আবার একদল আলিম কেবল জিহাদের ময়দানে শত্রুদেরকে ভীতি প্রদর্শন ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে কালো খিজাব ব্যবহার বৈধ মনে করেন না।<sup>[১]</sup>

আবু যর রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে—

إِنَّ أَخْسَنَ مَا عُتِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْءُ الْجِنَاءُ، وَالْكَتَمُ

| নিশ্চয়ই এ বার্ধক্যের শুভতা পরিবর্তনের সবচেয়ে উত্তম রং হলো মেহেদি ও  
কাতাম (কালো রং নিঃসারক উত্তিদ)।<sup>[২]</sup>

আনাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

وَقَدْ اخْتَصَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْجِنَاءِ وَالْكَتَمِ وَاخْتَصَبَ عُمَرُ بِالْجِنَاءِ بَعْثَةً

আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আনহু মেহেদি ও কাতাম (কালো রং নিঃসূতকারী উত্তিদ) দ্বারা খিজাব ব্যবহার করেছেন আর উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু শুধু মেহেদি দ্বারা খিজাব ব্যবহার করেছেন।<sup>[৩]</sup>

### দাঢ়ি বড় হতে দিন

আমাদের আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুতর্পূর্ণ একটি বিষয় হলো দাঢ়ি বড় রাখা। এ ব্যাপারে সহিল বুখারিতে ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু সূত্রে একটি হাদিসে

[১] এটাই অধিকাংশ ফকিহগণের মাযহাব। হানাফি, মালিকি, শাফিয়ি ও হাস্বলি মাযহাব মতে, কালো খিজাব ব্যবহার করা নাজায়িয়। তবে নাজায়িয়ের মাত্রা নিয়ে তাদের মাঝে সামান্য মতপার্থক্য আছে। সুতরাং হানাফি, মালিকি ও হাস্বলি মাযহাব মতে এখানে নাজায়িয় বলতে মাকরুহে তাহরিমি, আর শাফিয়ি মাযহাব মতে, এটা হারাম। তবে সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, শত্রুপক্ষকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদদের জন্য কালো খিজাব ব্যবহারের অনুমতি আছে। [আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৮০-২৮১]

[২] সুনানু আবি দাউদ : ৪২০৫; জামিউত তিরমিয়ি : ১৭৫৩; হাদিসটি সহিহ।

[৩] সহিহ মুসলিম : ২৩৪১; মুসনাদু আহমাদ : ১১৯৬৫

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

**خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ: وَقُرُّوا اللَّحْيَ، وَأَحْفُوا الشَّوَّارِبَ**

| তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করে দাঢ়ি বৃণ্ণি করো এবং গোঁফ ছেঁটে ফেলো।<sup>[১]</sup>

এখানে দাঢ়ি বৃণ্ণি করার অর্থ হলো দাঢ়ি না কেটে বড় হতে দেওয়া। যেমন : অন্য বর্ণনায় এসেছে—

**اَنْهَكُوا الشَّوَّارِبَ، وَأَغْفُوا اللَّحْيَ**

| তোমরা গোঁফ অধিক ছেঁট করো এবং দাঢ়ি ছেঁড়ে দাও (বড় রাখো)।<sup>[২]</sup>

দাঢ়ি বড় রাখার কারণটিও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তা হলো—মুশরিকদের বিরোধিতা। এখানে মুশরিক বলতে অগ্নিপূজারীদের বোঝানো হয়েছে।<sup>[৩]</sup> তাদের কেউ কেউ দাঢ়ি ছেঁটে ফেলত আর কেউ কেউ দাঢ়ি শেইভ করত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরোধিতার নির্দেশ দিয়েছেন, যেন মুমিনগণ ভেতর-বাহির সব দিক থেকে আলাদা স্বাতন্ত্র্য নিয়ে গড়ে ওঠে। পাশাপাশি দাঢ়ি শেইভ করাটা হলো পুরুষের সুভাব-বিরুদ্ধ একটি কাজ, যার মাধ্যমে নারীর সঙ্গে সাদৃশ্য তৈরি হয়। তাই ইসলামের মেজাজ ও বিধিবিধানের সঙ্গে এটি খাপ খায় না।

দাঢ়ি বড় রাখার মানে এই নয় যে, দাঢ়ি একেবারে কাটা যাবে না। নইলে তো আবার দাঢ়ি অতিরিক্ত লস্বা হয়ে বিশ্রী দেখা যাবে। তাই অতিরিক্ত লস্বা হয়ে গেলে সামনের ও পাশের অংশ থেকে কিছু অংশ কেটে ফেলবে। যেমনটি জামিউত

[১] সহিল বুখারি : ৫৮৯২; সহিহ মুসলিম : ২৫৯

[২] সহিল বুখারি : ৫৮৯৩; সহিহ মুসলিম : ২৫৯

[৩] অন্য হাদিসে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন : সহিহ মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে—

**جُزُّوا الشَّوَّارِبَ وَأَرْخُوا اللَّحْيَ خَالِفُوا الْمُجْوَسَ**

তোমরা গোঁফ কেটে এবং দাঢ়ি লস্বা করে অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করো। [সহিহ মুসলিম : ২৬০; মুসনাদ আহমাদ : ৮৭৮৫]

তিরমিয়ির একটি হাদিসে পাওয়া যায় [১] অনেক পূর্ববর্তী আলিমও এভাবে কেটে ফেলতেন।

কাষি ইয়ায রাহিমাল্লাহু বলেন, ‘দাঢ়ি শেইভ করা, ছেটে ফেলা ও অতিরিক্ত ছেট করে ফেলা মাকরুহ। তবে দাঢ়ি বেশি বড় হয়ে গেলে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ থেকে কিছু অংশ কেটে ফেললে, আর এতে কোনো সমস্যা নেই’ [২]

আবু শামাহ রাহিমাল্লাহু বলেন, অগ্নিপূজকরা তো দাঢ়ি (ছেট করার জন্য) ছেট ফেলতো। কিন্তু বর্তমানে কিছু মানুষ উদ্ভৃত হয়েছে, যারা দাঢ়ি একেবারে মুণ্ডিয়ে ফেলে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এরা অগ্নিপূজকদের চেয়েও জব্বন্য।

আমি বলি, বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মুসলিমই দাঢ়ি শেইভ করে তাদের দেশীয় উপনিবেশ চালানো ইহুদি-খ্রিস্টান শক্তির অনুকরণে। সাধারণত পরাজিতরা যেভাবে বিজয়ীদের সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করে ফেলে, সেভাবে এসব মুসলিমরাও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ ভুলে তাদের অনুসরণে মজে আছে।

বহু ফকিরের মত হলো দাঢ়ি শেইভ করা হারাম। তাদের প্রমাণ হলো—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, দাঢ়ি ছেড়ে দিতে। আর নির্দেশ মাত্রই অপরিহার্যতা বোঝায়। তাছাড়া এখানে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১] জামিউত তিরমিয়িতে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

أَنَّ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحَيَّتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَظُولِهَا

অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৈয়ে-প্রস্থে দুদিকে তার (অতিরিক্ত অংশের) দাঢ়ি ছাটতেন।’ [জামিউত তিরমিয়ি : ২৭৬২] তবে এ হাদিসটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা, এতে উমার ইবনু হারুন নামক একজন বর্ণনাকারী আছে, যাকে মুহাদ্দিসিনে কিরাম মাতৃক (পরিত্যক্ত) বর্ণনাকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন। সুতরাং এ হাদিসটি অত্যন্ত দুর্বল। একমুঠির অতিরিক্ত দাঢ়ি ছেটে ফেলার ব্যাপারে সবচেয়ে বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুর আমল থেকে। সহিল বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে—

وَكَانَ أَبْنُ عُمَرٍ إِذَا حَجَّ أَوْ اغْتَمَرَ قَبْصَ عَلَى لِحَيَّتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَحَدَهُ

অর্থাৎ ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুর যখন হজ বা উমরা করতেন তখন তিনি তার দাঢ়ি মুক্তি করে ধরতেন এবং মুক্তির বাইরে যতটুকু বেশি থাকত, তা কেটে ফেলতেন।’ [সহিল বুখারি : ৫৮৯২] এ বর্ণনার ভিত্তিতে অনেক আলিম বলেন, একমুঠি পর্যন্ত দাঢ়ি রাখা ওয়াজিব, এর কম হলে দাঢ়ি কাটার কোনো অবকাশ নেই। তবে একমুঠির অতিরিক্ত হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত অংশটুকু কেটে ফেলার অনুমোদন আছে; যেমনটি ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুর আমল থেকে প্রমাণিত হয়।

[২] ফাতহুল বারি, খণ্ড : ১০; পৃ ; ৩৫০

ওয়া সাল্লাম কারণ হিসেবে মুশরিকদের বিরোধিতার কথাও উল্লেখ করেছেন। আর ইসলামি শরিয়তে (পোশাক-পরিচ্ছদ ও চাল-চলনে) যথাসম্ভব কাফিরদের বিরোধিতাও আবশ্যিক। পূর্ববর্তী কোনো মনীষীর ব্যাপারেই একথা পাওয়া যায় না যে, তিনি দাড়ি শেইভ করেছেন কিংবা এই আবশ্যিকীয় বিধান পরিত্যাগ করেছেন।

বর্তমান সময়ের কিছু আলিম চারপাশের অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দাড়ি শেইভ করাকে বৈধতা দিতে চান। যেহেতু প্রচুর মানুষ লিপ্ত হচ্ছে; তাই তারা বলতে চান, এটি অনেকের সমস্যা। অতএব এখানে কিছুটা ছাড় ও অবকাশ থাকা দরকার। তারা আরো বলেন, দাড়ি রাখা কোনো শারয়ি বিষয় নয়, এটি বরং একটি অভ্যাসগত সামাজিক আচার।

কিন্তু সত্য কথা হলো, দাড়ির বিষয়টি এমন নয় যে, নবিজি সাল্লাম্বাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু দাড়ি রেখেই ক্ষান্ত হয়েছেন। তিনি তো কাফিরদের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে দাড়ি রাখার নির্দেশ করেছেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কাফিরদের বিরোধিতাও শরিয়ত-প্রণেতার একটি কঙ্কিত বাস্তবায়ন-যোগ্য নির্দেশ। বাইরে কারো সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রাখলে ধীরে ধীরে তার প্রতি ভেতরেও ভালোবাসা, আকর্ষণ ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়, এটি একটি বাস্তব বিষয়।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘সকল ক্ষেত্রে কাফিরদের বিরোধিতা, তাদের সাদৃশ্য গ্রহণের নিষিদ্ধিতার বিষয়টি কুরআন, হাদিস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। যারা বাইরের চলাফেরায় অমুসলিমদের অনুসরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তারা ধীরে ধীরে অন্তরের দিক থেকেও অমুসলিমদের অনুসরণ করতে শুরু করে। তাদের মধ্যে একসময় বিধৰ্মীদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, নিন্দনীয় কাজকর্ম ও আকিদা-বিশ্বাসের অনুকরণ-চাহিদা তৈরি হয়। কখনো কখনো এসব সামান্য সাদৃশ্যের ক্ষতি ও অকল্যাণ খোলা চোখে ধরা পড়ে না, কিন্তু এর সুদূরপ্রসারী ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব একটা ব্যাপার। যেখানেই এ ধরনের কোনো বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম লুকায়িত আছে, সেখানে শরিয়ত-প্রণেতা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে সেটি হারাম করে দিয়েছেন।’<sup>[১]</sup>

এখন পর্যন্ত আমরা দাড়ি শেইভ করার ব্যাপারে তিনটি বক্তব্য পেয়েছি। একটি বক্তব্য

[১] ইকতিজাউস সিরাতিল মুস্তাকিম : ৫৪৮

হলো, দাড়ি শেইভ করা সম্পূর্ণ হারাম। ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ-সহ অনেকের বক্তব্য এমন। দ্বিতীয় বক্তব্য হলো, এটা মাকরুহ। এই বক্তব্যটি ফাতহুল বারিতে ইমাম খাত্বাবি রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। তৃতীয় বক্তব্য হলো, এটা বৈধ। এই মতামত হলো অধুনা কিছু আলিমের [১]

সম্ভবত দ্বিতীয় বক্তব্যটিই সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও কুরআন হাদিসের কাছাকাছি [২] কারণ, হাদিসের নির্দেশটি অকাট্যভাবে আবশ্যক বোঝায় না; যদিও সেখানে কাফিরদের বিরোধিতার কারণ যুক্ত হয়েছে। এর কাছাকাছি আরেকটি বিধান হলো সাদা মাথায় খিজাবের ব্যবহার, সেখানেও ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিরোধিতার কারণ যুক্ত হয়েছে, কিন্তু আমরা দেখি সাহাবাদের কেউ কেউ খিজাব ব্যবহার করেছেন, আবার কেউ কেউ করেননি। এথেকে বোঝা যায়—খিজাব ব্যবহারের নির্দেশটি ছিল মুস্তাহব পর্যায়ের। একথা সত্য যে, পূর্বসূরিদের কারো থেকে দাড়ি শেইভের বিষয়টি পাওয়া যায়নি। এর কারণ হয়তো তাদের দাড়ি শেইভের কোনো প্রয়োজনই ছিল না বা দাড়ি রাখাটাই ছিল তাদের কাছে স্বাভাবিক।

[১] বস্তুত দাড়ি মুভানোর ব্যাপারে ফকিহগণের দুটি মত পাওয়া যায়। এক. হানাফি, মালিকি ও হাস্বলি মাযহাবের ফকিহগণের মত হলো, এটা হারাম। শাফিয়ি মাযহাবেরও এক মতানুসারে এটা হারাম; যেমনটি জহুর ফকিহগণ বলেছেন। দুই. শাফিয়ি মাযহাবের বিশুদ্ধতম মত হলো, এটা হারাম না, তবে মাকরুহ (যা হারামের নিকটবর্তী)। [রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪১৮; আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া, খণ্ড : ৩৫, পৃষ্ঠা : ২২৫-২২৬]

প্রথকার ড. ইউসুফ কারযাবি রাহিমাহুল্লাহ তৃতীয় যে মতটির কথা উল্লেখ করেছেন তা মূলত পূর্ববর্তী কোনো ফকিরের মত নয়; বরং এটা হলো আধুনিক সময়ের কিছু আলিমের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন মত, যা কোনোভাবেই আমলযোগ্য ও প্রহণযোগ্য নয়। ইমাম ইবনু হুমাম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—

وَمَا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمُغَارِبَةِ وَمُحْتَدَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبَخْ أَحَدٌ

অর্থাৎ একমুষ্টির কমে দাড়ি কাটা; যেমনটি কিছু পশ্চিমারা ও নারীসুলভ পুরুষরা করে থাকে—এটাকে কেউই বৈধ বলেননি। [ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৪৮]

অতএব ‘তৃতীয় মত’ থাকার অভিহাতে বিষয়টিকে হালকা ভাবার কোনো অবকাশ নেই। বাস্তবতা হলো, ‘তৃতীয়’ মতটি বিচ্ছিন্ন কোনো মত ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রসিদ্ধ ফকিহগণের মধ্যে ইখতিলাফ তো শুধু এটা নিয়ে যে, একমুষ্টির কমে দাড়ি কাটা হারাম নাকি মাকরুহ। শাফিয়ি মাযহাবের দুটি মতের মধ্যে বিশুদ্ধতম মত হলো, এটা মাকরুহ। আর এর বিপরীতে হানাফি, মালিকি ও হাস্বলি মাযহাব-সহ উম্মাহর অধিকাংশ ফকিহগণের মত হলো এটা হারাম। তাই একমুষ্টির কম দাড়ি কাটা কোনো অবস্থাতেই জারিয় হবে না।

[১] প্রথকার যদিও শাফিয়ি মাযহাবের মতানুসারে মাকরুহ হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কিন্তু দলিলের দিকে থেকে এ মাসআলায় হারাম হওয়ার মতটিই অধিক শক্তিশালী ও বেশি প্রহণযোগ্য, যা অধিকাংশ ফকিরের মাযহাব।

## ঘর-বাড়ি-বাসস্থান

প্রাকৃতিক ও চারপাশের বৈরিতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যেখানে আশ্রয় নেয়, সেটা হলো বাসস্থান ও ঘর। ঘর সম্পর্কে সবার মধ্যে আলাদা আপন-আপনবোধ কাজ করে। ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সবার মধ্যে মুক্ত ও ভারহীন ভাব এসে পড়ে। এখানে এলেই আমাদের দেহ-মন প্রশান্ত হয়। এ জন্য আল্লাহ তাআলা একে আমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ হিসেবে প্রকাশ করে বলেন—

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا...  
⊗

আল্লাহ তাআলা তোমাদের ঘরগুলোতে তোমাদের জন্য রেখেছেন প্রশান্তি [১]

প্রশংস্ত ঘর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিক পছন্দনীয় ছিল। তার কাছে পার্থিব সৌভাগ্যের মৌলিক উপাদানের একটি হলো ঘর। তিনি চারটি বিষয়কে সুখের উপকরণ বলে অভিহিত করে বলেছেন—

أَرْبَعٌ مِّنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحةُ ، وَالْمَسْكُنُ الْوَاسِعُ ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْكَبُ  
الْفَقِيرُ

চারটি জিনিস সৌভাগ্যের বিষয়। সেগুলো হলো—এক. সৎ স্ত্রী। দুই. প্রশংস্ত বাসস্থান। তিনি. ভালো প্রতিবেশী। চার. আরামদায়ক বাহন [২]

আবু মুসা আশআরি রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَئِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَضَّأَ ، فَسَمِعْتُهُ يَدْعُو يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي  
ذَنْبِي ، وَوَسْعَ لِي فِي دَارِي ، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي . قَالَ : فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، لَقَدْ سَمِعْتُكَ  
تَدْعُو بِكَذَا وَكَذَا قَالَ : وَهَلْ تَرْكَنَ مِنْ شَيْءٍ ؟

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম, তখন তিনি ওয়ু করছিলেন। তারপর আমি তাকে এ দুআটি বলতে শুনলাম, ‘হে আল্লাহ,

[১] সুরা নাহল, আয়াত : ৮০

[২] সহিলু ইবনি হিবান : ৪০৩২; হিলইয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৩৮৮; হাদিসটি সহিল।

আমার গুনাহ মাফ করুন, আমার ঘরে প্রশস্ততা দান করুন এবং আমার রিয়িকে বারাকাহ দান করুন।' আবু মুসা আশআরি রায়িয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর নবি, আমি আপনাকে এমন এমন দুআ বলতে শুনলাম! (এ দুআতে এমন কী আছে যে, আপনি এটা এত বেশি বেশি পাঠ করেন?) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি মনে করো যে, এ দুআ (দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকর) কোনো কিছু বাদ দিয়েছে? [১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ঘর-বাড়ির আঙিনা থাকত খুবই নোংরা। বৈরাগ্যের দোহাই দিয়ে তারা এসব পরিষ্কার করত না। কিন্তু ইসলামে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ধারণা অত্যন্ত মজবুত। মুমিনরা যাতে পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যত্নবান থাকে, তাদের বিষয়ে যেন সবাই সুধারণা পোষণ করে, তাই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর-বাড়ি, আঙিনা ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে ভীষণ রকম উৎসাহ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ ، طَيِّبٌ يُحِبُّ  
الْطَّيِّبِ فَنَظِفُوا أَفْنِيَتُكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوَا بِالْيَهُودِ تَجْمَعُ الْأَكْبَاءَ فِي دُورِهَا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পরিচ্ছন্ন, তাই পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। তিনি দানশীল, তাই দানশীলতা পছন্দ করেন। তিনি মহানুভব, তাই মহানুভবতা পছন্দ করেন। তিনি পবিত্র, তাই পবিত্রতা পছন্দ করেন। অতএব, তোমরা তোমাদের ঘরসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো এবং ইহুদিদের সঙ্গে সাদৃশ্য গ্রহণ কোরো না, যারা নিজেদের ঘরে ছাই-আবর্জনা জমা করে রাখে। [২]

### বিলাসিতা ও পৌত্রলিকতা

নানারকম বৈধ নকশা ও সাজসজ্জা দিয়ে ঘর-বাড়ি সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে কোনো সমস্যা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

[১] আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ি : ১৮২৮; আমালুল ইয়াইমি ওয়াল লাইলাহ, ইবনুস সুন্নি : ২৮; আদ-দুআ, তাবারানি : ৬৫৬; হাদিসটি সহিহ।

[২] আল-কুনা ওয়াল-আসমা, দুলাবি : ১২০৩; মুসনাদু আবি ইয়ালা : ৭৯০; জামিউত তিরমিয়ি : ২৭৯৯; হাদিসটির সনদ যইফ, তবে হাদিসটির মূল কথাগুলো অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

৩٦ ۖ قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ...

বলুন, আল্লাহর তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব সৌন্দর্যোপকরণ ও উৎকৃষ্ট  
জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন, কে তা হারাম করেছে? [১]

একজন মুসলিমের জন্য তার ঘর-বাড়ি, কাপড়চোপড়, জুতা ইত্যাদি জিনিসপত্রে  
সৌন্দর্যের প্রতি খেয়াল রাখাতে কোনো বাধা-নিষেধ নেই। নবিজি সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبِيرٍ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ  
يَكُونَ تَوْبَةً حَسَنًا وَنَعْلَةً حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبِيرُ بَطَرُ الْحَقِّ،  
وَعَمِطُ النَّاسِ

যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জানাতে প্রবেশ করবে না। এক  
ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, কেউ এটা পছন্দ করে যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার  
জুতা সুন্দর হোক! (এটা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না?) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন।  
প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে দণ্ডভরে সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ  
জ্ঞান করা। [২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَكَانَ رَجُلًا جَمِيلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي  
رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَيَّ الْجَمَالُ، وَأُغْطِيَتُ مِنْهُ مَا تَرَى، حَتَّىٰ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْوَقَنِي أَحَدٌ، إِنَّمَا قَالَ:  
إِشْرِاكٌ نَعْلِيٌّ، وَإِنَّمَا قَالَ: يُشِينُنِي نَعْلِيٌّ، أَفَمِنَ الْكِبِيرِ ذَلِكَ؟ قَالَ لَا، وَلَكِنَّ الْكِبِيرَ مَنْ بَطَرَ  
الْحَقَّ، وَعَمِطَ النَّاسَ

একদা এক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলো। লোকটি  
ছিল সুন্দর। সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমার কাছে সৌন্দর্য খুবই প্রিয়।

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ৩২

[২] সহিহ মুসলিম : ৯১; জামিউত তিরমিয়ি : ১৯৯৯

আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। এদিক দিয়ে কেউ আমার ওপর শ্রেষ্ঠত অর্জন করুক তা আমি পছন্দ করি না। এমন কি কেউ যদি বলে, আমার জুতার ফিতার চেয়ে তার জুতার ফিতাটা ভালো, সেটাও পছন্দ করি না। এরূপ করা কি অহংকারের অন্তর্ভুক্ত? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, না; বরং প্রকৃত অহংকার তো হলো, সত্যকে অসীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।<sup>[১]</sup>

### সোনা-রূপার পাত্র

কোনো কিছুতেই বাড়াবাড়ি ইসলাম সমর্থন করে না। তাই কুরআনে নিষিদ্ধ ও সমালোচিত বিলাসিতা ও অপচয় কোনো মুসলিম করুক, সেটা ইসলামের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনোই সহ্য করবেন না। তাছাড়া ইসলাম কখনো চাইবে না, কারো ঘরে চিত্র-প্রতিকৃতি, পৌত্রলিকতার প্রদর্শনী হোক। কারণ, ইসলাম তার জন্মলগ্ন থেকেই পৌত্রলিকতা ও মৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে।

এ জন্য কারো পক্ষে সোনা-রূপার পাত্র, নিরেট রেশমের বিছানা ব্যবহারের অনুমতি নেই। এই সীমালঙ্ঘনের বিষয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। সহিহ মুসলিমে উম্মু সালামা রায়িয়াল্লাহু আনহা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ شَرَبَ فِي إِنَاءٍ مِّنْ ذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ ، فَإِنَّمَا يُجَزِّرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِّنْ جَهَنَّمَ

যে বস্তি সোনা বা রূপা দ্বারা নির্মিত বাসনে পান করে সে তো কেবল তার পেটে জাহানামের অগ্নিই প্রবেশ করায়।<sup>[২]</sup>

সহিহ বুখারিতে হুয়াইফা রায়িয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

نَهَاَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَأَنْ تَأْكُلَ فِيهَا ،  
وَعَنْ لَبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيَّاجِ ، وَأَنْ تَجْلِسَ عَلَيْهِ

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৪০৯২; সহিহু ইবনি হিবান : ৫৪৬৭; হাদিসটি সহিহ।

[২] সহিহ মুসলিম : ২০৬৫; সহিহু ইবনি হিবান : ৫৩৪২

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি মোটা ও চিকন রেশমি বস্ত্র পরিধান করতে ও তাতে উপবেশন করতে নিষেধ করেছেন [১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا تَنْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيَبَاجَ ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي  
صِحَافِهَا ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ

তোমরা রেশম বা রেশমজাত কাপড় পরিধান কোরো না এবং সোনা ও রূপার পাত্রে পান কোরো না এবং এগুলোর বাসনে আহার কোরো না। কারণ এগুলো তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) জন্য দুনিয়াতে, আর তোমাদের জন্য রয়েছে আখিরাতে [২]

এগুলোর ব্যবহার যেহেতু নিষিদ্ধ, তাই হাদিয়া বা উপহার হিসেবে গ্রহণও নিষিদ্ধ। এসব বিলাসী বস্তু থেকে একজন মুসলিমের ঘরকে মুক্ত রাখাই যেহেতু এই বিধানের উদ্দেশ্য, তাই এই নিষেধাজ্ঞা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

ইমাম ইবনু কুদামা রাহিমাল্লাহ এ ব্যাপারে অত্যন্ত চমৎকার বলেছেন, ‘হাদিসের ব্যাপকতার ভিত্তিতে বিলাসী বস্তু-সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান। এগুলো নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো—অপচয়, অহংকার ও দরিদ্রদের মনঃকষ্ট। এই বিষয়গুলো দুই শ্রেণিৰ মধ্যেই পাওয়া যায়। স্বামীৰ মনোরঞ্জনেৰ জন্য নারীৰ সুর্ণালংকার ব্যবহারেৰ অনুমতি একটি ব্যতিকৰ্মী বিধান। সুর্ণ ব্যবহারেৰ অনুমতি তাই নির্দিষ্ট ক্ষেত্ৰেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আপত্তি উঠতে পারে—বিষয়টি যদি এমনই হয়, যেমনটা আপনারা বলছেন, তাহলে হীরার অলংকার ও আসবাবপত্রও তো হারাম হওয়াৰ কথা! অথচ সেগুলো তো হারাম নয়, আর এগুলো তো সোনা-রূপার চাইতেও দামি? এৱ উত্তোলন কৰতে পারে, হীরে-জহুরত এগুলোৰ মূল্য দরিদ্ৰৰা তেমন একটা জানে না, তাই এতে তাৰা কষ্ট পাৰে না। তাছাড়া এসব জিনিস এতো

[১] সহিল বুখারি : ৫৮৩৭; মুসনাদু আহমাদ : ২৩৪৩৭

[২] সহিল বুখারি : ৫৪২৬; সহিল মুসলিম : ২০৬৭

কম যে, ব্যাপকভাবে সবার এগুলো ব্যবহারের সুযোগও নেই।’[১]

পুরুষের জন্য সৃষ্টিকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লিখিত অর্থনৈতিক দিকটি সোনা-রূপাকে পাত্র ইত্যাদি হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরো অধিক ও স্পষ্টভাবে প্রযোজ্য। সোনা-রূপা হলো বৈশিক অর্থ তহবিল। এর দ্বারা মূলত সম্পদের মূল্য মাপা হয়, লেনদেন সহজ হয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে এগুলো নিয়ামত হিসেবে দিয়েছেন, যেন তারা এর দ্বারা লেনদেন করতে পারে, প্রয়োজনে এগুলো কাজে লাগায়; নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বানিয়ে ঘরের মধ্যে এগুলোকে অনর্থক ফেলে রাখার জন্য এগুলো মানুষকে দেওয়া হয়নি।

ইমাম গাযালি রাহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন, ‘দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ও দিনার (সুর্ণমুদ্রা) দিয়ে ঘরে ব্যবহার্য সোনা-রূপার পাত্র বানানো আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ অঙ্গীকারের নামান্তর। এটা অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয়ের চেয়েও জন্য ব্যাপার। একজন সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদাবান লোককে বন্দি বানিয়ে রাখার চেয়ে তাকে দিয়ে মুচি, ঝাড়ুদার এবং নিম্ন শ্রেণির কাজে খাটানো জন্যতর পর্যায়ের অপরাধ। মাটি, লোহা, সিসা ও তামা দিয়ে তৈরি তৈজসপত্র তরল পদার্থ এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র সংরক্ষণের কাজে আসে, অন্যদিকে সুর্ণ ইত্যাদি কেনাবেচার কাজে লাগে। সুর্ণ ইত্যাদি দিয়ে যদি তৈজসপত্র বানানো হয়, ঘরের প্রয়োজনীয় তরল পদার্থ সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তো মূল্য আদান-প্রদানের জন্য লোহা, সীসা, মাটি ও তামার জিনিসপত্র ব্যবহার করতে হবে; অথচ এগুলো কি সোনা-রূপার বিকল্প হতে পারবে? আমরা যে দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করলাম, সেই আলোচনা যদি কারো বুঝে না আসে, তাহলে তার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বক্তব্যই যথেষ্ট, ‘যে ব্যক্তি সোনা বা রূপা দ্বারা নির্মিত বাসনে পান করে, সে তো কেবল তার পেটে জাহানামের আগুনই প্রবেশ করায়।’[২]

সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে কোনো ধরনের জটিলতা ও সংকীর্ণতা তৈরি হয় না। কারণ, তৈজসপত্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য আরো অনেক বৈধ ও হালাল জিনিসপত্র রয়েছে। গাছ, মাটি, তামাসহ অন্যান্য খনিজ পদার্থ থেকে ঘরে তৈরি জিনিসপত্র বানানোর সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যদিকে তুলা, সূতা,

[১] আল-মুগনি, ইবনু কুদামা, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৭৪

[২] সহিহ মুসলিম : ২০৬৫; ইহইয়াউ উলুমিদিন, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৯২

কাতান-সহ বিভিন্ন উপাদান রয়েছে, যার থেকে বিছানা, বালিশ ইত্যাদি তৈরি হতে পারে।

### প্রতিকৃতির ব্যবহার হারাম

একজন মুসলিমের ঘরে কোনো ধরনের প্রতিকৃতির ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিষেধ। প্রতিকৃতি বলতে বোঝানো হয়েছে—দেহবিশিষ্ট প্রাণীর ভাস্কর্য। এসব প্রতিকৃতি ঘরে থাকলে সেখানে (রহমতের) ফেরেশতারা প্রবেশ করে না বলে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। ফেরেশতারা হলেন আল্লাহ তাআলার রহমত ও তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশক। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ

| নিশ্চয়ই (রহমতের) ফেরেশতারা এমন ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি-প্রতিকৃতি থাকে।[১]

ইমাম কুরতুবি রাহিমাল্লাহ বলেন, ‘যে ঘরে চিত্র থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ হলো, ছবি-প্রতিকৃতি সংরক্ষকের কাজের সঙ্গে কাফিরদের কাজের সাদৃশ্য রয়েছে। যেহেতু কাফিররা তাদের ঘরে চিত্র-মূর্তি রাখে এবং সেগুলোর সম্মান করে, আর ফেরেশতারা এসব জিনিস অত্যন্ত ঘৃণা করেন, তাই ঘৃণাবশত যে ঘরে ছবি-প্রতিকৃতি থাকে সে ঘরে তারা প্রবেশ করেন না।’[২]

ছবি-প্রতিকৃতি বানানো যেমন কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয়, তেমনি কোনো অমুসলিমকে তা শেখানোও বৈধ নয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوَّرُونَ

| নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার নিকট কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ কঠোর শাস্তিপ্রাপ্ত হবে ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণকারীগণ।[৩]

[১] সহিল বুখারি : ৫৯৫৮; সহিহ মুসলিম : ২১০৬

[২] ফাতহুল বারি, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ৩৯২

[৩] সহিল বুখারি : ৫৯৫০; সহিহ মুসলিম : ২১০৯

কম যে, ব্যাপকভাবে সবার এগুলো ব্যবহারের সুযোগও নেই।’<sup>[১]</sup>

পুরুষের জন্য সৃণালংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লিখিত অর্থনৈতিক দিকটি সোনা-রূপাকে পাত্র ইত্যাদি হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরো অধিক ও স্পষ্টভাবে প্রযোজ্য। সোনা-রূপা হলো বৈশিক অর্থ তহবিল। এর দ্বারা মূলত সম্পদের মূল্য মাপা হয়, লেনদেন সহজ হয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে এগুলো নিয়ামত হিসেবে দিয়েছেন, যেন তারা এর দ্বারা লেনদেন করতে পারে, প্রয়োজনে এগুলো কাজে লাগায়; নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বানিয়ে ঘরের মধ্যে এগুলোকে অনর্থক ফেলে রাখার জন্য এগুলো মানুষকে দেওয়া হয়নি।

ইমাম গায়লি রাহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন, ‘দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ও দিনার (সুর্ণমুদ্রা) দিয়ে ঘরে ব্যবহার্য সোনা-রূপার পাত্র বানানো আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ অসীকারের নামান্তর। এটা অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয়ের চেয়েও জ্বন্য ব্যাপার। একজন সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদাবান লোককে বন্দি বানিয়ে রাখার চেয়ে তাকে দিয়ে মুঢ়ি, ঝাড়ুদার এবং নিম্ন শ্রেণির কাজে খাটানো জ্বন্যতর পর্যায়ের অপরাধ। মাটি, লোহা, সিসা ও তামা দিয়ে তৈরি তৈজসপত্র তরল পদার্থ এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র সংরক্ষণের কাজে আসে, অন্যদিকে সুর্ণ ইত্যাদি কেনাবেচার কাজে লাগে। সুর্ণ ইত্যাদি দিয়ে যদি তৈজসপত্র বানানো হয়, ঘরের প্রয়োজনীয় তরল পদার্থ সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তো মূল্য আদান-প্রদানের জন্য লোহা, সীসা, মাটি ও তামার জিনিসপত্র ব্যবহার করতে হবে; অথচ এগুলো কি সোনা-রূপার বিকল্প হতে পারবে? আমরা যে দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করলাম, সেই আলোচনা যদি কারো বুঝে না আসে, তাহলে তার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বন্ধব্যই যথেষ্ট, ‘যে ব্যক্তি সোনা বা রূপা দ্বারা নির্মিত বাসনে পান করে, সে তো কেবল তার পেটে জাহানামের আগুনই প্রবেশ করায়।’<sup>[২]</sup>

সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে কোনো ধরনের জটিলতা ও সংকীর্ণতা তৈরি হয় না। কারণ, তৈজসপত্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য আরো অনেক বৈধ ও হালাল জিনিসপত্র রয়েছে। গাছ, মাটি, তামাসহ অন্যান্য খনিজ পদার্থ থেকে ঘরে তৈরি জিনিসপত্র বানানোর সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যদিকে তুলা, সুতা,

[১] আল-মুগানি, ইবনু কুদামা, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৭৪

[২] সহিহ মুসলিম : ২০৬৫; ইহইয়াউ উলুমিদিন, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৯২

কাতান-সহ বিভিন্ন উপাদান রয়েছে, যার থেকে বিছানা, বালিশ ইত্যাদি তৈরি হতে পারে।

### প্রতিকৃতির ব্যবহার হারাম

একজন মুসলিমের ঘরে কোনো ধরনের প্রতিকৃতির ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিষেধ। প্রতিকৃতি বলতে বোঝানো হয়েছে—দেহবিশিষ্ট প্রাণীর ভাস্কর্য। এসব প্রতিকৃতি ঘরে থাকলে সেখানে (রহমতের) ফেরেশতারা প্রবেশ করে না বলে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। ফেরেশতারা হলেন আল্লাহ তাআলার রহমত ও তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশক। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ

| নিশ্চয়ই (রহমতের) ফেরেশতারা এমন ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি-প্রতিকৃতি থাকে।<sup>[১]</sup>

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘যে ঘরে চিত্র থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ হলো, ছবি-প্রতিকৃতি সংরক্ষকের কাজের সঙ্গে কাফিরদের কাজের সাদৃশ্য রয়েছে। যেহেতু কাফিররা তাদের ঘরে চিত্র-মূর্তি রাখে এবং সেগুলোর সম্মান করে, আর ফেরেশতারা এসব জিনিস অত্যন্ত ঘৃণা করেন, তাই ঘৃণাবশত যে ঘরে ছবি-প্রতিকৃতি থাকে সে ঘরে তারা প্রবেশ করেন না।’<sup>[২]</sup>

ছবি-প্রতিকৃতি বানানো যেমন কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয়, তেমনি কোনো অমুসলিমকে তা শেখানোও বৈধ নয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوَّرُونَ

| নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার নিকট কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ কঠোর শাস্তিপ্রাপ্ত হবে ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণকারীগণ।<sup>[৩]</sup>

[১] সহিল বুখারি : ৫৯৫৮; সহিহ মুসলিম : ২১০৬

[২] কাততুল বারি, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ৩৯২

[৩] সহিল বুখারি : ৫৯৫০; সহিহ মুসলিম : ২১০৯

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

**أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ**

কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ কঠোর শাস্তিপ্রাপ্ত হবে ওই সকল লোক, যারা (প্রাণীর ছবি-প্রতিকৃতি বানিয়ে) আল্লাহর সৃষ্টি করা গুণের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে।<sup>[১]</sup>

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন—

**مَنْ صَوَرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحُ ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ**

যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ছবি-প্রতিকৃতি তৈরি করবে, কিয়ামত দিবসে তাকে এ সকল ছবি-প্রতিকৃতিতে জীবনদানের আদেশ করা হবে; অথচ তাতে সে জীবন দান করতে সক্ষম নয় (ফলে তাকে মর্মান্তিক শাস্তি দেওয়া হবে)।<sup>[২]</sup>

উদ্দেশ্য হলো—তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে এই ছবি-প্রতিকৃতির মধ্যে জীবন দেওয়ার জন্য; এই বাধ্যবাধকতা তার ওপর চাপানো হবে, তার অক্ষমতা প্রকাশ এবং শাস্তি প্রদানের জন্য।

### ছবি-প্রতিকৃতির ব্যবহার নিষিদ্ধ কেন?

[এক] নিষেধের পেছনে একটি কারণ (অনেকে মনে করে এটাই একমাত্র কারণ, তা ঠিক নয়) একত্বাদের বোধ যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও মূর্তিপূজকদের সাদৃশ্য থেকে মুমিনদের দূরে রাখা। মূর্তিপূজকরা বিভিন্ন ধরনের প্রতিকৃতি ও মূর্তি বানায়, সেগুলোর পায়ে মাথা ঠুকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানায়।

একত্বাদের বোধকে শিরকমুস্ত রাখার জন্য ইসলামের সতর্কতা ও সচেতনতা চূড়ান্ত পর্যায়ের। পূর্ববর্তী অনেক জাতির ঘটনাই আমাদের সামনে। প্রথম প্রথম তাদের ইচ্ছা ছিল স্মারক হিসেবে সৎ ও মহান ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি সংরক্ষণ।

[১] সহিল বুখারি : ৫৯৫৪; সহিহ মুসলিম : ২১০৭

[২] সহিল বুখারি : ৫৯৬৩; সহিহ মুসলিম : ২১১০

ধীরে ধীরে একসময় স্মারকগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জাপনের প্রচলন শুরু হয়ে গেল। আরো কিছু সময় পরে এসব মূর্তিগুলোকে তারা আল্লাহ তাআলার স্থানে বসিয়ে দিয়েছিল। ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরের পূজারিদের কথা তো কুরআনেই এসেছে।<sup>[১]</sup>

কোনো মন্দ জিনিস প্রতিহত করতে হলে সেই কাজে লিপ্ত হওয়ার সকল ফাঁক-ফোকর ইসলামে সৃষ্টিক্রিয়ভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। শিরকের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই ঘটেছে, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কোনো ধরনের শিরক এবং পৌত্রলিকতার সাথে সদৃশ কোনো কিছুই যাতে মুমিনদের মন ও মননে প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য শিরক-সংশ্লিষ্ট সব কিছুর সংরক্ষণই নিষিদ্ধ। বিশেষ করে ইসলাম যেহেতু কোনো এক বা দুই প্রজন্মের ধর্ম নয়; বরং কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য মনোনীত ধর্ম; তাই আশ্চর্যের কিছু নেই যে, এক সমাজে যেটা অগ্রহণযোগ্য, হতে পারে সেটি অন্য সমাজে সাদরে গৃহীত; বর্তমান যুগে যেটা অস্ত্রব, দূর বা নিকট ভবিষ্যতের কোনো যুগে যেটা বাস্তবও হতে পারে।

[১] যেমন পবিত্র কুরআনে তাদের বন্ধব বর্ণিত হয়েছে—

وَقَالُوا لَا تَدْرِنَ الْقَمَمَ وَلَا تَدْرِنَ وَدْأَ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغْوِثَ وَيَسْرِ

আর তারা (অর্থাৎ নুহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের লোকেরা) বলেছিল, তোমরা কখনো পরিত্যাগ কোরো না তোমাদের উপাস্যদেরকে; পরিত্যাগ কোরো না ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরকে। [সুরা নুহ, আয়াত : ২৩]

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম ফাকিহি রাহিমাহুল্লাহ-সহ প্রমুখ ইমাম বর্ণনা করেছেন, ‘ইবনু আবুস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেসব মূর্তি-প্রতিমার পূজা নুহ আলাইহিস সালামের কওমের মাঝে চালু ছিল, পরবর্তী সময়ে আরবদের মাঝেও সেগুলোর পূজা প্রচলিত হয়েছিল। ‘ওয়াদ’ নামক মূর্তিটি ছিল দুমাতুল জান্দাল এলাকায় কালব গোত্রের। ‘সুওয়া’ নামক মূর্তিটি ছিল হুয়ায়ল গোত্রের। ‘ইয়াগুস’ নামক মূর্তিটি ছিল মুরাদ গোত্রের, পরবর্তী সময়ে তা গাতিফ গোত্রের হয়ে যায়। এর আস্তানা ছিল সাবা কওমের নিকটবর্তী জাওফ নামক স্থানে। ‘ইয়াউক’ নামক মূর্তিটি ছিল হামাদান গোত্রের। আর ‘নাসর’ নামক মূর্তিটি ছিল যুলকালার অস্তর্গত হিমইয়ার গোত্রের। এসব নাম মূলত নুহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের কতিপয় পুণ্যবান লোকের নাম ছিল। তারা যখন মারা গেলেন তখন শয়তান তাদের কওমের লোকদের কাছে এসে এ প্ররোচনা দিল যে, তারা (আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও তাঁর স্মরণ করার জন্য) যেসব স্থানে বসত তোমরা সেসব মঙ্গলিসে তাদের কিছু ছবি-প্রতিকৃতি স্থাপন করো এবং ওই সমস্ত পুণ্যবান লোকের নামেই এগুলোর নামকরণ করো। ফলে তারা (শয়তানের ধোঁকায় প্রভাবিত হয়ে) তেমনটাই করল। কিন্তু (প্রথম প্রজন্মের লোকদের সময়) ওই সব ছবি-প্রতিকৃতির পূজা করা হতো না। এরপর যখন (ছবি-প্রতিকৃতি স্থাপনকারী প্রথম প্রজন্মের) লোকগুলো মারা গেল এবং ছবি-প্রতিকৃতিগুলোর ব্যাপারে (শরিয়তের) ইলম বিলুপ্ত হয়ে গেল তখন (পরবর্তী প্রজন্মের) লোকেরা সেসব ছবি-প্রতিকৃতির পূজা আরম্ভ করে দিল।’ [সহিল বুখারি : ৪৯২০; আখবারু মক্কা, ফাকিহি : ৭১]

[দ্বি] মৃৎশিল্পীর জন্য ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণ নিষিদ্ধ হওয়ার একটি কারণ তার শিল্পকর্মের প্রতি অতিমুগ্ধতা ও আত্মপ্রবঞ্চনা। একজন ভাস্কর শূন্য থেকে ধীরে ধীরে একটি প্রাণবন্ত ভাস্কর্য গড়ে তোলে। বহু সময় ও পরিশ্রম ব্যয়ের পর একটি নিখুঁত খোদাইকৃত মূর্তি নির্মাণ করে। সুন্দর একটি মূর্তি নির্মাণের পর ভাস্করের কাছে মনে হয়, নিজীব মাটির মধ্যে সে প্রাণ সঞ্চার করেছে, জীবন দিয়েছে! একটি বিখ্যাত ঘটনা আছে—এক ভাস্কর বহু শ্রম দিয়ে, দিনের পর দিন সময় দিয়ে একটি মূর্তি গড়ে। মূর্তিটি তৈরির পর ভাস্কর তার সৌন্দর্যে চূড়ান্ত রকমের মুগ্ধ হয়। মুগ্ধতার চরম আবেশে, আনন্দ ও বিস্ময়ে তার মুখ থেকে বের হয়ে এলো, ‘কথা বলো! এই, তুমি কথা বলো!’

এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ لَهُمْ: أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

যারা এ সকল (প্রাণীর) ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণ করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছিলে তাতে জীবন দান করো।<sup>[১]</sup>

হাদিসে কুদসিতে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنَ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخْلَقِي ، فَلَيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ شَعِيرَةً

আর ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম কে হতে পারে, যে আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে শুরু করে? পারলে সে একটা পিপড়া সৃষ্টি করুক কিংবা একটা শস্যদানা সৃষ্টি করুক কিংবা একটি যব সৃষ্টি করুক!<sup>[২]</sup>

[তিন] ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাতারা কোনো সীমা-পরিসীমা মেনে চলে না। অনেক সময় তারা নগ্ন ও অর্ধনগ্ন নারীদের ছবি-মূর্তি তৈরি করে। বিভিন্ন সময় তারা নানা

[১] সহিল বুখারি : ৫৯৫১; সহিহ মুসলিম : ২১০৮

[২] সহিল বুখারি : ৭৫৫৯; সহিহ মুসলিম : ২১১১

বাতিল ধর্মের জন্য ছবি-মূর্তি, প্রতিমা, ক্রুশ ইত্যাদিও তারা তৈরি করে, যা একজন মুসলিমের জন্য কখনোই শোভা পায় না।

[চার] প্রাচীনকাল থেকে আজ অব্দি এই ধারা চলে আসছে—বাসা-বাড়ির শোভা বর্ধনের জন্য ছবি-মূর্তি ও ভাস্কর্যের গ্রাহক মূলত বিলাসী ও আমোদপ্রিয় ব্যক্তিরাই। শখের বশে তারা বিভিন্ন উপাদানের নানা রকম ছবি-মূর্তি সংগ্রহ করে। ইসলাম যেহেতু অতিরিক্ত বিলাসিতায় সমর্থন দেয় না, সোনা-রূপা, রেশমের ব্যবহার পর্যন্ত ইসলামে নিষিদ্ধ, তাই এই ধরনের ছবি-ভাস্কর্য জাতীয় কোনো কিছু মুসলিমদের ঘরে রাখার ব্যাপারে ইসলাম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

### সম্মান প্রদর্শনে অতিরঞ্জন বর্জনীয়

মহান ব্যক্তিরা সম্মান ও শৃঙ্খার পাত্র সকল জাতির কাছেই। কারো কাছে মনে হতে পারে, আপন-কর্মে ও কীর্তিতে যারা অমর ও উজ্জ্বল, স্মারক হিসেবে তাদের কিছু ভাস্কর্য নির্মাণ কি খুব খারাপ কিছু? এর দ্বারা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাদের কীর্তি ও কর্ম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ, মানুষ অনেক কিছুই বিস্মৃত হয়, তাদের মনের অনেক স্মৃতিও এক সময় ধূসর হয়ে ওঠে।

[উত্তর] কারো প্রতি সম্মান ও শৃঙ্খা জ্ঞাপনে বাহুল্য ও অতিরঞ্জন ইসলামে অপচন্দনীয়। উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

لَا تُطْرُونِي ، كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى إِبْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ ، وَرَسُولُهُ

তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে অতিরঞ্জন কোরো না, যেমন ইসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালামের প্রশংসায় খ্রিস্টানরা অতিরঞ্জন করেছিল। আমি তো কেবল আল্লাহর বান্দা। তাই তোমরা (আমার ব্যাপারে এভাবে) বলো- আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল [১]

রাজা-বাদশাহদের সম্মানে দাঁড়ানোটাও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অপচন্দনীয় ছিল। তিনি এটাকে অমুসলিমদের আচরণ হিসেবে অভিহিত

[১] সহিল বুখারি : ৩৪৫; মুসনাদ আহমাদ : ১৬৪

করে বলেন—

إِنْ كَذَّبُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُوْمُونَ عَلَى مُلْوِكِهِمْ ، وَهُمْ قُغُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا

তোমরা একটু আগে পারস্য ও রোমের (সান্তাজ্যের) লোকদের মতোই আচরণ করতে যাচ্ছিলে। তারা তাদের বাদশাহদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, আর তারা (বাদশাহরা) বসে থাকে। কিন্তু তোমরা কখনো এমন কোরো না।<sup>[১]</sup>

সাহাবিদের মধ্যে কয়েকজন নবিজিকে দেখার পর দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান জানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নবিজি তাতে বাধা দেন। আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّلًا عَلَى عَصَمَ قَفْمَنَا إِلَيْهِ قَالَ: لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعْجَمُونُ ، يُعَظِّمُ بَغْضُهَا بَغْضًا

একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাঠিতে ভর দিয়ে আমাদের নিকট এলেন। আমরা তার সম্মানে উঠে দাঁড়াতে গেলে তিনি বললেন, তোমরা দাঁড়িয়ো না, যেরূপ অনারবরা একে অপরকে সম্মান দেখানোর জন্য দাঁড়ায়।<sup>[২]</sup>

তিনি মৃত্যুর পরে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করে বলেছেন—

[১] সহিহ মুসলিম : ৪১৩; সহিহ ইবনি হিবান : ২১২২

[২] দুনানু আবি দাউদ : ৫২৩০; মুসলানু আহমাদ : ২২১৮১; হাদিসটির সনদ যইফ।

তবে কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানোকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অপছন্দ করতেন তা অনেক বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন : একটু আগে সহিহ মুসলিমের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। অনুরূপ মুসলানু আহমাদে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—

مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَفْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَّةِ لِذِلْكِ

অর্থাৎ সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের নিকট রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে প্রিয় আর কেউ ছিল না। তবু তারা যখন তাকে দেখতে পেতেন তখন (তার সম্মানার্থে) দাঁড়াতেন না। কেননা, তারা জানতেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা অপছন্দ করেন।’ [মুসলানু আহমাদ : ১২০৪৫]

## দৈনন্দিন জীবনে হালাল-হারাম

وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا

| আর তোমরা আমার কবরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না। [১]

তিনি আল্লাহর কাছে দুआ করে বলেছেন—

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَئِنَّا يُغْبَدُ

| হে আল্লাহ, আপনি আমার কবরকে (লোকদের জন্য) পূজনীয় বানাবেন না। [২]

আনাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا مُحَمَّدُ يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدَنَا، وَخَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ يَتَقَوَّا كُمْ، لَا يَسْتَهِنُوكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَاللَّهُ مَا أَحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللَّهُ

একবার এক ব্যক্তি (নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে) বলল, ‘হে মুহাম্মাদ, হে আমাদের নেতা ও আমাদের নেতার পুত্র, হে আমাদের শ্রেষ্ঠজন ও শ্রেষ্ঠ পিতার সন্তান! তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের তাকওয়া (আল্লাহর ভয়) অর্জন করা উচিত। শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই পথচায়ত করতে না পারে। আমি হলাম আবুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদায় স্থান দিয়েছেন, তার থেকে তোমরা আমাকে ওপরে ওঠাবে, তা আমি পছন্দ করি না। [৩]

কিছু মানুষের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য তার ছবি-মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণ এবং এর পেছনে হাজার হাজার টাকা-পয়সা ব্যয়, একে ইসলাম কোনোভাবেই সমর্থন করে না।

[১] সুনানু আবি দাউদ : ২০৪২; মুসনাদু আহমাদ : ৮৮০৪; হাদিসটি সহিহ।

[২] মুসনাদু আহমাদ : ৭৩৫৮; মুসনাদুল হুমাইদি : ১০৫৫; হাদিসটি সহিহ।

[৩] মুসনাদু আহমাদ : ১২৫৫১, ১৩৫২৯; আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ি : ১০০০৬; হাদিসটি সহিহ।

নিলে ছবি-ভাস্কর্যের হাত ধরে কত কুখ্যাত ব্যক্তি নিজেকে মহামানব বানানোর ধান্দায় লিপ্ত হবে! যার হাতে অর্থ-ক্ষমতা থাকবে, সে বা তার অনুসারীরা তাদের নেতা ও প্রিয়জনদের ভাস্কর্য গড়বে। আর প্রকৃত মহান ব্যক্তিদের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি হবে এবং তারা চিরকাল মানুষের চোখের আড়ালেই রয়ে যাবেন।

প্রকৃত অমরত্ব হলো—আল্লাহ তাআলার কাছে অমর হওয়া। যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছু জানেন, যিনি বিভ্রান্ত হন না, বিস্মিত হন না। তাঁর কাছে বহু মহামানবের, বহু বিখ্যাত মানুষের নাম লিখিত রয়েছে। যারা হয়তো দুনিয়ার মানুষের কাছে অখ্যাত। এর কারণ আল্লাহ তাআলা আত্মগোপনকারী পুণ্যবানদের বেশি পছন্দ করেন। এরা যখন মানুষের মাঝে থাকে, তখন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। আবার যখন তারা মানুষের দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, তখন তাদের সম্পর্কে মানুষ খোঁজ-খবর রাখে না।

ভাস্কর্যই মানুষের কাছে অমর থাকার একমাত্র উপায় নয়। মানুষকে সেবা দিয়ে যেতে হবে। তাদের মন ও মননে প্রভাব বিস্তার করতে হবে। তাদের জন্য বিভিন্ন পুণ্যময় কর্ম ও উপকারী অবদান রেখে যেতে হবে। এসব কর্ম ও অবদানই ব্যক্তিকে যুগের পর যুগ মানুষের মনে সোনার মুকুট পরিয়ে রাখবে। এভাবেই মুমিনকে মানুষের মাঝে অমর হতে উৎসাহ জোগায় ইসলাম।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খুলাফায়ে রাশিদিন, ইসলামের বড় বড় মনীষী, বিভিন্ন স্তরের সম্মানিত ব্যক্তি যারা আছেন, তাদেরকে স্মরণে রাখার জন্য কোনো চিত্র তোলা বা ভাস্কর্য নির্মাণের প্রয়োজন পড়েনি। কর্ম ও গুণাবলিই তাদের আজও মানুষের মনে টিকিয়ে রেখেছে। তাদের কর্ম ও অবদানের কথা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আমাদের পর্যন্ত চলে এসেছে। এসব কর্ম ও অবদান মানুষের মন ও মননে খোদাই হয়ে রয়ে গিয়েছে। চিত্র নির্মাণ বা মাটির ভাস্কর্য বানিয়ে সেগুলো খোদাই করে রাখার কোনো দরকার হয়নি। তারা আমাদের মনে এমনভাবে অমর হয়ে আছেন—মজলিসে তাদের কথা আলোচিত হলে সেই মজলিসও সুবাসিত হয়, মানুষের মন-মগজ আলোকিত হয়। তারা তো স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে আছেন কোনো চিত্র, মূর্তি বা ভাস্কর্য ছাড়াই।<sup>[১]</sup>

[১] আমি আল-আয়হার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শারিয়া কলেজের ডিন অধ্যাপক

কিছু মূর্তি বা প্রতিকৃতি রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে সম্মান ও বিলাসিতা কোনোটিই প্রকাশ পায় না। এসব প্রতিকৃতি রাখলে পূর্ববর্তী সমস্যাও সৃষ্টি হয় না, এসব

মুহাম্মাদ আল-মোবারকের ‘আধুনিক মন ও ইসলাম’ শিরোনামের একটি বক্তব্যের অংশ এখানে উন্নত করছি। মহান ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষা-বিষয়ক কিছু বিশ্লেষণ এখানে রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা প্রতিনিয়ত বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও প্রতিষ্ঠিত নৈতিক শিক্ষার সাথে অসংগতিপূর্ণ নতুন রীতিনীতি ও অভ্যাসের মুখোমুখি হচ্ছি বা সেগুলো আমাদের সামাজিক জীবনে প্রবেশের পথ খুঁজছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি হলো—ইউরোপীয় ও আমেরিকান নায়কদের স্মরণ পদ্ধতি—তাদের ভাস্কর্য স্থাপন।

পশ্চিমা সভ্যতার অনুগত না হয়ে বরং আমরা যদি এই বিষয়টি মুক্ত মনে ভাবি, দেখা যায়, আরবদের স্মরণীয় রাখার একটি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। তাদের এখানে মহৎ, বিশ্বস্ত, উদার, দানবীর ও সাহসী বীরের ঘোতো ভালো গুণাবলি ছাড়া কোনো মহান ব্যক্তিই স্মরণীয় নয়। এদের কথা তারা গল্ল, কবিতার মধ্যে স্মরণীয় করে রেখেছে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এভাবে চলে আসছে। হাতেমের দানশীলতা ও আনতারার সাহসিকতা এভাবেই ইসলাম পূর্বযুগে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল।

ইসলাম এসে এই রীতিকে আরো শক্তি জুগিয়েছে। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও সর্বশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিচ্ছেন; কুরআনের ভাষায়, ‘আমি তো কেবল তোমাদের মতোই একজন মানুষ, কিন্তু আমার কাছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) প্রত্যাদেশ আসে...’। [সুরা কাহফ, আয়াত : ১১০] ইসলামে ঘোষিত হয়েছে, কর্মে মানুষের মূল্যায়ন হবে, শারীরিক রূপে নয়। আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সমস্ত মানবজাতির জন্য একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ। এখানে মানুষের প্রতি দাসত্বের মতো সম্মান প্রদর্শন নিষিদ্ধ, যাতে অন্যদের প্রতি অবমাননা হয়।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর প্রথম খলিফা আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আনহু এই সত্ত্বের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—‘যে মুহাম্মাদের উপাসনা করেছিল, সে জেনে নিক মুহাম্মাদ মৃত; আর যে আল্লাহর ইবাদত করেছিল, সে জেনে রাখুক আল্লাহ চিরজীব, তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না।’ এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, ‘মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল, তার পূর্বে আরো বহু রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছে, তিনি যদি মারা যান বা নিহত হন, তাহলে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে?’ [সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ১৪৪]

ভালো ও কল্যাণকর কাজের জন্য ইসলামে মহান ব্যক্তিরা অমর হয়ে আছেন। মুসলিমদের অন্তরে তারা চির ভাসুর। উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুর ন্যায়বিচার, আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আনহুর দৃঢ়তা ও প্রজ্ঞা, আলি রায়িয়াল্লাহু আনহুর বৈরাগ ও সাহসের কথা সাক্ষর-নিরক্ষর, নবীন-বৃন্দ সবারই জানা। তাদের কাউকে স্মরণে রাখবার জন্য পাথরের তৈরি কোনো মূর্তির প্রয়োজন হয়নি। কারণ, তাদের কাজ ও গুণাবলি মানুষের হৃদয়ে অঙ্গিত। মূর্তি স্থাপনের মাধ্যমে স্মৃতিচারণ প্রকৃতপক্ষে পশ্চাদপদতা। এগুলো গ্রিক ও রোমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, ইউরোপীয়রা সেখান থেকে গ্রহণ করেছে। কারণ, এরা সবাই সুভাবজাতভাবে মূর্তিপূজক। মুসলিম ও আরবদের চেয়ে সুভাব ও প্রকৃতিতে তারা নিচু স্তরের। মহৎ মানুষের আসল চিত্র ও চরিত্র অঙ্গনে অক্ষমতার ফলে তারা তাদের মহান পুরুষদের দেবতা হিসেবে কঞ্জনা করে এবং তাদের দেবতাদেরকেই মহাপুরুষ আখ্যা দিয়েছে।

আমাদের আলোচনার ফলাফল হলো—পশ্চিমা অনুশীলন আমাদের আজ্ঞাকরণের উপযুক্ত নয়। তাদের চিন্তা আমাদের থেকে নিকৃষ্ট। তাই মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং নৈতিকতার জন্য ক্ষতিকর মূর্তি ও ভাস্কর্য বানিয়ে শরিয়তের বিধান থেকে বিচ্ছুত হওয়া কখনোই কাম্য নয়।

## হালাল-হারামের বিধান

প্রতিকৃতির ব্যবহারে ইসলামে কোনো বিধি-নিষেধ নেই। যেমন : বাচ্চাদের খেলনার মধ্যে কখনো জামাই-বউ, বিড়াল, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি থাকে। এগুলোর ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, এই প্রতিকৃতিগুলোকে কেউ সম্মান জানায় না, বাচ্চারা এগুলো নিয়ে খেলা করে।<sup>[১]</sup>

---

[১] ত্রিমাত্রিক প্রতিকৃতি হারাম হওয়া নিয়ে কারো কোনো মতানৈক্য নেই। চার মাযহাবের সকল ফকিরের নিকটেই ত্রিমাত্রিক বা দেহবিশিষ্ট প্রতিকৃতি হারাম। তবে বাচ্চাদের খেলনার জন্য যেসব পুতুল ও বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতি বানানো হয় তা জায়িয় আছে কি-না, সে ব্যাপারে ফকিহগণের মাঝে মতভেদ আছে। এ ব্যাপারে মালিকি, শাফিয়ি ও হান্বলি মাযহাবের মত হলো, বাচ্চাদের জন্য বানানো পুতুল ও বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতি বানানো, ক্রয়-বিক্রয় করা ও ব্যবহার করা সবই জায়িয। তবে হান্বলি মাযহাবে এটা জায়িয হওয়ার জন্য শর্ত হলো, সেটার মাথা থাকতে পারবে না কিংবা এমন অঙ্গবিহীন হতে হবে, যে অঙ্গ ছাড়া কোনো প্রাণী সাধারণত বাঁচতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য ফকিহগণ এমন কোনো শর্ত আরোপ করেননি। [আল-মাউসুআতুল ফিকহিয়া, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ১১২]

এর বিপরীতে ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম ইবনুল বাত্তাল রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম দাউদি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম হালিমি রাহিমাহুল্লাহ-সহ অন্যান্য মাযহাবের বেশ কিছু আলিম প্রাণী জাতীয় পুতুল ইত্যাদিকে নাজায়িয বলেছেন এবং পুতুল জায়িয হওয়ার হাদিসকে মানসুখ (রহিত) বলে অভিহিত করেছেন। [ফাতহুল বারি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৫২৭]

আর হানাফি মাযহাবের ফকিহগণের মত হলো, প্রাণীর ত্রিমাত্রিক বা দেহবিশিষ্ট সকল প্রতিকৃতিই হারাম। তাদের নিকট প্রাণীর কোনো ধরনের ছবি-প্রতিকৃতিই জায়িয নয়; চাই তা বাচ্চাদের খেলনার জন্য বানানো হোক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে। এ ব্যাপারে হানাফি ফকিহগণ আলাদাভাবে কোনো পার্থক্য বা ব্যতিক্রম উল্লেখ করেননি। [রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৪৭]

তবে কেবল ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ থেকে এ ব্যাপারে স্পষ্ট একটি ভাষ্য পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ‘পুতুলের ক্রয়-বিক্রয় ও তা দ্বারা বাচ্চাদের খেলা জায়িয আছে।’ আল্লামা শামি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এ মতটিকে সমর্থন করে বলেন, ‘এ মতটি ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হওয়ার কারণে এটা বোঝার কোনো অবকাশ নেই যে, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ এ থেকে ভিন্নমত পোষণ করতেন। কেননা, হতে পারে এ মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহরও একই মত।’ [রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২২৬]

অর্থাৎ আল্লামা ইবনু আবিদিন শামি রাহিমাহুল্লাহর মতে, এটা ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহর মত হওয়ার পাশাপাশি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর মতও হতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, হানাফি ফকিহগণ থেকে ব্যাপকভাবে প্রাণীর সব ধরনের ছবি-প্রতিকৃতি হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষ্য পাওয়া গেলেও বাচ্চাদের পুতুলের ব্যাপারে বৈধতা বা অবৈধতার কোনো মতই আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি। বরং বিপরীতে ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহর মত থেকে বোঝা যায়, এ মাসআলাটি প্রাণীর ছবি-প্রতিকৃতি হারাম হওয়ার মাসআলা থেকে ব্যতিক্রম; যেমনটি মালিকি, শাফিয়ি ও হান্বলি মাযহাবের ফকিহগণ বলেছেন। কেননা, এ ব্যাপারে আলাদাভাবে একাধিক সুস্পষ্ট হাদিস পাওয়া যায়, যেখানে পুতুলের বৈধতার বিষয়টি রহিত হওয়ার দাবি কিংবা সেখানে ভিন্ন ব্যাখ্যার কোনোই অবকাশ নেই। এ হিসেবে হানাফি মাযহাবে যদি পুতুলের বৈধতার বিষয়টি সাধারণ ছবি-প্রতিকৃতি হারাম হওয়ার বিধান থেকে ব্যতিক্রম বলা হয় তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই; বিশেষত যখন এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহর স্পষ্ট ভাষ্য

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা বলেন—

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبُنَّ مَعِي ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّفَنَّ مِنْهُ ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبُنَّ مَعِي

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে থাকাকালীন আমি পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। আমার কিছু বাঞ্চবী ছিল, তারাও আমার সাথে খেলা করত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করলে তারা দৌড়ে পালাত। তখন তিনি তাদেরকে ডেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন, ফলে তারা আবার আমার সঙ্গে খেলত।<sup>[১]</sup>

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা বলেন—

قَدِيمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ ، أَوْ حَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ ، فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاجِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتِ لِعَائِشَةَ لَعِبٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةً ؟ قَالَتْ : بَنَاتِي ، وَرَأَى يَتِيْهُنَّ فَرَسَّا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِيقَاعٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ ؟ قَالَتْ : فَرَسْ ، قَالَ : وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ ؟ قَالَتْ : جَنَاحَانِ ، قَالَ : فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ ؟ قَالَتْ : أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْমَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ ؟ قَالَتْ : فَصَحِحْكَ حَتَّى رَأَيْتُ تَوَاحِذَهُ .

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক অথবা খায়বারের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। তার ঘরের তাকের ওপর একটি পর্দা ঝোলানো ছিল। বায়ুপ্রবাহের ফলে তার এক পাশ সরে যায়, ফলে তার খেলার পুতুলগুলো

রয়েছে এবং বিপরীতে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহ থেকে কোনো মত পাওয়া যায়নি। বরং আল্লামা শামি রাহিমাল্লাহুর ভাষ্য ও তার কথার ধরণ থেকে বোঝা যায়, তিনিও বাচ্চাদের জন্য পুতুলের বৈধতার মতটিকে সঠিক মনে করেন। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

তবে আমাদের উপমহাদেশের হানাফি ফকিরগণ তাদের বিভিন্ন গ্রন্থে পুতুলের ক্রয়-বিক্রয় এবং তার ব্যবহারকে নাজারীয় বলেছেন। তারা এক্ষেত্রে ছবি-প্রতিকৃতি নিষিদ্ধ হওয়া-সংক্রান্ত হাদিসগুলো দিয়ে দলিল দিয়েছেন। আর পুতুলের দ্বারা খেলা বৈধ হওয়ার হাদিসগুলোকে রহিত বা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও বাস্তবতার নিরিখে হাদিসগুলোকে রহিত হওয়ার দাবি করা বা সেগুলোর ভিন্ন ব্যাখ্যা করার সুযোগ কম, তবু যেহেতু এতে আলিমগণের ভিন্নমত রয়েছে, তাই সতর্কতাসূরূপ পুতুল বা এ ধরনের প্রাণী জাতীয় খেলনার ব্যবহার থেকে বিরত থাকাই শ্রেষ্ঠ ও সবদিক থেকে নিরাপদ।

[১] সহিল বুখারি : ৬১৩০; সহিহ মুসলিম : ২৪৪০

দৃশ্যমান হয়ে পড়ে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুতুলগুলো দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়িশা, এগুলো কী? উভরে আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা বললেন, এগুলো অমার খেলার পুতুল। আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এগুলোর মধ্যে কাপড়ের তৈরী দুই ডানাবিশিষ্ট একটি ঘোড়াও দেখতে পেলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এগুলোর মধ্যে ওটা কী দেখতে পাচ্ছি? আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা বললেন, ঘোড়া। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তার ওপর আবার ওটা কী? আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা বললেন, দুটো পাখ। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এ আবার কেমন ঘোড়া, যার পাখা আছে? আমি বললাম, আপনি কি শোনেননি যে, সুলাইমান আলাইহিস সালামের ঘোড়ার কয়েকটি পাখা ছিল? আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা বলেন, একথা শুনে নবিজি (জোরে) হেসে দিলেন, এমনকি আমি তার মাড়ির দাঁতসমূহ পর্যন্ত দেখতে পেলাম।<sup>[১]</sup>

এই হাদিসে পুতুল বলতে বোঝানো হয়েছে—খেলনার পুতুল, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি যা দিয়ে সাধারণত ছোট বাচ্চারা খেলাধূলা করে। আর আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহার বিয়ে হয়েছিল খুবই অল্প বয়সে, তাই তিনি তখনো খেলা করতেন।

ইমাম শাওকানি রাহিমাহুল্লাহু বলেন, ‘এই হাদিস থেকে শরীরী প্রতিকৃতি জাতীয় খেলনা দিয়ে বাচ্চাদেরকে খেলতে দেওয়ার অনুমোদন পাওয়া যায়।’<sup>[২]</sup>

অবশ্য ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহু সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি কন্যাসন্তানের জন্য এ ধরনের ছবি-প্রতিকৃতি জাতীয় খেলনা কিনে দেওয়াকে মাকরুহ (অপচূপনীয়) মনে করতেন।<sup>[৩]</sup>

কায় ইয়ায রাহিমাহুল্লাহু বলেন, ‘ছোট মেয়েদের জন্য পুতুল দিয়ে খেলার বিষয়টি (অন্যান্য সাধারণ ছবি-প্রতিকৃতির বিধান থেকে) ব্যতিক্রম। এ ব্যাপারে (শরিয়তে) অনুমোদন রয়েছে।’<sup>[৪]</sup>

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৪৯৩২; সহিলু ইবনি হিবান : ৫৮৬৪; হাদিসটি সহিহ।

[২] নাইলুল আওতার, শাওকানি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৪৫

[৩] ফাতহুল বারি, ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৫২৭

[৪] আল-মিনহাজ শাস্ত্র মুসলিম, নববি, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৮২

## দৈনন্দিন জীবনে হালাল-হারাম

অনেক জায়গায় বিভিন্ন প্রাণীর আকৃতিতে মিষ্টান্ন-বাতাসা তৈরি হয়, তা বিধানও বাচ্চাদের খেলনা পুতুলের মতেই। এসব মিষ্টান্ন-বাতাসা সাধারণত সৌদ ইত্যাদিতে বানানো হয়। এরপর সেগুলো লোকজন খেয়ে ফেলে, তাই এতে কোনো সমস্যা নেই।<sup>[১]</sup>

### অসম্পূর্ণ মূর্তির ব্যাপারে বিধান

একটি হাদিসে আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ لِي : أَئِثْكَ الْبَارِحَةَ فَلِمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنْ  
 كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامٌ سِتُّ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ ،  
 فَمَرَّ بِرَأْسِ التَّمَثالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ ، فَيَصِيرُ كَهْيَةً الشَّجَرَةِ

জিবরিল আলাইহিস সালাম আমার নিকট এসে বললেন, গত রাতে আমি আপনার কাছে এসেছিলাম। অতঃপর (আপনার) ঘরে প্রবেশের ক্ষেত্রে আমার একমাত্র অন্তরায় ছিল দরজায় থাকা কিছু ছবি-প্রতিকৃতি, ঘরে বিদ্যমান ছবিযুক্ত একটি পর্দা এবং ঘরে অবস্থানরত একটি কুকুর। সুতরাং আপনি ঘরে থাকা প্রতিকৃতির মাথা কেটে ফেলার আদেশ করুন, যাতে তা গাছের আকৃতির মতো হয়ে যায়।<sup>[২]</sup>

এই হাদিস দিয়ে একদল আলিম প্রমাণ করতে চান, নিষিদ্ধ ছবি-প্রতিকৃতি হলো যেটি পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু কোনো ছবি-প্রতিকৃতিতে যদি এমন কোনো অঙ্গ না

[১] খেলনা পুতুলের ব্যাপারে সুস্পষ্ট হাদিস ও বিভিন্ন ইমামের সুস্পষ্ট ভাষ্য থাকায় ছাড় থাকলেও খাবার জাতীয় প্রতিকৃতির ব্যাপারে এ অনুমোদন থাকার কোনো অবকাশ নেই। এমনকি মালিকি মাযহাবের যেখানে ছবি-প্রতিকৃতির বিষয়টি সবচেয়ে শিখিল, সেখানেও খাবারজাতীয় প্রতিকৃতি বানানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি। যেমন মালিকি মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকিহ আল্লামা দারদির রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

وَفِيمَا لَا يَطْوُلُ اسْتِمْرَارَةُ خَلَافَ ، وَالصَّحِيحُ حُرْمَةُ

আর প্রাণীর ছায়াবিশিষ্ট যে সকল প্রতিকৃতি দীর্ঘস্থায়ী হয় না, (যথা : আটা বা তরমুজের খোলস জাতীয় কিছু দিয়ে বানানো মূর্তি ইত্যাদি) সেগুলো বৈধ হওয়া, না হওয়ার ব্যাপারে (মালিকি মাযহাবের ফকিহদের মাঝে) মতানৈক্য আছে। তবে এ ব্যাপারে সঠিক মত হলো, এ ধরনের মূর্তি বানানোও হারাম। [অশ-শারহুস সগির ('হাশিয়াতুস সাবি'-এর সাথে সংযুক্ত), খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫০১] সুতরাং প্রাণীর আকৃতিতে বানানো মিষ্টান্ন-বাতাসার ব্যাপারে আমাদের সর্তর্ক থাকা কর্তব্য।

[২] সুনানু আবি দাউদ : ৪১৫৮; জামিউত তিরমিয়ি : ২৮০৬; মুসনাদু আহমাদ : ৮০৪৫; হাদিসটি সহিহ।

থাকে, যা ছাড়া কোনো প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না, তাহলে সেই চির বা মূর্তির সংরক্ষণ বৈধ।<sup>[১]</sup>

কিন্তু জিবরিল আলাইহিস সালাম বলেছেন, ‘প্রতিকৃতিটির মাথা কেটে গাছের আকৃতির মতো করে ফেলতো’ এ থেকে বুঝে আসে, এখানে ছবি-প্রতিকৃতির অতীব প্রয়োজনীয় অঙ্গহানি করা বা না করাটা এই হাদিসের উদ্দেশ্য নয়; বরং এই হাদিসের উদ্দেশ্য হলো—প্রতিকৃতিকে বিকৃত করে ফেলা, যাতে তার সৌন্দর্য বহাল না থাকে, প্রতিকৃতিটি সম্মান ও শ্রদ্ধার উপযুক্ত না থাকে।

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখব, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতি, ক্ষমতাবান ও মহামানবদের যেসব (মাথাসহ) অর্ধেক চির বা ভাস্কর্য রয়েছে, নিঃসন্দেহে সেগুলো সৌন্দর্যের জন্য মানুষের ঘরে ঘরে থাকা ছোট ছোট পূর্ণাঙ্গ চির-মূর্তির চেয়ে নিষেধাজ্ঞার আওতায় আরো আগে পড়বে।<sup>[২]</sup>

### দেহবিহীন চিত্রের বিধান

এতক্ষণ আমাদের আলোচনা ছিল দেহবিশিষ্ট প্রতিকৃতি নিয়ে, যেগুলোকে আমরা

[১] এটা মালিকি ও হাস্তি মাযহাবের মত যে, কোনো ছবি-প্রতিকৃতিতে যদি এমন কোনো অঙ্গ না থাকে, যা ছাড়া কোনো প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না, তাহলে তা বৈধ। যেমনটি ইমাম দারাদির মালিকি রাহিমাহুল্লাহ পরিক্ষার ভাষায় উল্লেখ করেছেন। [হাশিয়াতুস সাবি আলাশ শারহিস সগির, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫০১] অনুবৃত্ত ইমাম ইবনু কুদামা হাস্তি রাহিমাহুল্লাহও স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। [আল-মুগানি, ইবনু কুদামা, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৮২] এ হিসেবে যদি কোনো ছবি-প্রতিকৃতির শুধু মাথা থাকে, কিন্তু পেট, পিঠ ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ না থাকে তাহলে তা মালিকি ও হাস্তি মাযহাব অনুসারে বৈধ। কিন্তু হানাফি, শাফিয়ি মাযহাবের মত হলো, এ হাদিস থেকে শুধু এটা প্রমাণ হয় যে, ছবি-প্রতিকৃতির মাথা না থাকলে তা ছবি-প্রতিকৃতি হিসেবে বিবেচিত হয় না; বরং তা গাছের মতো প্রাণহীন বস্তুর ছবি-প্রতিকৃতির মতো হয়ে যায়। সূতরাং পেট-পিঠহীন শুধু মাথার ছবি-প্রতিকৃতি নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত হবে না। বরং পূর্ণাঙ্গ ছবি-প্রতিকৃতি যেমন হারাম, তেমনই শুধু মাথার ছবি-প্রতিকৃতিও হারাম। কেননা, ছবি-প্রতিকৃতির ক্ষেত্রে মাথা বা চেহারাই হলো মূল; যেমনটি সহিহ সনদে ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস থেকে প্রমাণ হয়। [আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৪৫৮০] এজন হানাফি, শাফিয়ি মাযহাবের মত হলো, কোনো ছবি-প্রতিকৃতির মাথা না থাকলে তা বৈধ, আর মাথা থাকলে তা পূর্ণাঙ্গ ছবি-প্রতিকৃতির মতোই অবৈধ। [আল-বাহরুর রায়িক, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩০-৩১; মুগানিল মুহতাজ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪০৯]

[২] হানাফি ও শাফিয়ি মাযহাব অনুসারে এ ধরনের ছবি-প্রতিকৃতি নিঃসন্দেহে নিষিদ্ধ ছবি-প্রতিকৃতির অঙ্গভূক্ত। কেননা, এসব অর্ধেক ছবি-প্রতিকৃতিতে পেট-পিঠ না থাকলেও মাথা ও চেহারা থাকে। আর আমাদের মতে কোনো ছবি-প্রতিকৃতির মাথা বা চেহারা থাকলেই তা নিষিদ্ধ ছবি-প্রতিকৃতির আওতাভূক্ত হয়ে যায়। পেট-পিঠ বা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকা জরুরি নয়।

মূর্তি বা ভাস্কর্য বলে থাকি। কিন্তু টাকা-পয়সা, বিছানার চাদর, পর্দা, দেওয়াল, কাগজ ও পোশাক ইত্যাদি সমান্তরাল বস্তুর উপর অঙ্গিত চিত্র ও ছবির বিধান কী হবে?

এক্ষেত্রে চিত্র ও ছবির কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় নেওয়ার পরে বিধান দিতে হবে। যেমন : ছবিটি কীসের, কোথায় স্থাপন করা হবে, কীসের জন্য ব্যবহার হবে এবং তা নির্মাণের পেছনে নির্মাণকারীর উদ্দেশ্য কী?

খ্রিস্টানদের জন্য ঈসা মাসিহের ছবি, হিন্দুদের জন্য গরুর ছবি, আল্লাহ ছাড়া পূজনীয় কোনো বস্তুর ছবি পূজার নিয়তে তৈরি করলে নির্মাণকারী কাফির বলে বিবেচিত হবে। কারণ, সে কুফর ও ভাস্তি ছড়নোর কাজে জড়িত হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে—

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوَّرُونَ

| নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার নিকট কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ কঠোর শাস্তিপ্রাপ্ত হবে ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণকারীগণ [১]

ইমাম তাবারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘এই হাদিসে ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণকারী বলতে পূজনীয় বস্তুর ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণকারী উদ্দেশ্য, যে জেনে বুঝে ও সুস্থায় পূজার উদ্দেশ্যে ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণ করে। কারণ, এতে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি পূজার উদ্দেশ্যে ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণ না করে, কেবল ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে মনে চেয়েছে বলেই তা করেছে, তাহলে সে ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণের কারণে গুনাহগার হবে, কিন্তু কাফির হবে না।’[২]

কোনো মুসলিম এসব মূর্তির ছবি সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখতে পারে না। একমাত্র সে-ই এমনটা করতে পারে, যে ইসলামকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। অপূজনীয় বস্তুর চিত্র কেউ যদি এই মনোভাব নিয়ে আঁকে যে, সেও আল্লাহর মতো সৃষ্টিতে সক্ষম, আল্লাহ তাআলা যেমন সৃষ্টিতে অভিনবত্ব আনেন, সেও তার শিল্পে

[১] সহিল বুখারি : ৫৯৫০; সহিল মুসলিম : ২১০৯

[২] ফাতহুল বারি, ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩৮৩

অভিনবত্তের স্বাক্ষর রাখে, তাহলে আল্লাহর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবের কারণে সে তাওহিদ ও ঈমানের সীমা থেকে বেরিয়ে কাফির হয়ে যাবে। এদের জন্যেই বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ

| কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ কর্তৃর শাস্তিপ্রাপ্ত হবে ওই সকল লোক, যারা (প্রাণীর ছবি-প্রতিকৃতি বানিয়ে) আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে।[১]

এই কুফর ও ঈমান নষ্ট হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণই শিল্পী তথা ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণকারীর নিয়ত ও ইচ্ছার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এই ব্যাখ্যার সমর্থনে একটি হাদিসে কুদসি উল্লেখ করা যেতে পারে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخْلَقِي ، فَلَيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لَيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً

| আর ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম কে হতে পারে, যে আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে শুরু করে? পারলে সে একটা পিংপড়া সৃষ্টি করুক কিংবা একটা শস্যদানা সৃষ্টি করুক কিংবা একটি যব সৃষ্টি করুক।[২]

‘যে আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে শুরু করে’—এই বক্তব্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এখানে ‘আল্লাহ তাআলার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছা’ বিষয়টি মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে আল্লাহ তাআলা ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণকারীদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, পারলে তারা যেন তাঁর মতো একটি পিংপড়া কিংবা শস্যদানা সৃষ্টি করে দেখাক। চ্যালেঞ্জ থেকেই বোঝা যায়, তাদের মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টি থাকতে হবে।

এজন্য কিয়ামতের দিন সকল মানুষের সামনে ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণকারীদেরকে শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়ার সময় বলা হবে—**مَنْ حَنَّى وَمَا حَنِّيوا** অর্থাৎ ‘তোমরা যা

[১] সহিল বুখারি : ৫৯৫৪; সহিহ মুসলিম : ২১০৭

[২] সহিল বুখারি : ৭৫৫৯; সহিহ মুসলিম : ২১১১

তৈরি করেছিলে তাতে জীবন দান করো।<sup>[১]</sup>

কিন্তু তারা কখনো তাতে জীবন দান করতে পারবে না। নিষিদ্ধ ছবির মধ্যে আরেকটি হলো—শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের ছবি-প্রতিকৃতি সংরক্ষণ; হোক তিনি দ্বীনি বা দুনিয়াবি দৃষ্টিকোণ থেকে সম্মানিত। দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ যেমন নবি, ফেরেশতা, বুজুর্গ ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে তাদের ছবি-প্রতিকৃতি সংরক্ষণ হারাম। সাধারণত খ্রিস্টানদের ঘরে ঘরে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম, ইসহাক আলাইহিস সালাম, মুসা আলাইহিস সালাম, মারযাম আলাইহাস সালাম, জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম প্রমুখের (কল্পিত) ছবি-প্রতিকৃতি সংরক্ষিত থাকে। তাদের অনুসরণে কিছু কিছু বিদআতি মুসলিমের ঘরে আলি রায়য়াল্লাহু আনহু, ফাতিমা রায়য়াল্লাহু তাআলা আনহা ও অন্যান্য বুজুর্গদের ছবি-প্রতিকৃতি সংরক্ষিত হওয়া শুরু হয়েছিল।

দুনিয়াবি দৃষ্টিকোণ থেকে স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ ও কীর্তিমান শিল্পীদের ছবি-প্রতিকৃতি সংরক্ষণও হারাম। প্রথম শ্রেণির (অর্থাৎ দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের) ছবি-প্রতিকৃতি সংরক্ষণের তুলনায় এই দ্বিতীয় শ্রেণির লোকদের ছবি-প্রতিকৃতি সংরক্ষণ করার গুনাহ যদিও একটু কম হবে, কিন্তু গুনাহ তো হবেই। বিশেষ করে, এরা যদি হয় বড় বড় কাফির, নাস্তিক, বদ্বীনের প্রতি আহারক ও সমাজে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতার প্রচারক এবং বিস্তারকারী।

নববি ও তৎপরবর্তী যুগের যেসকল ছবি-প্রতিকৃতি পাওয়া যায়, বলা যায়, এর সবই ছিল ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মানিত ব্যক্তিদের ছবি-প্রতিকৃতি। কারণ, এসব ছবি-প্রতিকৃতি হয়তো রোমান খ্রিস্টানদের তৈরি ছিল, নয়তো পারস্যের অগ্নিপূজারীদের ছিল। স্বাভাবিক ব্যাপার এসবজুড়ে তাদের ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের ছবি-প্রতিকৃতিই ছিল।

সহিহ মুসলিমে প্রখ্যাত তাবিয়ি আবু যুহা রাহিমাল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ ، فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ قَالَ مَسْرُوقٌ : هَذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى قَلْتُ :  
لَا ، هَذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ

[১] সহিহুল বুখারি : ৫৯৫১; সহিহ মুসলিম : ২১০৮

আমি মাসরুক রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে একটি ঘরে ছিলাম। সেখানে মারইয়াম আলাইহাস সালামের (সদ্শ) কিছু মূর্তি ছিল। মাসরুক রাহিমাহুল্লাহ বললেন, এটি (পারস্য বাদশাহ) কিসরার প্রতিমা। তখন আমি বললাম, না; এটি মারইয়াম আলাইহাস সালামের প্রতিমা।<sup>[১]</sup>

বোঝা গেল, মাসরুক রাহিমাহুল্লাহ ধারণা করেছিলেন, এগুলো কোনো অগ্নিপূজকের আঁকা চিত্র হবে। কারণ, তারা তাদের খাবারের পাত্রে পর্যন্ত তাদের রাজা কিসরার ছবি আঁকত। কিন্তু পরে জানতে পারলেন, এগুলো একজন খ্রিস্টান অঙ্কন করেছে। এই হাদিসের মধ্যে আছে, একথা শুনে তখন মাসরুক রাহিমাহুল্লাহ বললেন—

أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشَدُّ  
النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوْرُونَ

শুনে রাখো! আমি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিবসে লোকদের মধ্যে সর্বোচ্চ শাস্তিপ্রাপ্ত হবে ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণকারীরা।<sup>[২]</sup>

প্রাণী ছাড়া অন্য কিছু যেমন—গাছপালা, সাগর-নদী-জাহাজ, পাহাড়-পর্বত, চন্দ-সূর্য, প্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি জড়বস্তুর চিত্র ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রায়নে এবং সেগুলোর ছবি-প্রতিকৃতি সংরক্ষণে কোনো সমস্যা নেই, কোনো গুনাহ নেই।

অন্যদিকে কোনো প্রাণীর ছবি যদি কাঠ, কাপড়, কাগজ, দেওয়াল ইত্যাদিতে অঙ্কন করা হয় এবং তাতে পূর্বে উল্লেখিত নিষিদ্ধ ও আপত্তিকর বিষয়গুলো পাওয়া না যায়, এগুলোর ব্যাপারে আমার মত হলো—এগুলোও হারাম নয়।<sup>[৩]</sup> এর

[১] সহিহ মুসলিম : ২১০৯; মুসনাদু আহমাদ : ৩৫৫৮

[২] সহিহ মুসলিম : ২১০৯; মুসনাদু আহমাদ : ৩৫৫৮; সহিহল বুখারি : ৫৯৫০

[৩] এটা মালিকি মাযহাবের মত। তাদের ফকিহগণের মতে, প্রাণীর শরীর ও দেহবিশিষ্ট প্রতিকৃতি তথা ভাস্কর্য-মূর্তি হারাম হলেও কাঠজে বা কাপড়ে বা দেওয়াল ইত্যাদিতে অঙ্কিত ছবি হারাম নয়। কিন্তু হানাফি, শাফিয়ি, হাওলি মাযহাবসহ অন্যান্য ফকিহগণের নিকট ভাস্কর্য-মূর্তি যেমন হারাম, তদুপ কাগজে, কাপড়ে বা দেওয়ালে অঙ্কিত ছবিও হারাম। প্রথকার ড. ইউসুফ কারযাবি এখানে মালিকি মাযহাবের মতটিকে আংশিক গ্রহণ করেছেন। তার মতে, পূজার উদ্দেশ্যে না হলে এবং কোনো অর্ধেয় ব্যক্তির স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্যে না থাকলে সাধারণ অবস্থায় কাগজে বা কাপড়ে বা দেওয়াল ইত্যাদিতে অঙ্কিত ছবি হারাম নয়।

সমর্থনে অনেক বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে, বুসর ইবনু সাইদ রাহিমাহুল্লাহ যাইদ ইবনু খালিদ রাহিমাহুল্লাহর সূত্রে সাহাবি আবু তালহা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ قَالَ بُشْرٌ: ثُمَّ أَشْتَكَى زَيْدٌ، فَعُذْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِرْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعَبْيَيْدِ اللَّهِ، رَبِّيْبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ يُخِرِّنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الْأُولِ؟ فَقَالَ عَبْيَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَفِّمَا فِي تُوبِ

নিশ্চয়ই ফেরেশতারা ওই ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি-প্রতিকৃতি থাকে। (এ হাদিসটির একজন বর্ণনাকারী) বুসর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এরপর যাইদ ইবনু খালিদ রাহিমাহুল্লাহ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তার সেবা-শুশ্রাব জন্য গেলাম। তখন তার ঘরের দরজাতে একটি পর্দা দেখতে পেলাম, যাতে ছবি অঙ্কিত ছিল। আমি তখন উম্মুল মুমিনিন মাইমুনা রায়িয়াল্লাহু তাআলা আনহার পালিত পুত্র উবাইদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, যাইদ রাহিমাহুল্লাহ কি প্রথম দিন (অর্থাৎ ইতিঃপূর্বে) ছবি-প্রতিকৃতি নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেননি? তখন উবাইদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বললেন, তিনি

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহর মতে, হাদিসে রাখিয়ে রেখে নেওয়া কাপড়ে অঙ্কিত ছবি হলে ভিন্ন কথা। এখানে তেওঁ, দ্বারা ব্যাপকভাবে সব ধরনের ছবি উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রাণী ছাড়া অন্যান্য জিনিস, যেমন গাছপালা, জড় পদার্থ ইত্যাদি প্রাণহীন বস্তুর ছবি উদ্দেশ্য।

মানবিক মাযহাবের ফকিহগণের দাবি ছিল—হাদিসে বর্ণিত মাধ্যমে কাপড়ে থাকা প্রাণীর ছবির ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হাফিয় ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য উত্তৃত করে তাদের সে দাবিকে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, তাদের এ দাবি সঠিক নয় যে, হাদিসের উত্ত বাক্যটিতে কাপড়ে থাকা প্রাণীর ছবির ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বরং অন্যান্য হাদিসের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, এখানে গাছপালা ও জড়বস্তু জাতীয় প্রাণহীন বস্তুর ছবি উদ্দেশ্য।

হাফিয় ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, আমরা যদি মেনেও নিই যে, নেওয়া কাপড়ে অঙ্কিত প্রাণীর ছবির ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবুও এ বিধানটি পূর্বের, যা পরে মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। শরিয়তের কোনো বিধান তখনই চিরস্থায়ী বিধান হিসেবে র্যাদা পায়, যখন তা রহিত না হয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত পর্যন্ত বলবৎ থাকে। যদি কাপড়ে অঙ্কিত প্রাণীর ছবির ব্যাপারে অনুমতি দেওয়াও হয়ে থাকে, অন্যান্য হাদিসের দ্বারা যেহেতু তার বিধান রহিত হয়ে গেছে, তাঁট এ হাদিসটির মাধ্যমে কাপড়ে অঙ্কিত প্রাণীর ছবির বৈধতা প্রমাণের কোনো সুযোগ নেই।

কাপড়ে অঙ্কিত ছবির বৈধতা রহিত হয়ে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে, যা সহিত সনদে বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ (সুনান আবি দাউদ : ৪১৫৮), ইমাম তিরিমিয় রাহিমাহুল্লাহ (জামিউত তিরিমিয় : ২৮০৬), ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ (মুসলিমান আহমাদ : ৪০৪৫) আরো অস্মুখ।

(যাইদ ইবনু খালিদ রাহিমাত্তুল্লাহ) যখন হাদিস বলেছিলেন, তখন কি তুমি তার এ কথা শুনতে পাওনি যে, ‘তবে কাপড়ে অঙ্গিত ছবি হলে ভিন্ন কথা?’<sup>[১]</sup>

জামিউত তিরমিয়িতে বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ عَبْيِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَقْوُدُهُ ، قَالَ: فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ ، قَالَ: فَدَعَا أَبْنَوْ طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزَعُ نَمَطًا تَحْتَهُ ، فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ قَالَ: لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عِلِّمْتَ ، قَالَ سَهْلٌ: أَوْلَمْ يَقْلُ إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي تَوْبٍ ، قَالَ: بَلَى ، وَلَكِنَّهُ أَطْبَيْتُ لِنَفْسِي

উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনি উত্বা রাহিমাত্তুল্লাহ থেকে বর্ণিত যে, তিনি (অসুস্থ) আবু তালহা আনসারি রায়িয়াল্লাহু আনহুর সেবা-শুশ্রাব জন্য তার ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি (উবাইদুল্লাহ রাহিমাত্তুল্লাহ) বলেন, আমি সেখানে সাহল ইবনু হুনাইফ রায়িয়াল্লাহু আনহুকেও উপস্থিত পেলাম। তিনি বলেন, আবু তালহা রায়িয়াল্লাহু আনহু একজনকে ডাকলেন তার নিচের চাদর সরানোর জন্য। সাহল রায়িয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, কেন চাদর সরাবেন? আবু তালহা রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, কেননা তাতে অনেক ছবি অঙ্গিত আছে। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে যা বলেছেন সে সম্পর্কে তো আপনি অবগত। সাহল রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এ কথা বলেননি, ‘তবে কাপড়ে অঙ্গিত ছবি হলে ভিন্ন কথা?’ আবু তালহা রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, হ্যাঁ, বলেছেন। কিন্তু আমার আত্মার (প্রশান্তির) জন্য এটাই (অর্থাৎ ছবি সরিয়ে ফেলাটাই) অধিক উত্তম।<sup>[২]</sup>

এই হাদিস থেকে কি স্পষ্ট হয় না যে, ইসলামে নিষিদ্ধ ছবি বলতে শুধু দেহবিশিষ্ট প্রতিকৃতি উদ্দেশ্য, যাকে আমরা ভাস্কর্য বা মূর্তি বলি। কাঠ, ক্যানভাস, কাপড় বা বিছানা, দেওয়াল ইত্যাদি চিত্রিত বস্তু নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন বিশুদ্ধ ও আপত্তিমুক্ত কোনো হাদিস নেই।<sup>[৩]</sup> তবে কিছু বিশুদ্ধ হাদিস রয়েছে, যাতে

[১] সহিল বুখারি : ৫৯৫৮; সহিহ মুসলিম : ২১০৬

[২] জামিউত তিরমিয়ি : ১৭৫০; সুনান নাসারি : ৫৩৪৯

[৩] ইতিঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটা কেবল মালিকি মাঝহাবের ফকিহগণের মত। বিপরীতে হানাফি,

চিরাঞ্জিকত বস্তুর ব্যবহারের প্রতি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। যেহেতু এতে বিলাসী ও আমুদে লোকদের সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

যাইদ ইবনু খালিদ জুহানি রাহিমাহুল্লাহ আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—

سِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةَ بَيْنَاهُ فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا  
تَمَاثِيلُ. قَالَ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا يُخْرِبُنِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةَ بَيْنَاهُ فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلُ فَهَلْ سِمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ ذَكْرَ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: لَا، وَلِكِنْ سَأَحْدِثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَّ، رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي عَزَّاتِهِ،  
فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَرَّثُهُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ، عَرَفَتُ الْكَرَاهِيَّةَ فِي وَجْهِهِ،  
فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَّكَهُ أَوْ قَطَعَهُ، وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نُكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالظِّيَّنَ قَالَتْ  
فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتِينَ وَحَشَوْتُهُمَا لِيَقًا، فَلَمْ يَعْبَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ফেরেশতারা সে গৃহে প্রবেশ করেন না, যে গৃহে কোনো কুকুর অথবা ছবি-প্রতিকৃতি থাকে। বর্ণনাকারী (যাইদ ইবনু খালিদ জুহানি রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, অতঃপর আমি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, ইনি (আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফেরেশতারা সে গৃহে প্রবেশ করেন না, যে গৃহে কোনো কুকুর অথবা ছবি-প্রতিকৃতি থাকে। আপনি কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, না। কিন্তু আমি তাকে যা করতে দেখেছি, তার বর্ণনা তোমাদের নিকটে দিচ্ছি। আমি তাকে দেখতে পেলাম, তিনি (কোনো) জিহাদে বেরিয়ে গেলেন। সে সময় আমি একটি পাতলা নরম শাল জোগাড় করলাম এবং তা দ্বারা দরজার পর্দা তৈরি করলাম। তিনি প্রত্যাবর্তন করে যখন চাদরটি দেখতে পেলেন, তখন

---

শাফিয়ি, হাফলি ও উম্যাহর অন্যান্য অধিকাংশ ফকিরগণের মত হলো, ভাস্কর্য-মূর্তির মতো কাগজে বা কাপড় ইত্যাদিতে চিত্রিত ছবিও হারাম। এ ব্যাপারে অনেক স্পষ্ট ও দ্রুতগ্রহণ সহিহ হাদিস পাওয়া যায়। এই বিষয়টি নিয়ে ইতিঃপূর্বে ইয়াম নববি রাহিমাহুল্লাহ ও হাফিয় ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহর মতো তুলে ধরা হয়েছে, সুতরাং এখানে তা পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

তার চেহারায় আমি ঘৃণা ও অসন্তুষ্টির ছাপ লক্ষ করলাম। অতঃপর তিনি তা টেনে নামিয়ে ফেললেন; এমনকি তা ছিড়ে ফেললেন কিংবা টুকরা টুকরা করে ফেললেন। আর বললেন, মহান আল্লাহ আমাদেরকে পাথর অথবা মাটিকে বস্ত্র পরানোর নির্দেশ দেননি। আয়িশা রায়িয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, অতঃপর আমরা চাদরটি কেটে দুটি বালিশ তৈরি করলাম এবং সে দুটির অভ্যন্তরে খেজুর বৃক্ষের আঁশ ঢুকিয়ে দিলাম। তাতে তিনি আমাকে আর দোষারোপ করলেন না।<sup>[১]</sup>

দেওয়াল ইত্যাদিতে চিত্রযুক্ত পর্দা ব্যবহারের বিষয়ে এই হাদিস থেকে মাকরুহে তানিয়িহি বা অনুগ্রহ হওয়ার চেয়ে বেশি কিছুই প্রমাণিত হয় না।

ইমাম নববি রাহিমাল্লাহ বলেন, হাদিসটিতে এমন কিছু বলা হয়নি, যা হারাম হওয়ার দাবি করে। কারণ, ‘আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নির্দেশ দেননি’—বাক্যটি থেকে কেবল এতটুকু বোঝা যায় যে, এটি আবশ্যিকও নয় আবার মুস্তাহাবও নয়, কিন্তু এ থেকে হারাম হওয়ার বিষয়টি কিছুতেই প্রমাণ হয় না।<sup>[২]</sup>

একই ধরনের হাদিস ইমাম মুসলিম রাহিমাল্লাহ আয়িশা রায়িয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন—

[১] সহিহ মুসলিম : ২১০৭; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৪৫৮৬

[২] আল-মিনহাজ শারহ সহিহ মুসলিম, নববি, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৮৬-৮৭

এ হাদিস দ্বারা গর্হিত বিষয় দেখলে হাত দ্বারা তা প্রতিহত করা, নিষিদ্ধ ছবি-প্রতিকৃতিকে ছিড়ে ফেলা এবং গর্হিত-খারাপ কাজ দেখলে রাগায়িত হওয়ার ব্যাপারে দলিল দেওয়া হয়। পাশাপাশি এটারও দলিল দেওয়া হয় যে, ছবিযুক্ত কাপড় কর্তন করে তা দিয়ে বালিশ বানানো যাবে। আল্লাহ তাআলা-ই ভালো জানেন। আর পর্দা ছিড়ে তা অপসারণ করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি ‘মহান আল্লাহ আমাদেরকে পাথর অথবা মাটিকে বস্ত্র পরানোর নির্দেশ দেননি’ এটা দ্বারা এ দলিল দেওয়া হয় যে, দেওয়ালে পর্দা টানানো এবং ঘরকে কাপড় দ্বারা সজ্জিত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে এটা মাকরুহে তানিয়িহি বা অনুগ্রহ, হারাম নয়।

তবে শাস্তি আবুল ফাতহ নাসর আল-মাকদিসি রাহিমাল্লাহ এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, দেওয়ালে পর্দা দেওয়া এবং ঘরকে কাপড় দ্বারা সজ্জিত করা হারাম। আর, ইমাম নববি রাহিমাল্লাহ তার সে বন্ধুব্যক্ত খণ্ডন করে বলেছেন যে, এ হাদিসে এটা হারাম হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এখানে ইমাম নববি রাহিমাল্লাহ এটা বোঝাতে চাননি যে, এ হাদিস থেকে ছবি-প্রতিকৃতি হারাম হওয়ার বিষয়টি বোঝা যায় না। বরং তার উদ্দেশ্য হলো, দেওয়ালে পর্দা দেওয়া এবং ঘরকে কাপড় দ্বারা সজ্জিত করা হারাম হওয়ার বিষয়টি এ হাদিস থেকে সাব্যস্ত হয় না।

كَانَ لَهَا سِرْتٌ فِيهِ تِهَّمَّاً طَائِرٌ ، وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَوْلِي هَذَا ، فَإِنِّي كُلُّمَا دَخَلْتُ قَرَائِبَهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا

আমাদের একটি পর্দা ছিল, তাতে পাখির ছবি ছিল। আর প্রবেশকারী গৃহে প্রবেশ করলে তা তার সম্মুখে পড়ত। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, এটা সরিয়ে ফেলো। কারণ, যতবার আমি প্রবেশ করে তা দেখতে পাই, ততবারই আমার দুনিয়ার কথা স্মরণ হয়।[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্দাটি ছিড়ে ফেলার নির্দেশ দেননি, তিনি শুধু অপছন্দ করে সেটি সরিয়ে ফেলতে বলেছেন, যাতে ঘরে প্রবেশ করেই প্রথমে চিত্রযুক্ত একটি পর্দা দেখতে না হয়, যেটি আবার তাকে দুনিয়ার বিলাসিতা ও জাঁকজমকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাহাড়া নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ন্যত ও নফল নামাজগুলো ঘরেই পড়তেন, আর এই জাতীয় চিত্র ও নকশা-জাতীয় পর্দা স্বাভাবিকভাবেই সালাত আদায়কারীর মনোযোগ ও মনোনিবেশে বিঘ্নতা সৃষ্টি করবে।[২]

আনাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ ، سَرَّتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا ، قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمِيطِي عَنِّي ، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَغْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي

আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহার নিকট কিছু পর্দার কাপড় ছিল, তা দিয়ে তিনি ঘরের এক দিকে পর্দা টানিয়েছিলেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, আমার সামনে থেকে এটা সরিয়ে নাও, কেননা এর ছবিগুলো অনবরত আমার সালাতের মধ্যে এসে পড়ে।[৩]

[১] সহিহ মুসলিম : ২১০৭; সুনানুন নাসাই : ৫৩৫৩

[২] এ হাদিসটি মূলত মানসুখ বা রহিত; যেমনটি ইমাম নববি রায়িয়াহুল্লাহ বলেছেন। অর্থাৎ এটা ছবি-প্রতিকৃতি হারাম হওয়ার আগের ঘটনা। আর এজন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিঃপূর্বে ঘরে একাধিকবার আসা-যাওয়া করলেও এ ব্যাপারে কোনো তিরস্কার বা বাধা প্রদান করেননি। সুতরাং এ মানসুখ হাদিস দ্বারা ছবি-প্রতিকৃতি বৈধ হওয়ার পক্ষে দলিল দেওয়া যাবে না। [দেখুন, আল-মিনহাজ শারহ সহিহ মুসলিম, নববি, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৮৭]

[৩] সহিহল বুখারি : ৫৯৫৯; মুসতাখরাজু আবি আওয়ানা : ১৪৭৬

এই হাদিস থেকে স্পষ্ট হয়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘরে একটি পাখি ও চিত্রযুক্ত পর্দা রাখার সুৰক্ষিত দিয়েছিলেন।<sup>[১]</sup> এই সব হাদিসের কারণে অনেক সালাফ বলেছেন, ‘যার ছায়া আছে, সেই প্রতিকৃতি ঘরে রাখা নিষিদ্ধ। যার ছায়া নেই, সেই ছবি বা চিত্রতে কোনো সমস্যা নেই’।<sup>[২]</sup>

এই মতকে সমর্থন করে হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার বাণী—

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنَ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخْلَقِي ، فَلَيَخْلُفُوا ذَرَّةً أَوْ شَعِيرَةً

আর ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম কে হতে পারে, যে আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে শুরু করে? পারলে সে একটা পিপড়া সৃষ্টি করুক কিংবা একটা শস্যদানা সৃষ্টি করুক কিংবা একটি যব সৃষ্টি করুক!<sup>[৩]</sup>

কারণ, আল্লাহর সৃষ্টি—যেমন আমরা দেখছি—কোনো অঙ্কন বা চিত্রায়ন নয়; বরং রক্ত-মাংসের সৃষ্টি নিয়ে হচ্ছে তাঁর কারবার।<sup>[৪]</sup> যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেন—

. ① هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ كُمْ فِي الْأَرْضِ كَيْفَ يَشَاءُ... .

[১] এ হাদিসে প্রাণীর ছবি-প্রতিকৃতির কোনো কথা উল্লেখ নেই। শুধু এটাকু বলা হয়েছে যে, পর্দায় কিছু ছবি-প্রতিকৃতি ছিল। সেগুলো প্রাণীর ছবি-প্রতিকৃতি নাকি প্রাণী ছাড়া অন্য কোনো দৃশ্যের ছবি তা স্পষ্ট নয়। এজন্য এ হাদিসটি প্রাণীর ছবি বৈধ হওয়ার দলিল হিসেবে বিবেচ্য হবে না। যেমন : হাফিয় ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

وَهَذَا كَانَتْ نَصَاوِيرُهُ مِنْ غَيْرِ الْحَيَاةِ

আর এ হাদিসে পর্দার ছবিগুলো প্রাণী ছাড়া অন্য কিছুর ছিল। [ফাতহুল বারি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩৯১]

[২] এখানে অনেক সালাফ বলতে বোঝানো হয়েছে, ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ ও তার অনুসারীগণ। তার পূর্বেও কিছু সালাফ এ মত পোষণ করতেন, তবে তাদের সংখ্যা খুবই সীমিত। কিন্তু উম্মাহর অধিকাংশ ফকিহগণ এর বিপরীত মত পোষণ করে বলেন, ছায়াবিশিষ্ট হোক বা ছায়াহীন হোক সকল ধরনের প্রাণীর ছবি-প্রতিকৃতি ই হারাম। ছায়াবিশিষ্ট ছবি-প্রতিকৃতি বলতে বোঝানো হয়েছে, শরীরী ও দেহবিশিষ্ট তথা ভাস্কর্য-মূর্তি। আর ছায়াহীন ছবি-প্রতিকৃতি বলতে বোঝানো হয়েছে, কাগজে বা কাপড়ে বা দেওয়াল ইত্যাদিতে চিত্রিত ছবি, যার কোনো ছায়া থাকে না।

[৩] সহিলুল বুখারি : ৭৫৫৯; সহিহ মুসলিম : ২১১১

[৪] এ হাদিসে কুদসিতও ছবি-প্রতিকৃতি বৈধ হওয়ার কোনো দলিল নয়। কেননা, ‘আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি’ বলে সাদৃশ্য বোঝানো হয়েছে। আর এ সাদৃশ্য যেমন ভাস্কর্য-মূর্তি বানানোর মধ্যে পাওয়া যায়, তদুপ কাগজ, কাপড় বা দেওয়াল ইত্যাদিতে ছবি অঙ্কনের মধ্যেও পাওয়া যায়।

তিনিই মাত্রগভর্ডে যেভাবে ইচ্ছে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন [১]

অবশ্য আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহার একটি হাদিস পাওয়া যায়, যার ফলে এই মতামত প্রশংসিত হয়ে পড়ে। হাদিসটি হলো—

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا أَخْبَرَتْ نُبُرْقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا  
 رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ  
 الْكَرَاهِيَّةُ، فَقَلَّتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَثُوبُ إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا  
 أَذَّبَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ هَذِهِ النُّبُرْقَةِ؟ قَلَّتْ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ  
 لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ  
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيَقُولُ لَهُمْ أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ: إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا  
 يَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ

উশ্মুল মুমিনিন আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি একটি কুশন (গদিযুক্ত আসনবিশেষ) ক্রয় করেন, যাতে বেশ কিছু ছবি-প্রতিকৃতি ছিল। অতঃপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ঘরে প্রবেশ করার সময়) তা দেখতে পেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, ঘরে প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টি দেখতে পেলাম। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাওবা করছি। আমি কী অপরাধ করেছি? তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ (ছবিযুক্ত) কুশনের কী অবস্থা (কোথা থেকে এখানে এসেছে)? আমি বললাম, আমি এটি আপনার জন্য ক্রয় করেছি, যাতে আপনি এতে বসতে পারেন এবং বালিশবুপে ব্যবহার করতে পারেন। তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণকারীদের কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছিলে, তাতে জীবন দান করো। তিনি আরো বললেন, নিশ্চয়ই যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি-প্রতিকৃতি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না।[২]

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৬

[২] সহিলুল বুখারি : ২১০৫; সহিহ মুসলিম : ২১০৭

সহিহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা বলেন—

فَأَخْذُنَّهُ فَجَعَلْنَاهُ مِرْفَقَتَيْنِ فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ

| অতঃপর তা নিয়ে আমি সেটাকে আরামদায়ক দুটি বালিশ বানিয়ে দিলাম। ফলে  
| তিনি ঘরে সে দুটিতে হেলান দিতেন।[১]

কিন্তু এই হাদিসের ওপর বেশ কিছু আপত্তি উত্থাপিত হয়—

» এই হাদিসটি অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যত হাদিসের তথ্যগুলো  
অনেকটা পরস্পর সাংঘর্ষিক। কোনো কোনো বর্ণনা বলছে, চিত্রযুক্ত পর্দা কেটে  
বালিশ বানানোর পরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটি ব্যবহার  
করেছেন। অন্যদিকে কিছু বর্ণনা বলছে, পর্দা বলতে কিছু ছিলই না; আয়িশা  
রায়িয়াল্লাহু আনহা বালিশ কিনে এনেছেন।[২]

» কিছু বর্ণনার তথ্য অনুসারে চিত্রযুক্ত পর্দা দিয়ে দেওয়াল ঢাকতে নিষেধ করেছেন;  
কারণ, এভাবে পর্দা বোলানো মূলত বিলাসিতার নির্দর্শন।[৩] যেমন : ইমাম মুসলিম

[১] সহিহ মুসলিম : ২১০৭; মুসলাদু ইবনিল জাদ : ২৯২০

[২] এটাকে পরস্পর সাংঘর্ষিক বলা যায় না। বরং সম্ভাবনা রয়েছে যে, এখানে দুইটি ভিন্ন ঘটনা পৃথকভাবে  
বর্ণিত হয়েছে। হাদিসের ভাঙ্গারে এমন উদাহরণ অনেক আছে। আর হাদিস দুটি যেহেতু সহিহ বুখারি ও  
সহিহ মুসলিমের তখন সেখানে সাংঘর্ষিকতার সুযোগ নেই বললেই চলে। কেননা, সহিহ বুখারি ও মুসলিমের  
সকল হাদিস উচ্চতের সিংহভাগ আলিমের মতে সহিহ ও গ্রহণযোগ্য। এতে দুর্বল বা অগ্রহণযোগ্য কোনো  
হাদিস নেই। এ ব্যাপারে উচ্চতের অনেকটা ঐক্যত্ব রয়েছে।

[৩] পর্দা বোলানো বিলাসিতা হিসেবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাকে অপচন্দ করেছেন  
এবং বলেছেন, ‘মহান আল্লাহ আমাদেরকে পাথর অথবা মাটিকে বস্ত্র পরানোর নির্দেশ দেননি।’ এর  
দ্বারা প্রমাণ হয় যে, বিলাসিতার উদ্দেশ্যে দেয়ালে পর্দা টানানো এবং ঘরকে কাপড় দ্বারা সজ্জিত করা  
মাকরুহে তানিয়িহি বা অনুত্তম; যেমনটি ইয়াম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন। [আল-মিনহাজ শারহু সহিহ  
মুসলিম, নববি, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৮৬] কিন্তু সহিহ মুসলিমের সে হাদিসেই এসেছে—‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা বলার পূর্বে যখন ছবিযুক্ত চাদরটি দেখতে পেলেন, তখন তার চেহারায় ঘণা  
ও অসন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠল। এরপর তিনি তা টেনে নামিয়ে ফেললেন; এমনকি তা ছিড়ে টুকরো টুকরো  
করে ফেললেন।’ এখান থেকে বোঝা যায়, পর্দায় ছবি থাকার কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম অত্যন্ত রাগাত্মিত হয়ে যান; এমনকি তিনি তা ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। আর একজন নবির  
অন্য এটাই স্মাভাবিক যে, কোনো গর্হিত কাজ দেখলে তিনি তা শক্ত হাতে প্রতিহত করবেন। পর্দা বোলানো  
মারাঞ্চক কোনো গর্হিত কাজ নয়, কিন্তু ছবিযুক্ত পর্দা লাগানো মারাঞ্চক গুনাহ ও স্পষ্ট গর্হিত কাজ। আর

রাহিমাত্তুল্লাহ বর্ণনা করছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—‘মহান আল্লাহ আমাদেরকে পাথর অথবা মাটিকে বস্ত্র পরানোর নির্দেশ দেননি’[১]

» আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহার এই হাদিসেই সহিং মুসলিমের এক বর্ণনায় পাখির চিত্রিত একটি পর্দার কথা উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন বলেছেন, এটা সরিয়ে ফেলো। কারণ, যতবার আমি প্রবেশ করে তা দেখতে পাই ততবারই আমার দুনিয়ার কথা স্মরণ হয়।’ এই হাদিসটিও চিত্রিত কাপড় ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা বোঝায় না।[২]

» এই হাদিসটি ‘কিরাম’[৩]—এর হাদিসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ‘কিরাম’—এর হাদিসে পর্দার চিত্রগুলো তার সালাতের মধ্যে এসে পড়ে, তাই আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহাকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্দাটি সরিয়ে ফেলতে বলেছেন। হফিয ইবনু হাজার আসকালানি বলেন, ‘আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত বালিশের হাদিসের[৪] সঙ্গে এই হাদিসটির বক্তব্য সাংঘর্ষিক। এই ‘কিরাম’—এর

এজন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছবিযুক্ত পর্দাকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছেন। ছবি ছাড়া শুধু পর্দা হলে তিনি এমন কঠোরতা দেখাতেন না।

[১] সহিং মুসলিম : ২১০৭; আল-আদাব, বাইহাকি : ৫২৯

[২] ইতিঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, এ হাদিসটি মূলত মানসুখ বা রহিত; যেমনটি ইমাম নবিবি রাহিমাত্তুল্লাহ বলেছেন। অর্থাৎ এটা ছবি-প্রতিকৃতি হারাম হওয়ার আগের ঘটনা। আর এজন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিঃপূর্বে ঘরে একাধিকবার আসা-যাওয়া করলেও এ ব্যাপারে কোনো তিরস্কার বা শক্ত বাধা প্রদান করেননি। সুতরাং এ মানসুখ হাদিস দ্বারা ছবি-প্রতিকৃতি বৈধ হওয়ার পক্ষে দলিল দেওয়া যাবে না। [দেখুন, আল-মিনহাজ শারহু সহিং মুসলিম, নববি, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৮৭]

[৩] ‘কিরাম’—এর হাদিস বলতে বোঝানো হয়েছে, এই হাদিস—

‘আনাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহার নিকট কিছু পর্দার কাপড় ছিল, তা দিয়ে তিনি ঘরের এক দিকে পর্দা টালিয়েছিলেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, আমার সামনে থেকে এটা সরিয়ে নাও, কেননা এর ছবিগুলো অনবরত আমার সালাতের মধ্যে এসে পড়ে।’ [সহিলুল বুখারি : ৫৯৫৯]

[৪] বালিশের হাদিস বলতে বোঝানো হয়েছে, এই হাদিস—

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি একটি কুশন (গদিযুক্ত আসনবিশেষ) ক্রয় করেন, যাতে বেশ কিছু ছবি-প্রতিকৃতি ছিল। অতঃপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ঘরে প্রবেশ করার সময়) তা দেখতে পেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, ঘরে প্রবেশ করলেন না। আমি তার চেহারায় অস্ত্রুটি দেখতে পেলাম। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাওবা করছি। আমি কী অপরাধ করেছি? তখন

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, চিত্রিযুক্ত পর্দাটি ঘরে থাকাতে তিনি কোনো আপত্তি করেননি, কিন্তু যখন সালাতের সমস্যা হচ্ছিল, তখন তিনি পর্দাটি সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন। এথেকে বুঝে আসে, এখানে চিত্র বা ছবি থাকার বিষয়টি মুখ্য নয়।<sup>[১]</sup>

ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ দুই হাদিসের মধ্যে সমন্বয় করতে চেয়েছেন এভাবে—‘প্রথম হাদিসটিতে প্রাণীর চিত্রিযুক্ত পর্দার কথা এসেছে আর দ্বিতীয় হাদিসটিতে প্রাণহীন বস্তুর চিত্রিযুক্ত পর্দার কথা আলোচিত হয়েছে।’ (গ্রন্থকার ড. ইউসুফ কারযাবি বলেন,) কিন্তু তার এই সমন্বয় প্রচেষ্টা আপত্তির মুখে পড়ে ‘কিরাম’-সংক্রান্ত ওই বর্ণনাটির কারণে, যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘পর্দার মধ্যে একটি পাখির চিত্র ছিল।’<sup>[২]</sup>

» আবু তালহা আনসারি রায়িয়াল্লাহু আনহুর হাদিস, যাতে কাপড়ে অঙ্কিত চিত্রের বৈধতা উল্লেখিত হয়েছে, তার সঙ্গে এই হাদিসটি সাংঘর্ষিক<sup>[৩]</sup> ইমাম কুরতুবি

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ (ছবিযুক্ত) কুশনের কী অবস্থা (কোথা থেকে এখানে এসেছে)? আমি বললাম, আমি এটি আপনার জন্য কিনেছি, যাতে আপনি এতে বসতে পারেন এবং বালিশরূপে ব্যবহার করতে পারেন। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণকারীদের কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছিলে, তাতে জীবন দান করো। তিনি আরো বললেন, নিশ্চয়ই যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি-প্রতিকৃতি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না। [সহিতুল বুখারি : ২১০৫; সহিহ মুসলিম : ২১০৭]

[১] ইতিঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, এ হাদিসে প্রাণীর ছবি-প্রতিকৃতির কোনো কথা উল্লেখ নেই। শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, পর্দায় কিছু ছবি-প্রতিকৃতি ছিল। সেগুলো প্রাণীর ছবি-প্রতিকৃতি নাকি প্রাণী ছাড়া অন্য কোনো দৃশ্যের ছবি তা স্পষ্ট নয়। এজন্য এ হাদিসটি প্রাণীর ছবি বৈধ হওয়ার প্রবন্ধাদের পক্ষে দলিল হিসেবে বিবেচ্য হবে না। যেমন হাফিয় ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—وَفَدَأَكَانْتْ تَصَاوِيرُهُ مِنْ غَيْرِ الْحَيَّوَانِ—‘আর এ হাদিসে পর্দার ছবিগুলো প্রাণী ছাড়া অন্য কিছুর ছিল।’ [ফাতহুল বারি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩৯১]

[২] কিন্তু ইতিঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, এ হাদিসটি মূলত মানসুখ বা রহিত; যেমনটি ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন। অর্থাৎ এটা ছবি-প্রতিকৃতি হারাম হওয়ার আগের ঘটনা। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিঃপূর্বে তাঁর ঘরে একাধিকবার আসা-যাওয়া করলেও এ ব্যাপারে কোনো তিরস্কার বা শক্ত বাধা প্রদান করেননি। কেননা, আগে এসব ছবি জায়িয় ছিল, পরবর্তী সময়ে তা নিষিদ্ধ হয়েছে। [দেখুন, আল-মিনহাজ শারহু সহিহি মুসলিম, নববি, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৮৭]

[৩] ইতিঃপূর্বে আমরা এ সাংঘর্ষিকতার জবাবও উল্লেখ করে এসেছি। আবু তালহা রায়িয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে এসেছে- ‘তবে কাপড়ে অঙ্কিত ছবি হলে ভিন্ন কথা।’ এখানে পরিষ্কারভাবে প্রাণীর ছবি জায়িয় হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি। বরং শুধু এতটুকু উল্লেখ রয়েছে যে, কাপড়ে অঙ্কিত ছবে তা জায়িয় আছে। অধিকাংশ ফকির এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে প্রাণহীন বস্তুর ছবির কথা বোঝানো হয়েছে। সুতরাং এটা দ্বারা কাপড়ে বা কাগজে বা দেওয়াল ইত্যাদিতে অঙ্কিত প্রাণীর ছবি জায়িয় হওয়ার দলিল পেশ

রাহিমাহুল্লাহ সমন্বয় করতে চেয়েছেন যেভাবে—আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহার হাদিস থেকে চিত্রিত পর্দা ইত্যাদির ব্যবহার মাকরুহ, সেটি প্রমাণিত হচ্ছে। অন্যদিকে আবু তালহা রায়িয়াল্লাহু আনহুর হাদিস থেকে এই বিষয়টির বৈধতা বোৰা যাচ্ছে। আর শরিয়তে বৈধ যেকোনো বস্তু একইসাথে মাকরুহও হতে পারে। বস্তুত এই দুটির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এই মতামতটিকে ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহও পছন্দ করেছেন [১]

» বালিশের হাদিসটি আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন তার ভাতিজা (কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি আবি বকর রাহিমাহুল্লাহ)। কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহর মত ছিল, ‘দেহবিহীন ছবিযুক্ত আসবাবপত্রের ব্যবহার বৈধ।’ [২]

ইবনু আউন রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

دَخَلْتُ عَلَى الْقَاسِمِ وَهُوَ يَأْغِلِي مَكْهَةً فِي بَيْتِهِ فَرَأَيْتُ فِي بَيْتِهِ حَجَلَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ الْقُنْدُسِ  
وَالْعَنَقَاءُ

করা সঠিক নয়; যেমনটি বলেছেন ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ। [আল-মিনহাজ শাররু সহিহ মুসলিম, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৮৫-৮৬] আর হাফিয় ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ এ জবাবটি উল্লেখের পাশাপাশি আরেকটি জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, এটাও হতে পারে যে, কাপড়ে অঙ্কিত ছবি ব্যতিক্রম হওয়ার বিধানটি নিষেধাজ্ঞার পূর্বে ছিল; যেমনটি প্রমাণ করে আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিস, যা বর্ণনা করেছেন ‘সুনান’—এর সংকলকগণ।’ অর্থাৎ কাপড়ে বা কাগজে বা দেওয়াল ইত্যাদিতে অঙ্কিত প্রাণীর ছবি জায়িয় একসময় জায়িয় থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা মানসূখ বা রাহিত হয়ে গেছে। [ফাতহুল বারি, ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩৯০-৩৯১]

[১] এ জবাবের সারকথা হলো, একটি জিনিস একইসাথে বৈধ ও মাকরুহ হতে পারে। বৈধ হওয়ার অর্থ তা হারাম নয়, কিন্তু এতে এ নিশ্চয়তা থাকে না যে, তারা মাকরুহও হবে না। সুতরাং বৈধ হওয়ার পরও কোনো জিনিস মাকরুহ হতে পারে। ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, আবু তালহা আনসারি রায়িয়াল্লাহু আনহুর হাদিস দ্বারা বৈধতা তো প্রমাণিত হয়, কিন্তু আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহার হাদিস থেকে প্রমাণ হয় যে, তা মাকরুহ। সুতরাং এটা হারাম না হলেও মাকরুহ হবে। এটা মূলত মালিকি মাযহাবের একাংশ ফকিহগণের ব্যাখ্যা। তারা এভাবে কাগজে বা কাপড়ে বা দেওয়াল ইত্যাদিতে অঙ্কিত ছবিকে হারাম না বলে মাকরুহ হিসেবে বিবেচনা করেন। কিন্তু জমহুর ফকিহগণ এটার জবাব অন্যভাবে দিয়েছেন, যা আমরা ইতিঃপূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করেছি।

[২] কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি আবি বকর রাহিমাহুল্লাহর মত ছিল। তিনি ছাড়াও আরো কিছু সালাফ এমন মত পোষণ করতেন। পরবর্তী সময়ে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ এ মতটি প্রশংসন করেন। কিন্তু এর বিপরীতে উম্মাহর অধিকাংশ ফকিহগণ এটাকে হারাম হিসেবেই অভিহিত করেছেন; যেমনটি আমরা ইতিঃপূর্বে একাধিকবার বলে এসেছি।

আমি কাসিম রাহিমাহুল্লাহর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি তখন মকার উপকঠে অবস্থিত তার নিজের ঘরে ছিলেন। আমি তার ঘরে একটি চাদোয়া দেখতে পেলাম, যাতে বিবর<sup>[১]</sup> ও আনকা<sup>[২]</sup> পাখির ছবি ছিল।<sup>[৩]</sup>

হাফিয় ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘সম্ভবত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের **فِي نُوبَرْ قِرْبَهِ لَّا**’ (কাপড়ে অঙ্কিত হলে ভিন্ন কথা) উন্নিটি থেকে কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ ব্যাপক অনুমতি বুঝেছেন। তার মতে, ছবিযুক্ত পর্দা নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য দুটি বিষয় একত্রে পাওয়া যেতে হবে। এক. প্রাণীর ছবিযুক্ত হওয়া। দুই. দেওয়াল ঢাকা। এই দুটি বিষয় একত্র হলে তবেই সেই কাপড় বা পর্দার ব্যবহার নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে; অন্যথায় নয়। মদিনার বিখ্যাত সাতজন ফরিদের অন্যতম হলেন কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ। তিনি তার সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তক এবং ছবিযুক্ত বালিশ-সংক্রান্ত হাদিসের বর্ণনাকারী। তিনি চিত্রযুক্ত পর্দার অনুমোদনের বিষয়টি হাদিস থেকেই বুঝেছেন। অন্যথায় তিনি তার ঘরে ছবিযুক্ত চাদোয়া ব্যবহারের অনুমতি দিতেন না।’<sup>[৪]</sup>

ছবি, প্রতিকৃতি ও তা নির্মাণকারী-বিষয়ক হাদিসগুলোর দিকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে তাকালে যা বোঝা যায়, তা হলো—প্রাথমিক অবস্থায় ছবি ও ছবি-সংক্রান্ত বিষয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর ছিল। বিশেষ করে আরবরা যেহেতু মাত্রই শিরকি কর্মকাণ্ড এবং মূর্তিপূজা ও প্রতিকৃতির প্রতি সম্মান আরোপের সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হয়েছেন; পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে তাদের

[১] আরবি **سِرْدِنْفَلْ** অর্থ বীর। ইংরেজিতে বলা হয় beaver। এটা ধারালো দাঁতওয়ালা একজাতীয় লোমশ উভচর প্রাণী, যে গাছ কেটে বাঁধ নির্মাণে পটু।

[২] আরবি **قِرْبَهِ** অর্থ লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট। এটা একটা পাখির নাম। তবে এ পাখির অস্তিত্ব কোথাও দেখা যায় না। আরবের মানুষ এটার একটা কাঙ্গালিক রূপ এঁকে তার নানারকম ছবি-প্রতিকৃতি বানাত। আরবি সাহিত্যে এটাকে রূপকথার পাখি হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

[৩] মুসাল্লাফু ইবনি আবি শাইবা : ২৫৮১০; বর্ণনাটির সনদ সহিহ।

[৪] ফাতহুল বারি, ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩৮৮

হাফিয় ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ এটা উল্লেখ করার বলেন, ‘কিন্তু ছবি-সংক্রান্ত সকল হাদিস সামনে রাখলে প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম রাহিমাহুল্লাহর এ মতটি অগ্রহণযোগ্য। হাদিসে ছবির ব্যাপারে যে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সেটা হলো ওই ছবি, যা অসম্মানজনক অবস্থায় থাকে। কিন্তু যে ছবি কোথাও সম্মানজনকভাবে স্থাপিত থাকে, সেটা কখনো অনুমোদিত নয়।’ [ফাতহুল বারি, ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩৮৮]

আকিদা-বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে, ঈমানের শেকড় তাদের মন ও মননের গভীরে গেঁথে গিয়েছে, তখন তাদের জন্য দেহবিহীন নকশা ও রং-কালির ছবির ক্ষেত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিত্রিযুক্ত পর্দা তার ঘরে রাখতে দিয়েছেন বা কাপড়ে অঙ্কিত চিত্র ব্যবহারে শিথিলতা প্রদান করেছেন। অন্যথায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছবিযুক্ত পর্দা তার ঘরে রাখতে দেওয়ার বা কাপড়ে অঙ্কিত ছবি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করার প্রশ্নই আসে না। কাগজ, দেওয়াল ইত্যাদিতে অঙ্কিত ছবির বিধানও পর্দায় অঙ্কিত ছবির আওতাভুক্ত।

হানাফি মাযহাবের একজন বিখ্যাত ফকির ইমাম তাহাবি রাহিমাল্লাহ বলেন, ‘আরবের মুসলিমরা মাত্রই প্রতিকৃতি ও মূর্তির পূজা থেকে মুক্ত হয়েছে, তাই সতর্কতাবশত শুরুতে মূর্তি-জাতীয় যাবতীয় কিছু থেকে তাদেরকে দূরে রাখার জন্য সব ধরনের ছবির ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। পরবর্তী সময়ে নিষেধের বিষয়টি মানুষের অঙ্গে বসে যাওয়ার পরে তাদের জন্য ছবি-অঙ্কিত কাপড়, অসম্মানজনক স্থানে ছবিযুক্ত জিনিসপত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। কারণ, একজন মূর্খ ব্যক্তিও অসম্মানজনক স্থানে থাকা ছবির প্রতি সম্মান জানাবে না। তবে সম্মানজনক স্থানের ছবির নিষেধাজ্ঞা এখনো বহাল আছে’<sup>[১]</sup>।

### যেসব স্থানে চিত্রের ব্যবহার বৈধ

বিকৃতির কারণে কোনো চিত্র বা ছবি যখন সম্মানের অযোগ্য হয়ে পড়ে, তখন সেটি মাকরুহের গতি থেকে বেরিয়ে বৈধতার সীমায় চলে আসে<sup>[২]</sup>। একটি হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—

اسْتَأْذِنْ چَبِرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: ادْخُلْ فَقَالَ: كَبَفْ  
أَدْخُلْ وَفِي بَيْتِكَ سِرْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ ، فَإِنَّمَا أَنْ تَقْطَعَ رُغْوَسَهَا ، أَوْ تَجْعَلْ بِسَاطًا يُوْطَأً فِيَّا

[১] উমদাতুল কারি, আইন, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ৭৪

[২] এটাই অধিকাংশ ফকিরের মত। হানাফি, শাফিয়ি, মালিকি ও হাবলিসহ অধিকাংশ ফকির বলেন, ছবি যদি অসম্মানজনক স্থানে থাকে তাহলে তার ব্যবহার বৈধ। যেমন : বালিশ, বিছানা, কার্পেট, পাপোশ ইত্যাদিতে থাকা ছবি, যা সাধারণত হাত-পা-শরীর দিয়ে মাঝানো হয়। সুতরাং এসব স্থানে কোনো ছবি থাকলে তা নিষিদ্ধ ছবির অন্তর্ভুক্ত হবে না। [রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৪৮; আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ১১৮-১১৯]

مَغْشَرُ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ تَصَاوِيرٌ

জিবরিল আলাইহিস সালাম একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট (ঘরে) প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন, প্রবেশ করুন। জিবরিল আলাইহিস সালাম বললেন, আমি কী করে প্রবেশ করব; আপনার ঘরে এমন পর্দা রয়েছে, যাতে অনেক ছবি রয়েছে? সুতরাং আপনি হয় সেগুলোর মাথা কেটে ফেলুন, নয়তো তা দিয়ে বিছানা বানান, যা পদদলিত হবে। কেননা, আমরা ফেরেশতাগণ এমন ঘরে প্রবেশ করি না, যেখানে ছবি-প্রতিকৃতি রয়েছে।<sup>[১]</sup>

এজন্য আয়িশা রাখিয়াল্লাহু আনহা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায় ছবিযুক্ত বালিশের প্রতি বিরক্তি দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে ছিঁড়ে ফেললেন। পরে সেটিকে ছোট ছোট দুটো হেলান দেওয়ার বালিশ বানিয়ে ফেললেন। কেননা, এতে ছবির অবমাননা যেমন হয়, তেমনি এতে ছবির প্রতি ন্যূনতম সম্মান প্রদর্শনও বাকি থাকে না।

পূর্বসূরি অনেক আলিমের ব্যাপারে জানা যায়, তারা অসম্মানজনক ছবিযুক্ত বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করতেন, একে তারা দৃশ্যণীয় মনে করতেন না। যেমন : হিশাম ইবনু উরওয়া রাহিমাহুল্লাহ তার পিতা উরওয়া রাহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে বর্ণনা করেন—

كَانَ يَتَكَبَّرُ عَلَى الْمَرَافِقِ فِيهَا التَّمَاثِيلُ: الْطَّئِيرُ وَالرَّجَالُ

তিনি (উরওয়া রাহিমাহুল্লাহ) এমন আরামদায়ক বালিশসমূহে হেলান দিয়ে বসতেন, যেগুলোতে পাথি, মানুষ ইত্যাদির ছবি থাকত।<sup>[২]</sup>

ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

كَانُوا يَكْرَهُونَ مَا نُصِبَ مِنَ التَّمَاثِيلِ نَصْبًا، وَلَا يَرْفَعُنَّ بَأْسًا بِمَا وَطَئَتِ الْأَقْدَامُ

[১] সুনানুন নাসাই : ৫৩৬৫; শারহু মাআনিল আসার, তাহাবি : ৬৯৪৬; সহিল ইবনি হিবান : ৫৮৫৩; হাদিসাটি সহিহ।

[২] মুসামাফু ইবনি আবি শাইবা : ২৫৭৯৭; বর্ণনাটির সনদ সহিহ।

তারা (সাহাবা ও তাবিয়িন) সম্মানের সঙ্গে সংরক্ষিত ছবি-প্রতিকৃতিকে খারাপ (নাজায়িয়) মনে করতেন, কিন্তু যেসব ছবি-প্রতিকৃতি (অসম্মানজনক অবস্থায়) পায়ের নিচে পদদলিত হতো, এগুলোর ব্যাপারে তারা কোনো আপত্তি করতেন না।<sup>[১]</sup>

ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহ থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

كَانُوا يَقُولُونَ فِي التَّصَاوِيرِ فِي الْبَسْطِ وَالْوَسَائِدِ الَّتِي ثُوَطَ أَذْلَلَ لَهَا

তারা (সাহাবা ও তাবিয়িন) বলতেন, বিছানা, বালিশ ইত্যাদিতে যেসব ছবি-প্রতিকৃতি থাকে, যা (সাধারণত) পদদলিত করা হয়, এগুলোর জন্য তা অবমাননা (তাই এমন অবমাননাকর ছবিযুক্ত জিনিস ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই)।<sup>[২]</sup>

**ডিজিটাল ছবির ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?**

এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা যে, চিত্র ও চিত্রায়ন-বিষয়ক বর্ণিত সকল তথ্যই খোদাইকৃত বা (কাগজে, কাপড়ে বা দেওয়াল ইত্যাদিতে) অঙ্কিত চিত্রে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা ফটোর বিষয়টি নবিযুগ বা পরবর্তী মনীষীদের যুগেও ছিল না। এটি সম্পূর্ণই নতুন একটি বিষয়। চিত্র ও চিত্রকর-বিষয়ক হাদিস ও কুরআনের বিধান সবই কি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে নাকি হবে না?

যারা শুধু দেহবিশিষ্ট ছবি নিষেধের প্রবন্ধ (অর্থাৎ মালিকি মাযহাবের ফকিহগণ), তারা এগুলোকে হারাম মনে করবেন না; বিশেষ করে যদি ছবি পূর্ণাঙ্গ না হয়।

অন্যদের বক্তব্য অনুসারে এক্ষেত্রে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তুলির আঁচড়ে অঙ্কিত ছবির বিধান কি ক্যামেরার ফটোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, নাকি ‘নিষিদ্ধতা বা বৈধতার কারণ পাওয়া গেলে বিধান প্রযোজ্য হবে, অন্যথায় বিধান প্রযোজ্য হবে না’—ইসলামি আইনের এই মূলনীতি অনুসারে চিত্রকরদের শাস্তি-বিষয়ক কারণ (আল্লাহর সৃষ্টির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা) না পাওয়া যাওয়ায় সেই বিধান এখানে

[১] মুসাম্মাফু ইবনি আবি শাইবা : ২৫৮০০; বর্ণনাটির সনদ সহিহ।

[২] মুসাম্মাফু ইবনি আবি শাইবা : ২৫৭৯৯; বর্ণনাটির সনদ সহিহ।

প্রয়োজ্য হবে না?

মিশরের সাবেক মুফতি শাইখ বাখিতের ফটোয়া এক্ষেত্রে অনেকটা স্পষ্ট। তিনি এ ব্যাপারে বলেন, ‘ক্যামেরার মাধ্যমে ধারণকৃত ফটোতে মূল চিত্রের কিছুই থাকে না। এতে কেবল দৃশ্যের একটি ছায়াকে ধারণ করা হয়। এর সঙ্গে হাদিসে বর্ণিত নিষিদ্ধ ছবির কোনো সম্পৃক্ততা নেই। কারণ, নিষিদ্ধ চিত্রের অর্থ হলো—কাঞ্জনিক একটি চিত্র তৈরি করা, যার অস্তিত্ব আগে-পরে ছিল না। এর মাধ্যমে আজ্ঞাহর সৃষ্টি করা গুণের সাথে সাদৃশ্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি হয়। কিন্তু ক্যামেরা-জাতীয় যন্ত্র দিয়ে ধারণকৃত ফটোর মধ্যে এসবের কিছুই পাওয়া যায় না।’[১]

এই হলো ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা ফটোর সুরূপ ও তার শারয়ি অবস্থান [২] তবে একদল আলিম রয়েছেন, যারা ক্যামেরার ফটোসহ সব ধরনের ছবির নিষিদ্ধতার পক্ষে [৩]

[১] الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي [اباحه التصوير الفوتوغرافي]

[২] এটা মিশরের সাবেক মুফতি শাইখ বাখিত রাহিমাহুল্লাহ, ড. ইউসুফ কারযাবি-সহ আরববিশ্বের একদল আলিমের মত। কিন্তু দলিল ও যুক্তির বিবেচনায় এ মতটি সঠিক নয়।

[৩] এটা শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ, শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ, শাইখ মুসতাফা আল-হামায়ি রাহিমাহুল্লাহ, শাইখ মুহাম্মাদ আলি আস-সাবুনি রাহিমাহুল্লাহ-সহ আরববিশ্বের অনেক আলিমের পাশাপাশি আমাদের উপমহাদেশের প্রায় সকল আলিমের মত। তারা মনে করেন, ছবি চাই হাত দিয়ে অঙ্কন করা হোক বা যত্রের সাহায্যে তৈরি করা হোক উভয়টির একই বিধান। সুতরাং ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তুলে তা প্রিন্ট করা হলে সেটা হাতে আঁকা ছবির মতোই হারাম। এমনকি প্রিন্ট করার আগে রিলের মধ্যে যে নেগেটিভ ছবি থাকে সেটাও হারাম। কেননা, অস্পষ্ট ছবির ব্যবহার যদিও বৈধ, কিন্তু তা তোলা হারাম; যেমনটি আলামা শায়ি রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন। কোনো ছবির ব্যবহার বৈধ হওয়ার ভিত্তিতে তা তৈরি করা বৈধ হয়ে যায় না। এজন্যই অস্পষ্ট ছবি, একেবারে ছোট ছবি বা অপমানজনক স্থানে থাকা ছবির ব্যবহার তো শরিয়তে বৈধ, কিন্তু এসব ছবি তৈরি করা হারাম। অর্থাৎ যে এসব ছবি বানিয়েছে সে গুনাহগার হবে; যদিও ব্যবহারকারীর জন্য তা ব্যবহারের অনুমতি আছে।

এখনে আরেকটি বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা ফটো আর ডিজিটাল ছবি কিন্তু এক জিনিস নয়। অর্থাৎ একটা হলো আল্যালগ ক্যামেরা দিয়ে প্রথমে রিলের মধ্যে নেগেটিভ ছবি তুলে পরে তা ওয়াশ করে প্রিন্ট বের করা হয়। আর আরেকটি হলো ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবি, যেখানে কোনো নেগেটিভ থাকে না এবং তা ওয়াশও করে প্রিন্ট করারও দরকার হয় না; বরং সরাসরি স্ক্রিনেই পরিষ্কার ছবি দেখা যায়। এই দুই প্রকারের ছবির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রথম প্রকারের ছবি তো আরববিশ্বের অনেক আলিমসহ ভারতবর্ষের অধিকাংশ আলিমের মতে হারাম, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ছবির ব্যাপারে আলিম সমাজ দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন। পাকিস্তানের দারুল উলুম করাচির মুফতি রফি উসমানি, মুফতি তাকি উসমানি-সহ ভারত উপমহাদেশের বিশেষজ্ঞ একদল আলিমের দৃষ্টিতে এটা

অবশ্য প্রয়োজনীয় ছবি, যেসব ক্ষেত্রে ছবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয় না এবং ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই, যেমন : পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদির জন্য ছবি তোলার অনুমতি তারাও দেন।<sup>[১]</sup> কারণ, ছবিযুক্ত চাদর ইত্যাদি, যেগুলো ব্যবহারের অনুমতি নথিজি সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম দিয়েছেন, তার থেকে এসব ছবির অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।

### আধুনিক ছবি ও তার বিষয়বস্তু

এতক্ষণ আমরা আধুনিক ফটোগ্রাফির স্বাভাবিক বিধান আলোচনা করেছি। তবে সন্দেহ নেই—ছবি তোলা বৈধ ও অবৈধতার ক্ষেত্রে ছবির বিষয়বস্তুর দখল প্রবল। কোনো ছবির বিষয়বস্তু যদি ইসলামি আকিদা, শরিয়ত ও সংস্কৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তখন সেই ছবি নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কেউই দ্বিমত পোষণ করবে না। অতএব, নারীদের নশ্ব ও অর্ধনশ্ব ছবি ধারণ, যৌন আবেদন জাগানিয়া স্থানের চিত্র প্রদর্শনী, প্রকাশ্য বিভিন্ন জায়গায় এসব উভেজক ছবি আঁকা ও টানানো ইত্যাদি জাতীয় যে ধরনের কাজ বিভিন্ন পত্রিকা, ম্যাগাজিন, টিভি-সিরিজের লোকেরা অহরহ করে বেড়ায়, এগুলো হারাম হওয়ার বিষয়ে কোনো সন্দেহ বা সংশয় নেই। এগুলো দেওয়ালে টানানো এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এসব ছবি দেখা সবই হারাম।

মুসলিমবিদ্বেষী, জালিম, পাপাচারীসহ এরকম যাদের প্রতি মুমিনদের মনে ঘৃণা থাকা উচিত, তাদের ছবি তোলা, সংগ্রহ করাও বৈধ নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহদ্বৰ্দেশী, মুশারিক যে আল্লাহর সঙ্গে গরু, আগুন বা অন্য কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, মুহাম্মাদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের নবুওয়াত অসীকারকারী কোনো ইহুদি-খ্রিস্টান, নামধারী মুসলিম, কিন্তু আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারী; অভিনেতা-অভিনেত্রী, গায়ক-গায়িকা যারা সমাজে অশ্রীলতা ও বিশৃঙ্খলা ছড়ায়, এদের ছবি

নিষিদ্ধ ছবির সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না, তাই এটা জায়িব। এর বিপরীতে দারুল উলুম দেওবন্দ ও তার অনুসারী আরেকদল আলিমের মতে এটা নিষিদ্ধ ছবির মধ্যেই পড়ে, তাই এটা নাজায়িব। মোটকথা এটা নিয়ে বড় ধরনের মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ মতভেদ ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ ডিজিটাল ছবি স্ক্রিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু সেটা যদি প্রিন্ট করা হয় তাহলে সেটা আর মতান্বেক্যপূর্ণ মাসআলা থাকবে না; বরং সবার নিকটেই সেটা নাজায়িব বলে বিবেচিত হবে।

[১] এ অনুমোদন দেওয়া হয় শরিয়তের একটি মূলনীতির আলোকে। মূলনীতিটি হলো, একান্ত প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বিষয় অনুমোদিত হয়ে যায়। আইডি কার্ড ও পাসপোর্ট যেহেতু মানুষ একান্ত প্রয়োজনে তৈরি করে এবং এটার কোনো বিকল্পও নেই, তাই বিশেষ প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে শরিয়ত এখানে ছাড় দিয়েছে।

তোলা ও সংরক্ষণ করা সম্পূর্ণ হারাম।

পৌত্রলিকতা প্রদর্শনীমূলক ছবি, ইসলাম অসমর্থিত কোনো ধর্মের চিহ্ন-নির্দশন যেমন : মৃত্তি, ক্রুশ ইত্যাদির ছবি এগুলোর ব্যবহারও অবৈধ। খুব সন্তুষ্ট নবিযুগে অনেক বিছানা, চাদর, পর্দা, বালিশের কাভার ইত্যাদিতে এজাতীয় ছবি ও নির্দশন ছিল। আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন—

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتَرَكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبٌ إِلَّا نَقَضَهُ**

| নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘরে ক্রুশের ছবিযুক্ত কোনো কিছু পেলেই তা নষ্ট করে দিতেন [১]

ইবনু আবুস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى الصُّورَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى أَمْرَ بِهَا فَمُحِيتَ**

| নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাবা ঘরে বিভিন্ন ছবি দেখতে পেলেন, তখন তার নির্দেশে তা ধ্বংস করে ফেলার আগ পর্যন্ত তিনি তাতে প্রবেশ করলেন না। [২]

হারাম শরিফের চিত্রগুলো নিঃসন্দেহে মকার মুশারিকদের পৌত্রলিকতা ও ভাস্তির নির্দশন ছিল, তাই সেগুলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এসব চিত্র মুছে ফেলার নির্দেশ সরাসরি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে এসেছিল। আবুল হাইয়ায রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

**قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثْنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْ لَا تَدْعَ تِمَّاثِلًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ**

[১] সহিল বুখারি : ৫৯৫২; শারহস সুন্নাহ : ৩২২১

[২] সহিল বুখারি : ৩৩৫২; মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৪০১৯

আলি রায়িয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজে পাঠাব না, যে কাজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? কাজটি হচ্ছে কোনো (প্রাণীর) ছবি-প্রতিকৃতি দেখলে তা নিশ্চিহ্ন করে তবেই ক্ষান্ত হবে এবং কোনো উঁচু কবর দেখামাত্রই তা একেবারে সমান করে দেবে।<sup>[১]</sup>

যে ছবিগুলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিকৃত করতে এবং মুছে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো তো জাহেলি যুগের পৌত্রলিকতার নির্দর্শন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সারা জীবনের সাধনাই ছিল মদিনাকে এর থেকে মুক্ত রাখা, তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এধরনের মূর্তি পুনর্নির্মাণকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবর্তীণ বিষয়ের প্রতি অসীকৃতি বলে অবহিত করেছেন।

### চিত্র এবং চিত্রশিল্পীর ব্যাপারে শারয়ি বিধান

চিত্র এবং চিত্রশিল্পী-সংক্রান্ত আলোচনার সারনির্যাস বের করলে যা দাঁড়ায়—

[এক] নিষিদ্ধতা এবং গুনাহের বিবেচনায় সবচেয়ে জঘন্য রকমের চিত্র হলো— আল্লাহ ছাড়া পূজনীয় কোনো কিছুর প্রতিকৃতি তৈরি করা, যেমন : খ্রিষ্টানদের জন্য ঈসা মাসিহ আলাইহিস সালামের চিত্র আঁকা। কেউ যদি জেনে-বুঝে এবং পূজা-উপাসনার উদ্দেশ্যেই এই চিত্র আঁকে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। পূজার উদ্দেশ্যে নির্মিত ছবি-প্রতিকৃতি দু-ধরনের হতে পারে। দেহবিহীন ও দেহবিশিষ্ট। দেহবিশিষ্ট মূর্তি নির্মাণের গুনাহ ও কদর্যতা দেহবিহীন ছবির তুলনায় অনেক বেশি। যে এ ধরনের ছবি-প্রতিকৃতির প্রচলন করবে, এগুলোর প্রতি শ্রাদ্ধা প্রকাশ করবে, সেও এই গুনাহের ভাগিদার হবে। যে এর সঙ্গে যত বেশি জড়িত হবে তার গুনাহ তত বেশি হবে।

[দুই] গুনাহ ও জঘন্যতার বিবেচনায় দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে অপূজনীয় মূর্তি-ভাস্কর্য। কিন্তু ভাস্কর তার ভাস্কর্যশিল্পের কারুকার্যের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগুণের সাথে প্রতিবন্ধিতা করতে চায়। অর্থাৎ তার মনোভাব হলো অনেকটা এমন যে,

[১] সহিহ মুসলিম : ১৬৯; সুনানু আবি দাউদ : ৩২১৮

আল্লাহ তাআলা যেমন সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিজগতের মধ্যে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব দান করেন, সেও ভাস্কর্য শিল্পের মাধ্যমে এক ধরনের অভিনবত্ব ও নতুনত্বের দাবি করে। তার ভাস্কর্য শিল্পের মাধ্যমে এ ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবনা ও মানসিকতা থাকার কারণে সে কুফরির কাছাকাছি চলে যায়। এক্ষেত্রে এই কাজের কর্দ্যতা ও জ্ঞান্যতার মাত্রা ভাস্করের ইচ্ছা ও সংকল্প অনুসারে কমবেশি হবে।

[তিনি] এরপরের স্তরে রয়েছে দেহবিশিষ্ট অপূজনীয় রাজা-বাদশাহ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মৃত্যি। এই মৃত্যিগুলো যদিও পূজনীয় নয়, কিন্তু যেহেতু এগুলো রাজা-বাদশাহ ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ ও শিল্পীদের মৃত্যি, তাই এর প্রতি মানুষের সুভাবজাত শ্রদ্ধা জেগে ওঠে। বিশেষ করে যাদের বিশ্বাস ভাস্কর্য এসব মনীষীদের অমর করে রাখে। ভাস্কর্য তার পরিপূর্ণ আকৃতিতে হোক বা (মাথাসহ) অর্ধেক আকৃতিতে হোক, নিষিদ্ধতার বিবেচনায় সবই সমান।

[চার] নিষিদ্ধতার বিবেচনায় এর পরের স্তর হলো, ওই সকল দেহবিশিষ্ট প্রতিকৃতি যেগুলোকে সাধারণত সম্মান-শ্রদ্ধা করা হয় না। এসব প্রতিকৃতিও সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তবে যেগুলো অসম্মানের সাথে রাখা হয়, যেমন : বাচ্চাদের খেলনা, বাতাসা ইত্যাদি, যা খাওয়া যায়, সেগুলো এর ব্যতিক্রম [১]

[পাঁচ] এরপরের স্তর হলো—দেহবিহীন ক্যানভাসে অঙ্কিত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের স্থিরচিত্র। যেমন বিভিন্ন শাসক, নেতৃবৃন্দ, আন্দোলনের পথিকৃৎদের চিত্র। এসব চিত্র সম্মানের জন্য কোথাও টাঙ্গিয়ে বা ঝুলিয়ে রাখলে নিষিদ্ধতার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে ছবির ব্যক্তিবর্গ অনাচারী, পাপাচারী, ইসলাম বিদ্রোহী এবং খোদাদোহী হলে এদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মানে নিজের ঔমান ও ইসলামের ধৰ্ম সাধন।

[১] পূর্বে আমরা বলে এসেছি যে, বাচ্চাদের পুতুল জাতীয় খেলনার বৈধতার ব্যাপারে সুস্পষ্ট সহিত হাদিস থাকায় বেশিরভাগ ফুকাহা অন্যান্য মূর্তি-ভাস্কর্যের বিধান থেকে ব্যতিক্রম করে এটার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু খাবার জাতীয় মূর্তি-ভাস্কর্যের ব্যাপারে হাদিসে এমন কোনো ব্যতিক্রমের বিধান পাওয়া যায় না, তাই সাধারণ মূর্তি-ভাস্কর্যের বিধান হিসেবে খাবার জাতীয় মূর্তি-ভাস্কর্যও হারাম হবে। পূর্বে আমরা এটাও উল্লেখ করেছি যে, অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় মালিকি মাযহাবে ছবি-প্রতিকৃতির বিধান একটু শিথিলতা থাকা সত্ত্বেও এ মাসআলায় তাদের বিশুদ্ধতম মত হলো, খাবার জাতীয় মূর্তি-ভাস্কর্য, যা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না সেটাও হারাম; যেমনটি ইমাম দারাদির মালিকি রাহিমাহুমাহ বলেছেন।

[ছয়] এরপরের স্তর হলো—প্রাণীর এমন দেহবিহীন চিত্র, যা সাধারণত সম্মানিত ও শ্রদ্ধাযোগ্য নয়। এসব ছবি বিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদের নির্দশন হিসেবে বিবেচিত। যেমন : এ ধরনের ছবি দিয়ে দেওয়াল ইত্যাদির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। এসব ছবি সংরক্ষণ কেবল মাকরুহ বলে বিবেচিত হবে।<sup>[১]</sup>

[সাত] নিজীব বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান, গাছ-গাছালি, নদী-সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির ছবি আঁকা ও সংরক্ষণে কোনো সমস্যা নেই। শর্ত হলো—এগুলো যেন নামাজ-কালাম ইত্যাদিতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় এবং বিলাসিতা ও অপব্যয়ের পথ খুলে না দেয়। যদি সেগুলো বিলাসিতা ও অপব্যয়ের পথ খুলে দেয়, তাহলে সেগুলোও (বিলাসিতা ও অপব্যয়ের ধরন হিসেবে) হারাম বা মাকরুহ হবে।

[আট] ছবির বিষয়বস্তু নিষিদ্ধ কিছু না হলে (অ্যানালগ) ক্যামেরায় তোলা ফটো মূলত বৈধ [২] ছবির বিষয়বস্তু যেন ইহলোকিক বা পারোলোকিকভাবে সম্মানজনক কোনো ব্যক্তি বা বস্তু না হয়। সাধারণত স্থিরচিত্রের সম্মানিত ব্যক্তিরা হয়ে থাকে বড় বড় কাফির, অনাচারী, মূর্তিপূজারি, কমিউনিস্ট এবং বিকৃত বুচির শিল্পীবৃন্দ।

[নয়] পরিশেষে বলা যেতে পারে, যেকোনো নিষিদ্ধ চিত্র ও প্রতিকৃতি যখন বিকৃত হয়ে যায় অথবা সেটাকে অসম্মানজনক স্থানে রাখা হয়, তখন সেটি অবৈধতার গতি থেকে বেরিয়ে বৈধতার সীমায় চলে আসে। যেমন : বিছানার চাদরে ছবি

[১] আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, এটা জমহুর তথা অধিকাংশ ফকিহগণের মত নয়; বরং এটা হলো মালিকি মাযহাবের আংশিক মত। এ ব্যাপারে হানাফি, শাফিয় ও হাস্বিলিসহ অধিকাংশ ফকিহগণের মত হলো, শ্রদ্ধাযোগ্য হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় প্রাণীর দেহবিহীন ছবি হারাম, যেভাবে প্রাণীর দেহবিশিষ্ট প্রতিকৃতি হ্যারাম। সুতরাং কাগড়ে বা কাগজে বা দেওয়ালে বা ক্যানভাস ইত্যাদিতে অঙ্কিত প্রাণীর চিত্র অধিকাংশ ফকিহর নিকট হারাম।

[২] শাহিখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ, শাহিখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ-সহ আরববিশ্বের অন্যান্য আলিমগণ এবং ভারতবর্ষের প্রায় সকল আলিমের মতে এটাও হাতে অঙ্কিত ছবির মতোই হারাম। আধুনিক যন্ত্রের কারণে এতে বিধানগত কোনো পার্থক্য তৈরি হবে না। এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে সবিস্তরে আলোচনা করা হয়েছে। তবে ডিজিটাল ক্যামেরায় ধারণকৃত ছবি, যা প্রিন্ট করা হয়নি, সে ব্যাপারে আরব এবং ভারতবর্ষ উভয় অঞ্চলের আলিমদের মাঝেই বিরাট মতভেদ রয়েছে। দারুল উলুম করাচির মুফকি রিফি উসমানি হাফি., মুফতি তাকি উসমানি হাফি. ও তাদের অনুসারী একদল আলিম এটাকে বৈধ বলেন, আর দাবুল উলুম দেওবন্দের মুফতিগণ ও তাদের অনুসারী আরেকদল আলিম এটাকে অবৈধ মনে করেন। আল্লাহ ত্বাত্তাস্মা-ই ভালো জানেন। তবে ডিজিটাল ক্যামেরায় ধারণকৃত ছবি প্রিন্ট করা হলে সেটা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে তাদের কারো মাঝে কোনো মতভেদ নেই।

থাকলে সেই চাদর ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা বিছানার চাদর সাধারণত পা দ্বারা মাড়ানো হয়, বাচ্চারা এর ওপর লাফালাফি করে, তাই বিছানায় থাকা ছবি সম্মানযোগ্য হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

### বিনা কারণে কুকুর পালন

ঘরের মধ্যে যেসব জিনিস রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তার মধ্যে একটি হলো—বিনা প্রয়োজনে কুকুর পোষা। বর্তমান সময়ে এসে আমরা দেখছি, প্রচুর বিলাসী লোকজন রয়েছে, যারা গরিবকে ভিক্ষা দেয় না; অথচ কুকুরের পেছনে হাজার হাজার টাকা খরচ করে। এদের অনেকে কুকুরপ্রীতি প্রকাশের জন্য কেবল খরচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; মানুষের চেয়েও কুকুরের প্রতি তার ভালোবাসা, স্নেহ বেশি মাত্রায় প্রকাশ করে। অন্যদিকে আঢ়ীয়, পাড়া-প্রতিবেশী এবং নিজের মুসলিম ভাইদের প্রতি খেয়াল রাখার কথা মনেও পড়ে না। ঘরের মধ্যে কুকুর পুষলে আসবাবপত্র কুকুরের লালায় অপবিত্র হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে প্রচুর। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالْتُّرَابِ

| যখন তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দেবে, সে যেন পাত্রটি ৭ বার পানি দিয়ে এবং ১ বার মাটি দিয়ে ধূয়ে ফেলে।<sup>[১]</sup>

কুকুর পালন নিষিদ্ধ এ কারণে যে, প্রায়শই এটি মেহমান দেখলে উৎপাত করে, ভিক্ষুককে ভয় দেখায় এবং পথচারীকে কষ্ট দেয়।

আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন—

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 'أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لِي: أَتَيْتُكَ الْبَارِحةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامٌ سِتُّ فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمَرَّ بِرَأْسِ التَّمَثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ، فَيَصِيرُ گَهِيَّةً الشَّجَرَةِ، وَمَرَّ بِالسِّتُّرِ فَلَيْقَطَعُ، فَلَيُجْعَلْ مِنْهُ وَسَادَتِينَ مَنْبُودَتَيْنِ بُوْطَانٍ، وَمَرَّ بِالْكَلْبِ فَلَيُخْرَجُ'، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[১] সহিল বুখারি : ১৭২; সহিহ মুসলিম : ২৭৯

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জিবরিল আলাইহিস সালাম আমার নিকট এসে বললেন, গত রাতে আমি আপনার কাছে এসেছিলাম। অতঃপর (আপনার) ঘরে প্রবেশের ক্ষেত্রে আমার একমাত্র অন্তরায় ছিল দরজায় থাকা কিছু ছবি, ঘরে বিদ্যমান ছবিযুক্ত একটি পর্দা এবং ঘরে অবস্থানরত একটি কুকুর। সুতরাং আপনি ঘরে থাকা ছবিটির মাথা কেটে ফেলার আদেশ করুন, তাহলে তা গাছের আকৃতির মতো হয়ে যাবে। আর পর্দাটির ব্যাপারে নির্দেশ দিন, যেন তা কেটে ফেলা হয়, অতঃপর তা দ্বারা (জমিনের ওপর) বিছানো দুটি তাকিয়া বানানো হয়, যা (বসা, শোয়া ও চলাফেরার মাধ্যমে) মাড়াই করা হবে। আর কুকুরটিকে (ঘর থেকে) বের করে দেওয়ার হুকুম দিন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরিলের উপদেশমতো কাজ করলেন।<sup>[১]</sup>

মনে রাখা দরকার, এই নিষেধাজ্ঞা কেবল সেই সকল কুকুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেসব কুকুর (শারয়ি অনুমোদিত) প্রয়োজন ছাড়া বিনা কারণে পোষা হয়।

### প্রয়োজনের খাতিরে কুকুর পোষা বৈধ

শিকার, ঘরবাড়ি বা ফসল ইত্যাদি পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর পালনে কোনো সমস্যা নেই। এ বিষয়টি সাধারণ নিষেধাজ্ঞা থেকে ব্যতিক্রম। সহিহ বুখারি ও মুসলিমে উল্লেখিত একটি বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ أَتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبٌ مَّا شِئْتُمْ، أَوْ زَعْ، أَوْ صَيْدٍ، أَنْتَصَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

যে ব্যক্তি (গৃহপালিত) জীবজন্মুর পাহারা অথবা শিকার করা অথবা খেত পাহারার জন্য নিয়োজিত কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর রাখবে, তার সাওয়াব থেকে প্রতিদিন এক কিরাত (অর্থাৎ বিশাল অংশ) পরিমাণ করতে থাকবে।<sup>[২]</sup>

এই হাদিসের ওপর ভিত্তি করে কিছু ফকির বলেছেন, ‘কুকুর পালনের নিষেধাজ্ঞাটি

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৪১৫৮; মুসনাদু আহমাদ : ৮০৪৫; হাদিসটি সহিহ।

[২] সহিহ মুসলিম : ১৫৭৫; সুনানু আবি দাউদ : ২৮৪৪

মূলত মাকরুহ পর্যায়ের, হারাম পর্যায়ের নয়।<sup>[১]</sup> যদি এটি হারাম পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা হতো, তাহলে কুকুর পালন সর্বসম্মত নিষিদ্ধ হতো, এর দ্বারা সাওয়াব নষ্ট হোক বা না হোক।<sup>[২]</sup>

ঘরে কুকুর লালন-পালন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই নয় যে, কুকুরের প্রতি আচরণে কঠোর হতে হবে বা কুকুরকে সমাজ থেকে বিলুপ্ত করতে হবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أَمْمٌ لَأُمْرِتُ بِعَقْتِهَا

যদি কুকুরগুলো (আল্লাহর স্ফট) অন্যান্য জাতির মতোই একটি জাতি না হতো, তাহলে আমি এগুলোকে হত্যার নির্দেশ দিতাম।<sup>[৩]</sup>

এই হাদিসের মাধ্যমে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিশাল বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যার প্রতি কুরআনেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِيهِ إِلَّا أَمْمٌ أَمْالَكُمْ...<sup>[৪]</sup>

তৃপ্তি বিচরণশীল প্রত্যেকটি জীব এবং (বায়ুমণ্ডলে) নিজ ডানার সাহায্যে  
উড়ত প্রত্যেকটি পাখি তোমাদের মতোই এক একটি জাতি।<sup>[৫]</sup>

[১] এটা মালিকি মাযহাবের মত। তাদের মতে নিজের পশুপালের পাহারা অথবা শিকার করা অথবা খেত পাহারার জন্য নিয়োজিত কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করা মাকরুহ, হারাম নয়। আর অন্যান্য মাযহাবে তা নাজারিয বা হারাম। ইমাম ইবনুল হুমাম হানাফি রাহিমাল্লাহ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, পশুপালের পাহারা অথবা শিকার করা অথবা খেত পাহারার জন্য কুকুর পালন করা সর্বসম্মতিক্রমে জারিয। তবে ঢোর-ডাকাত বা শত্রুর ভয় না থাকলে (অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায়) তা ঘরে রাখা উচিত নয়। আল্লামা তাহতাবি হানাফি রাহিমাল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, কুকুর পালন করা হারাম। তবে পশুপালের পাহারা অথবা শিকার করা অথবা খেত পাহারার জন্য হলে তা জারিয আছে। [ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১১৮-১১৯; হাশিয়াতুত তাহতাবি আলা মারাকিল ফালাহ, পৃষ্ঠা : ৩৫৬; রদ্দুল মুহতার, শামি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২২৭; আল-মাওসুত্তুল ফিকহিয়া, খণ্ড : ৩৫, পৃষ্ঠা : ১২৪]

[২] সুলানু আবি দাউদ : ২৮৪৫; মুসনাদু আহমাদ : ১৬৭৮৮; হাদিসটি সহিহ।

[৩]সুরা আনআম, আয়াত : ৩৮

আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَئِنَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ ، فَوَجَدَ بِئْرًا ، فَنَزَّلَ فِيهَا ، فَشَرِبَ تُمَّ حَرَجَ ، فَإِذَا كَلَّبَ يَلْهَثُ ، يَأْكُلُ الشَّرَى مِنَ الْعَطْشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطْشِ مِثْلُ الَّذِي گَانَ بَلَغَ مِنِّي ، فَنَزَّلَ الْبَئْرَ فَمَلَأَ خَفَّةً مَاءً ، فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَفَقَرَ لَهُ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لِأَجْرٌ؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ ذَاتٍ گِيدٍ رَطْبَيْهِ أَجْرٌ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সাহাবিদেরকে এক ব্যক্তির ঘটনা শুনিয়ে) বললেন, একদিন এক ব্যক্তি রাস্তায় চলার পথে অত্যন্ত তৃষ্ণাত হলো। তারপর অতঃপর সে একটি কৃপ দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল। ওপরে উঠে এসে সে দেখতে পেল একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার দরুন ভেজা মাটি চেঁটে খাচ্ছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, এ কুকুরটির তেমনই পিপাসা পেয়েছে, যেমনটি আমার পেয়েছিল। তারপর সে কৃপের মধ্যে নামল এবং নিজের মোজায় পানি ভরে এনে কুকুরটিকে পান করালো। আল্লাহ তার এ কাজের প্রশংসা করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবিগণ (আশ্চর্য হয়ে) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, পশুদের ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য পুণ্য রয়েছে? তিনি বললেন, প্রতিটি প্রাণীর সেবার মধ্যেই পুণ্য রয়েছে।<sup>[১]</sup>

**কুকুর পোষার ব্যাপারে বিজ্ঞান কী বলে?**

কুকুরের মতো বিশ্বস্ত, পোষ্য এবং শান্তিশিষ্ট এই প্রাণীটির প্রতি ইসলামের এত সতর্ক অবস্থান অনেক পশ্চিমে-মুঢ়ি ব্যক্তিদের কাছে অপচন্দনীয়। তারা সকল-জীবে দয়াশীল ও উন্নত মানবতার ধর্জাধারী! তাদের উদ্দেশ্যে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান লেখা এখানে পেশ করছি। এটি একজন জার্মান বিজ্ঞানীর লেখা। তিনি কুকুর পালন এবং কুকুরের সংস্পর্শে এলে কী কী সমস্যা হতে পারে, সে-সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন—

‘বিগত কয়েক বছর ধরে কুকুর পালনের প্রতি মানুষের আগ্রহ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে কুকুরবাহিত রোগব্যাধি। এ বিষয়ে

[১] সহিলুল বুখারি : ২৪৬৬; সহিহ মুসলিম : ২২৪৪

সতর্ক হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। বিশেষ করে অনেকে কুকুর লালন-পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না; তারা কুকুরের সাথে খেলাধুলা করছে, সেগুলোকে চুমু খাচ্ছে, ছোট বড় সবার হাতও কুকুর চাটছে। অনেকসময় মানুষের খাবার পাত্রেই কুকুরকে উচ্ছিষ্ট খেতে দেওয়া হচ্ছে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথা বাদ দিলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুস্থ বুচির সঙ্গেও এসব আচার-আচরণ যায় না, তবে এটি যেহেতু একটি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-বিষয়ক প্রবন্ধ, তাই শিষ্টাচার-সংশ্লিষ্ট আলোচনা আমরা এখানে করব না।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যেটা আমাদের মূল আলোচনার বিষয়, কুকুর পালন এবং এর সংস্পর্শে আসার ফলে আমাদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ওপর এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কোনো হালকা বিষয় নয়। প্রথম দিকে এসব বিষয় উপেক্ষার ফলে পরে চড়া মূল্য দিতে হয়। কারণ, কুকুরের মধ্যে লহুকৃতির এক ধরনের কৃমি রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে মানুষের শরীরে দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধে এবং কখনো কখনো এর ফলে মানুষের মৃত্যুও ঘটে।

এ ধরনের ভয়ানক পরজীবী কৃমিগুলো মানুষ, গবাদি পশু এবং শূকরের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে পরিপূর্ণ আকৃতিতে দেখা যায় কেবল কুকুর, ভাল্লুক ও নেকড়ের মধ্যে। বিড়ালের মধ্যেও দেখা যায়, তবে খুবই কম। এই কৃমিটি অন্য অন্য কৃমির চেয়ে খুবই সূক্ষ্ম এবং খালি চোখে দেখা যায় না; খুব সম্প্রতিই এটি আবিষ্কৃত হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, জৈবিকভাবে এই কৃমির বিকাশ প্রক্রিয়া কিছুটা অস্তুত। এদের দ্বারা স্ফূর্ত ক্ষতগুলোতে একটি কৃমি ‘অনেকগুলো মাথা’র জন্ম দেয়, যা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং নানা ধরনের ক্ষত ও ফোড়া তৈরি করে। এই ‘মাথাগুলো’ কেবল কুকুরের টনসিলে পূর্ণবয়স্ক কৃমিতে পরিণত হয়। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে তারা তাদের মূল ক্ষত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ক্ষত এবং ফোড়া হিসেবে দেখা দেয়। প্রাণীতে একটি ফোড়ার আকার আপেলের সমান হয়; কিন্তু সংক্রামিত প্রাণীর লিভার তার স্বাভাবিক আকার থেকে পাঁচ থেকে দশগুণ পর্যন্ত বড় হয়ে যেতে পারে। মানুষের মধ্যে ফোড়ার আকার মুষ্টিবন্ধ হাত থেকে শিশুর মাথার মতো বড় হতে পারে। এই ফোড়া দশ থেকে বিশ পাউন্ড ওজনের হলুদ তরল দিয়ে পূর্ণ থাকে। এটি সংক্রামিত মানুষের ফুসফুস, পেশি, প্লীহা, কিডনি ও মস্তিষ্কে বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এটি এতো বেশি আকার পরিবর্তন করে যে, নিকট অতীতেও এটি শনাক্ত করতে

গলদযর্ম হতে হতো।

যাহোক, এই প্রদাহ ও কৃমি মানুষের স্বাস্থ্য এবং জীবনের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপারটি হলো—এই কৃমিগুলোর উৎস, বিকাশ ও গঠন সম্পর্কে সবকিছু জানা সত্ত্বেও আমরা এর প্রতিকার উঙ্গিবন করতে পারিনি। ক্ষেত্রবিশেষ এই পরজীবীরা এমনিতেই মারা যায়। সম্ভবত মানুষের শরীরে থাকা অ্যান্টিবিডির জন্য এমনটি ঘটে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই এই ধরনের পরজীবী মারা যাওয়ার ঘটনা সত্যিই বিরল। তদুপরি, কেমোথেরাপিও এক্ষেত্রে তেমন কোনো কাজে আসেনি। সর্বশেষ চিকিৎসা হলো—আক্রান্ত অংশগুলো অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অপসারণ করে ফেলা।

এই সমস্ত কারণে, এই ভয়াবহ রোগের বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্য এবং সম্ভাব্য বিপদ থেকে মানুষকে বাঁচাতে, সব ধরনের ব্যবস্থা ও সর্তর্কতা আমাদের প্রয়োজন করা উচিত।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা এটা হতে পারে, এ সমস্ত জীবাণু যাতে কুকুরের মধ্যেই সীমিত থাকে, সেখান থেকে ছড়াতে না পারে। যেহেতু কুকুর পালন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব নয়; তাই আমাদেরকেই আমাদের জীবন রক্ষার্থে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে, সর্তর্কতার সঙ্গে কুকুর পালনে হবে, কুকুরকে চুম্ব দেওয়া ও কুকুরের সংস্পর্শে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। বাচ্চারাও যাতে কুকুর থেকে দূরে থাকে, সেই শিক্ষা তাদেরকে দিতে হবে। তাদের হাত-পায়ে যেন কোনোভাবে কুকুরের লালা না লাগে, বাচ্চাদের খেলাধূলার জায়গা, পার্ক ইত্যাদি কুকুরমুক্ত রাখতে হবে।

আফসোসের বিষয় হলো—শিশু পার্ক এবং খেলাধূলার স্থানেই অধিক পরিমাণে কুকুর দেখা যায়। এছাড়া সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও কুকুর পৌঁছে নিয়েছে। কুকুরের খাবারের জন্য বিশেষ পাত্র প্রস্তুত রাখা দরকার, যাতে তারা মানুষের ব্যবহৃত খাদ্য-পাত্রে মুখ না দিতে পারে। খাবারের দোকান, বাজার এবং হোটেল ইত্যাদিতে যেন কুকুর প্রবেশ করতে না পারে। এককথায় কুকুরের ব্যাপারে সর্বাঙ্গিকভাবে সর্তর্ক থাকা উচিত, তারা যেন খাবার ও পানীয়ের সংস্পর্শে কোনোভাবে আসতে না পারে।<sup>[১]</sup>

[১] জেরার্ড ফাইনস্টিমারের লেখা, জার্মানের কসিনস পত্রিকাতে এই লেখাটি প্রকাশিত হয়।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুকুরের সাথে ওঠা-বসা, খাদ্য-পাত্রে কুকুরের মুখ দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালতে নিষেধ করেছেন। আরবের নিরক্ষর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ও উপদেশের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান চিকিৎসাশাস্ত্র কীভাবে ঐকমত্য প্রকাশ করেছে চিন্তা করেছেন কখনো? আমাদের পক্ষে তার সম্পর্কে শুধু এতটুকুই বলা সম্ভব, যেটা কুরআনুল কারিম বলেছে—

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ⑩ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

আর তিনি কোনো মনগড়া কথা বলেন না। এটা তো কেবল ওহি, যা (তার প্রতি) প্রত্যাদেশ করাহয় [১]

### উপার্জন ও পেশা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُبُولًا فَامْشُوا فِي مَنَائِكِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ الشُّوْزُ ⑯

তিনিই তো তোমাদের জন্য জমিনকে সুগম করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ করো এবং তাঁর দেওয়া রিযিক থেকে তোমরা আহার করো। আর পুনরুত্থান তো তাঁরই কাছে [২]

এই হলো ইসলামের মূলনীতি। পৃথিবীটা আল্লাহ তাআলা মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। আমাদের কাজ হচ্ছে এই নিয়ামত থেকে উপকৃত হওয়া এবং আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

### কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য কাজ করা বাধ্যতামূলক

কেবল ইবাদতের জন্য বা আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসার নামে রিযিক অন্নেষণে

[১] সুরা নাজর, আয়াত : ৩-৪

[২] সুরা আল-মুলক, আয়াত : ১৫

অলসতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন জায়িয় নয়। কারণ, আসমান থেকে সরাসরি টাকা-পয়সা, রুটি, ভাত, তরকারি নাখিল হয় না।

তেমনিভাবে একজন মুমিনের জন্য পরিশ্রম করে উপার্জনের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দান-সাদাকার ওপর নির্ভর করে চলা জায়িয় নয়। ইসলামের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا تَحْلِ الصَّدَقَةُ لَغْنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

| ধনী লোক ও সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য দান গ্রহণ বৈধ নয়।<sup>[১]</sup>

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কাকুতি-মিনতি করে, লাজলজ্জার মাথা খেয়ে, বিনা প্রয়োজনে মানুষের কাছে প্রার্থনাকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ قُفْرٍ، فَكَانَمَا يَأْكُلُ الْجَنَزَ

| যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষা করে, সে যেন জুলন্ত অঙ্গার ভক্ষণ করে।<sup>[২]</sup>

তিনি আরো বলেন—

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحْلِ لِغْنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ، إِلَّا لِذِي قُفْرٍ مُدْقَعٍ، أَوْ عُنْمٌ مُفْطَعٌ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُشْرِي بِهِ مَالَهُ، كَانَ حُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ شَاءَ فَلِيُقْلِ، وَمَنْ شَاءَ فَلِيُكْثِرْ

ধনী লোক এবং সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য (অপরের নিকট) ভিক্ষা করা বৈধ নয়, তবে তীব্র অভাবী এবং মারাঞ্চক ঝণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য বৈধ। আর যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে মানুষের নিকটে ভিক্ষা চায়, কিয়ামতের দিন তা (অর্থাৎ তার সেই ভিক্ষা করা সম্পদ) তার চেহারায় ক্ষতচিহ্ন হয়ে উঠবে

[১] মুনাফু আবি দাউদ : ১৬৩৪; মুসনাদু আহমাদ : ৯০৬১; হাদিসটি সহিহ।

[২] মুসনাদু আহমাদ : ১৭৫০৮; আল-আহমাদ ওয়াল-মাসানি, ইবনু আবি আসিম : ১৫১৩; হাদিসটি সহিহ।

এবং জাহানামের উত্তপ্ত পাথরে পরিণত হবে, যা সে ভক্ষণ করবে। অতএব যার ইচ্ছা হয় (ভিক্ষা) কর করুক আর যার ইচ্ছা হয় বেশি করুক।<sup>[১]</sup>

নবিজি আরো বলেন—

مَا يَرَالْرَجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَنَسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَجَةٌ لَخِمٍ

যে ব্যক্তি সর্বদাই মানুষের কাছে ভিক্ষা করে বেড়ায় (অর্থাৎ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে), সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় কোনো মাংস থাকবে না।<sup>[২]</sup>

এমন সব কঠোর হুঁশিয়ারি ও সর্তক বার্তার মাধ্যমে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মুসলিমকে তার সম্মান ও আত্মর্যাদা রক্ষার্থে উদ্বৃদ্ধ করেছেন। এর মাধ্যমে তাকে আত্মনির্ভরতা এবং ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

### ভিক্ষা কখন বৈধ?

তবে কখনো কখনো কারো ভিক্ষার প্রয়োজন হতে পারে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাও বিবেচনায় রেখেছেন। কারো যদি ভীষণ অভাবের কারণে ভিক্ষার প্রয়োজন হয়, তাহলে তার জন্য চাওয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রয়োজনে সে সরকার বা ব্যক্তির কাছে হাত পাততে পারে। তিনি বলেন—

الْمَسَائِلُ كُدُوشٌ يَكْتُنُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهُهُ ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَىٰ وَجْهِهِ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ ، إِلَّا  
أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا

ভিক্ষাবৃত্তি হলো আঁচড়, যার মাধ্যমে লোক নিজের চেহারা ক্ষতবিক্ষত করে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে (ভিক্ষাবৃত্তি করে) তার চেহারায় আঁচড়ের দাগ বহাল রাখুক (অর্থাৎ ভিক্ষা করুক) আর যার ইচ্ছা সে তা পরিহার করুক। কিন্তু কেউ যদি রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে (বাইতুল মাল থেকে কিছু সম্পদ) তালাশ করে কিংবা

[১] জামিউত তিরমিয়ি : ৬৫৩; শারহুস সুন্নাহ, বাগাবি : ১৬২৩; হাদিসটি হাসান।

[২] সহিল বুখারি : ১৪৭৪; সহিহ মুসলিম : ১০৪০

একান্ত নিরূপায় হয়ে (অন্য কারো কাছে) চায় তাহলে ভিন্ন ব্যাপার। (অর্থাৎ সেক্ষেত্রে তা তার জন্য বৈধ হবে) [১]

সহিহ মুসলিমে আবু বিশর কবিসা ইবনু মুখারিক রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلَةً فِيهَا ، فَقَالَ : أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ ، فَنَأْمِرُ لَكَ بِهَا ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : يَا قَيْصِيرَةُ إِنَّ الْمَسَأَةَ لَا تَحْلُ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةِ رَجُلٍ ، تَحْمَلْ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسَأَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةً اجْتَاهَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسَأَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ قَاقَةً حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذُوِي الْحِجَّةِ مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا قَاقَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسَأَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسَأَةِ يَا قَيْصِيرَةُ سُخْتَنَا يَا كُلُّهَا صَاحِبُهَا سُخْتَنَا

আমি একবার (খণ্ডের জামিনদার হয়ে) বিরাট অঙ্গের খণ্ডী হয়ে পড়লাম। কাজেই আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম; উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে আমি তার নিকট কিছু চাইব। অতঃপর (চাওয়ার পর) তিনি বললেন, সাদাকার সম্পদ আসা পর্যন্ত আমার কাছে অপেক্ষা করো, তা এসে গেলে আমি তোমাকে তা থেকে দিতে নির্দেশ দেবো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি বললেন, হে কবিসা, মনে রেখো, তিন ব্যক্তি ছাড়া কারো জন্য হাত পাতা বা সাহায্য প্রার্থনা করা হালাল নয়। যথা—

» যে ব্যক্তি (কোনো ভালো কাজ করতে গিয়ে বা দেনার জামিনদার হয়ে) খণ্ডী হয়ে পড়েছে। তাহলে খণ্ড পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সাহায্য প্রার্থনা করা তার জন্য হালাল। দেনা পরিশোধ হয়ে গেলে তখন সে বিরত থাকবে।

» যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত হয়েছে এবং এতে তার সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। তাহলে তার জন্যও সাহায্য চাওয়া হালাল যতক্ষণ না তার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়।

» যে ব্যক্তি এমন অভাবগ্রস্ত হয়েছে যে, তার গোত্রের তিনজন জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পর্ক

[১] সুনানু আবি দাউদ: ১৬৩৯; মুসনাদু আহমাদ: ২০২৬৫; হাদিসটি সহিহ।

লোক সাক্ষ্য দেয় যে, সতিয়ই অমুক অভাবে পড়েছে, তাহলে তার জন্য জীবিকা নির্বাহের পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া পর্যন্ত সাহায্য প্রার্থনা হালাল।

হে কবিসা, এ তিনি প্রকার লোক ছাড়া আর সকলের জন্য সাহায্য চাওয়া হারাম।  
অতএব এ তিনি প্রকার লোক ছাড়া যে সব লোক সাহায্য চেয়ে বেড়ায় তারা হারাম থায়।<sup>[১]</sup>

### পেশা ও শ্রমের মর্যাদা

কেনে বৈধ পেশা গ্রহণের ফলে জীবিকা নির্বাহের জন্য কাউকে ইনি ও তুচ্ছ ভাবার মনোভাবকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণরূপে নাকচ করেছেন।  
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবিদেরকে শিখেয়েছেন, (বৈধ)  
শ্রমের কাজ মানেই সম্মানজনক কাজ, সেটা যে কাজই হোক না কেন। অন্যের  
ওপর নির্ভরশীল হওয়া বা অন্যের দয়ায় জীবন্যাপন হলো লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার  
বিষয়। তিনি বলেন—

لَأْنَ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ، فَيَأْتِيَ بِحُرْمَةِ الْحَطَبِ عَلَىٰ ظَفَرِهِ ، فَيَبِعِقُّهَا ، فَيَكْفَ اللهُ بِهَا  
وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَغْطُوهُ أَوْ مَنْعُوهُ

তোমাদের মধ্যে কেউ রশি নিয়ে তার পিঠে কাঠের বোঝা বয়ে আনা এবং তা  
বিক্রি করা, ফলে আল্লাহ তার চেহারাকে (ভিক্ষার লাঞ্ছনা হতে) রক্ষা করেন,  
এটা (পরিশ্রমের এই কাজ) মানুষের কাছে ভিক্ষা-প্রার্থনা করার চেয়ে উত্তম,  
চাই তারা (চাওয়ার কারণে কিছু) দিক বা না দিক।<sup>[২]</sup>

যতক্ষণ কোনো কাজ সরাসরি হারাম, হারামের সহযোগী বা হারামের সঙ্গে জড়িত  
বলে প্রমাণিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণে ইসলামের  
দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো সমস্যা নেই। চাষবাস থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য,  
কারিগরিসহ যেকোনো ধরনের পেশা বা চাকরি করে উপার্জন একজন মুসলিমের  
জন্য বৈধ।

[১] সহিহ মুসলিম : ১০৪৪; সুনান আবি দাউদ : ১৬৪০

[২] সহিল বুখারি : ১৪৭১; সহিহ মুসলিম : ১০৪২

## চাষবাসের মাধ্যমে উপার্জন

কৃষিকাজের জন্য মৌলিকভাবে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বস্তুই সৃতত্ত্বভাবে আল্লাহ তাআলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করে ঘোষণা দিয়েছেন। এগুলো আল্লাহ-প্রদত্ত অনুগ্রহ ও দয়া। যেমন : জমি। আল্লাহ তাআলা জমিকে সমতল ও নরম করেছেন। এভাবেই তিনি জমিকে চাষ ও ফসল উৎপন্ন হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছেন। আমাদের উচিত তাঁর এই অনুগ্রহ ও কৃপার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ سِنَاطًا ۝ ۱۱ إِنْسَلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِي جَاجًا ۝

আর আল্লাহ তোমাদের জন্য জমিনকে করেছেন বিস্তৃত; যাতে তোমরা সেখানে চলাফেরা করতে পারো প্রশস্ত পথে [১]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْتَامِ ۝ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝ وَالْحَبْтُ ذُو الْعَصْفِ  
وَالرِّيحَانُ ۝ فِي أَيِّ آلاءِ رَتَكُمَا نُكَدِّبَانِ ۝

তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টিজীবের জন্য। এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণ বিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ। আর আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্মীকার করবে? [২]

আল্লাহ তাআলা বৃক্ষি, নদী বা সমুদ্রের আকারে চাষবাসের জন্য পানির ব্যবস্থা করেছেন। আর এভাবে তিনি মৃত জমিকে আবার জীবিত করে তোলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَصِرًا تُخْرِجُ مِنْهُ

[১] সুরা নুহ, আয়াত : ১৯-২০

[২] সুরা রহমান, আয়াত : ১০-১৩

حَبَّا مُتَرَاكِيًّا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِثَوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَغْنَابٍ وَالرِّيْثُونَ وَالرَّمَانَ  
مُشْتَهِيًّا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظَرُوا إِلَى ثَمَرٍ إِذَا أَنْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ⑯

আর তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। অনন্তর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে এবং (বের করি) আঙুরের বাগান, জাইতুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ করো, যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপূর্কতার প্রতি লক্ষ করো। নিশ্চয় এগুলোতে নির্দর্শন রয়েছে ওই সব লোকদের জন্য, যারা ঈমান আনে।[১]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

فَلَيَنْظِرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ⑯ أَنَّا صَبَّيْنَا الْمَاءَ صَبَّا ⑯ ⑯ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا ⑯ فَأَنْبَتْنَا  
فِيهَا حَبَّا ⑯ وَعَنْبَا ⑯ وَقَضَبَنا ⑯

মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ করুক। নিশ্চয়ই আমি প্রচুর পানি বর্ষণ করেছি। তারপর আমি জমিনকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করেছি। অতঃপর আমি তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙুর ও শাক-সবজি।[২]

এরপরে আসে বাতাস, আল্লাহ তাআলা বৃক্ষের সুসংবাদ বহনকারী হিসেবে বাতাস প্রেরণ করেন। বাতাস মেঘ টেনে নিয়ে আসে, সেখান থেকে বৃক্ষ ঝরে জমিন উর্বর হয়ে ওঠে। এসবকিছু সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ⑯ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا  
مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ⑯ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نَنْزَلْنَا إِلَّا بِقَدِيرٍ مَغْلُومٍ  
وَأَنْزَلْنَا الرِّبَاحَ لَوَاقِعَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْقَنْنَا كُمْهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَارِقِينَ ⑯

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ৯৯

[২] সুরা আবাসা, আয়াত : ২৪-২৮

আমি ভূপৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার ওপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি  
এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। আমি তোমাদের  
জন্য তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জন্যেও, যাদের  
অল্পদাতা তোমরা নও। আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাস্তার রয়েছে। আমি  
নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতরণ করাই। আমি বৃক্ষগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি।  
অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি। এরপর তোমাদেরকে তা পান  
করাই। কিন্তু তোমরা (এসব পানির) সংরক্ষণকারী নও।[১]

চাষবাসের নিয়ামতের পাশাপাশি এর প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ আল্লাহ তাআলা মানুষের  
জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। এখানে উল্লেখিত প্রতিটি আয়াতে আল্লাহ মানুষকে সেটাই  
মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ عَرْسًا ، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْتَمَةٌ ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

যে কোনো মুসলিম ফলবান গাছ রোপণ করে কিংবা কোনো ফসল ফলায় আর  
তা হতে পাখি কিংবা মানুষ বা চতুর্ক্ষণ জন্ম খায়, তবে তা তার পক্ষ হতে  
দান-সাদাকা বলে গণ্য হবে।[২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন—

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ عَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكَلَ السَّيْئُونَ مِنْهُ قَهْوَةً لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكَلَ الطَّيْرُ قَهْوَةً لَهُ صَدَقَةٌ ، وَلَا يَرْزَوْهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

যে কোনো মুসলিম ফলবান বৃক্ষ রোপন করলে সেখান থেকে যা কিছু খাওয়া  
হয় তা তার জন্য দানসূরূপ, যা কিছু চুরি হয় তাও দানসূরূপ, বন্য জন্ম যা খেয়ে

[১] সুরা হিজর, আয়াত : ১৯-২২

[২] সহিলুল বুখারি : ২৩২০; সহিল মুসলিম : ১৫৫২

নেয় তাও দানসুরূপ, পাখি যা খেয়ে নেয় তাও দানসুরূপ। আর কেউ কিছু নিয়ে  
গেলে তাও তার জন্য দানসুরূপ।[১]

এই হাদিস থেকে বোঝা গেল, বৃক্ষ বা ফসল যতদিন খাওয়ার ও উপকৃত হওয়ার উপযোগী থাকবে, ততদিন বৃক্ষরোপণকারী বা ফসল উৎপাদনকারী প্রতিদান পেতেই থাকবে। এমনকি সে যদি মারাও যায় কিংবা মালিকানা অন্যের কাছে চলেও যায় তবু।

ইবনুল আরাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ-বশত ছয়টি বস্তুর ক্ষেত্রে মানুষের জীবন্দশায় যেমন প্রতিদান দেন, তেমনি মৃত্যুর পরেও প্রতিদানের ধারা অব্যাহত রাখেন। ছয়টি বিষয় হলো—সাদাকায় জারিয়া, উপকারী জ্ঞান, নেক সন্তান—যে তার জন্য দুআ করে, (ফলবান বা ছায়াদার) গাছ, ফসল এবং ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেওয়া।’[২]

আবু দারদা রায়িয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে—

أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِي الدَّرْدَاءِ، وَهُوَ يَغْرِسُ حَوْزَةً، وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيرٌ تَمُوتُ  
عَدًا، أَوْ بَعْدَ عَدٍ، وَهَذِهِ لَا تُطِعِّمُ فِي كَذَا وَكَذَا عَامًا؟! فَقَالَ: وَمَا عَلَيِّ أَنْ يَكُونَ لِي أَجْرُهَا،  
وَيَا كُلُّ مَهْنَأٍ هَا عَنِّي

একলোক আবু দারদা রায়িয়াল্লাহু আনহুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল, তিনি আখরোটের গাছ লাগাচ্ছেন। সে বলল, আপনি বৃক্ষ বয়সে এই গাছ লাগাচ্ছেন? আপনি তো কাল-পরশুই হয়তো মারা যাবেন; অথচ এই গাছে তো এতো বছরের আগে ফল ধরবে না! তখন আবু দারদা রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, তাতে ক্ষতি কী, অন্যরা এর উপকার ভোগ করবে, আর আমি তার প্রতিদান পাব।[৩]

এসব হাদিসের ওপর ভিত্তি করে কিছু আলিম বলেন, কৃষিকার্য হলো সর্বোত্তম পেশা। অন্যরা বলেন, না, বরং কারিগরি ও হস্তশিল্প হলো সর্বোত্তম পেশা।

[১] সহিহ মুসলিম : ১৫৫২; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১১৭৪৯

[২] দলিলুল ফালিহিন, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৩৭৫

[৩] শারহুস সুন্নাহ, বাগাবি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৫১

আরেকদলের মতে ব্যবসা হলো সর্বোত্তম পেশা।

সহিল বুখারির ব্যাখ্যাকার আল্লামা কাসতাল্লানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘সর্বোত্তম পেশা মূলত আপেক্ষিক বিষয়। অবস্থাভেদে কখনো চাষবাস, কখনো হাতের কাজ, কখনো ব্যবসা উভয় পেশা হতে পারে। যখন শস্যের প্রয়োজন বেশি থাকবে, তখন চাষবাস উভয় বলে বিবেচিত হবে, যখন বাণিজ্যের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাবে, তখন সেটা শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে। আর যখন হাতের কাজের চাহিদা তীব্র হবে, তখন সেটি সর্বোত্তম বলে ধরা হবে।’<sup>[১]</sup>

আল্লামা কাসতাল্লানি রাহিমাহুল্লাহর এই অবস্থাভেদে তারতম্যের বিশ্লেষণী বস্তুব্যাহৃত আধুনিক অর্থনীতির শেষ কথা।

### নিষিদ্ধ চাষবাস

যেসব উদ্দিদ ইসলামে খাওয়া বারণ কিংবা যার ব্যবহার কেবল ক্ষতিকর কাজেই সীমিত, তার চাষবাসও নিষিদ্ধ। যেমন : তামাক, গাঁজা ইত্যাদি। একই বিধান হবে তামাক পাতার। যদি আমরা বলি সিগারেট খাওয়া হারাম, তাহলে এর চাষও হারাম হবে; আর যদি আমরা একে মাকরুহ বলি, তাহলে এর চাষও মাকরুহ হবে।

অমুসলিমের কাছে বিক্রির জন্য নিষিদ্ধ জিনিসের চাষাবাদ কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। কারণ, একজন মুসলিম হারাম জিনিস অব্যাহত রাখার কাজে জড়িত থাকবে, এ হতে পারে না। তেমনিভাবে কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে খিটানদের কাছে বিক্রির জন্য শূকর পালন করবে। এমনকি আঙুর কিনে যে মদ বানায়, তার কাছে হালাল আঙুর বা তার রস পর্যন্ত বিক্রয় করা ইসলামে বৈধ নয়।<sup>[২]</sup>

[১] উমদাতুল কারি, আইনি, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ১৫৫

[২] এটা মালিকি, শাফিয়ি ও হাফ্জি মাযহাবের মত। তাদের মতে এমন ব্যক্তির কাছে আঙুর বা আঙুরের রস বিক্রি করা বৈধ হবে না, যার ব্যাপারে জানা যায় যে, সে তা দ্বারা মদ বানাবে। কেননা, এটা গুনাহের কাজে সহযোগিতার শামিল। উস্মাহর অধিকাংশ আলিম এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন; এমনকি হানাফি মাযহাবের অন্যতম প্রধান দুই ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহও এ মতটিকে ধৰণ করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর মত হলো, এমন ব্যক্তির কাছে আঙুরের রস বিক্রি করতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, আঙুর কোনো নাজরিয় বস্তু নয়। সরাসরি তো এটাকে হারাম বলার সুযোগ নেই। কেউ মদ বানালে সেটা তো তাতে অনেক পরিবর্তন করার পর হয়, তাই এটার কারণে মূল হালাল বস্তুর বিক্রয় নিষিদ্ধ হবে না। বেশির থেকে বেশি এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা অনুমতি

## শিল্প ও অন্যান্য পেশা

ইসলাম কৃষিকাজের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে। এর প্রতি উৎসাহ জুগিয়েছে। একাজে অনেক প্রতিদান, সেটিও ঘোষণা করা হয়েছে। তবে সব মুসলিমই কৃষি পেশায় লেগে পড়ুক বা গরুর লেজ আঁকড়ে পড়ে থাকুক, সেটা ইসলাম কখনো চায় না। কারণ, সবাই এক পেশায় ঝাঁপিয়ে পড়লে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য পেশা অবহেলিত হতে থাকবে। এতে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সমাজ ভীষণরকম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে সর্তর্কও করে দিয়েছেন [১]

ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

إِذَا تَبَيَّغْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخْذَنَمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيَّتُمْ بِالرَّزِيعِ ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ ، سُلْطَانُ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ ذُلْلًا لَا يَنْزَعُهُ حَتَّى تَرْجِعُو إِلَى دِينِكُمْ

যখন তোমরা ঈনাখি পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরে থাকবে,  
কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর

হতে পারে, কিন্তু নিষিদ্ধ নয়। হানাফি মাযহাবের কিতাবগুলোতে এ মতের ওপরই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে।  
কিন্তু আল্লামা শামি রাহিমাল্লাহুর আলোচনা থেকে বোঝা যায়, তিনি এ মতের ওপর সন্তুষ্ট নন। তার কথা  
থেকে বোঝা যায়, তিনি এটা নাজারিয় হওয়ার পক্ষে। [আল-মাবসুত, সারাখসি, খণ্ড : ২৪, পৃষ্ঠা : ২৬;  
আল-হিদায়া, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৭৮; আল-ইখতিয়ার লি-তালিল মুখতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৬২; রদ্দুল  
মুহতার, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৯১; আল-মাওসুতাতুল ফিকহিয়া, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২০৮-২০৯]

[১] এ হাদিসটির প্রকৃত মর্ম হলো, মানুষ যখন ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ, গবাদি পশুপালন ইত্যাকার  
দুনিয়াবি কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং আল্লাহ তাআলাৰ বিধান জিহাদ ছেড়ে দেবে তখন আল্লাহ তাআলা  
তাদের ওপর এমন লাঘুনা চাপিয়ে দেবেন, যা থেকে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি পাবে না; যতক্ষণ না তারা  
তাদের দীনের বিধান তথা জিহাদের দিকে ফিরে আসে। এ হাদিসে জিহাদ পরিত্যাগের ভয়াবহ পরিণামের  
কথা বোঝানো হয়েছে, এখানে নির্দিষ্ট এক পেশা ধরে অন্যান্য পেশা না ধরার ব্যাপারে কোনো সর্তর্কবার্তা  
দেওয়া হয়নি। মুসলমান আহমাদ-সহ বিভিন্ন হাদিসের কিতাবে বর্ণিত এ-সংক্রান্ত অন্যান্য বর্ণনা দেখলে  
বিবরাচি একেবারে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায়।

[২] ঈনা হলো শরিয়া-নিষিদ্ধ এক ধরনের লেনদেন। হানাফি মাযহাব অনুসারে ঈনা বলা হয় এমন  
লেনদেনকে, যেখানে খণ্ডপ্রত্যাশী বাস্তির নিকট বিক্রেতা বাকিতে প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অধিক দামে কোনো  
পণ্য বিক্রি করে, অতঃপর খণ্ডপ্রত্যাশী ক্রেতা পণ্যটিকে বাজারে নিয়ে তার প্রকৃত মূল্যে অন্য কারো কাছে  
বিক্রি করে তার মূল্য শ্রেণ করে এবং নিজের প্রয়োজন মেটায়। এরপর খণ্ড পরিশোধের সময় হলে বিক্রেতা

এমন লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন, যা থেকে তিনি তোমাদের মুক্তি দান করবেন না;  
যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে আসো।[১]

থেকে বাকিতে কেনা পণ্যের মূল্য ক্রেতা পরিশোধ করবে। এটাই হলো হানাফি ফকিহগণের নিকট ইসলাম সংজ্ঞা ও পদ্ধতি। তবে এর আরো কিছু পদ্ধতি আছে, যা বিস্তারিতভাবে ফিকহের কিতাবসমূহে লিখিত আছে। এটার বিধান নিয়েও মতভেদ আছে। ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহর নিকট এটা মাকরুহে তাহরিম বা নাজায়িয়। আর ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহর মতানুসারে এটা মাকরুহে তানযিহি বা অনুগ্রহ। ইয়াম ইবনুল হুমাম রাহিমাহুল্লাহ-সহ প্রযুক্ত এখানে এ দুই মতের মাঝে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, যে পদ্ধতিতে বিক্রেতার বিক্রিত পণ্য আবার বিক্রেতার কাছেই ফিরে আসে, যেমন : বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতা পণ্যটি অধিক দামে কিনে আবার তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মধ্যস্থতায় সে বিক্রেতার কাছেই পণ্যটিকে প্রকৃত মূল্যে বিক্রি করল, তাহলে এটা মাকরুহে তাহরিম বা নাজায়িয় হবে। আর যে পদ্ধতিতে বিক্রিত পণ্য পুনরায় বিক্রেতার কাছে ফিরে আসে না, যেমন : ক্রেতা পণ্যটিকে বাজারে গিয়ে তার প্রকৃত মূল্যে অন্য কারো কাছে বিক্রি করল, তাহলে এটা মাকরুহে তানযিহি বা অনুগ্রহ। আলামা শামি রাহিমাহুল্লাহও ইয়াম ইবনুল হুমাম রাহিমাহুল্লাহর এ সমন্বয়কে পছন্দ করেছেন। [রদ্দুল মুহতুর, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩২৫-৩২৬; আল-মাবসুত, সারাখসি, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২১১; আল-মুহিতুল বুরহানি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৩৯]

নিম্নৰ্থ ইন্না পদ্ধতির সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হলো—বিক্রেতা নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে বাকিতে প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অধিক দামে ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রয় করবে। এরপর বিক্রেতা হুবহু সেই পণ্যটিই আবার ক্রেতার কাছ থেকে নগদে আগের মূল্যের চেয়ে কম দামে ক্রয় করে নেবে। এরপর ওই নির্দিষ্ট সময় এলে ক্রেতা তার বাকিতে কেনা পণ্যটির দাম পরিশোধ করবে। [আল-মাওসুতাতুল ফিকহিয়া, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৯৬]

এ লেনদেনের একটি উদাহরণ হলো—রাশেদের নগদ অর্থ দরকার। সে তার চাচা উবাইদুল্লাহর কাছে এক বছরের জন্য নগদ এক লক্ষ টাকা খণ্ড চাইল। কিন্তু চাচা উবাইদুল্লাহ এভাবে খণ্ড দিতে রাজি নয়। কারণ, এক বছরের জন্য লক্ষ টাকা খণ্ড দিলে বছর শেষে সে এক লক্ষ টাকাই ফেরত পাবে। এতে তার কোনো লাভ হবে না। তাই সে তার ভাতিজা রাশেদকে বলল, আমি আমার অমুক জমিটি বাকিতে তোমার কাছে এক লক্ষ দশ হাজার টাকায় বিক্রি করতে চাই। তুমি এক বছর পরে তা পরিশোধ করবে। তুমি কি এতে রাজি আছো? রাশেদ বলল, হ্যাঁ, আমি রাজি। অতঃপর রাশেদ তার চাচার কাছ থেকে বাকিতে এক লক্ষ দশ হাজার টাকায় জমিটি কিনে নিলো। এরপর তার চাচা উবাইদুল্লাহ রাশেদকে বলল, তুমি এ জমিটি আমার কাছে নগদ এক লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দাও। তখন রাশেদের টাকার প্রয়োজন থাকায় সে নগদ এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে তার চাচার কাছে একটু আগে কেনা জমিটি আবার বিক্রি করে দিল এবং তার মূল্য হিসেবে নগদ এক লক্ষ টাকা নিয়ে নিলো। এরপর সে ওই টাকা দিয়ে নিজের প্রয়োজন পূরণ করল। এক বছর শেষ হলে সে তার চাচার পাওনা এক লক্ষ দশ হাজার টাকা পরিশোধ করল। এতে তারও নগদ অর্থের প্রয়োজন পূরণ হলো, আবার তার চাচারও খণ্ড দিয়ে লাভ হলো।

এ লেনদেনের সুবিধা হলো, এতে ক্রেতার নগদ অর্থের প্রয়োজন পূরণ হয়, আর বিক্রেতা খণ্ড দেওয়ার বিকল্প হিসেবে পণ্যের মাধ্যমে লাভ অর্জন করে, যাতে খণ্ড দিয়ে অধিক অর্থ নেওয়ার কারণে সরাসরি সুদ না হয়। কিন্তু শরিয়ত এ লেনদেনকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। কেননা, এটা সরাসরি না হলেও সুদের বিকল্প একটি কৌশল, যা পরোক্ষভাবে সুদেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই শরিয়ত এ পদ্ধতির লেনদেনকে নাজায়িয় ঘোষণা করেছে।

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৩৪৬২; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১০৭০৩; মুসলানু আহমাদ : ৫০০৭, ৫৫৬২; হাদিসাতি হাসান।

অতএব, কৃষি কাজের পাশাপাশি অন্যান্য শিল্প ও পেশার লোকও থাকতে হবে। যাতে একটি সমৃদ্ধ আত্মনির্ভরশীল জাতি এবং পরনির্ভরতাহীন শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক উপাদানগুলো পূর্ণমাত্রায় মুসলিম সমাজে বিদ্যমান থাকে। এসব বিভিন্ন শ্রেণির পেশা ও শিল্পকর্ম ইসলাম ধর্মে কেবল বৈধই নয়, বরং বহু আলিম ও ফরিদের বক্তব্য অনুসারে এগুলো ফরজে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত।

ফরজে কিফায়া হওয়ার অর্থ হলো—একটি মুসলিম সমাজে প্রতিটি প্রয়োজনীয় শাস্ত্র, পেশা এবং শিল্পকর্মের অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোক থাকতে হবে। কোনো একটি শাস্ত্রেও যদি অপূর্ণতা ও শূন্যতা থাকে এবং সেই শূন্যতা পূরণের মতো কোনো অভিজ্ঞ ও যোগ্য লোক পাওয়া না যায়, তাহলে মুসলিম সমাজের সবাই একত্রে গুনাহগার হবে; বিশেষ করে যারা শাস্ত্র এবং সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় লোক, তারা এর জন্য দায়ী হবেন।

ইমাম গাযালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি শাস্ত্রই ফরজে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত, যেমন : চিকিৎসাশাস্ত্র। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি পেশা। অনুরূপভাবে অংকশাস্ত্র, অসিয়ত, উচ্চরাধিকারের সম্পত্তি বশ্টন। বিভিন্ন কাজে অংকশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সারাদেশে এসব বিষয়ে পারদর্শী কোনো লোকই যদি না থাকে, তাহলে সবাই সংকটে পড়বে। যদি একজনও শিখে ফেলে, তাহলে সবার পক্ষ থেকে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে এবং অন্য সকলের কাঁধ থেকে অপরিহার্যতার দায় রাখিত হয়ে যাবে। চিকিৎসা, হিসাববিজ্ঞান এগুলো শেখাও ফরজে কিফায়ার আওতাভুক্ত—এ কথা শুনে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। অন্যান্য মৌলিক পেশা, যেমন : কৃষিকাজ, কাপড় বুনন, রাজনীতি, এমনকি হিজামা (শিঙা লাগানো, বর্তমান যুগে বলা যায়, অপারেশন করা) ও দর্জির কাজও ফরজে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, পুরো রাষ্ট্রে যদি কোনো হিজামাকারী (শিঙা লাগানোয় পারদর্শী বা বর্তমান যুগ হিসেবে বলা যায় অপারেশনকারী) না থাকে, তাহলে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তারা সংকটে পড়বে। আর আল্লাহ মানুষকে অসমাধানযোগ্য কোনো সংকট বা বিপদে ফেলেন না। যিনি রোগ দিয়েছেন তিনি আরোগ্য পাঠিয়ে তার চিকিৎসা পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছেন। এরপরেও সেইসব উপাদান ও চিকিৎসা-সামগ্ৰীকে উপেক্ষা ও অবহেলা করে মানবজীবনকে ধূংসের মুখে ঠেলে দেওয়া কখনোই জায়িয় হতে পারে না।’<sup>[১]</sup>

[১] ইহইয়াউ উলুমিদিন, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬

কুরআনে আল্লাহ তাআলা অনেকগুলো শিল্পকর্ম এবং পেশা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলো তার অনুগ্রহ বলে অভিহিত করেছেন। যেমন : দাউদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তিনি বলেন—

وَاللَّهُ أَعْلَمُ سَابِقَاتٍ وَقَدْرٌ فِي السَّرِيدِ... ⑤

আর আমি তার (অর্থাৎ দাউদের) জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম,  
(এ নির্দেশ দিয়ে যে,) তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি করো এবং কড়াসমূহ  
যথাযথভাবে সংযুক্ত করো।<sup>[১]</sup>

অন্য আয়াতে তিনি দাউদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন—

وَعَلِمْنَا صَنْعَةً لَبُوسٍ لِكُمْ لِتُحْصِنُوكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

আর আমি তাকে (অর্থাৎ দাউদকে) তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে; কাজেই তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে?<sup>[২]</sup>

আল্লাহ তাআলা সুলাইমান আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন—

وَأَسْلَنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَغْفِلُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَأْذِنْ رَبِّهِ وَمَنْ يَزْغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا  
ثُدِّفُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ⑯ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبٍ وَمَأْتِيلٍ وَجَهَانِ گَالْجَوَابِ  
وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اغْمَلُوا آلَ دَاؤُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ⑭

আমি তার (অর্থাৎ সুলাইমানের) জন্য গলিত তামার এক বারনা প্রবাহিত করেছিলাম। আল্লাহর অনুমতিক্রমে কিছুসংখ্যক জিন তার সম্মুখে কাজ করত। আর ওদের (অর্থাৎ জিনদের) মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্তাদন করাবো। তারা (অর্থাৎ জিনেরা) তার (অর্থাৎ সুলাইমানের) ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউজসদৃশ

[১] সুরা সাবা, আয়াত : ১০-১১

[২] সুরা আলিম্বা, আয়াত : ৮০

বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির ওপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। হে  
দাউদ পরিবার, কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। আর আমার  
বাসাদের মধ্যে অল্লাই কৃতজ্ঞ! [১]

আল্লাহ তাআলা যুলকরনাইন ও তার প্রাচীর নির্মাণ সম্পর্কে বলেন—

قَالَ مَا مَكَنْتِي فِيهِ رَبِّيْ خَيْرٌ فَأَعْيُثُونِي بِقُوَّةِ أَجْعَلْتِيْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ⑯ آتَوْنِي زُبْرَ  
الْحَدِيدِ مَحَتَّنِي إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخْهُ وَامْحَتَنِي إِذَا جَعَلْتُهُ تَارًا ⑭ قَالَ آتَوْنِي أَفْغَ  
(عَلَيْهِ قَطْرًا ⑮) فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهِرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَفْبًا ⑯

তিনি (যুলকারনাইন) বললেন, আমার রব আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন,  
তা-ই উৎকৃষ্ট। কাজেই তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য করো, আমি  
তোমাদের ও তাদের মধ্যে এক মজবুত প্রাচীর গড়ে দেবো। তোমরা আমাকে  
লোহার পাত এনে দাও। অবশ্যে যখন তিনি দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গা  
সমান করে দিলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা হাপরে দম দিতে থাকো।  
এরপর তিনি যখন তা আগুনে পরিণত করলেন, তখন বললেন, তোমরা  
আমাকে কিছু গলিত তামা এনে দাও, আমি তা এর ওপর ঢেলে দিই।  
এরপর তারা (অর্থাৎ ইয়াজুজ-মাজুজ) সেটা অতিক্রম করতে পারল না এবং  
সেটা ভেদও করতে পারল না। [২]

নুহ আলাইহিস সালামের ঘটনা এবং তার নৌযান বানানো সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা  
বলেন—

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنِعْ الْفَلْكَ بِأَغْيِنَنَا وَوَحْيَنَا... ⑯

অতঃপর আমি তার (অর্থাৎ নুহের) কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি  
আমার দৃষ্টির সামনে এবং আমার নির্দেশে নৌকা তৈরি করো। [৩]

[১] সুরা সাবা, আয়াত : ১৩

[২] সুরা কাহফ, আয়াত : ৯৫-৯৭

[৩] সুরা মুমিনুন, আয়াত : ২৭

সমুদ্রে চলমান বিশাল জলযানের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ③

আর সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম জাহাজসমূহ তাঁর অন্যতম নির্দশন [১]

আল্লাহ তাআলা বহু সুরায় মাছ শিকার, প্রাণী শিকার, পাখি শিকার, সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা সংগ্রহ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন।

এসবকিছুর ওপরে কুরআনে লোহার গুরুত্ব ও উপকারিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কোনো আসমানি গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য রাসূল ও কিতাব প্রেরণের পর লোহার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন—

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ... ④

আর আমি অবতীর্ণ করেছি লোহা, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং আছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ [২]

আশ্চর্যের কিছু নেই—যে সুরায় এই আয়াতটি এসেছে, সেই সুরাটির নামই রেখে দেওয়া হয়েছে ‘হাদিদ’ বা লোহা।

সমাজের কোনো শূল্যতা ও প্রয়োজন পূর্ণ হয় বা সমাজের জন্য উপকারী সাধ্যস্ত হয়, এমন প্রতিটি শিল্প ও পেশাই যখন কেউ সততা ও ইসলাম বর্ণিত পন্থায় নির্ষার সঙ্গে করবে তখন সেটি সৎকাজ বলে বিবেচিত হবে।

এমন প্রচুর পেশা রয়েছে, যেগুলোকে মানুষ তাচ্ছিল্য এবং হীনতার দৃষ্টিতে দেখত, কিন্তু ইসলামে সেসব পেশা সম্মানিত এবং মর্যাদাময় বলে আখ্যায়িত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মেষ চরানোর কথা বলা যেতে পারে। সাধারণত সমাজের লোকজন

[১] সুরা শুরা, আয়াত : ২৭

[২] সুরা হাদিদ, আয়াত : ২৫।

মেষ, গরু-ছাগলের রাখালের প্রতি কখনো সম্মান প্রদর্শন করে না, তাদের পেশাককে কেউ সম্মানের চোখে দেখে না। কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَا بَقَتْ اللَّهُ تَبِعًا إِلَّا رَغَى الْقَنْمَ ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَأَنْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، كُنْتُ أَرْغَاهَا عَلَى  
قَرَارِيطِ الْأَهْلِ مَكْهَةً

আল্লাহ তাআলা এমন কোনো নবি প্রেরণ করেননি, যিনি মেষ চরাননি। তখন তাঁর সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও (মেষ চরিয়েছেন)? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি কয়েক কিরাতের (অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু মুদ্রার) বিনিময়ে মকাবাসীদের ছাগল চরাতাম।<sup>[১]</sup>

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবি। তিনি মেষ চরাতেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তার নিজের মেষ ছিল না সেগুলো, বরং তিনি মকার কোনো এক লোকের মেষ চরাতেন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। এটি আবার তিনি তার অনুসারীদের সামনে আলোচনা করছেন তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য—সম্মান শ্রমিকদেরই প্রাপ্য, বিলাসী ও বেকারদের নয়।

কুরআনে আমরা মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাই। তিনি একজন বৃদ্ধ নবির শ্রমিক হিসেবে খেটেছেন ৮ বছর। শ্রমিক হিসেবে থেকেছেন—স্ত্রীর দেনমোহরের বিনিময়সূরূপ। তিনি কতটা সৎ শ্রমিক এবং চমৎকার মানুষ ছিলেন, তা সেই বৃদ্ধের মেয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যেই চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে কুরআনের ভাষায়—

فَأَلْتَ إِخْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْنَاهُ إِنَّ حَيْزَرَ مِنْ اسْتَأْجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ⑥

বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, হে আমার পিতা, আপনি তাকে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দিন। নিশ্চয় আপনি যাদেরকে শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করবেন তাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে (একইসাথে) শান্তিশালী ও বিশ্বস্ত।<sup>[২]</sup>

[১] সহিলুল বুখারি : ২২৬২; সুনানু ইবনি মাজাহ : ২১৪৯

[২] সুরা আল-কাসাস, আয়াত : ২৬

ইবনু আবুস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি একজন লোকের কাছে আহিয়ায়ে কিরামের পেশার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন—

أَحَدِّثُكُمْ عَنْ آدَمَ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا حَرَّاً ، وَأَحَدِّثُكُمْ عَنْ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا نَجَّارًا ، وَأَحَدِّثُكُمْ  
عَنْ إِدْرِيسٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا حَيَّاتًا ، وَأَحَدِّثُكُمْ عَنْ دَاؤَدَ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا زَرَادًا ، وَأَحَدِّثُكُمْ عَنْ  
مُوسَى أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا رَاعِيًّا ، وَأَحَدِّثُكُمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا زَرَاعًا ، وَأَحَدِّثُكُمْ عَنْ صَالِحٍ  
أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا ثَاجِرًا

আমি তোমাকে আদম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বর্ণনা করছি যে, তিনি ছিলেন একজন (আল্লাহর) বান্দা ও কৃষক। আমি তোমাকে নুহ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বর্ণনা করছি যে, তিনি ছিলেন একজন (আল্লাহর) বান্দা ও কাঠমিস্ত্রি। আমি তোমাকে ইদরিস আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বর্ণনা করছি যে, তিনি ছিলেন একজন (আল্লাহর) বান্দা ও দর্জি। আমি তোমাকে দাউদ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বর্ণনা করছি যে, তিনি ছিলেন একজন (আল্লাহর) বান্দা ও বর্মনির্মাতা। আমি তোমাকে মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বর্ণনা করছি যে, তিনি ছিলেন একজন (আল্লাহর) বান্দা ও রাখাল। আমি তোমাকে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বর্ণনা করছি যে, তিনি ছিলেন একজন (আল্লাহর) বান্দা ও কৃষক। আমি তোমাকে সালিহ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বর্ণনা করছি যে, তিনি ছিলেন একজন (আল্লাহর) বান্দা ও ব্যবসায়ী [১]

একজন মুসলিম বৈধ যে পেশাই ধারণ করুক, তার আনন্দিত হওয়ার কথা যে, তার মতো পেশা আরেকজন নবিও অবলম্বন করেছেন। সহিলুল বুখারির একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَغَامًا قَطُّ ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنْ نَبِيٌّ اللَّهُ دَاؤُدَ عَلَيْهِ

[১] মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৪১৬৫—এ হাদিসটির সনদে আব্দুল মুনইম ইবনু ইদরিস আল-ইয়ামানি নামক একজন বর্ণনাকারী আছে। মুহাদ্দিসদের নিকট সে মাত্রুক (পরিত্যক্ত) বর্ণনাকারী হিসেবে সীকৃত। হাদিসের রিজালশাম্সের অনেক ইমাম তো তাকে মিথ্যুক ও হাদিস—জালকারী হিসেবেও অভিহিত করেছেন। [দেখুন—তারিখ বাগদাদ, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৩৩-১৩৫, জীবনী নং ৫৮২৫; লিসানুল মিয়ান, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৭৯, জীবনী নং ৪৯৩৯] তাই এ হাদিসটির সনদ মারাওক পর্যায়ের দুর্বল এবং একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

السلام، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

| নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায়নি। আর নিশ্চয়ই  
আল্লাহর নবি দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।[১]

### যেসব পেশা সম্পূর্ণ হারাম

উল্লিখিত বৈধ পেশাগুলো ছাড়াও আরো বিভিন্ন পেশা ও শিল্পকর্ম রয়েছে, যেগুলো  
ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ। কারণ, এতে ইসলামি সমাজের আকিদা-বিশ্বাস,  
চারিত্রিক পবিত্রতা ও মান-সম্মানের ঘাটতি হয়ে থাকে।

### পতিতাবৃত্তি

পাশ্চাত্যের অধিকাংশ রাষ্ট্রে এটি একটি বৈধ পেশা। এর জন্য তারা সব ধরনের  
সুযোগ-সুবিধা দিয়ে রেখেছে। এটি তাদের কাছে একটি সম্মানজনক পেশা হিসেবে  
সীকৃত। এই জন্য কাজটিকে তারা অন্য দশটি পেশার মতোই দেখে। বিপরীতে  
ইসলামে এই পেশাটি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত। কোনো স্বাধীন নারী কিংবা দাসীর  
জন্য ব্যভিচারের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জনের অনুমতি ইসলাম কখনোই দেয় না।

প্রাক-ইসলামি যুগে কিছু কিছু আরব তাদের দাসীদের ওপরে একটি পারিশ্রমিক  
বেঁধে দিতো। সেই পারিশ্রমিক পরিশোধে তারা ছিল বাধ্য। মনিবের টাকা পরিশোধ  
করতে গিয়ে অনেক দাসীই ব্যভিচারে বাধ্য হতো। আবার অনেকে পার্থিব-উপার্জন  
ও টাকা-পয়সার লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারেও বাধ্য করত। কিন্তু ইসলামে স্বাধীন  
নারী-পুরুষ সবার জন্যেই ব্যভিচার নিষিদ্ধ। একে পেশা হিসেবে গ্রহণের ওপর  
এসেছে কঠোর নিষেধাজ্ঞা। যেমন : জাবির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে,  
তিনি বলেন—

أَنَّ حَارِيَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَّبِيِّ ابْنِ سَلْوَلَ يَقَالُ لَهَا: مُسِينَكَهُ، وَأَخْرَى يَقَالُ لَهَا: أَمِينَهُ، فَكَانَ  
يُكْرِهُهُمَا عَلَى الرِّزْنَا، فَشَكَّتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: وَلَا تُكْرِهُوا  
فَتَيَّاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنَّ أَرْذَنَ تَحْصُنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ  
مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

[১] সহিল বুখারি : ২০৭২

আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনি সালুলের দুজন দাসী ছিল, একজনের নাম মুসাইকা এবং আরেকজনের নাম উমাইমা। সে তাদের দুজনকে দিয়ে জোরপূর্বক বেশ্যাবৃত্তি করাত। তাই তারা এ বিষয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অভিযোগ দায়ের করল। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন—‘আর তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য কোরো না। এই নিষেধাজ্ঞার পরও কেউ তাদেরকে বাধ্য করলে, তাদের (দাসীদের) ওপর আল্লাহ ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু॥’[১][২]

এই হাদিসের মাধ্যমে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নিকৃষ্ট পেশার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। প্রয়োজন যতই তীব্র হোক কিংবা উদ্দেশ্য যতই মহৎ (!) হোকনা কেন, ব্যভিচার কখনো বৈধ হতে পারে না। ইসলামের কথা হলো, সমাজকে এ ধরনের নিকৃষ্ট ও ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে অবশ্যই পবিত্র রাখতে হবে।

### অল্লীল শিল্পকর্ম ও তার বিধান

যৌন আবেদনময় ন্ত্য বা অন্য যেকোনো অল্লীল কর্ম, যেমন : অল্লীল গান, নগ্ন অভিনয় এবং এ ধরনের নাট্যকলা, শিল্পকলা নামে সমাজে প্রচলিত সবই হারাম। যদিও কেউ কেউ এসব অসভ্যতা ও পশুত্বকে শিল্প, সভ্যতা, উন্নতি ও অগ্রগতি বলে অবহিত করতে চায়।

ইসলামে বিবাহ-বহির্ভূত যাবতীয় যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ। অনুরূপ নিষিদ্ধ সম্পর্কের পথ খুলে দেয় এ জাতীয় প্রতিটি কথা, কাজ ও পদক্ষেপও এখানে নিষিদ্ধ। ব্যভিচারের নিষিদ্ধতা ঘোষণার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার বক্তব্যের বিশেষ ধরন ও শৈলী অবলম্বনের কারণই হলো এটি। তাঁর বক্তব্যের উপস্থাপনা খেয়াল করুন; আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا  
[৩]

[১] মুরা নূর, আয়াত : ৩৩

[২] সহিহ মুসলিম : ৩০২৯; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৬৭৯০

আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না, নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং  
মন্দ পথ।<sup>[১]</sup>

আল্লাহ তাআলা শুধু ব্যভিচারের বারণেই ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি এর ধারে-কাছে  
যেতেও নিবেধ করেছেন।

উল্লিখিত অশ্লীল কর্মকাণ্ড, অন্যান্য আরো যত যৌন-উভেজক শিল্প ও কলা  
আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে, এগুলো ব্যভিচারের ক্ষেত্রে শুধু সহায়ক ও  
সহযোগীই নয়; বরং এসব অনৈতিক কাজে এই উপাদানগুলো জ্বালানির মতো কাজ  
করে। এরা কী জ্যন্য কাজটাই না করে!

### চিত্রশিল্পী, কুশ ও ভাস্কর্য নির্মাণকারী

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি—ইসলামে দেহবিশিষ্ট মূর্তি ও প্রতিকৃতি সংরক্ষণ  
নিষিদ্ধ, এগুলো সংরক্ষণের চেয়ে এগুলো তৈরি করাটা আরো গুরুতর পর্যায়ের  
নিষিদ্ধ কাজ।

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ সাহীদ ইবনু আবিল হাসান রাহিমাহুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা  
করেন, তিনি বলেন—

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي إِنْسَانٌ  
إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا  
أَحَدَنِكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَرَ  
صُورَةً، فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِتَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا فَرَبُّ الْرَّجُلِ  
رَبِّوَةٌ شَدِيدَةٌ، وَاصْفَرُ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيَخْلُقُ، إِنْ أَتَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا  
الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ

আমি ইবনু আব্বাস রায়িয়াল্লাহু আনহুর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময়ে তার  
কাছে এক ব্যক্তি এসে (তার উপনাম ধরে ডেকে) বলল, হে আবু আব্বাস, আমি  
এমন এক মানুষ, আমার জীবিকা নির্বাহের একমাত্র মাধ্যম আমার হস্তশিল্প।

[১] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৩২

আর আমি (এ হস্তশিল্পের মাধ্যমে প্রাণীর) এসব ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণ করি। তখন ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, (প্রাণীর এসব ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণের বিষয়ে) আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা বলতে শুনেছি, শুধু তা-ই তোমাকে বর্ণনা করব। আমি তাকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো (প্রাণীর) ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণ করে আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দেবেন, যতক্ষণ না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে। আর সে তাতে কখনো প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। এতে লোকটি ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেল এবং তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তখন ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, আফসোস তোমার জন্য! তুমি যদি একান্ত এ কাজ না-ই ছাড়তে পারো, তবে এ গাছপালা ও প্রত্যেক প্রাণহীন বস্তুর ছবি-প্রতিকৃতি বানাতে পারো।<sup>[১]</sup>

মূর্তি, কুশ ও এ জাতীয় সবকিছুর বিধান এই হাদিসের আওতাভুক্ত।<sup>[২]</sup> আর ক্যানভাসে আঁকা ছবি, ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবি ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বেই আমরা বলে এসেছি, এসব ছবির ক্ষেত্রে বৈধতাই হলো শরিয়তের দাবি, সর্বোচ্চ একে মাকরুহ বলা যেতে পারে।<sup>[৩]</sup> এই বিধান প্রযোজ্য হবে যদি ছবির বিষয়বস্তু নিষিদ্ধ কিছু না হয়। কিন্তু ছবির বিষয়বস্তু নিষিদ্ধ কিছু হলে যেমন : নারীদের কামোন্তেজক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চিত্র, নারী-পুরুষের চুম্বনের দৃশ্য; অনুরূপ সম্মান ও পবিত্রতা ঝঁপক ছবি যেমন : ফেরেশতা ও নবিদের ছবি, তাহলে সেগুলোও হারাম হবে।

### মাদকের সাথে জড়িত সবার ওপর লানত

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা পেরেছি যে, মদের প্রচার-প্রসার-সংশ্লিষ্ট যাবতীয়

[১] সহিল বুখারি : ২২২৫; মুসলিম আহমাদ : ৩৩৯৪

[২] মূর্তি, কুশ এবং এ জাতীয় ভাস্কর্য-প্রতিকৃতিই কেবল নয়; বরং এর পাশাপাশি কাগজে, কাপড়ে বা দেওয়াল ইত্যাদিতে অঙ্কিত ছবিও এ হাদিসে বর্ণিত নিষিদ্ধ ছবি-প্রতিকৃতির অন্তর্ভুক্ত; যেমনটি আমরা ইতিঃপূর্বে সবিস্তরে আলোচনা করে এসেছি।

[৩] ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবি যদি প্রিন্ট না করা হয়, তাহলে সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আলিমদের মধ্যে শপ্তিশালী মতভেদ থাকলেও আ্যনালগ ক্যামেরার ছবি এবং যেকোনো ধরনের প্রিন্টেড ছবি আমাদের এ উপমহাদেশের প্রায় সকল আলিম এবং আরববিশ্বেরও অনেক বড় বড় আলিমদের মতে নাজায়িয় ও হারাম। আর দলিলের বিবেচনায় এটাই শপ্তিশালী ও প্রহণযোগ্য মত। তাই ক্যানভাসে আঁকা ছবি, অনুরূপ সব ধরনের প্রিন্টেড ছবি সৃপ্তি হারাম বলে বিবেচিত হবে; যেমনটি আমরা ইতিঃপূর্বে একাধিকবার আলোচনা করে এসেছি।

কার্যক্রম—মদ প্রস্তুতকরণ, বণ্টন ও সেবন সবকিছু ইসলামে হারাম। যারা এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকবে, তাদের সকলের প্রতি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন।

নিষেধাজ্ঞার বিবেচনায় গাঁজা, আফিম ইত্যাদি সকল নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ, বণ্টন ও প্রস্তুতকরণ মদের মতোই হারাম। তাছাড়া একজন মুসলিম হারাম-সংশ্লিষ্ট কোনো পেশা বা কাজের সঙ্গে জড়িত থাকুক অথবা কোনো হারাম জিনিসের প্রচার-প্রসারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হোক, সেটা ইসলাম কখনো চায় না।

### ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ

কুরআন-হাদিসে ব্যবসার ব্যাপারে উৎসাহ ও প্রেরণামূলক বহু আয়াত এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক বক্তব্য এসেছে। একে আল্লাহ তাআলা ‘অনুগ্রহ অনুসন্ধান’ বলে অভিহিত করেছেন। ব্যবসার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনের এক আয়াতে জিহাদকারী এবং ব্যবসার জন্য সফরকারীদেরকে একত্রে উল্লেখ করে বলেন—

عِلِّمَ أَنْ سَيَّكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَنَقَّعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...<sup>⑩</sup>

আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) অনুসন্ধানে জমিনে ভ্রমন করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে জিহাদ করবে [১]

সমুদ্রের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাহিরে ব্যাবসায়িক অভিযানার পথ উন্মোচিত করে দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পণ্য আমদানি-রপ্তানির জন্য এটাই সবচেয়ে বড় মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা সমুদ্র এবং ব্যাবসায়িক নৌযান সেখানে চালাবার মতো সুযোগ দিয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, সে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন—

...وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِزَ لِتَبَتَّغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعِلَّكُمْ تَشْكُرُونَ<sup>⑪</sup>

[১] সূরা মুয়াম্বিল, আয়াত : ২০

আর তুমি দেখো যে, তার (অর্থাৎ সাগরের) বুক চিরে নৌযান চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ (অর্থাৎ রিয়িক) অনুসন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।<sup>[১]</sup>

কখনো কখনো তিনি এর সাথে বাতাসের কথাও উল্লেখ করেছেন। কারণ পূর্বেকার প্রায় সকল জাহাজ চলত বাতাসের মাধ্যমে। তিনি বলেন—

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرًا وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا  
مِنْ فَضْلِهِ وَلَقَلْكُمْ شَكْرُونَ  
⑤

আর তাঁর (মহিমার) নির্দশনাবলির মধ্যে একটি এই যে, তিনি বাতাস প্রেরণ করেন (ব্রহ্মিত্ব) সুসংবাদবাহী হিসেবে এবং যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমত আস্বাদন করাতে পারেন এবং যাতে তাঁর নির্দেশে নৌযানগুলো চলাচল করে, আর যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ (রিয়িক) থেকে কিছু অনুসন্ধান করতে পারো এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞ হও।<sup>[২]</sup>

এই অনুগ্রহের কথা কুরআনে বারবার এসেছে, এমনকি কুরআনে নৌযান আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, তাঁর প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার প্রতি নির্দশন ও প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا  
يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ  
دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَغْفِلُونَ  
⑯

নিচয়ই আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, মানুষের উপকারী দ্রব্যবাহী চলমান সামুদ্রিক জাহাজে এবং আল্লাহ আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করে মৃত ভূমিকে জীবিত করেন তাতে এবং পৃথিবীতে সকল প্রকার বিচরণশীল জীব-জন্মের বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে,

[১] সূরা ফাতির, আয়াত : ১২

[২] সূরা বুম, আয়াত : ৪৬

আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে (আল্লাহর) নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে বিবেকবান  
লোকদের জন্য (আল্লাহর মহিমার) বহু নির্দশন রয়েছে [১]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَغْلَامِ ③

সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম জাহাজসমূহ তাঁর (মহিমার) অন্যতম নির্দশন [২]

অনেক জীবনোপকরণ দিয়ে আল্লাহ তাআলা মক্কাবাসীদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন,  
সেগুলো উল্লেখের পরে আল্লাহ তাআলা আরু উপনীপের মতো স্থানে তাদের  
দেশটাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাবসায়িক কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তুত করেছেন, সেই  
অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন—

أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا أَمِّنَ يُجْبَى إِلَيْهِ تَمَرَّاثُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لُدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا  
يَعْلَمُونَ ④

আমি কি তাদের (মক্কাবাসীদের) জন্য এক নিরাপদ ‘হারাম’-এর সুব্যবস্থা  
করিনি? সেখানে সব ধরনের ফলমূল আমদানি করা হয়, আমার পক্ষ থেকে  
রিযিকসুরূপ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না [৩]

এর মধ্য দিয়েই ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দুআর বাস্তবায়ন ঘটেছে, তিনি  
আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন; কুরআনের ভাষায়—

رَبَّنَا إِلَيْيِ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَنْعٍ عِنْدَ تَيْنِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
فَاجْفُلْ أَفْيَدَهُ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَازْقَهُمْ مِنَ التَّمَرَّاثِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ⑤

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৬৪

[২] সূরা শুরা, আয়াত : ৩২

[৩] সূরা কাসাস, আয়াত : ৫৭

হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই আমি আমার কিছু বৎসরদেরকে ফসলহীন উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করালাম, হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম করে। অতএব আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফল-ফলাদি দিয়ে তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করুন, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।<sup>[১]</sup>

কুরাইশদের জন্য বছরে দুটি ব্যাবসায়িক অভিযানের সুযোগ ছিল। একটি ছিল শীতকালীন ইয়ামানের দিকে, আরেকটি ছিল গ্রীষ্মকালীন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে। যেহেতু তারা কাবাঘরের সেবক, তাই তারা নিরাপদে এই দুটি অভিযানে যেতে পারত। এজন্য তাদের উচিত, এই নিরামতের শুকরিয়াস্বরূপ একমাত্র আল্লাহর ইবাদতে নিবেদিত হওয়া, যিনি কাবা ঘরের প্রতিপালক এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহকারী। এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন—

لِيَلَافِ قُرْنِيسِ ① إِيلَاهِهِمْ رِحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ ② فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ③ الَّذِي  
أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ④

কুরাইশের আসন্নির কারণে; শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের প্রতি তাদের আসন্নির কারণে; অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদের নিরাপদ করেছেন।<sup>[২]</sup>

ইসলাম সমস্ত মুসলমানের জন্য বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রতিবছর বাণিজ্যিক লেনদেনের একটি সুযোগ করে দিয়েছে। আর সেটি হলো প্রতি বছর হজের মৌসুমে বাণিজ্যের সুযোগ। হজের মৌসুমে আল্লাহর ঘরে যখন সবাই আসে, তখনই হলো সবচেয়ে বড় বাণিজ্যের সময়। যেমন : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ⑤

[১] সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৩৭

[২] সুরা কুরাইশ, আয়াত : ১-৪

আর মানুষের কাছে হজের ঘোষণা করে দিন, তারা আপনার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সব ধরনের কৃশকায় উটের পিঠে করে, তারা আসবে দূর-দূরাঞ্জের পথ অতিক্রম করে।<sup>[১]</sup>

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

لَيَشْهُدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّغْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِّنْ بَيْهِمَةِ الْأَنْعَامِ  
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ<sup>[২]</sup>

যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুর্ক্ষণ জন্ম হতে যা রিয়িক হিসেবে দান করেছেন তার (জবাইয়ের) ওপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা তা (অর্থাৎ জবাইকৃত কুরবানির গোশত) থেকে খাও এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।<sup>[৩]</sup>

কোনো সন্দেহ নেই—এসকল উপকারিতার মধ্যে একটি হলো ব্যবসা। সহিত্তুল বুখারির বর্ণনায় এসেছে, হজের মৌসুমে ব্যবসার ক্ষেত্রে মুসলিমদের মধ্যে মানসিকভাবে একটু দ্বিধা কাজ করছিল। তারা শঙ্কিত ছিলেন, এর ফলে হয়তো তাদের নিয়তের একনিষ্ঠতা এবং ইবাদত কল্পিত হবে! তখন আল্লাহ তাআলা কুরআনে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বললেন—

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ...<sup>[৪]</sup>

(হজের সময়) তোমাদের জন্য তোমাদের রবের অনুগ্রহ অনুসন্ধানে (অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য) কোনো পাপ নেই।<sup>[৫]</sup>

নিয়মিত মসজিদে গমনকারী, সকাল-বিকাল আল্লাহর স্মরণকারীদের প্রশংসা করে কুরআন বলছে—

[১] সুরা হজ, আয়াত : ২৭

[২] সুরা হজ, আয়াত : ২৮

[৩] সুরা বাকায়া, আয়াত : ১৯৮

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَنْعَثُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ...  
◎

এরা তো এমন লোক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় যাদেরকে আল্লাহর  
স্মরণ, সালাত কার্যেম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখতে পারে না।[১]

কুরআনের দৃষ্টিতে মুমিনগণ কেবল সারাক্ষণ মসজিদে পড়ে থাকা লোক,  
দুনিয়া-বিরাগী দরবেশ কিংবা গুহাবাসী সন্ধ্যাসী নয়; বরং তারা হলো পেশাজীবী  
ও কর্মজীবী মানুষ। তবে তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, পার্থিব জীবনের যাবতীয় ব্যস্ততা  
ধর্মীয় দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তাদেরকে অমনোযোগী ও উদাসীন করে না।

এ হলো কুরআনে উল্লেখিত ব্যবসা-সম্পর্কিত আলোচনা।

উপরন্তু হাদিসেও ব্যবসার প্রতি উৎসাহমূলক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লামের বহু বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও  
ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা,  
কাজ ও ব্যবসার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানান বিষয়ে সীকৃতি ও অসীকৃতির মাধ্যমে ব্যবসা  
সংশ্লিষ্ট বিধি-নিয়েধ ও নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

ব্যবসার ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি  
বক্তব্য হলো—

الَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ التَّبِيِّنِ ، وَالصَّدِيقِينَ ، وَالشُّهَدَاءِ

| সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী (কিয়ামতের দিন) নবিগণ, সিদ্দিকগণ ও শহিদগণের  
সাথে থাকবে।[২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সত্যবাদী ব্যবসায়ীকে যখন সিদ্দিক  
এবং আল্লাহর রাস্তায় শহিদদের পাশাপাশি উল্লেখ করেন, তাতে আমাদের আশ্চর্য  
হওয়ার কিছু নেই—কারণ, অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা দেখেছি, জিহাদ বা যুদ্ধ

[১] সুরা নূর, আয়াত : ৩৭

[২] জামিউত তিরমিয়ি : ১২০৯; মুস্তাদরাকুল হাকিম : ২১৪৩; হাদিসাটি হাসান।

কেবল যুদ্ধের ময়দানেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সততার সঙ্গে উপর্যুক্ত করতে হলে এখানেও তীব্র লড়াই করে টিকে থাকতে হয়।

সৃভাবতই প্রশ্ন জাগে, আল্লাহ তাআলা ব্যবসায়ীদেরকে এত সুমহান মর্যাদা ও প্রতিদান কেন দেবেন? সাধারণত ব্যবসা মানুষের মধ্যে লোভ-লালসার আগুন উৎকে দেয়। টাকায় টাকা আসে, মুনাফা মুনাফার জন্ম দেয়। তাই মানুষের মনে বৈধ-অবৈধ সব উপায়ে মুনাফা অর্জনের চিন্তা কঠিনভাবে চেপে বসে। এমন কঠিন মুহূর্তেও সততা ও বিশ্বস্ততার সীমায় যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে, সে-ই প্রবৃত্তির যুদ্ধে বিজয়ী একজন সফল মুজাহিদ। তার জন্য আসলেই একজন জিহাদকারীর মর্যাদা শোভা পায়। সৃভাবতই ব্যবসায়ীরা সবসময় টাকা টাকা আর টাকার চিন্তায় বিভোর থাকে। পুঁজির টাকা, মুনাফার টাকা, পাওনা টাকা- এসব নিয়েই তারা সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে। এমনকি আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেও আমরা এর বাস্তবতা দেখতে পাই। জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِّنَ الشَّامِ ، فَأَنْفَقَتِ النَّاسُ إِلَيْهَا ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ، فَأَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ :  
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرْكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ الْهُنُوْءِ وَمِنَ  
الْتِجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার জুমুআর দিন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে সিরিয়ার একটি বণিক দল এসে পৌঁছল। তখন লোকজন সবাই সেদিকে ছুটে গেল; এমনকি শেষপর্যন্ত (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে) কেবল বারোজন লোকই অবিশিষ্ট ছিল। তখন সুরা জুমুআর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়— ‘আর যখন তারা কোনো ব্যবসা অথবা ক্রীড়া-কৌতুক দেখে তখন তারা আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে যায়। আপনি বলুন, আল্লাহর কাছে যা আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আর আল্লাহ সর্বশেষ রিযিকদাতা।’[১]

যেসব ব্যবসায়ী এই টাকা-পয়সার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে থেকেও সততা ও বিশ্বস্ততায়

[১] সহিহ মুসলিম: ৮৬৩; সহিহুল বুখারি: ৯৩৬; সুরা জুমুআ, আয়াত: ১১

দৃঢ় ছিলেন, আল্লাহর ভয় ও স্মরণে যাদের অন্তর ছিল সদা জাগ্রত, তারা আসলেই আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত শ্রেণি তথা নবিগণ, সিদ্ধিকগণ ও শহিদগণের পাশে দাঁড়াবার উপযুক্ত।

ব্যবসার ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দ্যোগই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি যেমনিভাবে আধ্যাত্মিক বিষয়ে দেখাশোনা করেছেন তেমনিভাবে অর্থনৈতিক দিকটিও তিনি বিবেচনায় রেখেছেন। তিনি মদিনাতে তাকওয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন, সেটি যাতে ইবাদত, জ্ঞানার্জন, দাওয়াত এবং সর্বোপরি রাস্ত পরিচালনার একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠে। পাশাপাশি তিনি মদিনাতে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি বাজার প্রতিষ্ঠা করেছেন। বনি কাইনুকার বাজারে ইহুদিদের জুলুম ও তাদের কর্তৃত চলত। তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় বাজার প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন তখন প্রথমে তিনি বনু কাইনুকার বাজার পরিদর্শন করলেন। এরপর মদিনার বাজারে এসে ঘোষণা দিয়ে বললেন, এটা তোমাদের বাজার। সুতরাং এখানে কাউকে সংকটে ফেলা যাবে না এবং এখানে কোনো খারাজ বা ট্যাক্স নেই।<sup>[১]</sup>

মদিনার বাজারের নিয়ম-শৃঙ্খলা লেনদেনের পশ্চা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতেই নির্ধারিত হয়েছে এবং প্রায়শ তিনি বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা ও শিক্ষা দিয়ে বাজারের বিভিন্ন বিষয়াদি সংশোধন করেছেন। যেমন তিনি নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন, এখানে কোনো ধরনের প্রতারণা করা যাবে না, মাপে কম দেওয়া যাবে না, পণ্য গুদামজাতকরণ করা যাবে না এবং দালালি বা মধ্যস্থত ভোগের কারবার চলবে না। এগুলো সম্পর্কে আমরা লেনদেন অধ্যায়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

সাহাবিদের জীবনীর দিকে তাকালে, তাদের ভেতর যেমন আমরা অনেক অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর দেখা পাই, তেমনিভাবে কৃষিজীবীসহ অন্যান্য অনেক পেশার লোকজনের দেখাও পাই।

তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত। তার ওপর প্রতিনিয়ত কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছে। সকাল-বিকাল ওহি নিয়ে জিবরিল আলাইহিস সালামের আগমনের

[১] তারিখুল মদিনা, ইবনু আবি শাইবা, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩০৪

ধারাও সমানতালে জারি আছে। প্রত্যেক সাহাবিই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাগলের মতো, হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসেন। এক পলকের জন্যেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দৃষ্টির আড়াল হোক, তারা তা চাইতেন না। তাদের প্রত্যেকের কামনা ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যদি এক মুহূর্তের জন্যেও ছেড়ে যেতে না হতো!

তবু আমরা দেখি সাহাবিগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে বেরিয়ে পড়ছেন। কেউ হয়তো ব্যবসা করছেন। কেউ কৃষিকাজে ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন। নানাজন নানান পেশায় লেগে আছেন। জীবিকা উপর্জন করতে গিয়ে কেউ যদি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো হাদিস শুনতে না পেতেন, তাহলে যতটুকু সন্তুষ্টি তিনি অন্যদের কাছ থেকে জেনে নিতেন। মজলিসের উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ অনুপস্থিত লোকদের কাছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে আদেশপ্রাপ্তও ছিলেন।

অধিকাংশ আনসারি সাহাবি ছিলেন কৃষক ও কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত। অন্যদিকে বেশিরভাগ মুহাজির ছিলেন ব্যবসায়ী বা ব্যাবসায়িক কাজের সঙ্গে জড়িত। আবুর রহমান ইবনু আউফ রায়িয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন মুহাজির সাহাবি। তার বন্ধু সাদ ইবনু রবি রায়িয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন আনসারি। সাদ রায়িয়াল্লাহু আনহু আবুর রহমান ইবনু আউফ রায়িয়াল্লাহু আনহুকে নিজের টাকা-পয়সার অর্ধেক, দুটি বাড়ির একটি এবং তার দুই স্ত্রীর একজনকে তালাক দিয়ে তার হাতে সঁপে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আবুর রহমান রায়িয়াল্লাহু আনহু এই প্রস্তাব অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করে বললেন, ‘আল্লাহ আপনার সম্পদ, আপনার পরিজনে বারাকাহ দান করুন! এসবের কোনো কিছুই আমার দরকার নেই। আপনাদের এখানে কি কোনো বাজার আছে ব্যবসা করার মতো? সাদ রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, হ্যাঁ, বনু কাইনুকার বাজার আছে! আবুর রহমান ইবনু আউফ পনির ও ধি নিয়ে বাজারের দিকে রওনা দিলেন; সেদিন থেকেই তিনি ব্যবসায় লেগে গেলেন।<sup>[১]</sup>

আর এভাবেই ব্যবসা করতে করতে আবুর রহমান ইবনু আউফ রায়িয়াল্লাহু আনহু একসময় হয়ে উঠলেন মুসলিমদের মধ্যে সর্বাধিক ধনীদের একজন। মৃত্যুর সময় তিনি বিরাট অংকের সম্পদ রেখে দিয়েছিলেন তার উত্তরাধিকারীদের জন্য।

[১] সহিল বুখারি : ২০৪৮; জামিউত তিরমিয়ি : ১৯৩৩

আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আনহু সারা জীবন ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন, এমনকি খলিফা হওয়ার দিনেও তিনি পরিবারের ব্যাবসায়িক প্রয়োজনে বাজারে যাবার জন্য উদ্যত হয়েছিলেন।<sup>[১]</sup>

উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুও ব্যবসা করতেন। একদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, বাজারে অধিক পদচারণা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ততার ফলে আমি বেশি হাদিস শুনতে পারিনি।<sup>[২]</sup> এভাবে উসমান রায়িয়াল্লাহু আনহু-সহ আরো অনেক সাহাবি রয়েছেন, যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

### ব্যবসার ব্যাপারে গির্জার অবস্থান

ধর্মীয় দিক-নির্দেশনার আলোকে মুসলিম সমাজ এগিয়ে চলেছে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে, লেনদেনে জড়িয়েছে, কিন্তু এগুলো তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করতে পারেনি। ঠিক এই সময়টাতে, ইউরোপীয় বিভিন্ন রাষ্ট্র ও স্বীকৃত অধ্যুষিত এলাকায় ‘আত্মমুক্তি’-এর মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এই মতবাদের মূল কথা হলো—ব্যবসায় জড়লে মানুষের অন্তর কল্পিত হয়ে পড়ে, এটা ব্যবসা নিষিদ্ধের একটি দিক। অন্যদিকে কেউ স্বীকৃতধর্মের এই নীতি অমান্য করে ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়লে তার প্রতি অবতীর্ণ হবে আল্লাহর অভিশাপ। সাধারণত গুনাহের শাস্তি গুনাহ অনুপাতেই হয়। কিন্তু তখন বলা হতো, ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ার অপরাধ চিরস্থায়ী। কেউ ব্যাবসায়িক কাজে লিপ্ত হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা অভিসম্পাত তাকে আসমান, জরিন, এই জীবন ও পরকলীন জীবনেও তাড়া করে ফিরবে।

পোপ অগাস্টিন বলেছে, ‘ব্যবসা নিজেই একটি অপরাধ ও গুনাহের কাজ, কারণ ব্যবসায় লিপ্ত হলেই মানুষ আল্লাহর কথা ভুলে যায়।’

আরেক পোপ বলেছে, ‘একটি পণ্য কিনে তাতে কোনো পরিবর্তন ছাড়া, সেটি বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েই গির্জার পবিত্রতার হানিকারক বলে সাব্যস্ত হয়।’

[১] সহিল বুখারি : ২০৭০; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৩০০৬

[২] সহিল বুখারি : ২০৬২, ৭৩৫৩; সহিল মুসলিম : ২১৫৩

এসব বন্ধব্য মূলত পোপ সেন্ট জন পলের বন্ধব্যের ফলাফল। সে বলেছিল, ‘যেহেতু একজন খ্রিস্টানের জন্য আরেকজন খ্রিস্টানের সঙ্গে বিতর্কে জড়ানো বৈধ নয়, এর অনিবার্য করণীয় হলো—খ্রিস্টানদের মধ্যে কোনো বাণিজ্যিক তৎপরতা থাকতে পারবে না।’<sup>[১]</sup>

### কোন কোন ব্যবসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ?

অন্যায়, প্রতারণা, মধ্যস্থতভোগী কিংবা নিষিদ্ধ বস্তুসংশ্লিষ্ট ব্যবসা ছাড়া অন্য কোনো ব্যবসাই ইসলামে হারাম বা নিষিদ্ধ নয়। মদ, নেশাজাতীয় দ্রব্য, শূকর, মৃত্তি, প্রতিকৃতি এবং ইসলামের দৃষ্টিতে যেসব দ্রব্য গ্রহণ, আদান-প্রদান নিষিদ্ধ, সেগুলোর ক্রয়বিক্রয়ও নিষিদ্ধ। ইসলাম কখনোই এর অনুমতি দেয় না। ইসলামের দৃষ্টিতে এসব ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত যাবতীয় অর্থই হারাম ও ঘৃণ্য উপার্জন। এই হারাম উপার্জনে গড়া দেহ ও শরীরের জন্য উপযুক্ত স্থান হলো জাহানাম। এমন ব্যবসায়ীদের জন্য সতত ও বিশ্বস্ততার দরুন সুপারিশের কোনো সুযোগ থাকবে না। কারণ, তার ব্যবসাই হারাম, ইসলাম একে সীকৃতি দেওয়া তো দূরের কথা, এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

সুর্ণ ও রেশমের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ, এতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, এ দুটি নারীদের জন্য হালাল। হ্যাঁ, তবে রেশম বা সুর্ণনির্মিত এমন কিছুর বিক্রয় বৈধ নয়, যা কেবল পুরুষরাই ব্যবহার করতে পারে। বৈধ জিনিসের ব্যবসাতেও কিছু বিষয়ে সর্তকতা অবলম্বন জরুরি। এসব বিষয়ে সর্তক না থাকলে ব্যবসায়ীকে অনাচারী ও দুর্কর্মকারীদের দলভুক্ত হতে হবে। আর আল্লাহ তাআলা তো বলেই দিয়েছেন—

وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي حَجَّيمٍ ⑪

আর নিশ্চয়ই দুর্কর্মকারীরা থাকবে জাহানামে।<sup>খ</sup>

উবাইদ ইবনু রিফাআ রাহিমাহুল্লাহ তার পিতা রিফাআ ইবনু রাফি রায়িয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বর্ণনা করেন—

[১] ওয়ায়তুর রিবা ফি বিনাইল ইকতিসাদিল কাওমিয়ি (وضع الربا في بناء الاقتصاد القومي) অর্থনীতি বিনির্মাণে সুদ রাহিতকরণ, শাহখ ইস্লাম আব্দুল্লাহ ইবরাহিম : পৃষ্ঠা : ৬১

[২] সুরা ইনফিতার, আয়াত : ১৪

أَنَّهُ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَاهَيْعُونَ، فَقَالَ: يَا مَغْشَرَ التُّجَارِ، فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَفَعُوا أَغْنَافَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ التُّجَارَ يُبَغْثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَارًا، إِلَّا مَنْ أَنْقَى اللَّهَ، وَبَرَّ، وَصَدَقَ

একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। পথিগ্রন্থে দেখতে পেলেন কিছু লোক কেনাবেচা করছে। নবিজি তাদের ডাক দিলেন, ‘হে ব্যবসায়ীগণ! তারা আগ্রহের সাথে মাথা উঁচু করে নবিজির দিকে তাকাতে লাগাল। নবিজি তখন বললেন, নিশ্চয়ই ব্যবসায়ীরা হাশরের ময়দানে পাপাচারী হিসেবে উপ্থিত হবে। তবে যে তাকওয়া, সততা ও বিশ্বস্ততা অবলম্বন করে, তার কথা ভিন্ন।<sup>[১]</sup>

ওয়াসিলা ইবনু আসকা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَيْنَا ، وَكَثُرَ تُجَارًا وَكَانَ يَقُولُ: يَا مَغْشَرَ التُّجَارِ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ

আমরা ছিলাম ব্যবসায়ী, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় সময়ই আমাদের উদ্দেশে বের হয়ে বলতেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, তোমরা মিথ্যা বলা থেকে দূরে থাকো।<sup>[২]</sup>

মিথ্যাবাদিতা ব্যবসায়ীদের একটি বড় দোষ। কথায় কথায় তারা মিথ্যা বলে। মিথ্যা মানেই পাপাচার, আর পাপাচার সবসময় জাহানামের দিকে টানতে থাকে। অতিরিক্ত শপথ, বিশেষ করে মিথ্যা শপথ থেকে সার্বক্ষণিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। অন্য এক হাদিসে আবু যর রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزْكِيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ أَبُو ذِئْرٍ: خَابُوا وَخَسِرُوا ، مَنْ هُمْ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: الْمُسِنِّلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنْقِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِيفِ الْكَاذِبِ

[১] জামিউত তিরমিয়ি : ১২১০; মুস্তাদরাকুল হাকিম : ২১৪৪; হাদিসটি হাসান।

[২] আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ৫৬, হাদিস : ১৩২; মাজমাউয় যাওয়ায়িদ : ৬৩০১; হাদিসটি হাসান।

তিন শ্রেণির লোক আছে, যাদের সাথে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে (রহমতের নজরে) তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুম্বন্ধও করবেন না, আর তাদের জন্য থাকবে যত্নগাদায়ক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটি তিনবার পাঠ করলেন। আবু যর রায়িয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, এরা তো (নিশ্চিতই) ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হে আল্লাহর রাসুল, এরা কারা? তিনি বললেন, যে লোক পায়ের গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে চলে, যে লোক কোনো কিছু দান করে খোঁটা দেয় এবং যে লোক মিথ্যা শপথ করে পণ্ডব্য বিক্রি করে।[১]

আবু সাইদ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

مَرَّ أَغْرِيَيْ بِشَاءٍ ، فَقُلْتُ : تَبَعِينِيهَا بِئْلَائِهَةَ دَرَاهِمَ ؟ ، قَالَ : لَا وَاللهِ ، ثُمَّ بَاعَنِيهَا ، فَذَكَرْتُ  
ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : بَاعَ آخِرَتَهُ ، بِدُنْيَا

এক বেদুইন একটি বকরি নিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমি তাকে বললাম, তুমি কি আমার কাছে বকরিটি তিন দিরহামে বিক্রি করবে? সে বলল, না, আল্লাহর কসম, এটা হবে না। এর বেশ কিছুক্ষণ পরে (বাজারে দিয়ে তার কাঞ্চিত মূল্য না পেয়ে) সে বকরিটি আবার আমার কাছে (আগের দামেই) বিক্রি করে দিলো। এই ঘটনা আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালে তিনি বললেন, সে দুনিয়ার বিনিময়ে পরকালকে বিক্রি করে দিয়েছে।[২]

ধোঁকাবাজি ও পরিমাপে কম দেওয়া দুটোই গুরুতর অপরাধ। ওজনে কম প্রদানকারীদের ব্যাপারে কুরআনে এসেছে

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ①

দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়।[৩]

[১] সহিহ মুসলিম : ১০৬; সুনানু আবি দাউদ : ৪০৮৭

[২] সহিহ ইবনি হিবান : ৪৯০৯; আল-ওয়ারউ, ইবনু আবিদুনহয়া : ১৬২; হাদিসটি হাসান।

[৩]সুরা মুতফিফিন, আয়াত : ১

একচেটিয়া বাজার দখল ও সুদ বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। কেননা, বাজার দখলের নিয়তে পণ্য গুদামজাতকারীর সঙ্গে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। সুন্দি মাধ্যমে উপর্যুক্ত সম্পদের বারাকাহ আল্লাহ তাআলা নিশ্চিহ্ন করে দেন। হাদিসে এসেছে-

دِرْهَمٌ رِّبَّا يَأْكُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَغْلِمُ ، أَشْدُّ مِنْ سِتَّةِ وَتَلَاثَيْنَ زَيْنَةً

| জেনেশুনে এক দিরহাম পরিমাণ সুদ খাওয়া ৩৬ বার ব্যভিচারের চেয়ে জ্বন্য। [১]

আমরা সুদসংশ্লিষ্ট আলোচনা লেনদেন অধ্যায়ে আরো বিস্তারিতভাবে করব, ইনশাআল্লাহ।

### পেশা যখন চাকরি

চাকরি ইসলামে বৈধ। জীবিকার তাগিদে একজন মুসলিম সরকারি, আধা-সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে সেবা দিয়ে তার জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, এতে কোনো বাধা নেই। তবে কোনো পদে সেবা প্রদানের মতো সামর্থ্য বা যোগ্যতা না থাকলে, সেই পদে আবেদন করা বৈধ নয়। বিশেষ করে পদটি যদি বিচার-আচার বা জনগণের অধিকার-সংশ্লিষ্ট হয়।

আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

وَيْنَلِلْأَمْرَاءِ ، وَيْنَلِلْعَرْفَاءِ ، وَيْنَلِلْأَمْنَاءِ ، لَيَتَمَنَّيْنَ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ دَوَائِبَهُمْ كَانَتْ  
مُعْلَفَةً بِالثُّرِيَا ، يَتَذَبَّدُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَلَمْ يَكُنُوا عَمِلُوا عَلَى شَيْءٍ

ধৰ্ম শাসকদের জন্য, ধৰ্ম নেতাদের জন্য, ধৰ্ম কোষাধ্যক্ষদের জন্য! কিয়ামতের দিন অনেক লোক কামনা করবে—হায়! (দুনিয়ার জীবনে) যদি তাদের চুলের ঝুঁটি সুরাইয়া তারকার সাথে ঝুলিয়ে রাখা হতো এবং আসমান ও

[১] মুসনাদু আহমাদ : ২১৯৫৭; সুনানুদ দারাকুতনি : ২৮৪৩; হাদিসটির সনদ সহিত, তবে বিজ্ঞ মুহাদিসদের দ্বিতীয়ে এটা মারফু (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী) হিসেবে প্রমাণিত নয়; বরং এটা হলো কাবে আহবার রাহিমাল্লাহর উক্তি; যেমনটি ইমাম দারাকুতনি রাহিমাল্লাহ ও ইমাম বাগাবি রাহিমাল্লাহ বলেছেন। কাবে আহবার রাহিমাল্লাহর এ উক্তিটি বিশুধ্য সনদে মুসনাদু আহমাদের পরবর্তী হাদিসেই বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, মুসনাদু আহমাদ : ২১৯৫৮।

জমিনের মাঝে তারা দুলতে থাকত, (আধিরাতের অকল্পনীয় শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার এ শাস্তিও অনেক উত্তম ছিল,) তবু যদি তারা কোনো ব্যাপারে দায়িত্বে নিয়োজিত না থাকত [১]

আবু যর রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْتَعِمِنِي؟ قَالَ: فَصَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمٌ الْقِيَامَةِ حِزْيٌ وَنَدَاءٌ، إِلَّا مَنْ أَخْذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَى إِلَيْهِ عَلَيْهِ فِيهَا

আমি একবার আবেদন করে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আমাকে কোনো পদে নিয়োগ দেবেন না? বর্ণনাকারী আবু যর রায়িয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন তিনি তার হাত দিয়ে আমার কাঁধে আঘাত করে বললেন, হে আবু যর, তুমি দুর্বল মানুষ; অথচ এটি হচ্ছে একটি আমানত (গুরুদায়িত্ব)। আর কিয়ামতের দিন এটা হবে (অনেকের জন্য) লাঞ্ছনা ও অনুশোচনা। তবে যে ন্যায়গতভাবে এ দায়িত্ব প্রতিষ্ঠ করবে এবং এ ব্যাপারে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করবে তার কথা ভিন্ন [২]

বুরাইদা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন—

الْفُضَّاهُ تَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقُضِيَ بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارٌ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قُضِيَ لِلنَّاسِ عَلَى جَهَنَّمِ فَهُوَ فِي النَّارِ

বিচারক তিন প্রকার। এক প্রকার বিচারক জানাতি এবং অপর দু-প্রকার বিচারক জাহানামি। সুতরাং জানাতি বিচারক হলো, যে সত্যকে বুঝে তদানুযায়ী ফয়সালা করে। আর যে বিচারক সত্যকে জানার পর সীয়া বিচারে জুলুম করে সে জাহানামি

[১] মুসলাদু আহমদ : ৮৬২৭; মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৭০১৬; হাদিসাটি হাসান।

[২] সহিহ মুসলিম : ১৮২৫; মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৭০২০

এবং যে বিচারক (বাদী-বিবাদীর বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা না জেনে) অজ্ঞাতসারে ফয়সালা করে সেও জাহানামি।[১]

যোগ্য হলেও এসব বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ পদের কামনা বা এসব পদ লাভের পেছনে চেষ্টা-তদবির না করাটাই একজন মুমিনের জন্য অধিক শোভনীয়। যারা এসব পদবির পেছনে ছোটে, একসময় দেখা যায়, এগুলো তাদেরকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়। চিন্তা-ভাবনা পুরোটাই দুনিয়ার জেলুসে আচ্ছন্ন হয়ে গেলে আসমানের সাহায্য থেকে বণ্ণিত হতে হয়।

আব্দুর রহমান ইবনু সামুরা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

**قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمْرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أَغْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتُ إِلَيْهَا، وَإِنْ أَغْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعِنْتُ عَلَيْهَا**

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আব্দুর রহমান ইবনু সামুরা, তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কারণ, চাওয়ার পর যদি তোমাকে তা দেওয়া হয়, তবে তার সকল দায়-দায়িত্ব তোমার ওপরই বর্তাবে। আর যদি চাওয়া ছাড়াই তা তোমাকে দেওয়া হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সাহায্য করা হবে।[২]

আনাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

**مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعْانَ عَلَيْهِ، وُكِلَّ إِلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ، وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ، أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَكًا يُسَيِّدُهُ**

যে ব্যক্তি বিচারকের পদ কামনা করে এবং এজন্য সাহায্য-সুপারিশ তালাশ করে, তাকে তার নিজ দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি তা কামনা করেনি এবং এ ব্যাপারে কোনো সাহায্য-সুপারিশও তালাশ করেনি, আল্লাহ তাআলা (তার জন্য) একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ করেন, যে তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে।[৩]

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৩৫৭৩; জামিউত তিরমিয়ি : ১৩২২; হাদিসটি সহিহ।

[২] সহিতুল বুখারি : ৭১৪৬, সহিহ মুসলিম : ১৬৫২

[৩] সুনানু আবি দাউদ : ৩৫৭৮; মুসনাদ আহমাদ : ১৩৩০২; হাদিসটির সনদ যইফ।

কোনো পদের জন্য যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ লোক থাকে, তাহলে যোগ্য হলেও উচিত হলো সেখানে কোনো পদ না চাওয়া। কিন্তু কোনো পদের জন্য যদি সে ছাড়া কোনো যোগ্য ব্যক্তি না থাকে এবং সেই পদে অযোগ্য লোক নিযুক্ত হলে জনগণ ও রাষ্ট্র ক্ষতির মুখে পড়বে, তাহলে সে এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবে। কারণ, ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজে মিশরের বাদশাকে বলেছিলেন; কুরআনের ভাষায়—

قالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَرَائِنِ الْأَرْضِ حَفِظْنِي حَفِظْ عَلَيْمٌ  
◎

আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব দিন, নিশ্চয় আমি যথাযথ সংরক্ষণকারী,  
সুবিজ্ঞ[!]

এ হলো রাষ্ট্রীয় পদ-পদবি অর্জনের ক্ষেত্রে ইসলামিক রীতি ও শিষ্টাচার।

### যেসব চাকরি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

মুসলিম সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ নয়, চাকরির বৈধতা-বিষয়ক আমাদের বস্তুব্য এমন চাকরির জন্যই কেবল প্রযোজ্য। অতএব, ইসলামবিরোধী কোনো বাহিনীতে চাকরি নেওয়া একজন মুসলিমের জন্য বৈধ হতে পারে না। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অস্ত্র-প্রস্তুতকারক, প্রতিষ্ঠান অথবা ফ্যাক্টরিতে সেবা দেওয়া বা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কোনো দলের সঙ্গে কাজ করাও একজন মুসলিমের জন্য অনুমোদিত নয়।

তদূপ এমন প্রতিষ্ঠান যেখানে কাজ করলে কোনো অনাচার বা নিষিদ্ধ কাজে সহযোগিতা করতে হয়, সেখানকার চাকরিও অবৈধ। যেমন : কোনো সুনি উদ্যোগ, মদের বার ও ডাঙ ক্লাবে চাকরি-বাকরির অনুমতি নেই। চাকরিরত ব্যক্তি যদি হারামে লিপ্ত না-ও হয়, তবু সে গুনাহের দায় থেকে মুক্ত নয়। কেননা, আমরা পূর্বেই ইসলামের মূলনীতি বলে এসেছি যে, গুনাহের কাজে সহযোগিতাও গুনাহ। এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদের প্রাহকের পাশাপাশি সুদের হিসাবরক্ষক, তার সাক্ষীত্ব ও সহযোগীদের প্রতিও অভিসম্পাত করেছেন।

মদ্যপানকারীর পাশাপাশি মদ-প্রস্তুতকারক ও পরিবেশক ও তার সহযোগীদের প্রতিও অভিসম্পাত করেছেন।

এটা স্বাভাবিক সময়ের বিধান—যখন কোনো মুসলিম তার প্রয়োজনীয় জীবিকা উপার্জনের জন্য এ সকল নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য না হয়। কিন্তু কেউ যদি নিরূপায় হয় তাহলে প্রয়োজন অনুপাতে নিষিদ্ধ কাজ করেই সে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে, তবে বিকল্প হালাল জীবিকার অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে থাকবে; যতক্ষণ না আল্লাহ হালাল কিছুর ব্যবস্থা করে দেন।

মুসলিম মাত্রই সংশয় ও সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে নিজেকে সবসময় দূরে রাখবে। যেখানে গেলে আমার দীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আমার আকিদা-বিশ্বাস দুর্বল হয়, সেখানে কিছুতেই যাওয়া যাবে না, সেখানকার উপার্জন ও সুবিধাদি যত বেশি হোক না কেন!

হাসান ইবনু আলি রায়িয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

دَعْ مَا يَرِبُّكَ إِلَى مَا لَا يَرِبُّكَ

| যে বিষয়ে (বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে) তোমার সন্দেহ হয়, তা ছেড়ে দিয়ে যাতে সন্দেহের সম্ভাবনা নেই তা গ্রহণ করো।<sup>[১]</sup>

তিনি আরো বলেন—

لَا يَتَلْفُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَقِينَ حَتَّى يَدْعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ

| বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুন্তাকিদের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারবে না, যতক্ষণ না ক্ষতিকর (অবৈধ) কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় (সংশয়যুক্ত কিছু বৈধ) অক্ষতিকর বিষয় ছেড়ে দেয়।<sup>[২]</sup>

[১] জামিউত তিরমিয়ি : ২৫১৮; সুনানুল নাসাই : ৫৭১১; হাদিসটি সহিহ।

[২] জামিউত তিরমিয়ি : ২৪৫১; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২১৫; হাদিসটির সমদ যহফ।

## জীবিকার মূলনীতি

ইসলাম কখনোই অনুমতি দেয় না—তার অনুসারীরা যেমন ইচ্ছা ও যেভাবে ইচ্ছা জীবিকা উপর্যুক্ত করুক। বস্তুত ইসলামে বৈধ ও অবৈধ উপার্জনের উপায়গুলো অত্যন্ত স্পষ্ট। সমাজে ভারসাম্য রক্ষার্থে, মানুষের জীবনে কল্যাণতার প্রবেশ ঠেকাতে এর কোনো জুড়ি নেই। এক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হলো—যেসব পন্থাকে উপার্জন-মাধ্যম বানালে অন্যের ক্ষতি হয়, জীবিকার জন্য সেসব পন্থা অবলম্বন অবৈধ। আরেকটি মূলনীতি হলো—যেসব পন্থায় উপার্জনে সমাজের কোনো ক্ষতি হয় না এবং ন্যায়নুগ্রামাবে তারা পারস্পরিক অধিকার ও সুবিধা আদান-প্রদান করতে পারে, সেগুলো ইসলামে অনুমোদিত।

এই মূলনীতিটি আল্লাহ তাআলা নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَلْ يَنْتَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَفْعِلُوا أَنفُسَكُمْ هِلْ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ⑤ وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ غُدْوَانًا وَظَلَمًا فَسَوْفَ  
تُنْصَلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ⑥

হে মুমিনগণ, তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কোরো না। তবে পারস্পরিক সম্বন্ধিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু। আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে তা করবে, আমি অচিরেই তাকে অগ্নিতে দগ্ধ করব। আর আল্লাহর পক্ষে এটা

খুবই সহজসাধ্য [১]

এই আয়াতে ব্যবসা বৈধ হওয়ার জন্য দুটি শর্ত আরোপিত হয়েছে—এক. ব্যবসাটি হতে হবে উভয় পক্ষের অনুমোদন ও সন্তুষ্টিক্রমে। দুই. লেনদেনের সুবিধাটি যেন কোনো পক্ষের ক্ষতি ও জুলুমের কারণ না হয়।

দ্বিতীয় মূলনীতিটি আয়াতের এ অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে—‘তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা কোরো না।’ মুফাসসিরগণ এই অংশের দুটি ব্যাখ্যা করেছেন।

উভয় ব্যাখ্যাই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে দারুণভাবে মিলে যায়।

প্রথম ব্যাখ্যা—‘তোমরা পরস্পরে একে অপরকে হত্যা কোরো না।’ দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—‘তোমরা আপন হাতে নিজেদেরকে হত্যা কোরো না।’

আয়াতের অর্থ যা-ই হোক, উভয় ক্ষেত্রেই আয়াতের মূলকথা হলো—যে ব্যক্তিস্বার্থে অন্যের ক্ষতি করে, সে মূলত নিজের রন্ধন মূল্যহীন বানিয়ে ফেলে, নিজ হাতেই নিজের কবর খনন করে। সুতরাং, চুরি, ঘৃষ, জুয়া, প্রতারণা, ধোঁকা, ভেজাল মিশ্রণ ও সুস্মারণ এই জাতীয় আরো বহু অবৈধ উপার্জন-মাধ্যম রয়েছে, যেগুলো অবৈধ হওয়ার পেছনে এই দুটি কারণই মূলত দায়ী। কোথাও হয়তো উভয়পক্ষের সম্মতি পাওয়া যায়, কিন্তু কোনো এক পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সেই চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হয় [১]



[১] উস্মানুল ইকতিসাদ (اسس الاقتصاد) বা অর্থনীতির বুনিয়াদসমূহ, আবুল আলা মওদুদী, পৃষ্ঠা : ১৫২



### তৃতীয় অধ্যায়

## পারিবারিক ও দাম্পত্যজীবনে হলাল-হারাম

### জৈবিক চাহিদা

আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে দুনিয়া আবাদের জন্যই মূলত মানুষের সৃষ্টি। কিন্তু মানুষ যদি বেঁচেই না থাকে, তাহলে সেই উদ্দেশ্য সফলতার মুখ দেখবে কীভাবে? এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের জন্য পৃথিবীতে মানুষের জীবনধারণ নির্বিঘ্ন রাখা অপরিহার্য। তারা যেন চাষবাস, কাজকর্ম চলমান রাখে, জমি আবাদ, ঘরবাড়ি নির্মাণ, আল্লাহর হক আদায় ইত্যাদিতে রত থাকে। সবকিছু সুচারুরূপে সৃঝংক্রিয়ভাবে সম্পাদনের জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে কিছু মৌলিক সুভাব ও চাহিদা দিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে মানুষ নিজেকে যেমন বাঁচিয়ে রাখবে, তেমনি মনুষ্যজাতিও যুগ যুগ ধরে টিকে থাকবে। খাদ্যের চাহিদা ঠিক এমন একটি মানবিক চাহিদা। এই চাহিদা পূরণের মাধ্যমেই মানুষ মূলত জীবিত থাকে।

মানুষের যৌনচাহিদা এমনই আরেকটি চাহিদার নাম। এটি পূরণের মধ্য দিয়ে মনুষ্যজাতি তার বংশক্রম ও ধারাবাহিকতা পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্নভাবে জারি রাখে। তবে এই চাহিদাটি মানুষের মধ্যে কখনো কখনো অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। তখন মানুষমাত্রই এই চাহিদাটি পূরণের জন্য সুযোগ ও স্থান খুঁজে বেড়ায়। কথা হলো, মানুষের এই চাহিদার নিরুত্তি কীভাবে ঘটবে?

এখানে আমদের সামনে তিনটি সুযোগ রয়েছে—

[এক] মানুষকে পূর্ণ লাগামহীন ছেড়ে দেওয়া। নৈতিক, চারিত্রিক বা ধর্মীয় কোনো ধরনের বাধা-নিষেধ ও সীমায় তাকে না বেঁধে যেখানে ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা তার চাহিদাটি ও মনোবাসনা পূরণের সুযোগ প্রদান। যেমনটা ধর্মে ও মানুষের শ্রেষ্ঠত্বে অবিশ্বাসী অসীম বৈধতার পক্ষশক্তি বলে থাকে। এমন সুযোগ দিলে মানুষ ধীরে ধীরে পশুতে পরিণত হবে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজসহ সর্বস্তরে সে বিপর্যয় ডেকে আনবে।

[দুই] এই চাহিদাকে সর্বাঞ্চক্ষণে বাগে আনা এবং সমূলে নিশ্চিহ্নকরণ। যাতে এটি কখনোই মাথাচাড়া দিতে না পারে। যেমনটা সন্ধ্যাসী ও বৈরাগ্যবাদীরা করে থাকে। এতে মানুষের একটি সুভাবজাত চাহিদাকে গলা টিপে মেরে ফেলা হয়। এ তো স্ফটাপ্রদত্ত একটি মানবিক জন্মগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মহা-অবিচার। আল্লাহ তাআলা মানুষের বংশক্রম ও ধারা টিকিয়ে রাখার জন্য তার মধ্যে যে সৃংক্রিয় নিয়ম-নীতি প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে এই নিয়ম কখনোই যায় না।

[তিনি] চাহিদাটি নিবৃত্তির জন্য লাগামহীনভাবে ছেড়ে না দিয়ে কিংবা একে সমূলে উপড়ে না ফেলে তার জন্য নির্দিষ্ট একটা সীমা বেঁধে দেওয়া। বিভিন্ন আসমানি ধর্মে এই সীমাকেই ‘বিয়ে’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। সবগুলো আসমানি ধর্মেই বিয়ের বৈধতা আর ব্যভিচারের নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে ইসলামের বৈশিষ্ট্যই হলো মানুষের সুভাবজাত চাহিদার সীকৃতি প্রদান, তাই এখানে বিয়ে অত্যন্ত সহজ একটি বিধান। অন্যদিকে সন্ধ্যাসবাদ ও নারীসঙ্গ বর্জন এখানে নিষিদ্ধ। পাশাপাশি ব্যভিচার ও তার আনুষাঙ্গিক বিবয়াদিতে আরোপিত হয়েছে কঠোর হুঁশিয়ারি ও নিষেধাজ্ঞা।

মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত এটিই। বিয়ের মাধ্যমে যৌনচাহিদা পূরণের অনুমতি না দিলে মানুষের বংশানুক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভব হতো না। অন্যদিকে সমাজে ব্যভিচার চালু থাকলে পারিবারিক ভালোবাসা, আদর, স্নেহ ও ত্যাগের অনুভূতিগুলো গড়ে ওঠে না। একটি পরিবার গঠিত হয় মূলত এসব অনুভূতিকে কেন্দ্র করেই। সেই পরিবারের হাত ধরেই আবার গড়ে ওঠে সমাজ। পরিবারই যদি না থাকে, তাহলে সমাজ আসবে কোথেকে? আর সমাজবন্ধ হওয়া ছাড়া মানুষের পক্ষে উন্নতি ও অগ্রগতি করা অসম্ভব।

## ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না

যিনার নিষিদ্ধতা ও বিরোধিতায় সকল ঐশ্বী ধর্মই বন্ধপরিকর। ইসলাম সেই ধারার সর্বশেষ ধর্ম। ব্যভিচারের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর। মূলত এতে বিশিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা, সমাজে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়লে জন্ম, বংশ-প্রক্রিয়া, পরিবার ও সমাজব্যবস্থা সবকিছুর অর্গান ও শৃঙ্খল ভেঙে পড়বে। অশ্লীলতা ও নির্জনতা ছড়াবে লাগামহীনভাবে। চারদিকে বিস্তার লাভ করবে যৌনবাহিত রোগ ও চরম চারিত্রিক অবক্ষয়।

আল্লাহ তাআলা যথার্থই বলেছেন—

وَلَا تَقْرُبُوا إِلَيْنَا مَنْ فَاحِشَّهُ وَسَاءَ سُبِيلًا

আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং  
জ্ঞান্য পথ [১]

কোনো কিছু হারামের অর্থই হলো, তার সঙ্গে জড়িত যাবতীয় উপায়-উপকরণও নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে। সেই ধারাবাহিকতায় প্রকাশ্য যৌন-উদ্রেজক, নারী-পুরুষকে ফিতনা ও অশ্লীলতার প্রতি আহায়ক, তাদের কাছে নির্জনতার প্রচারক ও নীতি-নৈতিকতার বাঁধ ভেঙে ফেলতে সহযোগী সকল কিছুই ইসলামে হারাম ও নিষিদ্ধ।

## গায়রে মাহরাম নারীর সাথে একান্তে অবস্থান

ব্যভিচার রোধে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অন্যতম হচ্ছে—গায়রে মাহরাম নারীর সঙ্গে কোনো পুরুষ একান্তে থাকতে পারবে না। স্ত্রী এবং যাদের সঙ্গে বিয়ে হারাম (যেমন : মা, বোন, ফুফু, খালা প্রমুখ) তারা ছাড়া বাকি সব নারী একজন পুরুষের জন্য গায়রে মাহরাম হিসেবে বিবেচিত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে, ইনশাআল্লাহ।

নারী-পুরুষের প্রতি অনাস্থা থেকে এই বিধিনিয়েধ তৈরি হয়নি। একজন পুরুষ ও নারী যখন একান্তে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় থাকে, তাদের মধ্যে তৃতীয় কেউ না থাকে,

[১] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৩২

তখন শয়তানের কুম্ভণা ও প্ররোচনার ফলে তাদের ভেতরকার আদি পুরুষত্ব ও নারীত্ব জাগ্রত হতেই পারে। এই সন্তান-ফ্যাসাদ থেকে রক্ষার জন্যই মূলত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَخْلُونَ بِإِمْرَأَةٍ لَّيْسَ مَعَهَا دُوَّمَ حَرَمٍ مِّنْهَا ، إِنَّ  
ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে সে যেন এমন কোনো (গায়রে মাহরাম) নারীর সঙ্গে একান্ত নির্জনে না থাকে, যার সাথে তার মাহরাম পুরুষ নেই। কারণ, (এমতাবস্থায় কুম্ভণা দেওয়ার জন্য) শয়তান তাদের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকে।[১]

ইবনু আবুস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

কোনো পুরুষ যেন কোনো (গায়রে মাহরাম) নারীর সাথে তার মাহরাম পুরুষের উপস্থিতি ছাড়া একান্তে অবস্থান না করে।[২]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿... وَإِذَا سَأَلُتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسأْلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقْلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ...﴾

আর যখন নবি-পত্নীদের কাছে তোমরা কোনো সামগ্রী চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে; এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র।[৩]

[১] মুসনাদু আহমাদ : ১৪৬৫১; আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৯১, হাদিস : ১১৪৬২; হাদিসটি হাসান।

[২] সহিল বুখারি : ৫২৩৩, সহিহ মুসলিম : ১৩৪১

[৩] সুরা আহমাদ, আয়াত : ৫৩

‘তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র’—এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘সুভাবত পুরুবের মনে নারী সম্পর্কে এবং নারীর মনে পুরুষ নিয়ে যেসব চিন্তার উদয় ঘটে, সেগুলোও যাতে কারো মনে উদয় না হয়, উভয়েই ঝুঁকিমুক্ত থাকে এবং তাদের ব্যাপারে অন্যদের মনেও সংশয় জাগ্রত না হয়; এজন্য এভাবে (পর্দার আড়াল থেকে) প্রয়োজনীয় জিনিস চাইতে বলা হয়েছে। এখান থেকে বোৰা গেল, কারো জন্যই নিজের ওপর আস্থার কারণে গায়রে মাহরামের সঙ্গে একান্তে থাকা উচিত হবে না। কেননা এমন ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ এড়িয়ে চলাই হলো সবার জন্য নিরাপদ ও কল্যাণকর এবং চারিত্রিক পবিত্রিতার পক্ষে অধিক সহায়ক।’<sup>[১]</sup>

এজন্য আপন দেবর, চাচাতো দেবরদের সঙ্গে নারীদের একান্তে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। যেহেতু আম্বীয়দের মধ্যে সাধারণত পর্দার ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা থাকে, এই সুযোগে যেকোনো সময় ঘটে যেতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা, খুলে যেতে পারে জঘন্য সব গুনাহের দুয়ার। তাই আম্বীয়দের সঙ্গে একান্তে সময় কাটানোর বিষয়ে আরো বেশি সতর্ক থাকা দরকার। আম্বীয়দের মধ্যেই পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা তুলনামূলক বেশি। কারণ, আম্বীয় হওয়ার সুবাদে তারা যতটা নারীর কাছে যেতে পারে, একজন অপরিচিত মানুষের পক্ষে সেটা সম্ভব হয় না।

একই বিধান নারীর গায়রে মাহরাম পুরুষ আম্বীয়দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন : নারীর চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, খালাতো ভাই। এদের সঙ্গেও একান্তে ঘনিষ্ঠ অবস্থান ইসলামে অনুমোদিত নয়।

উকবা ইবনু আমির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّكُمْ وَاللُّدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟  
قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ

| তোমরা (গায়রে মাহরাম) নারীদের কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকো। তখন এক আনসারি সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, ‘হামবু’ (স্বামীর

[১] তাফসিল কুরতুবি, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২২৮

| নিকটাঞ্চীয়)-এর ব্যাপারে আপনি কী বলেন? তিনি উত্তর দিলেন, ‘হামবু’  
হলো মৃত্যু।[১]

‘হামবু’ অর্থ—স্বামীর নিকটাঞ্চীয়।[২]

‘হামবু’ হলো মৃত্যু’—এই বক্তব্যের দ্বারা নবিজি সাল্লাল্লাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম  
বোঝাতে চেয়েছেন, এদের সঙ্গে নির্জনে একান্তে মিলিত হওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ  
ও ধূংসের কারণ। কেননা, নারী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তো  
তার পরকাল ধূংস হলো, আর অন্যদিকে স্বামী যদি (এসব ঘটনায় সন্দেহ করে  
বা নিশ্চিত হয়ে) তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে এর পাশাপাশি তার দুনিয়াও গেল।  
তাছাড়া এ ধরনের নানা অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে আঞ্চীয়দের মধ্যকার সম্পর্কেও  
ধস নামতে বাধ্য।

এসব ঘটনা ও দুর্ঘটনার রেশ কেবল আক্রান্ত ব্যক্তি কিংবা বিচ্ছেদের মধ্যেই সীমিত  
থাকে না; বরং এটি পরিবার ও স্বামী-স্ত্রীর জীবনকে বিশাল হুমকির মুখে ফেলে  
দেয়। নিম্নুক ও ছিদ্রানুসন্ধানীরা এদের দোষ খুঁজে বেড়ায়, আর নানান জিনিস রঁটাতে  
থাকে। আর এতে সুভাবিকভাবেই একসময় তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

ইমাম ইবনুল আসির রাহিমাতুল্লাহ বলেন, ‘আরবি ভাষাভাষীরা ‘সিংহ হলো মৃত্যু’  
এবং ‘শাসক হলো আগুন’—এ জাতীয় কথা অনেক বেশি বলে। এটার অর্থ সিংহ  
ও শাসকের সাক্ষাৎ মৃত্যু-সমতুল্য। ‘হামবু হলো মৃত্যু’ কথাটিও এমনই একটি  
কথা। এর অর্থ—অপরিচিত মানুষের সঙ্গে নির্জনে সময় কাটানোর চেয়ে হামবু  
তথা স্বামীর আঞ্চীয়দের সঙ্গে নির্জনে সময় কাটানো অধিক ভয়ানক, প্রায় মৃত্যু  
সমতুল্য। এর বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, যেমন হতে পারে সেই ‘হামবু’ স্ত্রীকে

[১] সহিল বুখারি : ৫২৩২, সহিল মুসলিম : ২১৭২

[২] এখানে موتুল্লাহ বলতে স্বামীর নিকটাঞ্চীয় বোঝানো হয়েছে। তবে স্বামীর পিতা-দাদা বা তার উর্ধ্বতন  
পুরুষ এবং তার (উরসজাত অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত) সন্তান-নাতী বা তার অধস্তন পুরুষ উদ্দেশ্য নয়; কেননা  
এরা হলো তার স্ত্রীর জন্য মাহরাম, তাদের সাথে তার স্ত্রীর একান্তে অবস্থান করা বৈধ। অতএব তারা  
তার জন্য মৃত্যুতুল্য নয়। এখানে স্বামীর নিকটাঞ্চীয় হচ্ছে, হলো—স্বামীর ভাই, ভাতিজা, চাচা, চাচাতো ভাই  
প্রমুখ, যারা তার স্ত্রীর জন্য মাহরাম নয়। মানুষ সাধারণত এদের ব্যাপারে (দেখা-সাক্ষাৎ, চলাফেরায়)  
শিথিলতা প্রদর্শন করে এবং নিজের ভাবিব সাথে একান্তে অবস্থান করে। সুতরাং এটাই হলো তাদের জন্য  
মৃত্যু সমতুল্য। আর এটার কারণেই অনাঙ্চীয়দের চেয়ে এসব দেবর, চাচা, চাচাতো ভাইয়েরাই নিষেধাজ্ঞার  
অধিক উপযুক্ত। [আল-মিনহাজ শারহু মুসলিম, নববি, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৫৪]

সুমীর কাছে তার সাধ্যাতীত কোনো কিছু চাইতে উক্ষে দিলো কিংবা তাকে সুমীর প্রতি দুর্ব্বহার করতে প্রোচনা জোগালো ইত্যাদি।<sup>[১]</sup>

### বিপরীত লিঙ্গের কারো প্রতি কামনাপূর্ণ দৃষ্টি

জৈবিক চাহিদা ও মৌনতাকে নিয়ন্ত্রিত পন্থায় পূরণের ধারাবাহিকতায় আরেকটি বিষয় নিষিদ্ধ হয়েছে—বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কামভাব নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তাকানো। এটি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কারণ চোখ হলো অন্তরের দরজা। তাই (বেগানা নারীর দিকে) দৃষ্টিপাত ব্যভিচারের বার্তাবাহক ও যাবতীয় ফিতনার সূচনাদ্বারা।

প্রাচীন এক কবি বলেছেন—

كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَاهَا مِنَ النَّظَرِ وَمُعَظُّمُ الْتَّارِ مِنْ مُسْتَصْفَرِ الشَّرِّ

চোখের দৃষ্টি থেকেই সকল বিপদ শুরু,  
ছেট স্ফুলিঙ্গ থেকে জন্মায় বিশাল অশ্বিকাণ্ড।

আরেক কবি বলেন—

نَظَرَةٌ فَابْتِسَامَةٌ فَسَلَامٌ فَكَلَامٌ فَمَوْعِدٌ فَلِقاءٌ

চোখাচোখি, মুচকি হাসি, এরপর সালাম-কালাম, প্রতিশ্রুতি। তারপর সাক্ষাৎ।

তাই কুরআনে মুমিন নারী-পুরুষ সবার উদ্দেশে দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ লজ্জাস্থান হিফায়তের আদেশের সঙ্গেই আলোচিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

فُلَّ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْصُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَخْفِظُوا فُرُوجَهُمْ هَذِهِ أَزْكَى لَهُمْ طَإِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ  
بِمَا يَصْنَعُونَ ③ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْصُبُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفِظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُنْدِينَ  
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ طَوَّلَ يُنْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِيُنْعَوِّلُهُنَّ  
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ

[১] জামিউল উসুল, ইবনুল আসির, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৬৫৬

بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرُ أُولَئِي الْأَزْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ  
أَوِ الطِّفْلُ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوْزَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُغْلَمُ مَا يُخْفِيَنَّ مِنْ  
زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أُتْهِيَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٣﴾

আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গ সংযত রাখে, এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্মক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গ সংরক্ষিত রাখে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভাতুপুত্র, ভগ্নিপুত্র, নিজেদের (ধর্মের মুসলিম) নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, যৌনকামনাধীন পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ব্যতীত অন্য কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য জোরে পদচারণা না করে।[১]

এই আয়াতে আল্লাহ-প্রদত্ত অনেক নির্দেশনা রয়েছে, তন্মধ্যে দুটি নির্দেশনা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য। যথা : দৃষ্টি অবনত রাখা ও যৌনাঙ্গের হিফায়ত। আর অবশিষ্টগুলো বিশেষভাবে নারীর জন্য।

লক্ষণীয় বিষয় যে, দৃষ্টি নত রাখার নির্দেশের ভাষ্য হলো—**يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ** অর্থাৎ দৃষ্টির পুরোটাই নত রাখতে হবে না; বরং আংশিক নত রাখলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু লজ্জাস্থান সংযত করার নির্দেশের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে—**وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ** অর্থাৎ লজ্জাস্থান পুরোটাই হিফায়ত করতে হবে, সেখানে বিলুমাত্র ছাড় নেই। অন্যদিকে দৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা সামান্য ছাড় দিয়েছেন, অন্যথায় মানুষের জন্য চলাফেরা করা কষ্টকর হয়ে যেতো।

দৃষ্টি নত রাখার অর্থ, চোখ বন্ধ করে মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটা নয়। এটা কুরআনের উদ্দেশ্যও নয় আর তা পালন করা সম্ভবও নয়। কেননা, আমরা দেখি সুরা লুকমানে উল্লেখিত হয়েছে—

[১] সুরা নুর, আয়াত : ৩০-৩১

وَأَعْصُنْ مِنْ صَوْتِكَ [১]

আর তোমার কষ্টস্বর নিচু রাখো [১]

এখানে কষ্টস্বর নিচু রাখার অর্থ ঠোঁট সেলাই করে একেবারে মুখ বন্ধ রাখা নয়। অনুরূপ দৃষ্টি নত রাখার অর্থ হলো যথাসম্ভব নিম্নগামী রাখা, একেবারে লাগামহীন হেডে না দেওয়া। সামনে যত সুন্দর নারী-পুরুষ পড়ে, সবার দিকে হা করে তাকিয়ে না থাকা। বিপরীত লিঙ্গের কারো প্রতি দৃষ্টি পড়লে তার সৌন্দর্য গিলে গিলে খাওয়া বা তাকে মন ভরে দেখা যাবে না; বরং চোখ পড়ামাত্রই তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হবে।

এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রায়িয়াল্লাহুকে বলেছেন—

**يَا عَلِيٌّ لَا تُتْبِعِ النَّظَرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَنِسْتَ لَكَ الْآخِرَةُ**

হে আলি, (কোনো নারীর দিকে) একবার দৃষ্টি দেওয়ার পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিয়ো না। কেননা, তোমার জন্য (আকস্মিক হওয়ায়) প্রথমবার দেখার অনুমতি আছে, কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখার বৈধতা নেই।[২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপরীত লিঙ্গের প্রতি স্কুধিত ও লোলুপ দৃষ্টি দেওয়া যিনা বলে অভিহিত করেছেন। যেমন আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

**الْعَيْنَانِ تَرْبِيَانٍ وَزِنَاهُمَا النَّظرُ**

| চোখও যিনায় লিপ্ত হয়, চোখের যিনা হলো অন্যায়ভাবে দৃষ্টিপাত। [৩]

অবৈধ দৃষ্টিকে যিনা বলার কারণ হলো, বিপরীত লিঙ্গের কারো দিকে লালসাপূর্ণ

[১] সুরা লুকমান, আয়াত : ১৯

[২] সুনান আবি দাউদ : ২১৪৯; জামিউত তিরমিয়ি : ২৭৭৭; হাদিসটি হাসান।

[৩] সহিলুল বুখারি : ৬২৪৩, সহিহ মুসলিম : ২৬৫৭

দৃষ্টিতে তাকানোও জৈবিক চাহিদা পূরণের একটি অবৈধ মাধ্যম। কারণ এতেও মানুষ তৃপ্তি লাভ করে, জৈবিক আনন্দ পায়।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের এই হাদিসের মতো ইঞ্জিলেও ঈসা আলাইহিস সালামের এমন একটি বন্ধব্য এসেছে। তিনি বলেন, ‘তোমাদের পূর্বের লোকেরা বলত, তোমরা যিনা কোরো না। আমি তোমাদের বলছি, যে লোলুপ চোখ দিয়ে দেখল, সেও (একপ্রকার) যিনা করল।’<sup>[১]</sup>

লালসাপূর্ণ ও ক্ষুধিত দৃষ্টিতে বিপরীত লিঙ্গের দিকে নজর দেওয়ার প্রতিক্রিয়া অনেক বিশাল ও বিস্তৃত। এর প্রভাব সাধারণত চারিত্রিক পরিভ্রতার সীমা ছাড়িয়ে মানসিক স্থিতিশীলতা, অন্তরের প্রশান্তি সবকিছুর ওপর পড়ে। এর ফলে অনেক সময় ব্যক্তি নানা দুর্ঘটনা ও বিচ্যুতির শিকার হয়।

কবি বলেন—

وَكُنْتَ مَتَّى أَرْسَلْتَ طَرِفَكَ رَائِدًا  
لِقَلْبِكَ يَوْمًا أَثْعَبْتَكَ الْمَنَاطِرِ  
رَأَيْتَ الِّذِي لَا كُلُّهُ أَنْتَ قَادِرٌ  
عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بَغْضِيهِ أَنْتَ صَابِرٌ

আর তুমি যখন অন্তরের অগ্রদূত হিসেবে তোমার দৃষ্টিকে দিয়েছ ছেড়ে,  
তখন মনে রেখো, একদিন সকল দৃশ্য-রূপ তোমাকে তুলবে ক্লান্ত করে;  
তুমি (দুচোখ ভরে সৌন্দর্যের) যা কিছু দেখেছ, না সক্ষম তার সব পেতে,  
আবার (সৃচক্ষে সবকিছু দেখার পর) কিছু ব্যাপারে না পারছ ধৈর্য ধরতে।

### সবার জন্য উন্মুক্ত গোসলখানায় নারীদের প্রবেশ

পর্দা প্রসঙ্গে সর্তকতা অবলম্বনের জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম উন্মুক্ত গোসলখানায় নারীদের গোসলের জন্য প্রবেশ নিয়েধ করেছেন। এসব

[১] মথির ইনজিল, ৫ : ২৮, ২৯

গোসলখানায় নারীরা একত্রে অন্যান্য নারীর সামনে বিবস্ত্র হয়ে গোসল করত। সাধারণত সব জায়গাতেই এমন কিছু নারী থাকে, যারা অন্য নারীদের শারীরিক গঠন, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিয়ে আলাপ-আলোচনায় মজলিস মাতিয়ে রাখে এবং বিভিন্ন কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রচার করতে উস্তাদ। এসব উন্মুক্ত গোসলখানায় যেহেতু পর্দা লঙ্ঘন হয়, তাই সূভাবিক অবস্থায় এসব গোসলখানায় নারীদের প্রবেশ নিষেধ।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লুঙ্গি ইত্যাদি ছাড়া সতর অন্বৃত অবস্থায় পুরুষদেরকেও এসব গোসলখানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلُ الْحَمَّامَ بِعِنْدِ إِرَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ

আল্লাহ তাআলা ও শেষ দিবসের প্রতি যে লোক ঈমান রাখে সে যেন ইয়ার (লুঙ্গি-পায়জামা) পরা ছাড়া (পুরুষদের সবার জন্য উন্মুক্ত) গোসলখানায় প্রবেশ না করে। আল্লাহ তাআলা ও শেষ দিবসের প্রতি যে লোক ঈমান রাখে সে যেন তার স্ত্রীকে (সবার জন্য উন্মুক্ত) গোসলখানায় প্রবেশ না করায়।<sup>[১]</sup>

তবে বিশেষ প্রয়োজন হলে, যেমন : কোনো রোগ বা সন্তান জন্মের পরে যদি কোনো নারীকে এসব গোসলখানায় নেওয়ার একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। আবুল্লাহ ইবনু আমর রায়িয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাম্মাম বা উন্মুক্ত গোসলখানার ব্যাপারে বলেছেন—

إِنَّهَا سَفَّاحَةٌ لِكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَاتَلُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ، فَلَا يُدْخِلُنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأَزْرِ، وَأَمْنَغُوهَا النِّسَاءُ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نَفَسَاءً.

শীঘ্রই তোমাদের হাতে অনারবদের বহু অঞ্চল বিজিত হবে এবং সেখানে তোমরা এমন কতগুলো ঘর দেখতে পাবে, যেগুলোকে হাম্মাম (গণ-গোসলখানা) বলা

[১] জামিউত তিরমিয়ি : ২৮০১; মুসনাদু আহমাদ : ১৪৬৫১; হাদিসাটি হাসান।

হয়। ইয়ার (লুঙ্গি-পায়জামা) ছাড়া কোনো পুরুষ যেন তাতে প্রবেশ না করে। আর তোমরা নারীদেরকেও তাতে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করো, অসুস্থ ও প্রসূতি হলে ভিন্ন কথা।<sup>[১]</sup>

এই হাদিসের সনদে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। তবে অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইসলামে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও ছাড়ের মনোভাব এই হাদিসের বিষয়কে সমর্থন করে। তেমনিভাবে একটি প্রসিদ্ধ ফিকহি মূলনীতি হলো—মন্দের দরজা বন্ধের উদ্দেশ্যে শরিয়তে যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা প্রয়োজন এবং কল্যাণের খাতিরে বৈধ হতে পারে। ফিকহের এ মূলনীতিটিও এই হাদিসের বস্তব্যকে শক্তি যোগায়। অনুরূপ মুস্তাদরাকুল হাকিমে বর্ণিত ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহুর হাদিসও একে সমর্থন করে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

اَنْقُوا يَئِنَّا يُقَالُ لَهُ الْحَمَامُ。 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّرَنَ وَيَئْنَعُ الْمَرِيضَ ، قَالَ :  
فَمَنْ دَخَلَهُ فَلَيَسْتَبِرْ

হান্মাম (গণ-গোসলখানা) নামক ঘর থেকে তোমরা দূরে থাকো। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, তা (শরীরের) ময়লা দূর করে এবং অসুস্থ রোগীর উপকারে আসে। তিনি বললেন, তাহলে যে তাতে প্রবেশ করবে, সে যেন সতর আবৃত রাখো।<sup>[২]</sup>

সুতরাং বিনা প্রয়োজনে যে নারী উন্মুক্ত গোসলখানায় যাবে, সে হারামে লিপ্ত হবে এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরস্কারের উপযুক্ত হবে। আবুল মালিহ আল-হুয়ালি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

دَخَلَ نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتِنَ ۝ قُلْنَ مِنْ أَهْلِ  
الشَّامِ قَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنْ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَامَاتِ ۝ قُلْنَ: نَعَمْ قَالَتْ: أَمَا إِنِّي  
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ امْرَأٌ تَخْلُعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ يَئِنَّها إِلَّا  
هَتَّكَتْ ، مَا يَئِنَّهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৪০১১; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৭৪৮; হাদিসটির সনদ যইফ।

[২] মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৭৭৭৮; শুআবুল ঈমান : ৭৩৭৫; হাদিসটি সহিহ।

একবার সিরিয়ার কিছু মহিলা আয়িশা রায়িয়াম্মাহু আনহার কাছে এলে তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমরা কারা? তারা বলল, আমরা সিরিয়ার অধিবাসী। তিনি বললেন, তোমরা সম্ভবত সেই শহরের অধিবাসী, যেখানে মহিলারা হাম্মাম তথা গণ-গোসলখানায় প্রবেশ করে। তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সালাম্মাহু আলাইহি ওয়া সালামকে বলতে শুনেছি, কোনো মহিলা নিজের ঘর ছাড়া অন্যত্র তার পরিধেয় বস্ত্র খুললে সে নিঃসন্দেহে তার ও আল্লাহর মধ্যকার পর্দা ছিড়ে ফেলল (অর্থাৎ সম্পর্ক ছিন্ন করল)।<sup>[১]</sup>

উন্মু সালামা রায়িয়াম্মাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সালাম্মাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন—

أَيُّهَا الْمُرْأَةُ تَرَغَبُ تِبَابَتَاهَا فِي غَيْرِ تِبَابَتَاهَا ، حَرَقَ اللَّهُ عَنْهَا سِرْرًا

যে নারী তার নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তার কাপড় খোলে, তার থেকে আল্লাহ তাঁর পর্দা সরিয়ে নেন।<sup>[২]</sup>

হাম্মাম বা গণ-গোসলখানা হলো, চার দেওয়ালবিশিষ্ট একটি ঘর, যেখানে কেবল নারীরা প্রবেশ করে। চারপাশে দেওয়াল থাকা সত্ত্বেও এখানে নারীদের প্রবেশের বিষয়ে এতটা কঠোরতা আরোপিত হয়েছে। তাহলে যে সব নারীরা বিভিন্ন সমুদ্র তীরে প্রায় বিবস্ত্র হয়ে দেহিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাদের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান কী হতে পারে?

এরা তো তাদের জন্য রবের ‘নিরাপত্তার পর্দা’ ছিড়েই ফেলেছে। গুনাহের ক্ষেত্রে এদের পুরুষ অভিভাবকরাও এদের সম-অংশীদার। কারণ, অভিভাবকরা এসব নারীদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। হায় যদি তারা বুবতো!

### নারীদের সৌন্দর্য-প্রদর্শন হারাম

কাফির এবং জাহিলি নারীদের চেয়ে একজন মুসলিম নারীর সূতত্ত্ব হলো—তার চারিত্রিক পবিত্রতা, লজ্জা ও চারিত্রিক সংকোচন। অন্যদিকে একজন জাহিলি নারীর

[১] মুনাফু আবি দাউদ : ৪০১০; জামিউত তিরমিয়ি : ২৮০৩; হাদিসটি সহিহ।

[২] মুসনাফু আহমাদ : ২৬৫৬৯; শুআবুল ঈমান : ৭৩৮৪; হাদিসটি হসান।

বৈশিষ্ট্য হলো—সৌন্দর্য প্রদর্শন এবং পুরুষদের অলুধকরণ।

### তাবাররুজ (সৌন্দর্য প্রদর্শন)

তাবাররুজ (تبرج) অর্থ—উন্মোচন ও চোখের সামনে প্রকাশ পাওয়া, যা برج শব্দমূল থেকে নির্গত। এ কারণেই আরবিতে সুউচ্চ দুর্গ ও আকাশের নক্ষত্রকে বুরুজ (ج) বলা হয়। যেহেতু এগুলো উঁচু ও প্রকাশ্য হওয়ার ফলে মানুষের দৃষ্টিতে আসে। বিখ্যাত ভাষাবিদ ও মুফাসসির ইমাম যমাখশারি তাবাররুজ (تبرج) শব্দটির বাস্তবতা উল্লেখ করে বলেন—

تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه من قولهم: سفينة بارج ، لا غطاء عليها... إلا أنه اختص  
بأن تكشف المرأة للرجال يابداء زينتها وإظهار محاسنها

‘তাবাররুজ (تبرج) শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো—যা গোপন করা অপরিহার্য ছিল তা জোরপূর্বক প্রকাশ করা। যেমন : (আরবি ভাষায়) বলা হয়, অর্থাৎ এমন জাহাজ, যার কোনো পাল নেই। (জাহাজকে পাল দিয়ে আবৃত রাখার নিয়ম থাকলেও জোর করে পাল খুলে ফেলা হয়েছে; বিধায় এটাকে সفينة বার্জ বলা হয়েছে।) ...পরে অবশ্য তাবাররুজ (تبرج) শব্দটি বিশেষভাবে শুধু পুরুষের সামনে নারীর সৌন্দর্য-শোভা ও রূপ প্রকাশের জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।’<sup>[১]</sup>

ইমাম যমাখশারির ব্যাখ্যা থেকে আমরা অতিরিক্ত একটি উপাদান—জোরপূর্বক প্রদর্শনীর অর্থ পেলাম। আর নারীদের এই রূপ-লাভণ্য প্রকাশের বিষয়টি কখনো দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদর্শনের দ্বারা যেমন হতে পারে, তেমনি আবার কখনো বাচনভঙ্গি, হাঁটার ধরন বা অলংকার, কাপড়-চোপড় ও প্রসাধনী প্রকাশের মাধ্যমেও হতে পারে।

অতীতে নারীদেহের সৌন্দর্য প্রকাশ ও প্রদর্শনীর বিভিন্ন ধরন ও উপায় যেমন ছিল, বর্তমান সময়েও সেগুলো রয়েছে। মুফাসসিরগণ এর কিছু কিছু চিত্র সুরা আহ্যাবের ৩৩ নম্বর আয়াতের অধীনে আলোচনা করেছেন। বিখ্যাত তাবিয়ি মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তাবাররুজ (تبرج) অর্থ—পুরুষের মধ্য দিয়ে গঠিত করে হেঁটে বেড়ানো। কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তাবাররুজ (تبرج) অর্থ—হেলেদুলে ও

[১] আল-কাশশাফ, যমাখশারি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৫৫

আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে হাঁটা। মুকতিল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তাবারবুজ (بَرْج) এর উদ্দেশ্য হলো, জাহিলি-যুগে নারীরা মাথায় ওড়না দিত, কিন্তু সেটি বেঁধে রাখত না, ফলে তার সাজসজ্জা—অলংকার ও দেহ—কাঁধ, গলা সবই দেখা যেত।

পুরুষের সঙ্গে ওঠাবসা, কোমর দুলিয়ে হাঁটা, ওড়না পরে শারীরিক সৌন্দর্য প্রদর্শন—এগুলো ছিল প্রাচীন জাহিলি দেহ-প্রদর্শনীর অংশ। তবে বর্তমান সময়ের নগ্ন ও অর্ধনগ্ন দেহ-প্রদর্শন প্রতিযোগিতার নানা উদ্দট ধরন ও প্রকারের সামনে প্রাক-ইসলামি যুগের অসভ্যতা ও বর্বরতা অনেকটা ভদ্রতার মধ্যেই পড়ে যাবে হয়তো।

### নারীদের পর্দানশিন হওয়ার উপায়

ইসলামের নির্দেশনা অনুসারে নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে মুক্ত থাকার উপায়গুলো—

ক. দৃষ্টি সংযত রাখা। নারীদের সবচেয়ে মূল্যবান সৌন্দর্য হলো লজ্জা। আর লজ্জার সবচেয়ে বড় নির্দশন হলো আনত দৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

আর আপনি মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে।<sup>[১]</sup>

খ. পুরুষদের মিশ্রণ থেকে দূরে থাকা। সম্মেলনের হল, ইউনিভার্সিটির সিঁড়ি, সেমিনার রুম, জনবহুল যানবাহনে পুরুষের ঠেলাঠেলি ও স্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হবে। মাকিল ইবনু ইয়াসার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا نُنْهِنَّ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَمْسَى امْرَأَةً لَا تَحْلُّ لَهُ

গায়রে মাহরাম নারীকে স্পর্শ করার চেয়ে তোমাদের কারো মাথায় লোহার সুচ বিন্দু হওয়া অধিক উত্তম।<sup>[২]</sup>

[১] সুবা বুর, আয়াত : ৩১

[২] আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২১১-২১২, হাদিস : ৪৮৬, ৪৮৭; মুসলাদুর

গ. নারীর পোশাক-আশাক যেন শারয়ি নির্দেশ অনুসারে হয়।

### পোশাকের ব্যাপারে শারয়ি নির্দেশনা

১. কাপড় ভেদ করে শরীর যেন উম্মোচিত না হয়। কেননা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا ، قَوْمٌ مَعْهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ،  
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ ، رُغْوَسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لَا يَدْخُلُنَّ  
الْجَنَّةَ ، وَلَا يَعْدُنَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيَوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

জাহানামিদের দুটি শ্রেণিকে আমি (এখন পর্যন্ত) দেখিনি। একদল (পুরুষ) লোক, যাদের সঙ্গে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, তা দ্বারা তারা লোকজনকে মারবে। আরেক দল হলো এমন কিছু নারী, যারা কাপড় পরিহিত হয়েও বিবস্ত্র থাকবে। তারা (পুরুষদেরকে) আকর্ষণকারিণী হবে এবং গর্বভরে হেলেনুলে চলবে। তাদের মাথার চুলের অবস্থা বুখতি উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। ওরা জানাতে যেতে পারবে না, এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না; অথচ এত এত (অর্থাৎ অনেক) দূর হতেও তার সুন্দর পাওয়া যায়।[১]

কাপড় পরার উদ্দেশ্য হলো শরীর ঢেকে রাখা। যেহেতু তাদের পরিহিত কাপড় পাতলা ও সৃচ্ছ হওয়ায় শরীরের ভেতরের অংশ প্রকাশ পায়, তাই বলা হয়েছে পোশাক পরেও তারা বিবস্ত্র।

বর্ণিত আছে, বনু তামিম গোত্রের কিছু নারী আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহার কাছে এলেন। তাদের গায়ে ছিল খুবই সৃচ্ছ ও পাতলা কাপড়। তখন তিনি তাদের দেখে বললেন—

إِنْ كُنْتُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَيْسَ هَذَا بِلِبَاسِ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَإِنْ كُنْتُنَّ غَيْرَ مُؤْمِنَاتٍ فَتَمَتَّعْنَ

| যদি তোমরা মুমিন নারী হয়ে থাকো, তাহলে (জেনে রাখো যে,) এটা মুমিন নারীদের পরিচ্ছদ নয়। আর যদি তোমরা মুমিন নারী না হয়ে থাকো তাহলে তা উপভোগ করতে পারো।[১]

আরেকবার আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহার কাছে সৃছ ফিনফিনে ওড়না পরানো এক নববধূকে আনা হলো। তিনি তাকে দেখে বললেন—

لَمْ تُؤْمِنْ بِسُورَةِ النُّورِ امْرَأَةٌ تَبْسُطْ هَذَا

| এই পোশাক যে নারী পরেছে সে সুরা নুরের (বিধানের) প্রতি (পরিপূর্ণ) ঈমান আনতে পারেনি।[২]

২. শরীরের উঁচু-নিচু ভাঁজগুলো যেন স্পষ্ট না থাকে। দেহ-সর্বসু পশ্চিমী অসভ্যদের কাজ হলো পোশাকের মাধ্যমে স্তন, কোমর ও নিতঙ্গের আকারকে চরমভাবে ফুটিয়ে তোলা, যাতে এগুলো মানুষের জৈবিক চাহিদা ও যৌনলালসা তীব্রভাবে জাগিয়ে তুলতে পারে। এসব পোশাক পরিহিতা নারীরাও হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী ‘পোশাক পরেও বিবস্ত্র নারীদের’ শ্রেণিভুক্ত হবে। এসব পোশাক সৃছ ফিনফিনে কাপড়ের চেয়েও আরো বেশি ভয়ানক ও উদ্ভেজক।

৩. পুরুষের পোশাক পরিধান না করা, বর্তমান সময়ে যেমন শার্ট-প্যান্ট। কেননা, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপরীত লিঙ্গের সাদৃশ্য গ্রহণকারী নারী-পুরুষদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। যেমন ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

لَقَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

| রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণকারী নারীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।[৩]

[১] তাফসিলুল কুরতুবি, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২৪৪

[২] অগুর্জ

[৩] সহিল বুখারি : ৫৮৮৫; সুনান আবি দাউদ : ৪০৯৭

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে পুরুষের পোশাক ও পুরুষকে নারীদের পোশাক পরতেও নিষেধ করেছেন। যেমন আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَىٰ أَن يلبسَ الرَّجُلُ لِبْسَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ لِبْسَ الرَّجُلِ

রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষকে নারীর বেশভূষা গ্রহণ করতে এবং নারীকে পুরুষের বেশভূষা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।<sup>[১]</sup>

৪. ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুর্তিপূজারীদের বিশেষ কোনো পোশাক পরা যাবে না। ইসলামে অন্য ধর্মের সাদৃশ্য গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম। ইসলাম চায়, তার অনুসারীরা ভেতরে-বাইরে তাদের স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধরে রাখুক। এ কারণে অনেক বিষয়ে সরাসরি কাফিরদের বিরোধিতা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

। যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।<sup>[২]</sup>

৫. হাঁটাচলা ও কথাবার্তায় গান্ধীর্য এবং দৃঢ়তা বজায় রাখা। শারীরিক যেকোনো নড়াচড়ার মাধ্যমে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ, কোমর দুলিয়ে হাঁটা, পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ এসব মুমিনদের নয়—অনাচারীদের বৈশিষ্ট্য।

[১] মুসনাদুল বাজ্জার : ৯০৮৯; হাদিসটি সহিহ।

এখানে অধিকাংশ বর্ণনায় নিষেধের পরিবর্তে লানত তথা অভিসম্পাতের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ-সহ প্রযুক্ত মুহাদিস সহিহ সনদে আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন—

لَقَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَلْبَسُ لِيْسَةَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لِيْسَةَ الرَّجُلِ

রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন ওই পুরুষকে, যে নারীর বেশভূষা গ্রহণ করে এবং (অভিসম্পাত করেছেন) ওই নারীকে, যে পুরুষের বেশভূষা গ্রহণ করে। [সুনানু আবি দাউদ : ৪০৯৮; মুসনাদু আহমাদ : ৮৩০৯]

[২] সুনানু আবি দাউদ : ৪০৩১; মুসনাদু আহমাদ : ৫১১৪; হাদিসটি হাসান।

পর্দার বিধানে কঠোরতা অবলম্বনকারী একদল আলিমের মত হলো, নারীরা পুরুষের শরীরের কিছুই দেখতে পারবে না।<sup>[১]</sup> প্রমাণ হিসেবে তারা উম্মু সালামা রায়িয়াল্লাহু আনহার আযাদকৃত দাস নাবহানের সূত্রে বর্ণিত একটি হাদিস সামনে আনেন। সেই হাদিসে এসেছে, উম্মু সালামা রায়িয়াল্লাহু আনহা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন—

كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أَمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَغْدَ أَنْ أُمِّنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجِبَا مِنْهُ، قَفَلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ أَغْمَى لَا يُنْصَرِّفُ، وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْعَمْنَا وَأَنْشَمْنَا، أَلْسَنْمَا تُبْصِرَانِيهِ

একদা আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম এবং তাঁর নিকট মাইমুনা রায়িয়াল্লাহু আনহাও ছিলেন। এ সময় (অন্ধ সাহাবি) ইবনু উম্মি মাকতুম রায়িয়াল্লাহু আনহু এলেন। এটা আমাদের ওপর পর্দার হুকুম নাফিল হওয়ার পরের ঘটনা। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তার থেকে আড়ালে চলে যাও। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, সে কি অন্ধ নয়? সে তো আমাদের দেখতে ও চিনতে পারবে না। নবিজি সাল্লাল্লাহু

---

হাদিস থেকে প্রমাণিত যে, নারীরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মসজিদে ও ঈদগাহে আসতেন। এতে তাদের বাধা দেওয়া হতো না।

তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর উম্মতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহা ও মুহাদিসা আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা নারীদের মসজিদে আসার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে বলেন, বর্তমানের নারীরা (মসজিদে আসার সময় সাজসজ্জা ও সুগৰ্হি মেঝে) যে অবস্থা সৃষ্টি করেছে তা যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পেতেন তাহলে অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করে দিতেন, যেভাবে বনি ইসরাইলের নারীদের মসজিদে আসতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। [সহিতুল বুখারি : ৮৬৯] উমর রায়িয়াল্লাহু আনহুর মতে শরিয়তের কঠোর পাবন্দ ব্যক্তিগত নিজের স্ত্রীর মসজিদে যাওয়া পছন্দ করতেন না। [সহিতুল বুখারি : ৯০০]

[১] এটা শাফিয়ি মাযহাবের মত। শাফিয়ি ফকিহগণ বলেন, একজন নারী কোনো বেগানা পুরুষের দিকে অয়োজন না হলে তাকাতে পারবে না। তবে একান্ত প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা। হানাফি ও হাফলি মাযহাবের মত হলো, নারী থেকে হাটু পর্যন্ত অংশ ব্যতীত শরীরের অন্য অংশের দিকে তাকাতে পারবে। তবে শর্ত হলো, ফিতনার আশঙ্কা না থাকা। আর মালিকি মাযহাবের মত হলো, শুধু চেহারা ও হাত-পায়ের দিকে তাকাতে পারবে। বুক ও পেট-পিঠের দিকে তাকানোর অনুমতি নেই। এখানেও শর্ত হলো, ফিতনার আশঙ্কা না থাকা। সুতরাং যদি পুরুষের দিকে তাকানোর দ্বারা আকর্ষণ, ভালোলাগা, কামনা-বাসনা বা কোনোরূপ যৌন-উত্তেজনা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো মাযহাব অনুসারেই তাকানো বৈধ হবে না। [আল-মাসুআতুল ফিকহিয়া, খণ্ড : ৩১, পৃষ্ঠা : ৫১]

| আলাইছি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা দুজনেও কি অধি? তোমরা উভয়ে কি তাকে দেখছো না? [১]

তবে হাদিস-বিশেষজ্ঞদের মতে এই হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ নয়। কারণ, নাবহান বর্ণনাকারী হিসেবে প্রমাণযোগ্য নয় [২]

হাদিসটি বিশুদ্ধ হিসেবে মেনে নিয়েও আমরা বলতে পারি, এই বিশেষ নিষেধাজ্ঞা সবার জন্য নয়; বরং শুধু উম্মুল মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট [৩] কারণ, তাদের জন্য

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৪১১২; মুসলানু আহমাদ : ২৬৫৩৭; হাদিসটির সনদ যইফ।

[২] পুরুষদের দিকে নারীদের তাকানোর বৈধতার প্রবন্ধাদের উত্থাপিতে ইয়াম ইবনু আবিল বার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ফাতিমা বিনতু কাইস রায়িয়াল্লাহু আনহার হাদিসটির সনদ সহিহ। সুতরাং এটাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা অপরিহার্য। পক্ষান্তরে নাবহানের বর্ণিত হাদিসটি এমন পর্যায়ের, যা দলিলযোগ্য নয়। [আত-তামহিদ, ইবনু আবিল বার, খণ্ড : ১৯, পৃষ্ঠা : ১৫৫]

হাফিয়ুল হাদিস ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদিসের বিশুদ্ধতা নিয়ে মতান্বেক্য রয়েছে। [ফাতহুল বারি, ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৫০] কিন্তু অন্যত্র তিনি বলেছেন, এটার সনদ শক্তিশালী। এখানে সর্বোচ্চ যে দুর্বলতা বলা হয়, সেটা হলো নাবহান থেকে কেবল যুহরি একাই হাদিস বর্ণনা করেছেন (তার থেকে অন্য কেউ কোনো হাদিস বর্ণনা করেননি)। কিন্তু এটা এমন কোনো দুর্বলতা নয়, যা হাদিসের বিশুদ্ধতায় সমস্যা সৃষ্টি করবে। কেননা, যাকে যুহরি চেনেন এবং বর্ণনা করেন যে, সে উম্মু সালামা রায়িয়াল্লাহু আনহার আবাদকৃত দাস, পাশাপাশি তাকে কেউ (দুর্বল বলে) নিষ্পাদ করেনি, তার বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। [ফাতহুল বারি, ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩৩৭]

শাহীথ শুআইব আরানাউত রাহিমাহুল্লাহ ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহর বন্ধব্য উল্লেখ করে বলেন, এ হাদিসটি একাধিক সহিহ হাদিসের সাথে সংঘর্ষিক। যেমন : একটি হলো, আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহার হাদিস, যা পূর্বে (মুসলানু আহমাদের ২৪৫৪১ নম্বর হাদিসে) বর্ণিত হয়েছে। আরেকটি হলো ফাতিমা বিনতু কাইস রায়িয়াল্লাহু আনহার হাদিস, যা সামনে (মুসলানু আহমাদের ২৭৩২৭ নম্বর হাদিসে) বর্ণিত হবে। সংঘর্ষিকতার কারণ আমরা সহিলু ইবনি হিকোনের তা'লিকে এবং শারহু মুশকিলিল আসারের তা'লিকে সবিস্তরে বর্ণনা করেছি। [দেখুন-তাখরিজু মুসলানু আহমাদ, খণ্ড : ৪৪, পৃষ্ঠা : ১৬০, হাদিস নম্বর ২৬৫৩৭ সংশ্লিষ্ট আলোচনা]

[৩] এটা ইয়াম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহর পক্ষ থেকে হাদিস দুটির মাঝে দৃশ্যমান বৈপরীত্যের সমাধান। তাঁর দৃষ্টিতে ফাতিমা বিনতু কাইস রায়িয়াল্লাহু আনহার হাদিসটি আম বা ব্যাপক, আর নাবহানের সূত্রে বর্ণিত উম্মু সালামা রায়িয়াল্লাহু আনহার হাদিসটি খাস বা নির্দিষ্ট।

আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহার হাদিসটিও ফাতিমা বিনতু কাইস রায়িয়াল্লাহু আনহার হাদিসটিকে শক্তিশালী করে। কারণ, আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইছি ওয়া সাল্লামের সাথে দাঁড়িয়ে হাবশিদের খেলা দেখছিলেন, আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইছি ওয়া সাল্লাম আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা-কে পর্দা দিয়ে আড়াল করে রাখছিলেন, যেন তাকে কেউ দেখতে না পায়। এ হাদিসটি নাবহানের সূত্রে বর্ণিত উম্মু সালামা রায়িয়াল্লাহু আনহার হাদিসটির সাথে সাংঘর্ষিক। এখানে এই দুই হাদিসের মাঝে সমঘয়ের জন্য আলিমগণ

পর্দার বিধানে অন্যদের তুলনায় একটু বেশি কঠোরতা ও অতিরিক্ত সতর্কতা আরোপ করা হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ-সহ অনেকের বক্তব্যেই আমরা এর ইঙ্গিত পাই।[১]

এর বিপরীতে বিশুদ্ধ ও সবার জন্য প্রযোজ্য হাদিসটি হলো—নবিজি সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ফাতিমা বিনতু কায়িস রায়িয়াল্লাহু আনহাকে ইদত পালনের জন্য উম্মু শারিক রায়িয়াল্লাহু আনহার ঘরে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে আবার তার নির্দেশ পরিবর্তন করে লোক মারফত বলে পাঠালেন—

একাধিক জ্বাব দিয়েছেন। হাফিয় ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে চমৎকার আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা এবং নাবহানের সূত্রে বর্ণিত উম্মু সালামা রায়িয়াল্লাহু আনহার হাদিস দুটির মাঝে সমন্বয়ের পদ্ধতি হলো, হতে পারে (উম্মু সালামা রায়িয়াল্লাহু আনহার) এ ঘটনাটি আগে ঘটেছে (আর আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা হাবশিদের খেলা দেখার ঘটনা পরে ঘটেছে; বিধায় আগের হাদিসের বিধানটি রহিত)। অথবা এটাও হতে পারে যে, নাবহান যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন, সেখানে হয়তো অন্য কোনো ব্যাপার ছিল। ইবনু উম্মি মাকতুম রায়িয়াল্লাহু আনহু অৰ্থ হওয়ার যদিও তার দৃষ্টি থেকে উম্মুল মুমিনিনগণ সংরক্ষিত ছিলেন, কিন্তু হতে পারে, তার থেকে শরীরের কোনো কিছু উন্মোচিত হয়ে যাবে; অথচ তিনি তা উপলব্ধি করতে পারবেন না (এজন্য উম্মুল মুমিনিনদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে)। পুরুষদের দিকে নারীদের তাকানোর বৈধতা এ ঘটনাও শক্তিশালী করে যে, পর্দা রক্ষা করে নারীদের মসজিদে, বাজারে, সফরে যাওয়ার বৈধতার ব্যাপারে উস্মাহর নিরবচ্ছিন্ন আমল চলে আসছে। তাদেরকে নিকাব সহকারে পর্দা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তাদেরকে পুরুষের দেখতে না পায়। কিন্তু পুরুষদের কথনে নিকাব পরার নির্দেশ দেওয়া হয়নি, যেন তাদেরকে নারীরা দেখতে না পারে। এটা প্রমাণ করে যে, (নারী ও পুরুষ) দুই শ্রেণির মানুষের বিধানে ভিন্নতা আছে। ইমাম গাজালি রাহিমাহুল্লাহও এটা দ্বারা পুরুষদের দিকে নারীদের তাকানোর বৈধতার পক্ষে দলিল দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা এটা বলি না যে, পুরুষের চেহারা নারীদের জন্য সতর; যেভাবে (আমরা বলে থাকি) নারীদের চেহারা পুরুষদের জন্য সতর। বরং নারীদের জন্য পুরুষের চেহারা হলো একজন পুরুষের জন্য শ্বশুইন বালকের চেহারার মতো (যেখানে স্বাভাবিক অবস্থায় একজন পুরুষের জন্য শ্বশুইন বালকের চেহারার দিকে তাকাতে কোনো দোষ নেই, তবে ফিতনার আশঙ্কা থাকলে তাকানো বৈধ হবে না)। সুতরাং কেবল ফিতনার আশঙ্কা থাকলেই নারীদের জন্য পুরুষের চেহারা দেখা হারাম হবে। আর যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে তাহলে তাকাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, যুগ যুগ ধরে এটাই চলে আসছে যে, পুরুষের চেহারা খোলা রেখে চলাফেরা করে আর নারীরা চেহারা নিকাব দিয়ে ঢেকে বের হয়। যদি এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ে সমর্প্যায়ের হতো তাহলে পুরুষদেরও নিকাব পরতে আদেশ করা হতো অথবা তাদেরকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করা হতো। [ফাতহুল বারি, ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩৩৭]

[১] ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ বিধান নবিজি সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের স্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট। তুমি কি ইবনু উম্মি মাকতুম রায়িয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে ফাতিমা বিনতু কাইস রায়িয়াল্লাহু আনহার ইদত পালনের বিধায়টি লক্ষ কোনো না? নবিজি সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ফাতিমা বিনতু কায়িস রায়িয়াল্লাহু আনহাকে বলেছেন, ‘তুমি ইবনু উম্মু মাকতুমের বাড়িতে ইদত পালন করো। কারণ, সে অৰ্থ লোক। তুমি সেখানে খোলামেলা পোশাকে থাকতে পারবে।’ [সুনান আবি দাউদ: হাদিস নম্বর ৪১১২ সংলিঙ্গিত আলোচনা]

أَنْ أُمٌّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأُولُونَ ، فَأَنْتَلِقِي إِلَى ابْنِ أُمٍّ مَكْثُومٍ الْأَغْمَى ، فَإِنَّكَ إِذَا  
وَضَعْتِ خِمَارَكَ لَمْ يَرَكِ

উচ্চু শারিক এমন একজন মহিলা, যার কাছে প্রাথমিক হিজরতকারী সাহাবিগণ (বিভিন্ন প্রয়োজনে) আসা-যাওয়া করে থাকে। সুতরাং তুমি অন্ধ ইবনু উম্মি মাকতুমের ঘরে চলে যাও। কারণ, (সেখানে তুমি প্রয়োজনবোধে) তোমার ওড়না নামিয়ে রাখলে সে তোমাকে দেখতে পাবে না।<sup>[১]</sup>

### বিকৃত যৌনতা ইসলামে জঘন্যভাবে নিষিদ্ধ

ইসলামে জৈবিক চাহিদাসংশ্লিষ্ট নিয়ম-নীতির নিষিদ্ধ অংশ হারামের সঙ্গে সঙ্গে এর সকল উপকরণ ও উপসর্গকেও হারাম করেছে। আর এরই ফলে বিকৃত যৌনতাও ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আজকাল সমকামিতার নামে যেসব অপকর্ম সারা বিশ্বে প্রচলিত তার সবই ইসলামে হারাম। কারণ, এই নিকৃষ্ট কাজটি মানুষের সুভাবজ্ঞাত বৈশিষ্ট্যের সাথে সাংঘর্ষিক, নোংরামির চূড়ান্ত পর্যায় এবং এতে লুকিয়ে আছে পুরুষদের অপচয় ও নারী অধিকারের প্রতি অবিচার। এই জঘন্য কদাচার কেনো সমাজে ছড়িয়ে পড়লে সেই সমাজব্যবস্থা এবং তার যাবতীয় চারিত্রিক, নৈতিক শিষ্টাচারের বাঁধ ভেঙে যেতে বাধ্য। এই অনাচার ও কদর্যতার উত্তোলক লুত সম্প্রদায় সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্যই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তারা নারীদের ছেড়ে পুরুষদের সঙ্গে যৌনতায় লিপ্ত হতো। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তাদের নবি লুত আলাইহিস সালাম বলেছিলেন; কুরআনের ভাষায়—

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ وَتَذَرُّونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ حَبْلٌ أَنْتُمْ قَوْمٌ  
عَادُونَ ﴿٢﴾

সৃষ্টিকুলের মধ্যে তোমরা কি কেবল পুরুষদের সাথেই উপগত হও (অর্থাৎ কুরকর্ম করো)? আর তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাকো। বরং তোমরা তো এক সীমালঞ্জনকারী সম্প্রদায়।<sup>[২]</sup>

[১] সহিহ মুসলিম : ১৪৮০; জামিউত তিরমিয়ি : ১১৩৫

[২] সুরা শুআরা, আয়াত : ১৬৫-১৬৬

কুরআনের অনেকগুলো আয়াতে লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে মূর্খ, সীমালঙ্ঘনকারী, বিশৃঙ্খলাকারী এবং অপরাধী সাব্যস্ত করে হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

মানসিকভাবে অসুস্থ, বিচ্যুত, অধঃপতিত, বিকৃত রুচির এসব মানুষদের সামনে সবচেয়ে অঙ্গুত পরিস্থিতিটা তৈরি হয়েছিল লুত আলাইহিস সালামের মেহমানদের দেখে। তারা ছিলেন মূলত আল্লাহ তাআলার আযাবের ফেরেশতা। তারা পরীক্ষার জন্য এবং সরেজমিনে এই সম্প্রদায়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও প্রমাণ সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। এই ঘটনা কুরআনে বর্ণিত হচ্ছে—

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّعَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذِرْعًا وَقَالَ هُذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَاءَهُ قَوْمٌ  
يُهَرَّعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلٍ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمَ هُؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ مَا فَاعَلُوكُمْ  
اللَّهُ وَلَا تُخْرُونَ فِي ضَيْفِي مَا لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوا لَقَدْ عِلِّمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ  
حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوْ أَنِّي لَيْ بِكُمْ فُؤَادًا أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾ قَالُوا يَا لُوطُ  
إِنَّا رَسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصُلُوا إِلَيْكَ مَفَاسِرٍ بِأَهْلِكَ يُقْطِعُ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَنْقِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأُكَ  
إِلَّهٌ مُّصِيبُهَا مَا أَصْبَاهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصِّبْحُ أَلَيْسَ الصِّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾

আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লুতের নিকট উপস্থিত হলো, তখন তাদের আগমনে তিনি দুশিঙ্গাগ্রস্ত হলেন এবং তিনি বলতে লাগলেন, আজ অত্যন্ত কঠিন দিন। আর তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা সুতঃস্ফুর্তভাবে তার (গৃহ) পানে ছুটে আসতে লাগল। পূর্ব থেকেই তারা কুরম্বে তৎপর ছিল। তিনি (লুত) বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, এই আমার কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত কোরো না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ভালো মানুষ নেই? তারা বলল, তুমি তো জানোই, তোমার কন্যাদের বিষয়ে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই। আর আমরা কী চাই, তাও তুমি অবশ্যই জানো। তিনি (লুত) বললেন, হায়! যদি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার শক্তি-ক্ষমতা থাকত, অথবা আমি কোনো সুদৃঢ় স্তম্ভের (শক্তিশালী দলের) আশ্রয় নিতে পারতাম! তারা (ফেরেশতাগণ) বললেন, হে লুত, নিশ্চয়ই আমরা আপনার রবের প্রেরিত ফেরেশতা। তারা কখনই আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না। কাজেই আপনি রাতের কোনো এক সময়ে আপনার পরিবারবর্গ-সহ বের হয়ে পড়ুন এবং আপনাদের মধ্যে কেউ পিছন দিকে তাকাবে না,

আপনার স্ত্রী ছাড়া। তাদের যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে। নিশ্চয়ই প্রভাত তাদের (আয়াবের) জন্য নির্ধারিত সময়। প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়? [১]

এই অপরাধে লিপ্ত হওয়ার শাস্তির ব্যাপারে ফকিহগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তাদের ওপর কি ব্যভিচারের শাস্তি আরোপিত হবে, নাকি তাদের হত্যা করা হবে? যদি হত্যা করা হয়, তাহলে কীভাবে হত্যা করা হবে? জবাই করে নাকি পুড়িয়ে কিংবা তাদেরকে উঁচু দেওয়াল থেকে নিষ্কেপ করে? [২]

এই কঠোরতাকে কখনো কখনো অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনে হয়, তবে ইসলামি সমাজকে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক জীবাণু থেকে পবিত্র রাখার জন্যই এসব বিচার ও দণ্ড নির্ধারিত হয়েছে। কারণ, এগুলো থেকে ধ্বংস ও অধঃপতন ছাড়া আর কিছুই জন্ম নেয় না।

### হস্তমেথুনের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?

যুবকদের মধ্যে কখনো কখনো যৌন-উত্তেজনা সৃষ্টি হলে শিরা-উপশিরা শাস্তি করার জন্য শরীর থেকে বীর্য বের করে ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। হাত বা অন্য কিছুর মাধ্যমে বীর্য নির্গত করে তারা যৌন তাড়না থেকে তারা মুক্তি পেতে

[১] সুরা হুদ, আয়াত : ৭৭-৮১

[২] সমকামিতার শাস্তি নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর মতে, এর নির্দিষ্ট কোনো শাস্তি নির্ধারিত নেই। বিচারক অপরাধের মাত্রা ও অপরাধীর অবস্থা বুঝে যে শাস্তি উপযুক্ত মনে করবেন সেটাই প্রয়োগ করবেন। তবে কারো থেকে যদি বারবার এ জন্য কাজের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর মতে, এটার শাস্তি হলো হত্যা; চাই সে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত। ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহর মতে, এটার শাস্তি হলো ব্যভিচারের শাস্তির মতো। সুতরাং বিবাহিত হলে প্রস্তরাঘাতে হত্যা আর অবিবাহিত হলে একশ বেত্রাঘাত করা হবে। ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ থেকে অন্য এক বর্ণনা মতে, এটার শাস্তি হলো হত্যা; চাই সে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে। এক মতানুসারে তার শাস্তি হলো হত্যা; চাই সে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক। অন্য মতানুসারে তার শাস্তি ব্যভিচারের শাস্তির মতো। সুতরাং বিবাহিত হলে প্রস্তরাঘাতে হত্যা আর অবিবাহিত হলে একশ বেত্রাঘাত করা হবে। এ দ্বিতীয় মতটি হাম্মলি মাযহাবের প্রহণযোগ্য মত হিসেবে স্বীকৃত। [আল-মাবসুত, সারাখসি, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৭৭; আল-ইখতিয়ার লি-তালিলি মুখতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৯০-৯১; মানহুল জালিল শারহু মুখতাসারিল খালিস, খণ্ড : ৯, ২৬১; আল-কাফি ফি ফিকহি আহলিল মাদিলা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০৭৩; আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২৭; মুগানিল মুহতাজ, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৪৩; আল-মুগানি, ইবনু কুদামা, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৬০-৬১; আল-ইনসাফ, মারদাবি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১৭৬]

চায়। এটি বর্তমান সময়ে হস্তমৈথুন বা মাস্টারবেশন নামে পরিচিত। অধিকাংশ আলিমদের মতে এটি নিষিদ্ধ [১]

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ নিষিদ্ধতার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন—

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ⑤ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ⑥ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ⑦

আর যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফায়তকারী। তবে নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসী ব্যতীত; কেননা এতে তারা নিন্দিত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারাই হবে সীমালজ্বনকারী [২]

হস্তমৈথুনকারী জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য কুরআনে উল্লেখিত দুটি পন্থা ছাড়া ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে।

[১] আলামা ইবনু আবিদিন শামি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘হস্তমৈথুন যদি ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হয়ে যায় (অর্থাৎ হস্তমৈথুন না করলে নিশ্চিত ব্যভিচারে লিঙ্গ হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়) তাহলে সেক্ষেত্রে হস্তমৈথুন করা আবশ্যিক হয়ে পড়বে। কেননা, (ব্যভিচারে লিঙ্গ হওয়ার চেয়ে) এটাই তুলনামূলকভাবে সহজ পথ। ফাতহুল কাদিরের ভাষ্য হলো, যদি তার উত্তেজনা প্রবল হয়ে ওঠে, ফলে সে হস্তমৈথুন করে ফেলে, এতে তার উদ্দেশ্য থাকে উত্তেজনাকে প্রশমিত করা তাহলে আশা করা যায়, এতে (আখিরাতে) তার কোনো শাস্তি হবে না। ‘মিরাজুদ দিরায়া’ প্রশ্নে এসেছে, ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহর পূর্বের মতানুসারে হস্তমৈথুনের ব্যাপারে ছাড় আছে। কিন্তু ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহর পরবর্তী ও শেষোন্ত মত হলো, এটা হারাম ও নিষিদ্ধ। আর স্ত্রী ও দাসীর হাতের মাধ্যমে মৈথুন করলে তা বৈধ হবে। ব্যাখ্যাকার আলামা হাসকাফি রাহিমাহুল্লাহ হৃদুদের অধ্যায়ে জাওহারার উন্নতিতে উল্লেখ করেন যে, স্ত্রী ও দাসীর হাতের মাধ্যমে মৈথুন করা মাকরুহ। (আলামা শামি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,) সন্তবত এখানে মাকরুহ বলতে বোঝানো হয়েছে, মাকরুহে তানযিহি বা অনুত্তম। সুতরাং এ বন্ধবের সাথে মিরাজুদ দিরায়া প্রশ্নে উল্লেখিত বৈধতার বন্ধবের সাথে কোনো বৈপরীত্য নেই। (কেননা, কোনো কাজ বৈধ হওয়ার পাশাপাশি মাকরুহে তানযিহি বা অনুত্তমও হতে পারে।) আস-সিরাজ প্রশ্নে এসেছে, যদি কেউ এমন প্রবল উত্তেজনাকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে হস্তমৈথুন করে, যা অন্তরকে অস্থির করে তোলে, আর সে অবিবাহিত যুবক, যার কোনো স্ত্রী বা দাসীও নেই কিংবা থাকলেও কোনো ওজরের কারণে সে তার সামিধ্যে যেতে পারছে না, এমন ব্যক্তির ব্যাপারে ইমাম আবুল লাইস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি মনে করি, সে হস্তমৈথুন করলে তার কোনো গুনাহ হবে না। কিন্তু যদি কেউ যৌনসুখ লাভের উদ্দেশ্যে (ইচ্ছাকৃতভাবে) উত্তেজনা সৃষ্টি করে হস্তমৈথুন করে তাহলে সে গুনাহগার হবে।’ [আদ-দুররুল মুখ্যতার মাত্রা রাস্তার মুহরার, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯৯]

[২] সুরা মুমিনুন, আয়াত : ৫-৭

ইমাম আহমদ ইবনু হাস্বল রাহিমাতুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তার একটি মত হলো—বীর্য হলো শরীরের ভেতরের ময়লা। সুতরাং পুঁজ, নাপাকি ইত্যাদির মতো একেও বের করে দেওয়া জায়িয়। তার থেকে একটি বর্ণনায় এমনই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনু হায়ম রাহিমাতুল্লাহ একে সমর্থন করেছেন।

তবে হাস্বলি মায়হাবের ফকিহগণ হস্তমেখুনের বৈধতার জন্য দুটি শর্ত দিয়েছেন—  
এক. ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা। দুই. বিয়ের সামর্থ্য না থাকা।

পড়াশোনা বা কাজের জন্য অনেকে প্রবাসে থাকে। চতুর্দিকে বিপুল যৌন-উত্তেজক উপকরণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার শঙ্কা তীব্র। তখন উত্তেজনা উপশমের জন্য কেউ এই পথার আশ্রয় নিতে পারে। এতে কোনো অসুবিধা নেই।  
তবে এক্ষেত্রেও সীমালঙ্ঘন ও অভ্যন্তর নিন্দনীয়। ইমাম আহমাদ ইবনু হাস্বল রাহিমাতুল্লাহর বক্তব্য আমরা এমন বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে পারি।

তবে এর চেয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত কর্মপথ অধিক উত্তম। তিনি বিয়েতে অসামর্থ্য যুবকদের সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে তাদের মধ্যে মানসিক দৃঢ়তা, ধৈর্য, তাকওয়া ও আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি পায় এবং শক্তিশালী হয়। তিনি বলেছেন—

يَا مَغْشِرَ الشَّبَابِ، مَنْ أَسْتَطَعَ الْبَاءَةَ قُلْيَنْرَوْجَ، فَإِنَّهُ أَغْصُنْ لِلْبَصَرِ وَأَخْصُنْ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ  
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

হে যুব সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন  
বিয়ে করে। কেননা, বিয়ে দৃষ্টিকে সর্বাধিক সংযতকারী এবং লজ্জাস্থানের সর্বোচ্চ  
সুরক্ষা দানকারী। আর যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সিয়াম পালন করে।  
সিয়াম যৌনতা দমন করে [১]

### বিয়ে

ইসলামে বৈরাগ্যের কোনো স্থান নেই

জৈবিক চাহিদা মানুষের একটি সুত্তাগত বৈশিষ্ট্য। একে সম্পূর্ণরূপে দমন ও নিয়ন্ত্রণের

[১] সহিল বুখারি : ৫০৬৬, সহিহ মুসলিম : ১৪০০

প্রশ্নই আসে না। তবে এই চাহিদা পূরণের পথ অবাধ করে দেওয়াও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। ব্যভিচার ও তার অনুষঙ্গ-উপসর্গ সবই হারাম ইসলামে। ইসলাম এখানে বৈরাগ্য ও নির্বীর্যতার ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে বিয়ের প্রতি আহ্বান জানায়।

তাই একান্তে ইবাদতের জন্য বা দুনিয়াবিমুখতার উদ্দেশ্যে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিয়ে না করা কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কিছু কিছু সাহাবির মাঝে বৈরাগ্যের প্রতি বৌঁক দেখতে পেয়ে একে ইসলাম পরিপন্থি ও তার সুন্নাহের প্রতি অবজ্ঞা বলে অবহিত করেছেন। এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজ থেকে শ্রিষ্টীয় চেতনা নাকচ হয়ে গিয়েছে। আবু কিলাবা রাহিমাল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَرَادَ نَاسٌ مِنْ أَصْنَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْفَضُوا الدُّنْيَا، وَيَتَرَكُوا النِّسَاءَ  
وَيَتَرَهُبُوا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّظَ فِيهِمُ الْمَقَالَةَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ  
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْتَّشْدِيدِ فَشَدَّدُوا فَشَدَّدَ عَلَيْهِمْ، فَأُولَئِكَ بَقَائِيَاهُمُ الدِّيَارُ وَالصَّوَامِعُ ،  
اغْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَحُجُّوَا وَاعْتَمِرُوا فَاسْتَقِيمُوا يُسْتَقِمُ لَكُمْ، قَالَ: وَنَزَّلْتُ  
فِيهِمْ—يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু সাহাবি স্ত্রী-সন্তান ও দুনিয়া ছেড়ে বৈরাগী হতে চাইছিলেন। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মিস্ত্রে) দাঁড়িয়ে কঠোর ভাষায় তাদেরকে ধর্মক দিয়ে বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী সময়ের লোকজন অধিক কঠোরতা আরোপের দ্রুন ধ্বংস হয়েছে। তারা নিজেদের ওপর অধিক কঠোরতা চাপিয়ে নিয়েছে, ফলে আল্লাহ তাআলাও তাদের ওপর অধিক কঠোরতা চাপিয়ে দিয়েছেন। তাদের ধ্বংসাবশেষ তো গীর্জা ও প্যাগোডায় এখনো বিদ্যমান। তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কাউকে শরিক কোরো না। তোমরা হজ করো, উমরাহ করো এবং সরল পথে অবিচল থাকো, তাহলে তোমাদেরকে সরল পথে অবিচল রাখা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এদের ব্যাপারে অবর্তীণ হয়েছে—হে মুমিনগণ, আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন সেগুলোকে তোমরা হারাম কোরো না।<sup>[১]</sup>

[১] সূরা মাযিদা, আয়াত : ৮৭

[২] তাফসিল আদিব রাজ্জাক : ৭১৯; আয-যুহদ ওয়ার-রাকায়িক, ইবনুল মুবারক : ১০৩১; হাদিসটির সনদ আবু কিলাবা পর্যন্ত সহিত, তবে এটা মুরসাল বর্ণনা।

মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘উসমান ইবনু মায়উন রায়িয়াল্লাহু আনহু ও আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রায়িয়াল্লাহু আনহু-সহ কিছু সাহাবি নারীসঙ্গ বর্জন করে নিজেদেরকে খাসি বানিয়ে চটের পোশাক পরার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِرِّمُوا طَبِيبَاتٍ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَغْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُغْتَدِينَ ﴿٤٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ خَلَالًا طَبِيبًا وَأَنْقُوا اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

অর্থাৎ হে মুমিনগণ, আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন সেগুলোকে তোমরা হারাম কোরো না, এবং সীমালঞ্চন কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঞ্চনকারীকে পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে খাও এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, যার প্রতি তোমরা সকলে বিশ্বাসী। [১][২]

আনাস ইবনু মালিক রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٌ إِلَى بَيْوَتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَلَّمَا أَخْبَرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَصْلَى  
اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَرْوَجُ  
أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا  
وَاللَّهِ إِنِّي لَا خَشَاكُمْ بِهِ وَأَنْقَاثُكُمْ لَهُ، لَكُمْ أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَصْلِي وَأَرْقُدُ، وَأَتَرْوَجُ النِّسَاءَ،  
فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي

তিনজনের একটি দল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের বাড়িতে এলো। যখন তাদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলো, তখন তারা ইবাদতের পরিমাণ কম মনে করল এবং বলল, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আমাদের তুলনা হতে পারে না। কারণ, তার আগের ও পরের সকল

[১] সুরা মায়দা, আয়াত : ৮৭-৮৮

[২] তাফসিরুত তাবারি, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৬১২

গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতভর সালাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সবসময় সিয়াম পালন করব, কখনোই সিয়াম ছাড়ব না। অপরজন বলল, আমি নারীসঙ্গ ত্যাগ করব, কখনোই বিয়ে করব না। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, তোমরা কি ওই সব লোক, যারা এমন এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি অনুগত। এতৎসত্ত্বেও আমি সিয়াম পালন করি, আবার তা থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি এবং নিদ্রাও যাই। আর আমি নারীদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং (শুনে রাখো,) যারা আমার সুন্নাতকে অপচন্দ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।<sup>[১]</sup>

সাদ ইবনু আবি অক্বাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

رَدُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ التَّبَشِّيلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خَصِّنَا

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান ইবনু মাযউন রায়িয়াল্লাহু আনহুর নারীসঙ্গ বর্জনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। যদি তিনি তাকে অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরা নিজেদের খাসি বানিয়ে নিতাম।<sup>[২]</sup>

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল অবিবাহিত যুবকদের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন—

يَا مَغْشِرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

হে যুব সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। বিয়ে দৃষ্টিকে সর্বাধিক সংযতকারী এবং লজ্জাস্থানের সর্বোচ্চ সুরক্ষা

[১] সহিল বুখারি : ৫০৬৩, সহিহ মুসলিম : ১৪০১

[২] সহিল বুখারি : ৫০৭৩, সহিহ মুসলিম : ১৪০২

| দানকারী। আর যার বিয়ের সামর্থ্য নেই, সে যেন সিয়াম পালন করে। সিয়াম  
যৌনতা দমন করে।<sup>[১]</sup>

এই হাদিসের ভিত্তিতে কিছু আলিম বলেন, বিয়ে একটি ফরজ ও অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। সামর্থ্য থাকলে কোনো মুসলিমের জন্য বিয়ে উপেক্ষা করা বৈধ নয়। অবশ্য কিছু আলিমের মতে, ব্যক্তি আগ্রহী ও গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিয়ে অপরিহার্য, অন্যথায় নয়।<sup>[২]</sup>

ভরণপোষণ ও দায়িত্ব পালনের ভয়ে বিয়ে থেকে বিরত থাকা একজন মুসলিমের জন্য শোভা পায় না। কেননা, আল্লাহ তাআলা তো প্রতিশুতি দিয়েছেন, চরিত্র ও আত্মিক পবিত্রতা রক্ষার্থে যারা বিয়ে করতে চায়, আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন। তাই তার দায়িত্ব হলো চেষ্টা-তদবির অব্যাহত রাখা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَنِّكُحُوا الْأَيَامِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٍ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...<sup>[৩]</sup>

আর তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহীন (কুমারী হোক কিংবা বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা, নারী হোক বা পুরুষ) তাদের বিয়ে সম্পাদন করো এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন।<sup>[৪]</sup>

আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু

[১] সহিল বুখারি : ৫০৬৬, সহিহ মুসলিম : ১৪০০

[২] হানাফি মাযহাব অনুসারে, শারীরিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্য থাকলে স্বাভাবিক অবস্থার বিয়ে করা সুন্মাত্রে মুআকাদা। তবে কোনো ব্যক্তির অবস্থা যদি এমন হয় যে, বিয়ে না করলে ব্যক্তিকে জড়িয়ে পড়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে তাহলে তার জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব, আর ব্যক্তিকে জড়িয়ে পড়ার নিশ্চিত অসম্ভব থাকলে তার জন্য বিয়ে করা ফরজ। তবে শর্ত হলো, শারীরিক ও আর্থিকভাবে তার বিয়ে করার সামর্থ্য থাকতে হবে। সুতরাং যদি কারো বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে বিষ্ণে না করার কারণে স্বীকৃত হবে না। আর কোনো ব্যক্তি যদি বিয়ের পর স্ত্রীর ওপর জুলুম করার প্রকল্প আশঙ্কা করে তাহলে তার জন্য বিয়ে করা মানববুহে তাহরিমি, আর নিশ্চিত আশঙ্কা করলে তার জন্য বিয়ে হ্যারাম। [অস-সুরুকুল মুহারিস মাজা রদ্দিল মুহতার, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৬-৭]

[৩]সুরা নূর, আয়াত : ৩২

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

تَلَئِنَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: عَوْنَةُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ  
الْعَفَافَ، وَالْمُكَابِلُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ

তিন চুক্তি এমন, যাদের প্রত্যেককে সাহায্য করা আলাহ তাআলার দায়িত্ব। এক আলাহর রাস্তার মুজাহিদ। দুই. বিবাহকারী, যে চরিত্র রক্ষা করতে চায়। তিন মুকাতাব (নিজের মুক্তির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ) দাস, যে চুক্তির অর্থ আদায় করতে চায়।<sup>[১]</sup>

বিয়ের জন্য নারীদের দেখা যাবে কি?

বিয়ের জন্য কোনো মেয়ের ব্যাপারে কথা আগানোর পর তাকে দেখা জায়ি। বিয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাকে দেখা নেওয়াই ভালো। কেননা, পরস্পর সম্পর্কে কিছুই না জেনে দাম্পত্যজীবন শুরু করলে বিভিন্ন সময়ে নানা ঝগড়াঝাঁটি ও অসন্তুষ্টি তৈরি হতে পারে। সেগুলো থেকে নিরাপদ থাকার জন্যই আগে দেখে নেওয়া উচিত। তাছাড়া চোখ মনের দরজা, কখনো কখনো চোখের দেখাই মনের দেখা হয়ে উঠতে পারে; এতে করে তাদের মধ্যে ভালোবাসা ও আকর্ষণও বৃদ্ধি পাবে।

ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে উল্লেখ করেন, তিনি বলেন—

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ،  
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظُرْنِي إِلَيْهَا؟ ، قَالَ: لَا ، قَالَ: فَإِذْهَبْ فَانْظُرْ  
إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي أَغْيَنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। ইতোমধ্যে একলোক এসে তাকে জানাল যে, সে আনসারি এক নারীকে বিয়ে করতে চাইছেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে দেখেছ? সে বলল, না।

[১] সুনানুন নাসাফি : ৩১২০; মুসনাদু আহমাদ : ৯৬৩১; হাদিসটি হাসান।

তিনি বললেন, যাও, তাকে দেখে আসো। কেননা আনসারি নারীদের (কারো কারো) চোখে কিছু (ত্রুটি) আছে।<sup>[১]</sup>

মুগিরা ইবনু শুবা রায়িয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطَبْهَا قَالَ: إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَخْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا قَالَ: فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبْوَيْهَا وَخَبَرْتُهُمَا بِقُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَمَا كَرِهَا ذَلِكَ ، فَسَمِعْتُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ وَهِيَ تَقُولُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَكَ بِذَلِكَ أَنْ تَنْظُرْ فَانْظُرْ ، وَإِلَّا فَإِنِّي أَنْشَدْتُكَ ، كَانَهَا أَغْظَمْتَ ذَلِكَ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَرَوْ جَهْتُهَا ، فَذَكَرَ مِنْ مُوافِقَتِهَا

আমি একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে একটি মেয়ের বিবাহের প্রস্তাবের ব্যাপারে আলোচনা করি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যাও তাকে দেখে নাও। কারণ, তা তোমাদের মাঝে গভীর ভালোবাসা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, এরপর আমি আনসারি মেয়ের বাড়িতে গিয়ে তার মাতা-পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পেশ করি। পাশাপাশি তাদের কাছে (বিয়ের আগে মেয়ে দেখা-সংক্রান্ত) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীটিও বর্ণনা করলাম। কিন্তু তাদেরকে এ বিষয়ে (অর্থাৎ পাত্রী দেখাতে) অনাপ্রযৱ মনে হলো। তখন মেয়েটিকে আমি বলতে শুনলাম, যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে দেখার জন্য বলে থাকেন তাহলে আপনি আমাকে দেখুন। অন্যথায় আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিছি (আপনি আমাকে দেখবেন না)। মনে হচ্ছিল, মেয়েটি (বিয়ের আগে) দেখার বিষয়টিকে কঠিন ও বড় করে দেখছিল। তিনি বলেন, অতঃপর (অনুমতি পাওয়ার পর) আমি তাকে দেখলাম এবং বিয়ে করলাম। পরে মুগিরা রায়িয়াল্লাহু আনহু মেয়েটিকে তার মনঃপূত ও উপযুক্ত পেয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।<sup>[২]</sup>

নারীর কতৃক অংশ দেখা যাবে, সে বিষয়টি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুগিরা রায়িয়াল্লাহু আনহু কিংবা অন্য কাউকেই বলে দেননি।

[১] সহিহ মুসলিম : ১৪২৪; সুনানুন নাসারি : ৩২৪৬

[২] মুসামাফু আব্দির রাজ্জাক : ১০৩৩৫; মুসনাদু আহমাদ : ১৮১৩৭; হাদিসটি সহিহ।

তাই কেউ কেউ বলেছেন, কেবল চেহারা ও হাত দেখা যাবে [১] কিন্তু কামনা-বাসনা (এবং ফিতনার আশঙ্কা) না থাকলে তো হাত ও মুখ বিয়ে ছাড়া সুভাবিক সময়েই দেখা যায়। বিয়ের প্রস্তাবের সময় মেয়ে দেখার বিষয়টি যেহেতু সুতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই সেক্ষেত্রে সুভাবিক সময়ের তুলনায় আরো বেশি অংশ (অর্থাৎ চেহারা ও হাত ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অংশ) দেখার অনুমতি থাকবে। যেমন একটি হাদিসে এসেছে—

إِذَا حَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرْ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعُلْ

তোমাদের কেউ যখন কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়; তখন ওই নারীর এমন কিছু যদি দেখার সুযোগ থাকে, যা দেখলে বিয়ের প্রতি ওই ব্যক্তির আগ্রহ আরো বাড়বে; তাহলে সে যেন তা দেখে নেয় [২]

বিয়ের জন্য প্রস্তাবিত মেয়ে দেখার বিষয়ে আলিমগণ দুদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কেউ অতিরিক্ত শিথিলতার পথে হেঁটেছেন, আর কেউ ধরেছেন অতিরিক্ত কঠোরতার পথ। তবে মধ্যপথ অবলম্বন ও ভারসাম্য রক্ষা করে চলাই হলো উত্তম।

কিছু গবেষক বলেছেন, ‘আমাদের বর্তমান সময়ে বিয়েছুক ব্যক্তির সামনে পাত্রী সে পোশাকে আসতে পারবে, যে পোশাক একজন মেয়ে তার বাপ-ভাইয়ের সামনে পরিধান করতে পারে।

এছাড়াও বিয়েতে আগ্রহী ব্যক্তির প্রস্তাবিত নারী ও তার পরিবারসংশ্লিষ্ট তথ্য জানার এবং তাকে দেখার অধিকার রয়েছে। দেখা ও খোঁজ-খবর নেওয়া সম্পর্কে মেয়ে বা তার পরিবার না জানলেও কোনো সমস্যা নেই। তবে এগুলো সবই হতে

[১] হানাফি, মালিকি, শাফিয়ি ও হাফ্জিলিসহ অধিকাংশ আলিমগণের মতই এটা। সুতরাং পাত্র কেবল পাত্রীর কম্ব পর্যন্ত হাত ও মুখমণ্ডল দেখতে পারবে। এর বেশি কোনো অংশ সে আবরণ ছাড়া দেখতে পারবে না। এসব অঙ্গের প্রতি সে একাধিকবার তাকাতে পারবে। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করার জন্য সে দীর্ঘসময় নিয়ে তাকিয়ে থাকতে পারবে। কাপড়ের ওপর দিয়ে সে মাথা থেকে পা পর্যন্ত শারীরিক গঠনের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেরাতে পারবে। আমাদের সমাজে কনের মাথার কাপড় ফেলে চুল দেখানোর যে প্রচলন আছে, তা নিতান্তই তুল ও শরিয়ত পরিপন্থি। চুল দেখার জন্য পাত্রপক্ষের মহিলারাই যথেষ্ট। [আল-মিনহাজ শারফুল মুসলিম, নববি, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২১০, হাদিস : ২৫৫২ সংশ্লিষ্ট আলোচনা]

[২] সুনানু আবি দাউদ : ২০৮২; মুসনাদু আহমাদ : ১৪৫৮৬; হাদিসটি হাসান।

হবে প্রস্তাব দেওয়ার নিয়তে। জাবির ইবনু আবুল্লাহ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِذَا حَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْتَظِرْ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعُلْ، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَجْبَأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَرُوْجِهَا فَتَرَوْجُنْهَا

তোমাদের কেউ যখন কোনো মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তখন যদি সে মেয়েকে বিয়ে করতে আগ্রহ সৃষ্টি করে এমন কিছু দেখে নেওয়া সম্ভব হয় তাহলে সে যেন তা করে। বর্ণাকারী (জাবির ইবনু আবুল্লাহ রায়িয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি একটি মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পর তাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা অন্তরে গোপন রেখেছিলাম। অতঃপর আমি তার মাঝে এমন কিছু দেখি, যা আমাকে তাকে বিয়ে করতে আকৃষ্ট করল। অতঃপর আমি তাকে বিয়ে করলাম।<sup>[১]</sup>

মুগিরা ইবনু শুবা রায়িয়াল্লাহু আনহুর হাদিস থেকে আমরা জানলাম, সত্যিই বিয়েতে আগ্রহী হলে পাত্র প্রস্তাবিত পাত্রীকে দেখতে পারবে। সমাজে নিয়ম নেই বলে এতে বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার একজন মুসলিম বাবার নেই। কেননা সমাজের নিয়মকে শরিয়ার অনুগামী বানাতে হবে, শরিয়াকে উপেক্ষা করে সামাজিক রীতির অনুসরণ করা যাবে না।

এমনিভাবে বাবা, ছেলে, মেয়ে কারো জন্যই অতিরিক্ত শিথিলতা অবলম্বনও বৈধ নয়। পশ্চিমা অসভ্যদের মতো ছেলে-মেয়েকে লাগামহীন ছেড়ে দেওয়া, তাদের সঙ্গে কোনো মাহরাম নেই, কেউ নেই, এমতাবস্থায় তারা সিনেমা হল, থিয়েটার ও শপিংমল চষে বেড়াবে, এসবের কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। অতিরিক্ত কড়াকড়ি বা অধিক শিথিলতা এক কথায় সব ধরনের বাড়াবাড়ি-ই ইসলামে প্রত্যাখ্যাত।

### বিয়ের প্রস্তাব যখন হারাম

তালাক বা স্বামীর মৃত্যু পরবর্তী ইদত চলাকালে কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া যাবে না। ইদত হলো পূর্ববর্তী বিয়ের বাউভারির মতো, এই বাউভারি অতিক্রমের অধিকার কারো নেই। স্বামীর মৃত্যুপরবর্তী ইদত চলাকালে যেকেউ

[১] সুনানু আবি দাউদ : ২০৮২; মুসনাদু আহমাদ : ১৪৫৮৬; হাদিসটি হাসান।

তাকে ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহের কথা জ্ঞান দিতে পারবে, তবে সরাসরি বা স্পষ্টভাবে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারবে না, শরিয়তে এর অনুমোদন নেই। আল্লাহ তাত্ত্বালা বলেন—

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ...  
[৩]

আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে (বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা) নারীদের বিয়ের প্রস্তাব দাও বা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখো, তবে তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই [১]

নারী কারো প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে, এসময়ে অন্য কারো জন্য সেই নারীকে প্রস্তাব দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। কারণ, প্রথম প্রস্তাবদাতার সঙ্গে বিয়ে-চুক্তির ক্ষেত্রে নারী অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। এখানে প্রথম প্রস্তাবদাতার এক ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব এ সময়ে আরেকজনের প্রস্তাব দেওয়া মানে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ। আমরা যেহেতু সামাজিক প্রাণী, তাই সমাজে চলতে হলে আমাদের হৃদ্যতা, পরস্পরের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা বজায় রেখে চলতে হয়। বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অন্যের অধিকার ছিনিয়ে নিতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক হৃদ্যতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা নষ্ট হবে। তাই এক প্রস্তাবের পর আরেক প্রস্তাবের অনুমতি নেই। তবে প্রথমজন যদি নিজের অধিকার থেকে সরে দাঁড়ায় বা অপরজনকে প্রস্তাবের অনুমতি দেয়, তাহলে অন্যজন প্রস্তাব দিতে পারবে, তখন আর তাতে কোনো সমস্যা থাকবে না।

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَئْتَىءَ عَلَىٰ بَيْعٍ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَىٰ خِطْبَةِ  
أَخِيهِ حَتَّىٰ يَدْرِ

এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। অতএব কোনো মুমিনের জন্য তার (মুমিন) ভাইয়ের ক্রয়ের মধ্যে (নিজের জন্য তার কাঙ্ক্ষিত পণ্যটি) ক্রয় করতে যাওয়া

এবং তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের মধ্যে (নিজের জন্য নতুন) প্রস্তাব দেওয়া হালাল নয়; যতক্ষণ না সে (নিজের প্রস্তাব) প্রত্যাহার করে নেয়।<sup>[১]</sup>

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

*لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّىٰ يَتَرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ*

এক মুসলিম ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের মধ্যে (নতুন করে) অন্য কেউ যেন প্রস্তাব না দেয়; যতক্ষণ না তার (প্রস্তাব দেওয়ার) পূর্বে প্রথম প্রস্তাবকারী নিজের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয় কিংবা তাকে (প্রস্তাব দেওয়ার) অনুমতি দেয়।<sup>[২]</sup>

**বিয়েতে কুমারি<sup>[৩]</sup> মেয়ের সম্মতি নেওয়া বাধ্যতামূলক**

বিয়ের কর্তৃত মেয়ের হাতেই, বাবা বা অভিভাবকের জন্য তার মতামত অবহেলা বা অগ্রাহ্যের সুযোগ নেই।<sup>[৪]</sup> নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১] সহিহ মুসলিম : ১৪১৪; শারহু মাআনিল আসার : ৪২২৬

[২] সহিলুল বুখারি : ৫১৪২; সহিহ মুসলিম : ১৪১২

[৩] হানাফি মাযহাব অনুসারে, যে মেয়ের সাথে বিয়ের ভিত্তিতে সহবাস করা হয়নি তাকে কুমারী মেয়ে বলা হয়। সুতরাং যিনার দ্বারা যদি কারো সতীত নষ্ট হয়ে যায় তাহলে হাকিকি (প্রকৃত) অর্থে কুমারী না হলেও হুকমি বা বিধানগতভাবে সে কুমারী। সুতরাং বিয়ের ক্ষেত্রে কুমারী মেয়েদের যে বিধান, যিনার দ্বারা সতীত হারানো মেয়েরও একই বিধান। তবে এখানে যিনার দ্বারা সতীত নষ্ট হলে শারয়ি দৃষ্টিতে তাকে কুমারী মেয়ে হিসেবে গণ্য করার জন্য দৃষ্টি শর্ত আছে। এক. যিনাটি তার অভ্যাসে পরিণত না হওয়া। অর্থাৎ অতিরিক্ত কামাসন্তির কারণে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে একবার যিনা করেছে কিংবা জোরপূর্বক তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে, এমন মেয়ে হতে হবে। সুতরাং যারা বারবার এমন জ্বলন্ত কাজে অভ্যস্ত তারা কুমারী মেয়ের অঙ্গৰুষ্ট হবে না। দুই. যিনার কারণে তার ওপর হদ (শরিয়া কর্তৃক নির্ধারিত) শাস্তি আরোপ না হতে হবে। অর্থাৎ সে গোপনে যিনা করেছে, যা কেউ জানে না কিংবা অল্প কিছু মানুষ জানলেও শারয়ি সাক্ষ্য না থাকায় তার ওপর যিনার হদ প্রয়োগ করা হয়নি। সুতরাং যদি তার যিনার বিষয়টি প্রসিদ্ধ হয়ে যায় এবং শারয়ি সাক্ষের ভিত্তিতে তার ওপর হদ প্রয়োগ করা হয় তাহলে সে কুমারী মেয়ের অঙ্গৰুষ্ট হবে না। [আল-মাবসুত, সারাখসি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৭-৮; আল-হিদায়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯২; আল-বাহরুর রায়িক, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১২৪; আল-ইখতিয়ার লি-তালিলিল মুখতার, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৩]

[৪] সাধারণভাবে বর-কনের অনুমতি ছাড়া বাধ্যতামূলক বিয়ে শুধু হয় না। তবে হানাফি মাযহাবে এক ক্ষেত্রে তা শুধু হয়। সেটা হলো, কোনো নাবালক ছেলে-মেয়েকে যদি তার কোনো অভিভাবক বিয়ে দেয় তাহলে সে বিয়ে শুধু বলে বিবেচিত হবে। তবে অভিভাবক যদি পিতা বা দাদা হয়ে থাকে তাহলে তাদের

النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا ، وَالْبَكْرُ تُسْتَأْمَرُ ، وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا

অভিভাবকের চেয়ে অকুমারী (অর্থাৎ বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা) নারী নিজের (বিয়ের ব্যাপারে) ব্যপারে অধিক কর্তৃত্বান; কুমারী নারীর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে, নীরবতাই তার সম্মতি বলে গণ্য হবে।<sup>[১]</sup>

আরেক বর্ণনায় এসেছে—

جاءَتْ فَتَاهٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُبِي زَوْجَنِي ابْنُ أَخِيهِ يَرْفَعُ بِي حَسِيبَتَهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا قَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَجَزَتُ مَا صَنَعَ أُبِي، وَلَكِنْ أَرْدَثُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ لِلْأَبْاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

এক যুবতি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ জানিয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, (আমার অসম্মতি সঙ্গেও) আমার পিতা আমাকে তার ভাতুষ্পুত্রের সাথে বিয়ে দিয়েছেন, আমার মাধ্যমে তার হীনতা ও দুর্দশা দূর করার উদ্দেশ্যে। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (বিয়ে বহাল রাখা না রাখার) সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা মেয়ের হাতে অপর্ণ করলেন। সে বলল, বাবার সম্পাদিত বিয়েকে আমি বহাল রাখলাম। তবে আমার ইচ্ছা

সম্পাদিত সে বিয়ে পরিপূর্ণ এবং আবশ্যক হয়ে যায়, পরবর্তী সময়ে তালাক প্রদান ছাড়া যা ভেঙে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আর অভিভাবক যদি পিতা-দাদা ছাড়া অন্য কেউ (যেমন : ভাই বা চাচা) হয়ে থাকে তাহলে তাদের সম্পাদিত বিয়ে বর-কনে সাবালক হওয়ার পর আদালতের শরণাপন্ন হয়ে ভেঙে দিতে পারবে। যদি সাবালক হওয়ার পর তারা সে বিয়ে মেনে নেয় কিংবা বিয়ের কথা জানা সঙ্গেও এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য না করে নীরব থাকে তাহলে সে বিয়ে পরিপূর্ণ ও আবশ্যক হয়ে যাবে। পিতা-দাদা ছাড়া অন্য অভিভাবকদের সম্পাদিত বিয়ে শুধু হওয়ার জন্য শর্ত হলো, সে বিয়েতে মোহর ও কুফু (সমতা) যথাযথ হতে হবে। সুতরাং যদি তারা সাবালক ছেলে বা মেয়েকে এমন জায়গায় বিয়ে দেয়, যা কুফুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না কিংবা মোহর অভ্যধিক কমবেশ হয় তাহলে সে বিয়ে শুধুই হবে না। অবশ্য পিতা বা দাদা এমনটা করলে সে বিয়ে শুধু ও আবশ্যক হয়ে যাবে। কেননা, পিতা ও দাদার মধ্যে নিজের সন্তান ও নাতির প্রতি সর্বোচ্চ দয়া-মায়া ও পূর্ণ অভিভাবকত্ব বিদ্যমান, তাই তাদের সিদ্ধান্ত সর্বাবস্থায়ই কার্যকর হবে, যা অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই এক্ষেত্রে অন্য অভিভাবকদের জন্য শর্তের কড়াকড়ি করা হয়েছে। [আল-হিদায়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯৩-১৯৪; তাবায়িনুল হাকারিক, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২২; আল-লুবাব ফি শারহিল কিতাব, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১০-১১; রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩০৫-৩১]

[১] সহিত মুসলিম : ১৪২১; সুনানু আবি দাউদ : ২০৯৮

ছিল, (আমার এ ঘটনার দ্বারা) নারীরা যেন জানতে পারে যে, (সম্মতি ছাড়া মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে) বাবাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই।[১]

দীনদার, চরিত্রিবান ও সমস্তরের কোনো পাত্র যদি প্রস্তাব দেয়, তাহলে কোনো বাবার জন্য মেয়ের বিয়ে বিলম্বিত করা উচিত নয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

ثَلَاثٌ لَا تُؤْخِرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ ، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالآئِمَّةُ إِذَا وَجَدْتُ لَهَا كُفَّاً

তিনটি বিষয়ে কখনো দেরি করবে না। এক. সালাত, যখন তার সময় এসে যায়। দুই. জানায়া, যখন তা উপস্থিত হয়ে যায়। তিন. বিবাহহীন মেয়ে (চাই কুমারী হোক কিংবা বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা), যখন তার কুফু অর্থাৎ সমস্তরের উপযুক্ত ছেলে পেয়ে যাও।'[২]

নবিজি আরো বলেছেন—

إِذَا حَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ رَزَضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوْجُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ ،  
وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

যখন তোমাদের নিকট এমন ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার দীনদারি ও সুভাব চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট থাকো তাহলে তার সঙ্গে তোমরা (তোমাদের মেয়েদের) বিয়ে দাও। যদি তোমরা তা না করো তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।[৩]

### মাহরাম নারীগণ

নিচের তালিকাভুক্ত (কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন) নারীগণকে বিয়ে করা কোনো পুরুষের জন্য বৈধ নয়। তারা হলো—

[১] মুসনাদু আহমাদ : ২৫০৪৩; মুসনাদু ইসহাক ইবনু রাহয়াহ : ১৩৫৯; হাদিসটি সহিহ।

[২] জামিউত তিরমিয়ি : ১৭১; মুসনাদু আহমাদ : ৮২৮; হাদিসটির সনদ যাইক।

[৩] জামিউত তিরমিয়ি : ১০৮৫; সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৬৭; হাদিসটি হাসান।

### রস্তসম্পর্কীয় মাহরাম নারীগণ

১. বাবার স্ত্রী : বাবা মারা গেলে বা তালাক দিলেও তাকে (বাবার স্ত্রী তথা সৎমাকে) বিয়ে করা ছেলের জন্য বৈধ নয়। জাহিলি যুগে এই ধরনের বিয়ে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইসলামে এই বিয়ে অননুমোদিত। কারণ, কোনো নারী বাবার বিবাহ-বন্ধনে আসার অর্থ হলো, তিনি সন্তানের মা হয়ে যান। বাবার সম্মান ও ইজ্জত রক্ষার্থে এই নারী সন্তানের জন্য চিরদিনের মতো হারাম; যাতে তাদের পরস্পরে যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার বাসনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এর ফলে তাদের (সন্তান ও সৎমায়ের) মধ্যে সম্মান ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক তৈরি হবে।

২. মা : তেমনিভাবে দাদি, নানি ও তাদের ওপরে যারা আছেন।

৩. মেয়ে : অনুরূপ ছেলের মেয়ে বা মেয়ের মেয়ে, এভাবে তাদের নিচে যত মেয়ে আছে, তারা সবাই হারাম।

৪. বোন : অর্থাৎ সহোদর বোন, বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় বোন সবাই হারাম।

৫. ফুফু : অর্থাৎ বাবার সহোদর, বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় সব বোনই হারাম।

৬. খালা : অর্থাৎ মায়ের সহোদর, বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় সব বোনই হারাম।

৭. ভাতিজি : অর্থাৎ ভাইয়ের মেয়েগণ (সহোদর ভাইয়ের মেয়ে হোক কিংবা বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মেয়ে)।

৮. ভাগনি : অর্থাৎ বোনের মেয়েগণ (সহোদর বোনের মেয়ে হোক কিংবা বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় বোনের মেয়ে)।

ইসলামে এসব নারী আঞ্চীয়কে বলা হয় মাহরাম। কারণ, একজন মুসলিমের জন্য এসব আঞ্চীয় চিরতরে হারাম। এদের সঙ্গে কোনো অবস্থাতে কখনোই বিয়ে জারিয নয়। এসব নারীদের সাথে যেসব পুরুষদের বিয়ে নিষিদ্ধ তাদেরকেও মাহরাম (অর্থাৎ নারীর জন্য পুরুষ মাহরাম) বলা হয়।

### মাহরাম নারীদের বিয়ে করা হারাম কেন?

ক. একজন উন্নত ও সুস্থ মানুষ কখনো নিজের মা, বোন বা মেয়ের প্রতি জৈবিক চাহিদা অনুভব করে না। এমনকি অনেক বন্য প্রাণীও এমন কাজ থেকে বিরত থাকে। খালা, ফুফুর প্রতিও মানুষের মতোই অনুভূতি থাকে। অন্যদিকে

ভাতিজি-চাচা ও ভাগনি-মামা এদেরকে সমাজে মেয়ে-বাবার মতোই মনে করা হয়।

খ. সাধারণত এসব নারীদের সঙ্গে (দৈনন্দিন জীবনে) নিয়মিত ওঠাবসা ও প্রচুর চলাফেরা করতে হয়। এজন্য এদের সঙ্গে যদি স্থায়ীভাবে বিয়ে হারাম না হতো, তাহলে যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকত।

গ. এসব নারী নিকটাঞ্চীয়দের সঙ্গে পুরুষের একটি চিরস্থায়ী সম্পর্ক বিরাজমান থাকে। এই সম্পর্ক কখনো সম্মান-শ্রদ্ধা আর কখনো আদর-স্নেহ হিসেবে প্রকাশিত হয়। (এ আঞ্চীয়তা যেহেতু চিরস্থায়ী, তাই এখানে বিয়ের মাধ্যমে নতুন আঞ্চীয়তা সৃষ্টির প্রয়োজন নেই।) এজন্য অনাঞ্চীয়দের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়লে নতুন করে কিছু আঞ্চীয় হয়। আর এভাবেই মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও মুহাবতের বিস্তার ঘটে। যেমন : বৈবাহিক সম্পর্কের উপকারিতার ব্যাপারে পরিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً...  
⑥

আর তিনি তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মায়া-মহতা সৃষ্টি করেছেন। [১]

ঘ. এসব নিকটাঞ্চীয় নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক ও অনুভূতি সম্মান বা স্নেহ যেভাবে টিকে আছে, সেভাবেই সদা বহাল রাখা দরকার। এসব সম্পর্কে ফাটল ধরে এমন কিছু কখনোই করা উচিত নয়। কিন্তু এদের মধ্যে যদি বিয়ে-শাদি হয়, তাহলে এসব আবেগ ও সম্পর্ক ঝুঁকির মুখে পড়বে। কারণ, স্বাভাবিকভাবে দাম্পত্যজীবনে বাকবিতঙ্গ, মতান্বেক্য ও ঝগড়াবাঁটি হতেই পারে। এমনকি কখনো কখনো এগুলো বিচ্ছেদ ও তালাকের দিকেও গড়ায়। নিকটাঞ্চীয়দের মধ্যে যদি এমন কিছু হয়, তাহলে সেই চিরায়ত ভালোবাসা ও আবেগে ফাটল ধরে সামাজিক ভারসাম্যহীনতা তৈরি হবে।

ঙ. নিকটাঞ্চীয়দের মধ্যে শারীরিক বা মেধাগত কোনো রোগ বা অসুস্থতা থাকলে পরবর্তী প্রজন্মও সেসব রোগ ও অসুস্থতায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা খুব বেশি

[১] সুরা বুম, আয়াত : ২১

থাকে (তাই এদের মাঝে পারস্পরিক বিয়ে না হওয়াটাই যৌক্তিক)।

চ. বিয়ের পর সুমীর কাছে স্ত্রীর অধিকার আদায় ও রক্ষার জন্য তার পক্ষ হয়ে নিকটাঞ্চীয়কে তর্ক-বিতর্ক করতে হয়। এখন (বিয়ের কারণে) নারীর রক্ষকই যদি তার বিবাদী হয়ে যায়, তাহলে তার অধিকার রক্ষা করবে কে?

### দুখ-সম্পর্কিত কারণে মাহরাম নারীগণ

৯. দুখ-মা : নারীর দুখ স্বাভাবিকভাবে শৈশবে বাচ্চার হাজিড ও মাংস গঠনে ভূমিকা রাখে। তাছাড়া এই দুখপানের ফলে নারী ও শিশুর মধ্যে সন্তান ও মাতৃসুলভ একটি অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এই অনুভব হয়তো কখনো কখনো সুপ্ত থাকে, কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ঠিকই এটি জেগে ওঠে। তাই ইসলামি শরিয়তে যিনি বাচ্চাকে দুখ খাওয়াবেন, তিনি মায়ের স্থলাভিষিক্ত বা মায়ের মতো হয়ে যাবেন। তাই তাকে আর কখনো বিয়ে করা জায়িয হবে না।

শিশুর দুই বছরের মধ্যে পাঁচবার পরিত্পু হয়ে দুখ পানের ফলে এই বিধান সাব্যস্ত হবে। কারণ দুখই থাকে তখন বাচ্চাদের প্রধান খাদ্য। পরিত্পু দুখপানের মাত্রা হলো, তৎপু হয়ে বাচ্চা নিজে নিজেই মুখ থেকে যখন দুখ ছেড়ে দেয় বা মুখ থেকে দুখ খসে পড়ে। পাঁচবার পরিত্পু হওয়ার বর্ণনাটিই অধিক গ্রহণযোগ্য ও ভারসাম্যপূর্ণ বর্ণনা [১]

[১] এটা শাফিয়ি মাযহাবের মত। কিন্তু হানাফি মাযহাবের মতানুসারে দুর্ঘপোষ্য শিশুকে দুখপান করানোর নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই। দুর্ঘপোষ্য শিশু অল্প পান করুক বা বেশি পান করুক, একবার পান করুক বা একাধিকবার পান করুক, দুখপানের নির্দিষ্ট সময়সীমা দুই বছরের মধ্যে দুখপান করে থাকলে এর দ্বারাই হুরমাতে রায়আত (দুর্ঘপানজনিত বিবাহ-নিষিদ্ধতা) প্রয়াণিত হয়ে যাবে। হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত ফকির ইমাম মারগিলানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ إِذَا حَصَلَ فِي مُدْرَأِ الرَّضَاعِ شُقُّ لِبَقِيرِهِ اللَّهُ لَا يَنْبَغِي التَّخْرِيمُ إِلَّا بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ . لِئَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّانِ وَلَا الإِنْلَاجَةُ وَلَا الإِنْلَاجَانِ . وَلَنَا فُلَهُ تَعَالَى [وَأَمْهَاتُكُمْ الْلَّا يُرْضِفُكُمْ] [النَّسَاء٢: 23] : الْأَبْيَةُ وَقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِ قَضْلٍ ، وَلَأَنَّ الْحُرْقَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِشَبَهِ الْبَغْضِيَّةِ الثَّابِتَةِ بِلِشَوْءِ الْعَطْمِ وَإِنْبَاتِ اللَّخْمِ لِكُلِّهِ أَمْرُ بَطْنِنَ فَقُلْقُلُ الْحُكْمِ يَفْعَلُ الْإِرْضَاعَ

‘অল্প দুখপান ও বেশি দুখপান বরাবর। দুখপানের সময়ের মধ্যে (অর্থাৎ দুবছরের মধ্যে) দুখপান হয়ে থাকলে এদ্বারা হুরমত (বিবাহ-নিষিদ্ধতা) সাব্যস্ত হয়ে যাবে। ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পাঁচবার দুখপান হাড়া হুরমত (বিবাহ-নিষিদ্ধতা) সাব্যস্ত হবে না। যেহেতু রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, ‘এক দু-বার দুখপান ও চুমুক হারাম সাব্যস্ত করে না।’ আর আমাদের দলিল হলো, আল্লাহ তাআলার বাণী—‘আর (হারাম করা হয়েছে তোমাদের জন্য) তোমাদের সেসব মাতা, যারা তোমাদেরকে

১০. দুধ-বোন, দুধ-ফুফু, দুধ-খালা, দুধ-ভাতিজি, দুধ-ভাগনি ইত্যাদি : দুধ পান করানোর ফলে নারীটি যেমন দুধ-মা হয়েছে, তেমনি তার (গর্ভজাত) মেয়েরা দুধপানকারী ছেলেশিশুটির দুধ-বোন বলে বিবেচিত হবে। এমনিভাবে তার বোনেরা শিশুটির খালা এবং এভাবে তার অন্যান্য আত্মীয়গণ দুধ-শিশুটির আত্মীয় বলে বিবেচিত হবে। হাদিসে এসেছে—

يَخْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النِّسْبِ

| বংশগত কারণে যা হারাম হয়, দুধ পানের কারণেও তা হারাম হয়।[১]

সুতরাং বংশগত বা রক্তসম্পর্কের কারণে যেমন ফুফু, খালা, ভাতিজি, ভাগনি হারাম, তেমনি দুধ-সম্পর্কের কারণেও এরা (দুধ-ফুফু, দুধ-খালা, দুধ-ভাতিজি, দুধ-ভাগনি) হারাম হবে।[২]

### বিয়ে-সম্পর্কিত কারণে মাহরাম নারীগণ

১১. স্ত্রীর মা তথা শাশুড়ি : মেয়ের সঙ্গে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের মা তথা শাশুড়ি ছেলের মায়ের মতো হয়ে যায়। স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার আগেই শাশুড়ি তার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যায়।

১২. স্ত্রীর অন্য ঘরের কন্যা : শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে এমন স্ত্রীর আগের স্বামীর

দুধপান করিয়েছে? [সুরা নিসা, আয়াত : ২৩] তৃতীয় দলিল হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী—‘বংশগত কারণে যাদেরকে বিয়ে করা হারাম দুধপানের কারণেও তাদেরকে বিয়ে করা হারাম’ এখানে (একবার বা একাধিকবার দুধপানের মাঝে) কোনো পার্থক্য করা হয়নি। তৃতীয় দলিল হলো, হুরমতের বিষয়টি যদিও এ কারণে সাব্যস্ত হয় যে, দুধপানের কারণে (দুধপানকারী শিশুর) শরীরে হাঙ্গি-গোশত বৃদ্ধি পায়, তার এতে শিশুটি দুধমায়ের (গর্ভজাত সন্তানের মতো নিজ শরীরের) অংশ হওয়ার সন্দেহ তৈরি হয়, কিন্তু এটা তো একটি আভ্যন্তরীণ বিষয়; তাই হুরমতের বিধান দুধপান করানোর সাথেই সংশ্লিষ্ট হবে (চাই অল্প দুধপান করানো হোক বা বেশি)। [আল-হিদায়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১৭]

[১] সহিল বুখারি : ২৬৪৫; সহিহ মুসলিম : ১৪৪৭

[২] এখানে দুধ-মেয়ের কথা বলা হয়নি একারণে যে, সে তো এখনো শিশু। দুধ-মেয়ের দেখা তখনই পাওয়া যায় যখন বিয়ে করার পর নিজের স্ত্রীর দুধ কোনো মেয়েশিশু পান করে। অন্য মহিলার দুধ পান করার কারণে ছেলেশিশুটির দুধ-মা, দুধ-বোন, দুধ-ফুফু, দুধ-খালা, দুধ-ভাতিজি, দুধ-ভাগনি পাওয়া গেলেও সে বড় হয়ে বিয়ে করে নিজের স্ত্রীর দুধ অন্য কোনো মেয়েশিশুকে পান করানোর আগ পর্যন্ত তার দুধ-মেয়ে পাওয়া যাবে না। এজন্যই এখানে দুধ-মেয়ের কথা বলা হয়নি।

ওরসজাত মেয়েস্তানকে বিয়ে করা চিরতরে হারাম। তবে স্তৰীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক হওয়ার আগেই বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে তার (আগের স্বামীর ওরসজাত) মেয়েকে বিয়ে করতে কোনো সমস্যা নেই।

১৩. পুত্রবধূ : এই বিধান নিজের ওরসজাত স্তানের বধূর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, পোষ্যপুত্রের জন্য নয়। পোষ্যপুত্রকে আপন পুত্র হিসেবে গ্রহণের বুসুম ও তৎসংশ্লিষ্ট অধিকার ইসলাম নাকচ করেছে। কারণ, এটা বাস্তবতার পরিপন্থি এবং এর ফলে হারামকে হালাল, হালালকে হারাম করতে হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا جَعَلَ أَذْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ حَذِيلَكُمْ قَوْلَكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ...  
①

আর তিনি তোমাদের পোষ্যদেরকে তোমাদের (প্রকৃত) পুত্র করেননি।  
এগুলো তো তোমাদের মুখের কথা মাত্র।<sup>[১]</sup>

অর্থাৎ এগুলো শুধুই কথার কথা। এসবের কারণে বাস্তবতা পরিবর্তন হবে না কিংবা অনাভীয় লোক আভীয় হয়ে যাবে না।

বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই এ তিন শ্রেণির নারী মাহরাম হয়েছে। বৈবাহিক সেতুর ওপর নির্ভর করে অনেকগুলো সম্পর্ক গড়ে উঠে, সেগুলো রক্ষার জন্যই মূলত এই নিষেধাজ্ঞা।<sup>[২]</sup>

### দুই বোনের একই স্বামী

১৪. শ্যালিকা : জাহিলি যুগে একই স্বামীর কাছে একসাথে দুই বোনের বিয়ের প্রচলন ছিল। ইসলাম এসে এটাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। বোনদের মধ্যকার

[১] সূরা আহমাব, আয়াত : ৪

[২] এতক্ষণ পর্যন্ত যেসব নারীর কথা বলা হলো, তাদেরকে বলা হয় মাহরাম নারী। এদের সাথে একজন পুরুষের বিয়ে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ। অর্থাৎ এদেরকে কখনোই বিয়ে করা যাবে না। এরপর সামনে যেসব নারীদের আলোচনা আসবে, তারা হলো অস্থায়ী বিবাহ-নিষিদ্ধ নারী। অর্থাৎ বিশেষ কোনো কারণ থাকায় তাদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ। কারণটি দূর হয়ে গেলে তখন তাদের বিয়ে করা যাবে। এজন্য এদেরকে মাহরাম (স্থায়ীভাবে বিবাহ-নিষিদ্ধ) নারী বলা হয় না। সুতরাং (বিশেষ কারণটি বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত) এদেরকে বিয়ে করা না গেলেও তাদের সাথে পর্দা রক্ষা করে চলা আবশ্যিক।

ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দ্য ইসলাম বহাল রাখতে চায়। তাই দুই বোনকে একসাথে এক পাত্রে বিয়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। কেননা, তারা সতিন হলে তাদের মধ্যকার হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা আর বজায় থাকবে না।

দুই বোনকে এক পাত্রস্থ-বিষয়ক নিষেধাজ্ঞার কথা সরাসরি কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি আরো দুটি শ্রেণিকে যুক্ত করেছেন, তথা ভাতিজি-ফুফু ও ভাগনি-খালাকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا يُجْمِعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالِتِهَا

| কোনো মেয়ে ও তার ফুফুকে কিংবা কোনো মেয়ে ও তার খালাকে একত্রে  
| বিয়ে করা যাবে না। [১]

অন্য হাদিসে তিনি আরো অতিরিক্ত বলেছেন—

إِنْكُنْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطْغَنْ أَرْحَامَكُنْ

| যদি তোমরা এটা করো, তাহলে তোমরা (এর মাধ্যমে) তোমাদের আত্মীয়তার  
| সম্পর্ক ছিন্ন করলে। [২]

ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ককে প্রভৃতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সুতরাং যে কাজে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়, ইসলাম সেটাকে কীভাবে অনুমতি দিতে পারে?

### অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী

১৫. বিবাহিতা নারী : অন্যের বিবাহের অধীনে থাকা নারীর সঙ্গে কারো বিয়ে বৈধ নয়। অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে বৈধ হওয়ার জন্য দুটি শর্ত লাগবে—এক. স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়া। দুই. মৃত্যু বা তালাক-পরবর্তী নারীর ইদ্দত পূর্ণ হওয়া।

[১] সহিল বুখারি : ৫১০৯, সহিল মুসলিম : ১৪০৮

[২] সহিল ইবনি হিবনান : ৪১১৬; মুজামু ইবনিল আরাবি : ২৯৯; হাদিসটি হাসান।

ইদত হলো—আগের বিয়ের দায়িত্বপূরণের মতো একটি বিষয়। গর্ভবতীর জন্য ইদতের সীমা হলো গর্ভপাত, তার জন্য যতদিনই লাগুক। আর গর্ভবতী না হলে বিধবা নারীর ইদত চার মাস দশ দিন। আর তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদত তিন মাসিক পর্যন্ত সময়। গর্ভমুক্তির বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনটি মাসিক ধার্য হয়েছে। অন্যথায় তার গর্ভাশয়ের কোথাও পূর্বের স্বামীর বীর্য থেকে গেলে সন্তানের বংশ নির্ধারণে অস্পষ্টতা তৈরি হবে। তবে স্ত্রী যদি অতিরিক্ত ছেট হয়, যার বাচ্চা ধারণের ক্ষমতাই নেই বা অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়, যার স্নাব বৰ্ধ হয়ে গিয়েছে, তাদের ইদত হলো তিন মাস। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالْمُطْلَقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ تَلَائِةٌ قُرُوءٌ وَلَا يَحْلُ لَهُنَّ أَنْ يَكُونُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
أَرْخَامِهِنَ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...  
➊

আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন রজঃস্নাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে। আর তারা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়।<sup>[১]</sup>

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيطِ مِنْ يَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبَّنِمْ فَعِدْنَهُنَ تَلَائِةٌ أَشْهُرٌ وَاللَّائِي لَمْ  
يَحْضُنَ وَأَوْلَاثُ الْأَخْمَالِ أَجْهَنَّ أَنْ يَضْعَنَ حَمَلَهُنَ...  
➊

আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের আর ঝুতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ইদত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদতকাল হবে তিন মাস। আর যারা এখনো ঝুতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদেরও (ইদতকাল হবে তিন মাস)। আর গর্ভবতী নারীদের ইদতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।<sup>[২]</sup>

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...  
➊

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৮

[২] সূরা তালাক, আয়াত : ৪

আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস  
দশ দিন অপেক্ষা করবে [১]

উল্লিখিত ১৫ শ্রেণির নারী, যাদের সঙ্গে (কারো সাথে স্থায়ীভাবে, আর কারো  
সাথে অস্থায়ীভাবে) বিয়ে নিষিদ্ধ, তাদের কথা সুরা নিসার তিনটি আয়াতে  
উল্লিখিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ الْبَسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَنِيَّةً وَسَاءَ سَبِيلًا  
١٢ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ  
الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَغْتُنَّكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتِ  
الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ إِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٣ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابُ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَأَءَ ذَلِكُمْ ١٤

আর নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষ বিয়ে করেছে (অর্থাৎ যারা  
তোমাদের সৎ-মা), তাদেরকে তোমরা বিয়ে কোরো না। অবশ্য যা অতীতে  
হয়ে গেছে (তা ক্ষমা করা হলো)। নিশ্চয় তা অশ্লীল, মারাত্মক ঘৃণ্ণ ও নিকৃষ্ট  
পন্থা। তোমাদের জন্য (বিয়ে) হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদেরকে,  
তোমাদের কন্যাদেরকে, তোমাদের বোনদেরকে, তোমাদের ফুফুদেরকে,  
তোমাদের খালাদেরকে, ভাতিজিদেরকে, ভাগনিদেরকে, তোমাদের সেসব  
মাতাকে যারা তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোনদেরকে,  
তোমাদের শাশুড়িদেরকে, তোমরা যেসব স্ত্রীর সাথে (সহবাসে) মিলিত  
হয়েছ সেসব স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর ওরসজাত কন্যাদেরকে, যারা তোমাদের  
অভিভাবকত্বে রয়েছে। আর যদি তোমরা তাদের সাথে (সহবাসে) মিলিত  
না হয়ে থাকো (এবং সহবাসের পূর্বেই তাদের তালাক দিয়ে থাকো) তাহলে  
(তাদের পূর্বের স্বামীর ওরসজাত কন্যাদেরকে বিয়ে করলে) তোমাদের  
কোনো পাপ নেই। আর (তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে) তোমাদের  
ওরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকে এবং (স্ত্রী হিসেবে) দুই বোনকে একত্র করা।  
তবে অতীতে যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন কথা। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৩৪

দয়ালু। আর (হারাম করা হয়েছে) নারীদের মধ্য থেকে সধবাদেরকে। তবে তোমাদের মালিকানাধীন দাসী হলে ভিন্ন কথা (সেক্ষেত্রে তাদের কাফির স্বামী জীবিত থাকা সত্ত্বেও দাসী হওয়ার ভিত্তিতে ইদতের পর তাদের সাথে সহবাস করা যাবে)। এটি তোমাদের ওপর আল্লাহর বিধান এবং এরা ছাড়া সকল নারীকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।<sup>[১]</sup>

ভাতিজি-ফুফু ও ভাগনি-খালাকে এক পাত্রস্থ-বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা কুরআনে আসেনি, এদের আলোচনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে এসেছে।<sup>[২]</sup>

### মুশরিক নারী

১৬. মুশরিক (শিরককারী) নারী : এরা হলো ওই সব নারী, যারা আরবের মুশরিক নারীদের মতো মৃত্তিপূজা করে। এদেরও বিয়ে করা যাবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مُلَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ حَيْثُ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَغْبَجَتْكُمْ وَلَا تنكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ حَيْثُ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أَغْبَجَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ  
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ

আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে কোরো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। নিশ্চয়ই মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে উত্তম; যদিও সে (রূপ-লাবণ্য দিয়ে) তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে তোমরা (নিজেদের মেয়েদেরকে) বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে (গুণ-বৈশিষ্ট্য দিয়ে) তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। তারা তোমাদেরকে আগুনের

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ২২-২৪

[২] হাদিসটি কিছুক্ষণ পূর্বেই গত হয়েছে। পাঠকদের জন্য আমরা হাদিসটি এখানে উল্লেখ করে দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا يُجْمِعُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَعَيْنَاهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالِتَهَا

কোনো মেয়ে ও তার ফুফুকে কিংবা কোনো মেয়ে ও তার খালাকে একত্রে বিয়ে করা যাবে না। [সহিল বুখারি : ৫১০৮; সহিহ ফুসলিয় : ১৪০৮]

দিকে আহান করে, আর আল্লাহ সীয় ইচ্ছায় তোমাদেরকে জানাত ও ক্ষমার  
দিকে আহান করেন [১]

মুশরিক নারীর সঙ্গে যেমন কোনো মুসলিম পুরুষের বিয়ে বৈধ নয়, তেমনি  
মুশরিক পুরুষের সঙ্গে কোনো মুসলিম নারীর বিয়েও বৈধ নয়। দুটি ধর্মের  
আদর্শগত ব্যবধান অনেক। একদল ডাকে জানাতের দিকে, আরেকদল ডাকে  
জাহানামের দিকে। এরা হলো আল্লাহ, নবি ও আখিরাতে বিশ্বাসী, আর ওরা হলো  
আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্তকারী, নবি ও আখিরাত অস্তীকারকারী। বিয়ে  
হলো স্থিতিশীলতা ও ভালোবাসার নাম; তাই দুজন যদি দুই মেরুর হয় তাহলে  
সহাবস্থান কীভাবে সম্ভব?

### কিতাবি নারীদেরকে বিয়ে

যারা আহলে কিতাব বা কিতাবিখি, তারা যেহেতু ঐশ্বী গ্রন্থকে মানে; ইসলামের  
মতোই একটি আসমানি ধর্মের অনুসারী, তাই তাদের নারীদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে  
আবদ্ধ হওয়া ইসলামে বৈধ।[২] তাদের গ্রন্থ ও ধর্মের বিভিন্ন বিষয় বিকৃত ও

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২১

[২] ইমাম ইবনুল হুমায় রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আহলে কিতাব বা কিতাবি বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যে কোনো  
নবির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং (আসমানি) কোনো কিতাবকে স্বীকার করে। আর সামরিয়া জাতি  
ইহুদীদেরই অন্তর্গত একটি দল। আর যারা দাউদ আলাইহিস সালামের যাবুর এবং ইবরাহিম আলাইহিস  
সালাম ও শিস আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণকৃত সহিফাসমূহের প্রতি ইমান আনবে তারাও আহলে  
কিতাব। আমাদের নিকট তাদের (মেয়েদের) সাথে (আমাদের মুসলিম পুরুষদের) বিয়ে করা বৈধ। [ফাতহুল  
কাদির, ইবনুল হুমায়, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২২৯]

[৩] যে সকল নারী আহলে কিতাব তথা প্রকৃত ইহুদি-খ্রিস্টানের অন্তর্ভুক্ত, তাদেরকে বিয়ে করার অনুমতি  
দেওয়া হয়েছে; যদিও তা উত্তম নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

**الْيَوْمَ أَجِلٌ لِّكُمُ الطَّيِّبَاتِ... وَالْمُحْسَنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكُتُبَ مِنْ قَبْلِكُمْ**

আজ তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো সকল ভালো জিনিস... এবং (বৈধ করা হলো) যুমিন সচরিও  
নারীগণকে ও তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচরিও নারীদেরকে (বিয়ে করা)।  
[সুরা মায়দা, আয়াত : ৫]

শর্ত হলো, তারা সত্যিকারার্থেই আহলে কিতাব হতে হবে অর্থাৎ, আল্লাহ প্রেরিত কোনো রাসূল ও আসমানি  
কোনো কিতাবে বিশ্বাসী হতে হবে। অন্যথায় নামে ইহুদি-খ্রিস্টান হলেও সে প্রকৃত আহলে কিতাবের  
অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। তবে ইহুদিরা উয়াইর আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিস্টানগণ ইসা  
আলাইহিস সালামকে তিনি প্রভুর একজন বললেও প্রকৃত আহলে কিতাব হওয়ার ক্ষেত্রে তা প্রতিবন্ধকৃত।

পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের সরবরাহকৃত খাদ্য এবং তাদের ধর্মের অনুসারী নারীদের সঙ্গে পরিণয়কে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। যেমন : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَحْدِزِي أَخْدَانٍ...  
⑤

আজ তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো সকল ভালো জিনিস। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের (জবাইকৃত) খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ ও তোমাদের (জবাইকৃত) খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ। আর (বৈধ করা হলো) মুমিন সচরিত্রা নারীগণকে ও তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচরিত্রা নারীদেরকে (বিয়ে করা); যখন তোমরা তাদেরকে মোহর দেবে বিবাহকারী হিসেবে, প্রকাশ্য ব্যভিচারকারী বা গোপনপত্নী গ্রহণকারী হিসেবে নয়।<sup>[১]</sup>

এটা হলো ইসলামি উদারতার নির্দশন। অন্য কোনো ধর্মে বা আদর্শে এর নজির মেলা ভার। কুরআনে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাফির ও আন্ত বলা হয়েছে, তবু একজন কিতাবি নারী মুসলিম পুরুষের সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হয়ে স্বধর্মে বহাল থেকেই একজন মুমিনের গৃহকর্ত্তা, তার মনের প্রশান্তি, অন্তরঙ্গ সঙ্গী ও সন্তানের মা হতে পারবে। যেই দার্পত্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

সৃষ্টি করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ আলাইহি শুয়ো সালামের শুগেও তারা এমন বিশ্঵াসই রাখত, তবু কুরআনে তাদেরকে আহলে কিতাব বলে সীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাই এমন শিরকি বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তারা আহলে কিতাব, তবে ঈমানের পথে তারা অবশ্যই কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত। হানাফি মাযহাবের প্রখ্যাত ফকির আল্লামা হাসকাফি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

وَصَحْ دَكَاحٌ كَيَابِيَّةٌ . وَإِنْ كُرَّةً تَنْزِيْهًا (مُؤْمِنَةٌ بِنَبِيٍّ) مُرْسَلٌ (فَقْرَةٌ بِكَتَابٍ) مُنْزَلٌ . وَإِنْ اغْتَدَدُوا النَّبِيَّ إِلَيْهِ ، وَكَذَا حِلٌّ  
ذَبِيعَتُهُمْ عَلَى الْمَذْهَبِ بَخْرٌ

অর্থাৎ আহলে কিতাব নারীকে বিয়ে করা বৈধ; যদিও তা মাকুরুহে তানমিহি বা অনুসূম। আহলে কিতাব হলো, বে আল্লাহ-প্রেরিত কোনো নবিতে বিশ্বাসী এবং আসমান থেকে অবতীর্ণ কোনো কিতাবের সীকৃতি দানকারী; যদিও তারা ঈসা আলাইহিস সালামকে উপাস্য বলে বিশ্বাস করুক। অনুরূপ বিশুদ্ধ মতানুসারে তাদের জবাইকৃত পশুও হালাল। [আদ-দুররুল মুখ্যতার মাঝা রদ্দিল মুহতার, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৫]

[১] সুরা মায়দা, আয়াত : ৫

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْتَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ [৫]

তার নির্দশনসমূহের একটি হলো, তিনি তোমাদের জন্য নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের জীবনসঙ্গীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশংসন্তি খুঁজে পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া-মায়া সৃষ্টি করেছেন।<sup>[১]</sup>

### কিতাবি নারীদের বিয়েতে শর্তসমূহ

১. বাস্তবেই নারী যদি কিতাবি হয়—ঐশ্বী ধর্ম ও গ্রন্থের অনুসরণ করে, তার সঙ্গেই শুধু প্রণয়ে আবদ্ধ হওয়া যাবে। কিন্তু যারা কেবল নামেই ইহুদি-খ্রিষ্টান, কিন্তু বাস্তবে নাস্তিক কিংবা ইসলাম অসমর্থিত কোনো দল, যথা বাহাউদ্দী, দুরিয়া, নুসাইরিয়ার আকিদা-ধর্মে বিশ্বাসী, তাদের (নারীদের) সঙ্গে বিয়ে সম্পূর্ণভাবে না-জায়িয়। আদমশুমারিতে তারা ইহুদি, খ্রিষ্টান বা মুসলিম যে হিসেবে-ই গণ্য হোক না কেন।
২. সৎ চরিত্রান্বয় স্বাধীন কিতাবি নারীর সঙ্গে পরিণয় জায়িয়, কিন্তু ব্যভিচারী নারীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কখনোই জায়িয় নয়।
৩. মুসলিমদের সঙ্গে শত্রুতা ও যুদ্ধ চলমান, এমন কিতাবি নারীর সঙ্গে বিয়ে জায়িয় নয়। বিয়ের দ্বারা মূলত দুপক্ষের আত্মীয়তা, বন্ধন ও বন্ধুত্ব তৈরি হয়। এক্ষেত্রে বন্ধন সৃষ্টি না হয়ে, এই মেয়ে সৃগত্রের আত্মীয়তা ও সম্পর্কের সুবাদে তাদের গুপ্তচর বা মদদদাতা হয়ে উঠতে পারে। তাই একজন মুসলিমের জন্য কোনো ইসরায়েলি নারীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে না।
৪. গতানুগতিক মুসলিমের তুলনায় একজন দীনদার, ধর্ম-সচেতন নারী বিয়ের জন্য অগ্রাধিকার পাবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এমনই শিক্ষা দিয়েছেন। একটি হাদিসে তিনি বলেন—

شَكَحَ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسِيبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ بِذَاتِ

[১] দূয়া বুম, আয়াত : ২১

চারাটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে (সাধারণত) মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়—তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারিতা। সুতরাং তুমি দ্বীনদার নারীকে বিয়ে করে সফল হও, নতুবা তোমার হাত ধূলিমলিন হোক (অর্থাৎ দ্বীনদারিকে প্রাধান্য না দিলে দাম্পত্যজীবনে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে)।<sup>[১]</sup>

এর মাধ্যমে আমাদের কাছে আরো সুস্পষ্ট হলো যে, একজন মুসলিম পুরুষের জন্য একজন কিতাবি নারীর তুলনায়—সে যেই হোক—একজন মুসলিম নারী অধিক উত্তম। (কেননা, ঈমান থাকায় সে নিঃসন্দেহে কিতাবি নারীর তুলনায় অধিক দ্বীনদার।)

৫. কোনো কিতাবি নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের দ্বারা সম্ভানদের শিক্ষা ও ধর্ম নিয়ে শঙ্কা তৈরি হলে, দ্বীন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রক্ষার্থে এমন নারী থেকে দূরে থাকাই উত্তম। বিশেষ করে, স্বামী যখন স্ত্রীদের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে (বা তাদের দেশে) বসবাস করবে।

৬. কোনো ভূখণ্ডে যদি মুসলিম-সংখ্যা খুব কম থাকে, সেখানকার মুসলিম পুরুষদের জন্য কিতাবি নারী বিয়ে করা সম্পূর্ণ না-জায়ি। কারণ, মুসলিম নারীদের জন্য অমুসলিম পুরুষ বিয়ে করা তো অনুমোদিত নয়, এখন মুসলিম পুরুষগণও যদি তাদের বিয়ে না করে, তাহলে তারা তো বিয়ের জন্য কোনো পাত্র পাবে না। ফলে তাদের কিছু অংশ হয়তো অবিবাহিত থেকে যাবে এবং এতে মুসলিম-সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু অমুসলিম নারীর বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলে এই সমস্যা দূর হয়ে যায়।

### অমুসলিম পুরুষের সঙ্গে মুসলিম নারীর বিয়ে

কিতাবি বা অ-কিতাবি সকল অমুসলিম পুরুষের সঙ্গেই মুসলিম নারীর বিয়ে হারায়। কোনো অবস্থাতেই তাদের সঙ্গে মুসলিম নারীদের বিয়ে জায়ি নয়। পূর্বেই আমরা কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেছি, আল্লাহ তাত্ত্বালা বলেন—

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ...<sup>①</sup>

আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে কোরো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান  
গ্রহণ করে।<sup>[১]</sup>

হিজরতকারী নারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ جُلُّ لَهُنْ وَلَا هُنْ يَحْلُونَ لَهُنْ<sup>[২]</sup>

যদি তোমরা জানো যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের  
কাছে ফেরত পাঠিয়ো না। এরা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফিররাও  
এদের জন্য হালাল নয়।<sup>[৩]</sup>

এই বিধানের ক্ষেত্রে কিতাবি পুরুষগণ অন্যান্য কাফিরদের মতোই। কিতাবি পুরুষদের  
ব্যাপারে ভিন্ন কোনো আয়াত ও হাদিস বর্ণিত হয়নি। এজন্য তাদের সঙ্গে মুসলিম  
নারীদের বিয়ে নিষিদ্ধের বিষয়ে সমগ্র উন্মাদ একমত।

একজন মুসলিমের জন্য ইহুদি বা খ্রিস্টান নারী বিয়ের অনুমতি রয়েছে, কিন্তু একজন  
মুসলিম নারীর সঙ্গে অমুসলিম পুরুষের বিয়ে অনুমোদিত নয়। এর কারণ হলো,  
একটি পরিবারে হর্তাকর্তা মূলত থাকে একজন পুরুষ। নারীর দায়-দায়িত্ব থাকে  
স্বামীর হাতে। মুসলিম পুরুষের অধীনে একজন কিতাবি নারী তার আকিদা-বিশ্বাস  
ঠিক রেখে চলার স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু ইহুদি বা খ্রিস্টান ধর্ম এ ধরনের নিরাপত্তার  
নিশ্চয়তা দেয় না। তাহলে ইসলাম কীভাবে তার অনুসারীদেরকে বিপদের মুখে  
ঠেলে দিতে পারে? কীভাবে পারে এমন লোকদের হাতে তাদেরকে সমর্পণ করতে,  
যারা তাদের ধর্ম ও আকিদা রক্ষার বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা দেয় না?

কথা হলো, স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীর আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, এতে  
তাদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় থাকবে। একজন মুসলিম তো ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের  
প্রতি বিশ্বাস রাখে। তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিকৃতি সত্ত্বেও সে জানে, এগুলো আল্লাহ-  
প্রদত্ত গ্রন্থ। সে বিশ্বাস করে, মুসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম  
আল্লাহ তাআলার প্রেরিত দুজন সম্মানিত ও মহান নবি। তাই কিতাবি নারী যখন

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২২১

[২] সূরা মুমতাহিনা, আয়াত : ১০

মুসলিমের অধীনে থাকে, তখন সে এমন একজনের অধীনে থাকে, যে তার ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি সহনশীল ও একমত; বরং এর প্রতি বিশ্বাস ছাড়া তার ঈমানই পূর্ণ হবে না।

কিন্তু ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ তো ইসলামকে ধর্ম হিসেবে স্বীকারই করে না। কুরআন কিংবা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কিছুর প্রতিই তারা বিশ্বাস রাখে না। তাহলে তার অধীনে একজন মুসলিম নারী—যার ধর্মে বহু সুতন্ত্র নির্দশন, ফরজ-ওয়াজিব ইবাদত ও নানা বিধিনিষেধ রয়েছে—কীভাবে থাকতে পারে?

নিজের ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাসের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে একজন মুসলিম নারীর পক্ষে কোনো অমুসলিম পুরুষের অধীনে কী করে থাকা সম্ভব, যেখানে কর্তৃত্বান্বিত পুরুষ মুসলিম নারীর যাবতীয় ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাসকে অস্বীকার করে?

এ কারণে মুশারিকদের সঙ্গে (মুসলিম নারী-পুরুষ উভয়ের) বিয়ে সম্পূর্ণরূপে নিষেধের ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান পুরোপুরিই যৌক্তিক। কারণ, পৌত্রলিকতার সঙ্গে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে সাংঘর্ষিক, তাহলে এদের মধ্যে কীভাবে সম্প্রীতি বজায় থাকবে?

আরব্য কবি বলেন—

ওহে, তুমি সুহাইলের সঙ্গে সুরাইয়ার বিয়ে দিছ; আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী  
করুন, কীভাবে তারা মিলিত হবে?

স্বাধীন হয়ে গেলে সুরাইয়া তো চলে যাবে সিরিয়ায়, আর স্বাধীনতা পেলে  
সুহাইল চলে যাবে ইয়ামেনে!

### পতিতা নারী

১৭. যারা খোলাখুলিভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং একে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের কথা বলা হয়েছে এখানে [১] আমর ইবনু শুআইব রাহিমাহুল্লাহ তার পিতা

[১] সচরিত্র পুরুষের জন্য ব্যভিচারিণী বা পতিতা নারীকে বিয়ে করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহর মতে, সচরিত্র পুরুষের জন্য ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করা বৈধ নয়। অনুরূপ সচরিত্রা নারীকে ব্যভিচারী পুরুষের কাছে বিয়ে দেওয়াও বৈধ নয়। তবে সে যদি নিষ্ঠাপূর্ণভাবে তাওবা করে এবং ব্যভিচার একেবারে ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে বিয়ে করার অনুমতি আছে। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ দলিল হিসেবে সুরা নুরের ৩ নম্বর আয়াত ও সুনানু আবি দাউদ-সহ বিভিন্ন হাদিসগুলো বর্ণিত হাদিস পেশ করেন।

সুত্রে তার দাদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنْ مَرْتَدَ بْنَ أَبِي مَرْتَدِ الْعَنْوَىيْ كَانَ يَخْمِلُ الْأَسْتَارِيْ بِمَكْنَةَ، وَكَانَ يُمْكِنَهُ تَغْيِيرُ يَقْاعُدَ لَهَا: عَنْاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتُهُ، قَالَ: جَئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ عَنْاقَ؟ قَالَ: فَسَكَّتَ عَنْتِي، فَنَزَّلَتْ: {وَالرَّازِيَّةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: ٣] فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ: لَا تَنْكِحُهَا

মারসাদ ইবনু আবি মারসাদ গানাবি রায়িয়াল্লাহু আনহু মক্কা থেকে বন্দীদেরকে বহন করতেন। সে সময় মক্কাতে আনাক নামে এক ব্যভিচারিণী ছিল। সে ছিল মারসাদের (জাহিলিয়গের) বান্ধবী। তিনি বলেন, আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমাতে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি আনাককে বিয়ে করব? মারসাদ রায়িয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি আমার প্রশ্নের ব্যাপারে চুপ থাকলেন। অতঃপর আয়াত অবতীর্ণ হলো—

الرَّازِيَّةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَّ حُرْمَةُ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ ③

এর বিপরীতে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহ, ইমাম মালিক রাহিমাল্লাহ এবং ইমাম শাফিয়ি রাহিমাল্লাহ বলেন, সচরিত্র পুরুষের জন্য ব্যভিচারিণী বা পতিতা নারীকে বিয়ে করা কিংবা সচরিত্রা নারীকে ব্যভিচারী পুরুষের কাছে বিয়ে দেওয়া বৈধ। তারা এক্ষেত্রে দলিল পেশ করেন সুরা নুরের ৩২ নম্বর আয়াত দ্বারা। আয়াতে বলা হয়েছে—‘আর তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন (কুমারী হোক কিংবা বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা, নারী হোক বা পুরুষ) তাদের বিয়ে সম্পাদন করো এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও।’ [সুরা নুর, আয়াত : ৩২] তারা বলেন, এ আয়াতের দ্বারা সুরা নুরের ৩ নম্বর আয়াতের বিধান রাহিত হয়ে গেছে। কেননা, এ আয়াতটি আম বা ব্যাপক, যা সচরিত্র ও ব্যভিচারী সব শ্রেণির মানুষকেই অঙ্গৰুচ্ছ করেছে। অনুরূপ হাদিসটিও যেহেতু সুরা নুরের ৩ আয়াতের সাথে সংঞ্চিষ্ট ছিল, তাই সেটাও সুরা নুরের ৩২ নম্বর আয়াতের দ্বারা রাহিত হয়ে গেছে। অনুরূপ সুরা নিসার ৩ নম্বর আয়াতের বিধান রাহিত হয়ে গেছে। সুরা নিসার ৩ নম্বর আয়াতের দ্বারা রাহিত হয়ে গেছে। সুরা নিসার ও নম্বর আয়াতের দ্বারাও তারা দলিল পেশ করেন এবং বলেন যে, এটা দ্বারা সুরা নুরের ৩ নম্বর আয়াতের বিধান রাহিত হয়ে গেছে। সুরা নিসার ও নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, ‘তোমরা বিয়ে কোরো নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে—দৃষ্টি, তিনটি অথবা চারটি করে। আর যদি আশঙ্কা করো যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকেই (বিয়ে করো)।’ [সুরা নিসা, আয়াত : ৩] ইমাম কুরতুবি রাহিমাল্লাহ বলেন, ‘এটাই অধিকাংশ আলিমের মত। ফতোয়া বিশারদগণ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো নারীর সাথে ব্যভিচার করেছে, তার জন্য সে নারীকে বিয়ে করা বৈধ। অনুরূপ অন্য লোকদের জন্যও সে ব্যভিচারিণী নারীকে বিয়ে করা বৈধ।’ এছাড়াও এখানে আরো অনেক দলিল-প্রমাণ ও দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ফিকহ-ফাতাওয়া ও তাফসিলের কিতাবাদিতে রয়েছে। [তাফসিলুল কুরতুবি, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ১৬৯; তাফসিলুল ইবনি কাসিম : খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৭; বাহরবুর রায়িক, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১১৪; আদ-দুরবুল মুখতার মাআল ফাদিল মুহতার, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫০; আল-মাওসুত্তালুল ফিকহিয়া, খণ্ড : ৩৬, পৃষ্ঠা : ২২০-২২১]

ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশারিক নারীকেই বিয়ে করে আর ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশারিক পুরুষই বিয়ে করে। এদেরকে (ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে) মুমিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে।<sup>[১]</sup> এরপর তিনি আমাকে ডেকে আয়াতটি পড়ে শোনালেন এবং বললেন, তুমি তাকে বিয়ে কোরো না।<sup>[২]</sup>

মুমিন ও কিতাবিদের মধ্য থেকে চরিত্রবান নারীরা মুসলিম পুরুষের জন্য বৈধ। তেমনিভাবে পুরুষের জন্য বিয়ে হালাল হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো চরিত্র রক্ষার নিয়ত থাকা, পাপাচারের উদ্দেশ্য থাকলে বিয়ে বৈধ হবে না। এই বিধান যারা অন্তর থেকে মানতে পারেনি এবং তাদের জীবনে অনুসরণ করেনি তারা হলো মুশারিক। তার মতো আরেকজন মুশারিকই কেবল এই ধরনের বিয়েতে সমর্থন দিতে পারে। অন্যদিকে এই বিধান সীকার করে, মেনেও চলে, কিন্তু বিয়ের সময় শারয়ি সীমার বাইরে গিয়ে নিষিদ্ধ কারো সঙ্গে বিয়েতে জড়ায়, সেও ব্যভিচারী বলে গণ্য।

সুরা নূরের আয়াতটি উল্লেখিত হয়েছে রজমের (অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে শাস্তির বিধানের) আয়াতের পরেই। রজমের আয়াতে শারীরিক শাস্তি আর এই আয়াতে সামাজিক শাস্তির কথা বিবৃত হয়েছে। ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সঙ্গে বিয়ে নিষিদ্ধের শাস্তি অনেকটা আধুনিক পরিভাষায় কোনো অপরাধের শাস্তিবশত কোনো নাগরিককে লৈঙ্গিক বা সামাজিক অধিকার থেকে বণ্ণিত করার মতোই।<sup>[৩]</sup>

এই আয়াতের অর্থ বয়ানের পরে ইমাম ইবনুল কাহিয়িম রাহিমাতুল্লাহ বলেন, এই বিধানটি যেমনিভাবে কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ, তেমনিভাবে এটি প্রকৃতি ও বিবেকেরও দাবি। সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের কাছে এমন কর্মকাণ্ড অপচল্দনীয়। তাই আরবের লোকেরা অতিরিক্ত মন্দ গালি দিতে চাইলে বলত, ‘তুই একটা

[১] সুরা নূর, আয়াত : ৩

[২] সুনানু আবি দাউদ : ২০৫১; সুনানুন নাসায় : ৩২২৮; হাদিসটি হাসান।

[৩] সুরা নূরের আয়াতের এমন ব্যাখ্যা এবং এ শাস্তির বিধান হাস্তলি মাযহাবের মতানুসারে। যেমনটি আমরা ইতিঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হাস্তলি মাযহাব অনুসারে সচরিত্র পুরুষের জন্য ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করা বৈধ নয়। অনুরূপ সচরিত্রা নারীকে ব্যভিচারী পুরুষের কাছে বিয়ে দেওয়াও বৈধ নয়। তবে সে যদি নিষ্ঠাপূর্ণভাবে তাওয়া করে এবং ব্যভিচার একেবারে ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে বিয়ে করার অনুমতি আছে। [তাফসিল ইবনি কাসির, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৭]

বেশ্টার জামাই।' তার জন্য নিজের স্ত্রীকে অন্য কারো সঙ্গে ভাগাভাগি করা কিংবা ব্যভিচারিণীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ ইসলামে নিষিদ্ধ। মুমিনগণ যেন এ ধরনের মন্দ কাজে জড়াতে না পারে, তাই আল্লাহ তাআলা এমন কাজে নিষেধাজ্ঞার তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

নিষেধাজ্ঞার অন্তর্নিহিত কারণ হলো, ইসলামে স্বামীর শয্যা ও সন্তানের বংশধারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আল্লাহ তাআলা বংশধারা সৃষ্টি করেছেন, এটি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু ব্যভিচারের মতো জঘন্য অপরাধের দ্বারা স্বামীর শয্যা ও বংশধারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যভিচারের ফলে বহু পুরুষের বীর্য এক নারীর গর্ভে জমা হয়ে সন্তানের বংশধারা নষ্ট হয়। এজন্য ইসলামি শরিয়তে ব্যভিচারীর সঙ্গে সচরিত্র লোকের বিয়ে অবৈধ। তবে সে যদি তাওবা করে ফিরে আসে, তাহলে তার গর্ভ পবিত্র হওয়ার পর তার সঙ্গে বিয়ে বৈধ হবে। গর্ভ পবিত্র হওয়ার জন্য অন্তত এক হায়িয় (ঝুতুস্ত্র) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, যাতে তার গর্ভমুক্তির বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

তাছাড়া ব্যভিচারিণী হলো জঘন্য ও ঘৃণ্যকাজে লিপ্ত নারী, অন্যদিকে বিয়ে হলো ভালোবাসা, আদর ও সম্প্রীতির বিষয়। সুতরাং একজন ঘৃণ্য নারীর পক্ষে কি তার স্বামীর কাছে আদর ও ভালোবাসার পাত্রী হওয়া সম্ভব?

আরবিতে **لِجَزْدَوَاجْ** শব্দের অর্থ স্বামী। শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে **لِجَزْدَوَاجْ** থেকে। শব্দের অর্থ হলো জুটিবন্ধ হওয়া। অতএব, স্বামী-স্ত্রী মানেই হলো—এরা সামঞ্জস্যপূর্ণ জুটি। কিন্তু একজন ব্যভিচারী ও একজন সচরিত্র মুমিনের মধ্যে তো বৈপরীত্য পরিপূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান; হোক সেটা শারয়ি বিবেচনায় বা মর্যাদাগত বিবেচনায়। এই সম্পর্কের মধ্যে কোনো সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও প্রণয় থাকতে পারে না। আল্লাহ তাআলা যথার্থ বলেছেন—

**الْخَيْثَاتُ لِلْخَيْثِينَ وَالْخَيْثُونَ لِلْخَيْثِاتِ وَالطَّبِيَّاتُ لِلطَّبِيَّينَ وَالطَّبِيُّونَ لِلطَّبِيَّاتِ... ⑤**

দুশ্চরিত্রা নারীরা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষরা দুশ্চরিত্রা নারীদের জন্য (উপযুক্ত)। অনুরূপ সচরিত্রা নারীরা সচরিত্র পুরুষদের জন্য এবং সচরিত্র পুরুষরা সচরিত্রা নারীদের জন্য (উপযুক্ত) [১]

[১] সুরা নূর, আয়াত : ২৬

## মুতআ বিয়ে

একত্রে দুজন মানুষ সারা জীবন কাটানোর নিয়তে কৃত একটি মজবুত চুক্তি ও দৃঢ় প্রতিশুতির নাম বিয়ে। এতে দুজনের মধ্যে সৃষ্টি হয় মানসিক প্রশান্তি, ভালোবাসা ও দয়া—এগুলো কুরআনেই উল্লেখিত হয়েছে। পাশাপাশি বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সন্তান জন্মদান, এতে যুগের পর যুগ মানুষের ক্রমধারা বজায় থাকবে। যেমন পূর্বে কুরআনে বলা হয়েছে—

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًاٰ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْجُوكُمْ بَيْنَ وَحْدَةٍ...﴾ [১]

আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন  
এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্র সৃষ্টি করেছেন [১]

## মুতআ বিয়ে হারাম

কোনো নারীর সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সাময়িক বিবাহ-চুক্তিকে মুতআ বা সাময়িক বিয়ে বলা হয়। এ ধরনের বিয়েতে কুরআনে বর্ণিত বিয়ের কোনো উদ্দেশ্যই অর্জিত হয় না। ইসলামি শরিয়াহ পরিপূর্ণভাবে স্থির হওয়ার পূর্বে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের বিয়ের অনুমোদন দিয়েছিলেন। দ্রমণ ও যুদ্ধের সময় এই সাময়িক বিয়ের অনুমতি ছিল। পরবর্তী সময়ে এতে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে ও চূড়ান্তভাবে হারাম করা হয়েছে।

## মুতআ বিয়েকে সাময়িক বৈধতা দেওয়ার কারণ

আরবের মুসলিমরা জাহিলিয়ুগের আচার-ব্যবহার ও সভ্যতা ছেড়ে ধীরে ধীরে ইসলামি সভ্যতায় অভ্যস্ত হচ্ছিল। এই সময়কে আমরা ‘পরিবর্তন কাল’ বলতে পারি। ইসলামপূর্ব যুগে ব্যভিচার খুবই সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু ইসলাম এসে এগুলোর ওপর ঝুলিয়ে দেয় নিষেধাজ্ঞার তালা। সমস্যা দেখা দিত, যখন সাহাবিরা তাদের স্ত্রীদের ছেড়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধে ও সফরে বের হতো তখন। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মজবুত ঈমানের অধিকারী, আবার কেউ কেউ ছিলেন তুলনামূলক দুর্বল ঈমানের অধিকারী। যুদ্ধে ও

সফরে বের হলে শঙ্কা তৈরি হলো, দুর্বলেরা হয়তো ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে, আর এটা তো ভয়ানক জঘন্য কাজ! অন্যদিকে মজবুত ইমানদারগণ নপংসক হওয়ার অনুমতি চাইলেন। যেমন : ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

كُنَّا نَفْرُوْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا: أَلَا تَخْتَصِيْ ? فَنَهَا نَعَنْ  
ذَلِكَ ، فَرَحْصَنَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ تَنْزَوَّجَ الْمَرْأَةُ بِالثُّوْبِ

আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধে বের হতাম, কিন্তু আমাদের সঙ্গে স্ত্রীগণ থাকত না। তখন আমরা বলতাম, আমরা কি খাসী (নপংসুক) হয়ে যাব না? তিনি আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করলেন। এ ঘটনার পর তিনি আমাদেরকে কাপড়ের বিনিময়ে নারীকে নির্দিষ্ট মেয়াদে বিয়ে করার (অর্থাৎ মুতআ বিয়ের) অনুমতি দিলেন।<sup>[১]</sup>

এই বিবেচনায় সাময়িক বিয়ের অনুমোদন ছিল দুর্বল মুমিন ও শক্তিশালী মুমিন উভয়ের সমস্যার সমাধান কল্পে এবং ব্যভিচারের পথ রোধ করে দাম্পত্যজীবন-বিষয়ক পরিপূর্ণ বিধিনিষেধ আরোপের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

জাহিলি যুগে চারদিকে ছিল মদের ছড়াছড়ি এবং সুদের প্রবল প্রভাব ও দাপট। তাই মদ বা সুদ কোনোটাই একবারে নিষিদ্ধ হয়নি। ধীরে ধীরে এগুলোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যভিচার নিষিদ্ধের ব্যাপারেও ক্রমান্বয়ে এগিয়েছেন। বিশেষ প্রয়োজনের মুহূর্তে মুতআ বিয়ের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু পরে এসে এ ধরনের বিয়েতে তিনি চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এ বিষয়ে আলি রায়িয়াল্লাহু আনহু-সহ বহু সাহাবির হাদিস রয়েছে।

এমন একটি হাদিস ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ সাবরাহ আল-জুহানি রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি মৰ্কা বিজয়ের সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিঃপূর্বে তাদেরকে মুতআ বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি এটাকে চিরতরে রহিত করার ঘোষণা দিয়ে বলেছেন—

[১] সহিল বুখারি : ৪৬১৫; সহিহ মুসলিম : ১৪০৪

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِهْنَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيُخْلِلْ سَيِّلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاكُمْ هُنَّ شَيْئًا

হে লোক সকল, আমি তোমাদেরকে নারীদের সাথে মুতআ বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন। অতএব যার নিকট এ ধরনের বিয়ে সূত্রে কোনো নারী আছে, সে যেন তার পথ ছেড়ে দেয়। আর তোমরা তাদেরকে (বিনিময় হিসেবে) যা কিছু দিয়েছ তা কেড়ে নিয়ো না।[১]

প্রশ্ন হলো, এই নিয়েধাজ্ঞা কি মা-মেয়েকে বিয়ের করার মতো অকাট্য ও চিরস্থায়ী হারাম, নাকি মৃত জঙ্গু রস্ত ও শূকরের মাংসের মতো হারাম, যা বিশেষ প্রয়োজন ও গুনাহে লিপ্ত হওয়ার শর্করা থাকলে বৈধ হবে?

অধিকাংশ সাহাবির মতে এই বিয়ে অকাট্য ও চিরস্থায়ীভাবে হারাম। শরিয়ত চূড়ান্ত হওয়ার পরে এই ধরনের বিয়ের আর কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু এ মাসআলায় ইবনু আবুস রায়িয়াল্লাহু আনহু অন্যদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তার মতে, এটি প্রয়োজনের মুহূর্তে জায়িয। মুতআ সম্পর্কে এক লোক প্রশ্ন করলে তিনি তাকে বৈধতার কথা বলেন। তখন তার আয়াদকৃত গোলাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ অনুমতি কি কেবল নিতান্ত প্রয়োজনের সময়, যখন নারী সুল্লতা থাকে? ইবনু আবুস রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, হ্যাঁ।[২]

পরবর্তী সময়ে ইবনু আবুস রায়িয়াল্লাহু আনহু যখন দেখতে পেলেন যে, তার এ অনুমতির কারণে মানুষ বাড়াবাড়ি করছে, প্রয়োজনের মধ্যে সীমিত থাকছে না, তখন তিনি এই ফতোয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকেন এবং তার পূর্বের মত প্রত্যাহার করে নেন।[৩]

### একাধিক স্ত্রী প্রহণ

ইসলাম একটি সুভাবজাত ও বাস্তবমুখী ধর্ম। এখানে কোনো বাড়াবাড়ি নেই,

[১] সহিহ মুসলিম : ১৪০৬; সহিল্ল ইবনি হিবান : ৪১৪৭

[২] সহিল্ল বুখারি : ৫১১৬; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৪১৬২

[৩] যাদুল মাআদ, ইবনুল কাইয়িম, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১০২

ছাড়াছাড়িও নেই। এই বিষয়টি একাধিক বিয়ের অনুমোদনের ক্ষেত্রে আরো ব্যাপকভাবে ফুটে উঠেছে। কারণ, ইসলাম ব্যক্তিগত, সামাজিক ও বিভিন্ন মানবিক দিক বিবেচনায় নিয়ে একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে।

ইসলামের আগে বিভিন্ন ধর্মে ও জাতিরাষ্ট্রে সীমাহীন বিয়ের অনুমোদন ছিল। কোথাও ১০টি, কোথাও ১০০টিরও বেশি বিয়ের বৈধতা ছিল। এ ব্যাপারে কোনো সীমা ও শর্ত ছিল না। কিন্তু ইসলাম এসে একাধিক বিয়ের ক্ষেত্রে একটা সীমা ও বেশ কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছে।

বিয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা হলো ৪ জন, এর বেশি বিয়ের অনুমতি নেই। ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَسْلَمَ عَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسَوَةٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَذْرٌ مِنْهُنَّ أَزْبَعًا

গাহলান ইবনু সালামা রায়িয়াল্লাহু আনহু যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর দশজন স্ত্রী ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি তাদের মধ্য হতে চারজনকে গ্রহণ করো।<sup>[১]</sup>

অনুরূপভাবে যার অধীনে ৮ জন স্ত্রী ছিল, তাকে ৪ জনের বেশি রাখতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। কাহিস ইবনু হারিস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسَوَةٍ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَزْبَعًا

আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম, সেসময় আমার ৮ জন স্ত্রী ছিল। বিষয়টি আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালে তিনি বললেন, তাদের মধ্য হতে চারজনকে বেছে নাও।<sup>[২]</sup>

[১] সুনান ইবনি মাজাহ : ১৯৫৩; মুসনানু আহমাদ : ৪৬০৯; হাদিসটি সহিহ।

[২] সুনান আবি দাউদ : ২২৪১; সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৫২; হাদিসটি সহিহ।

তবে একসাথে ৯ জন স্ত্রী রাখার ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন। দাওয়াতি বিভিন্ন কার্যক্রম এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর উম্মাহর নানা প্রয়োজনকে বিবেচনায় নিয়েই মূলত এই বিয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

### একাধিক বিয়েতে সমতা বাধ্যতামূলক

একের অধিক নারীর সঙ্গে বিয়ের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য শর্ত হলো সমতা। নিজের ওপর মুমিনের আস্থা থাকতে হবে যে, তিনি একাধিক স্ত্রীর পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছেদ, খোরপোষ এবং তাদের সঙ্গে রাত্রিযাপনে সমতা বজায় রাখতে পারবেন। এসব অধিকার ন্যায্যতা ও সমতা বজায় রাখার সামর্থ্য না থাকলে একাধিক স্ত্রী রাখা সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...  
⑤

আর যদি আশঙ্কা করো যে, (একাধিক স্ত্রীর মাঝে) সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকেই (বিয়ে করো) [১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِخْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجْرُّ أَحَدَ شَفَّيْنِهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا

যে ব্যক্তির দুজন স্ত্রী আছে, আর সে (ইনসাফ না করে) তাদের একজনকে উপেক্ষা করে অন্যজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ল, কিয়ামতের দিন সে তার দেহের একপাশ অবশ বা ঝুলন্ত অবস্থায় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে উপস্থিত হবে।[২]

এখানে অপরজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ার অর্থ হলো—অন্যজনের অধিকারে বিঘ্নতা ঘটানো। তবে অন্তরের টান ও ভালোবাসা এখানে বিবেচ্য নয়। কারণ, মনের আকর্ষণ ও ঝৌঁক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মানুষের সাধ্যের বাইরের জিনিস। তাই এগুলো

[১] সুয়া নিসা, আয়াত : ৩

[২] মুসলামু আহমাদ : ৭৯৩৬; সুনানু আবি দাউদ : ২১৩৩; হাদিসটি সহিহ।

আল্লাহ তাআলা ক্ষমার চোখে দেখবেন। তিনি বলেন—

وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَغْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْبِلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعْلَقَةِ

---

আর তোমরা যতই কামনা কোরো না কেন তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সমান আচরণ করতে কখনো পারবে না। সুতরাং তোমরা (একজনের প্রতি) সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ে (অপরকে) ঝুলিয়ে রেখো না [১]

---

অন্তরের কোনো নিয়ন্ত্রণ যেহেতু মানুষের হাতে নেই, এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার স্ত্রীদের মধ্যে সময় বণ্টনে বাহ্যিক সমতা বজায় রেখেছেন। অতঃপর যেটা মানুষের সাধ্যের বাইরে অর্থাৎ অন্তরের আকর্ষণ ও ভালোবাসায় সমতা রক্ষা, সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার পাকড়াও থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে এভাবে দোয়া করেছেন—

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْنِيٌّ فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلْمِنِي فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا أَمْلِكُ

আল্ল-হুস্মা হা-যা কস্মী ফীমা- আম্লিকু, ফালা- তালুম্নী ফীমা- তাম্লিকু  
ওয়ালা- আম্লিকু।

অর্থ : হে আল্লাহ, এটা আমার পক্ষ থেকে বণ্টন, যা আমার নিয়ন্ত্রণে আছে। আর যা (অর্থাৎ অন্তরের টান ও ভালোবাসা) আপনার নিয়ন্ত্রণে এবং আমার সাধ্যের বাইরে, সে ব্যাপারে আপনি আমাকে অভিযুক্ত করবেন না [২]

সফরের সময় স্ত্রীদের মনোতৃষ্ণি অর্জন এবং তাদেরকে মর্মবেদনা ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে রাখার জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নামে লটারি করতেন। লটারিতে যার নাম আসতো, তাকে সঙ্গে নিয়ে সফরে বের হতেন।

---

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ১২৯

[২] সুনানু আবি দাউদ : ২১৩৪; জামিউত তিরমিয়ি : ১১৪০; মুসনাহু আহমাদ : ২৫১১১; হাদিসটির সনদ সহিত। তবে হাদিসটি মুরসাল নাকি মুত্তাসিল, সে ব্যাপারে মুহাদিসদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ ব্যাপারে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হলো, এটি মুরসাল হাদিস; যেমনটি ইমাম তিরমিয়ি রাহিমাল্লাহ ইমাম বুখারি রাহিমাল্লাহুর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

## একাধিক বিয়ের বৈধতা বনাম ঘোষিকতা

ইসলাম হলো আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ মনোনীত ধর্ম ও জীবন-বিধান। নবি প্রেরণের ধারাবাহিকতা এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। তাই এখানে একটি চিরঙ্গন ও বিস্তৃত নীতিমালা প্রদান করা হয়েছে, যা সর্বযুগে, সর্বাঙ্গলে এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। শহরের বিধান আছে, গ্রাম্যদের বিধান নেই; শীতপ্রধান অঞ্চলের কথা আছে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের খবর নেই; এক যুগের সমাধান আছে, আরেক যুগের নেই—ইসলাম এমন কোনো ধর্ম নয়। ইসলাম একইসাথে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের প্রয়োজন ও কল্যাণের প্রতি-ই খেয়াল রাখে।

মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরন আছে। কেউ অনেক বেশি সন্তান চান, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বন্ধ্যাত্ত, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে তার স্ত্রীর সন্তান হয় না। এই ব্যক্তির জন্য যদি আরেকটি বিয়ের সুযোগ দেওয়া হয়, যার মাধ্যমে তার সন্তানের শখ পূরণ হবে, প্রথম স্ত্রীও যাবতীয় অধিকার নিয়ে বহাল তবিয়তে থাকবে, তাহলে কেমন হয়?

কারো আবার জৈবিক চাহিদা খুব বেশি। ঘটনাক্রে তার স্ত্রী হিসেবে আগত নারীর যৌন আগ্রহ খুবই কম, শারীরিক অসুস্থতা বেশি, মাসিকের সময় খুবই দীর্ঘ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এদিকে পুরুষটি আবার নারীসঙ্গ থেকে দীর্ঘ সময় দূরে থাকতে পারে না। তাহলে গোপনে অবৈধ নারীসঙ্গ গ্রহণের পরিবর্তে তার জন্য একটি বৈধ বিয়ের সুযোগ দেওয়া কি উত্তম হবে না?

কখনো কখনো, বিশেষ করে যুদ্ধের পরে নারীদের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেড়ে যায়, তখন নারী ও সমাজের কল্যাণার্থেই একাধিক বিয়ে জরুরি হয়ে পড়ে। একজন নারীর জন্য সারা জীবন কুমারি থেকে দাম্পত্যজীবনের সুখ, প্রশান্তি, নারীত্বের পূর্ণতা—মাতৃত্বের নিয়ামত হতে বঞ্চিত হওয়ার চেয়ে কারো সত্তিন হওয়া কি উত্তম নয়?

বিবাহ-উপযুক্ত পুরুষদের সংখ্যার চেয়ে যেখানে অতিরিক্ত সংখ্যক নারী রয়েছে, সেখানে তাদের সামনে তিনটি দরজা খোলা থাকে—

» সারা জীবন কষ্ট, তিস্ততা ও বঞ্চনার মধ্যে কাটিয়ে দেবে।

» তাদেরকে লাগামহীন ছেড়ে দেওয়া হবে; ফলে তারা ফাসেক পুরুষদের লালসা পূরণের বস্তুতে পরিণত হবে।

» একজন বিবাহিত পুরুষকে বিয়ে করবে, যিনি তাদের খোরাপোষ দেবেন এবং তাদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করবেন।

উল্লিখিত তিনটি দরজার মধ্যে শেষোক্ত দরজাটিই নিঃসন্দেহে সেরা বিকল্প ও সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান। আর এটাই ইসলামের শাশ্বত বিধান, যা তার অনুসারীদের জন্য বিধিসম্মত করা হয়েছে। কতইনা চমৎকার এ বিধান! পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

...وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقَنُونَ ﴿١﴾

আর দৃঢ় বিশ্বাসী (ঈমানদার) সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর  
অপেক্ষা আর কে শ্রেষ্ঠ? [১]

এই হলো বহুবিবাহের সারকথা। এজন্য পশ্চিমা স্থিটান সমাজ ইসলামের নিন্দা ও সমালোচনা করতে চায়; অথচ তাদের মতে অসংখ্য গার্লফ্রেন্ড ও প্রেমিকা গ্রহণে কোনো সমস্যা নেই। এখানে নারী কিংবা অবাধ সম্পর্ক থেকে জন্মানো সন্তানের জন্য কোনো আইনি ব্যবস্থা নেই। একটা হলো পশ্চিমা নিয়মে ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও চরিত্র-বিধিসী বহু প্রেমিকা গ্রহণের পদ্ধতি আর অন্যটা হলো ইসলামি বিধানানুসারে সম্মানজনক বহু বিয়ের পথ। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে একটু চিন্তা করে বলুন তো, এ দুটির মধ্যে কোনটি সর্বাধিক উত্তম পথ ও সঠিক সমাধান? নিঃসন্দেহে সম্মানজনক বহুবিবাহের পথই সর্বাধিক উত্তম ও সবচেয়ে সুন্দর সমাধান।

### দাম্পত্য সম্পর্ক

কুরআনুল কারিমে বৈবাহিক সম্পর্কের মানসিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এটাই দাম্পত্যজীবনের মূলভিত্তি। মানুষের জৈবিক চাহিদাগত অস্থিতিশীলতা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ভালোবাসার মাধ্যমে দূর হয়। বৈবাহিক সম্পর্কের হাত ধরে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি পরিবারের মধ্যে ভালোবাসা ও মুহাবাতের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সন্তানের প্রতি বাবা-মার ভালোবাসা, আদর ও স্নেহের বিকাশ এবং পূর্ণতা সাধিত হয়। এদিকে ইঞ্জিত করে আল্লাহ তাআলা বলেন—

[১] সুরা মায়দা, আয়াত : ৫০

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْواجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُؤَدَّةً وَرَخْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ⑪

তার নির্দর্শনসমূহের একটি হলো, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংজ্ঞাদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে বহু নির্দর্শন।[১]

### স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্ক

ইসলামে বিয়ের মানসিক উদ্দেশ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে শারীরিক দিকও উপেক্ষিত হয়নি। এখানে স্বাভাবিক সময়ে জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং রজঃস্বাবের সময় বিরত থাকার জন্যও সর্বোন্তম পন্থা নির্দেশিত হয়েছে।

বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, ইহুদি ও অগ্নিপূজকেরা রজঃস্বাবকালীন স্ত্রীদের থেকে দূরত্ব বজায়ে অনেক বাড়াবাঢ়ি করত। তারা এ সময়ে স্ত্রীদের সঙ্গে এক ঘরে এক বিছানায় থাকত না; এমনকি একসাথে বসে পানাহারও করত না। এর বিপরীতে খ্রিস্টানরা দেখাত অতিরিক্ত শিথিলতা। তারা রজঃস্বাবের সময়েও স্ত্রীদের সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হতো, এ ব্যাপারটিকে তারা কিছুই মনে করত না। আর জাহিলি যুগের আরবরা ছিল ইহুদি ও অগ্নিপূজকদের মতো। তারাও স্ত্রীদের সঙ্গে এক ঘরে এক বিছানায় থাকত না এবং একসাথে বসে পানাহার করত না।

এজন্যই মুমিনগণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রজঃস্বাবকালীন স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা ও ওঠাবসার ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذْىٌ فَاغْتَرِبُوا إِلَيْهَا فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ  
حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُتْوِهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ  
الْمُتَطَهِّرِينَ ⑯

আর তারা আপনাকে রঞ্জঃস্রাব (হায়িয) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বলুন, তা অশুচি। কাজেই তোমরা রঞ্জঃস্রাবকালে স্ত্রীদের (সহবাস) থেকে দূরে থাকো এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত (সহবাসের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। তারপর তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুধ হবে তখন তাদের নিকট (সহবাসের জন্য) ঠিক সেভাবে গমন করো, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিচয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে।<sup>[১]</sup>

কিছু গ্রাম্য লোক স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকা বলতে বুঝেছিল, স্ত্রীর সঙ্গে এক ঘরে বসবাস করা যাবে না। এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। যেমন আনাস রায়িয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا ، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ  
فَسَأَلَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى  
وَبَسَأَلَوْنَكُمْ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذْيٌ فَاغْتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } إِلَى آخر الآية ،  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ » فَبَلَغَ ذَلِكَ  
الْيَهُودَ ، فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدْعُ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَقْنَا فِيهِ

ইহুদিরা তাদের কারো স্ত্রীর হায়িয (ঝাতুস্রাব) হলে তার সাথে একসঙ্গে খাবার খেতে না এবং একঘরে বসবাসও করত না। সাহাবা রায়িয়াল্লাহ আনহুম এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন—‘আর তারা আপনাকে রঞ্জঃস্রাব (হায়িয) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বলুন, তা অশুচি। কাজেই তোমরা রঞ্জঃস্রাবকালে স্ত্রীদের (সহবাস) থেকে দূরে থাকো...।’<sup>[২]</sup> এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা (স্ত্রীদের ঝাতুস্রাবের সময় তাদের সাথে) শুধু সহবাস ছাড়া অন্যান্য সবকিছুই করতে পারবে। এ খবর

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২২

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২২

ইহুদিদের কাছে পৌছলে তারা বলতে লাগল, এ লোকটি সব কাজেই কেবল আমাদের বিরোধিতা করতে চায়।<sup>[১]</sup>

অতএব, সহবাস ছাড়া অন্যভাবে স্ত্রীর কাছ থেকে আনন্দ নিতে কোনো বাধা নেই। মাসিকের সময় স্ত্রীদের ঘর থেকে বের করে দেওয়াটা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি; যেমনটি ইহুদিরা করত, অন্যদিকে সহবাসে লিপ্ত হওয়াটা অতিরিক্ত ছাড়াছাড়ি; যেমনটি শ্রিষ্টানরা করত। ইসলামের শিক্ষা হলো মধ্যমপন্থা অবলম্বন। আর সেটা হলো, রজঃস্রাবকালে স্ত্রীর সাথে সহবাস ছাড়া বাকি সবকিছু স্বাভাবিকভাবে করা।

সম্প্রতি চিকিৎসাবিজ্ঞানের আবিষ্কার থেকে আমরা জেনেছি, রজঃস্রাবের রক্তে একটি বিষাক্ত পদার্থ থাকে, এটি নিঃসৃত না হলে তা শরীরের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। একইভাবে, রজঃস্রাবের সময় সহবাস এড়ানোর হেতুও আবিষ্কৃত হয়েছে। এসময় অভ্যন্তরীণ প্রাণি থেকে রস নিঃসরণের কারণে প্রজনন অঙ্গগুলো সংকুচিত ও স্নায়ু অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। ফলে এ সময় সহবাস করলে এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কখনো কখনো মাসিক বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি যৌন অঙ্গগুলোতেও প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে।<sup>[২]</sup>

### সহবাসে মলদ্বার ব্যবহার নিষিদ্ধ

স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন—

نَسَاوُكُمْ حَرَثٌ لَّكُمْ فَأُثْوِرُ أَنَّى شَيْئُمْ وَقَدِيمُوا لِأَنفِسِكُمْ وَأَنْتُمْ أَنْكُمْ

مُلَاقُوهُ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে (অর্থাৎ স্ত্রীর যোনিপথে সামনের দিক থেকে বা পেছনের দিক থেকে, ডানের দিক থেকে বা বামের দিক থেকে—যেদিক থেকেই) ইচ্ছে গমন করতে পারো। আর তোমরা নিজেদের কল্যাণে কিছু

[১] সহিহ মুসলিম : ৩০২; সুনানু আবি দাউদ : ২৫৮

[২] আল-ইসলাম ওয়াত-তিকুল হাদিস (الإِسْلَامُ وَالطَّبُّ الْحَدِيثُ) বা ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা, আব্দুল আযিয ইসমাইল রাহিমাহ্মাহ।

(উভম আমল) অগ্রে প্রেরণ করো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো, তোমরা অবশ্যই আল্লাহর সম্মুখীন হবে। আর (হে নবি,) আপানি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন।<sup>[১]</sup>

এই আয়াতটি অবতীর্ণের পেছনে একটি প্রেক্ষাপট ও কারণ আছে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাম্মদসে দেহলভি রাহিমাতুল্লাহ রচিত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থে আলোচনাটি সুন্দরভাবে এসেছে। তিনি বলেন, ‘কোনো ঐশী নির্দেশ ছাড়াই অযৌক্তিকভাবে যৌনমিলনের মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু বিধিনিষেধ তৈরি করে রেখেছিল ইহুদিরা। আনসার এবং অন্যরা তাদের সেসব মত অনুসরণ করে বলত, যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর পেছন দিক থেকে যোনিপথে সহবাস করে, তাহলে সেখান থেকে জন্ম নেওয়া শিশুটির চোখ বাঁকা হবে। তাদের এই অহেতুক বক্তব্য প্রত্যাখ্যানের জন্য অবতীর্ণ হয়—‘অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে গমন করতে পারো।’<sup>[২]</sup> অর্থাৎ তোমরা স্ত্রীর পেছনের দিকে থাকো বা সামনের দিকে, সেটা বিবেচ্য নয়, শর্ত হলো সংগম হতে হবে যোনিপথ দিয়ে। এর সঙ্গে ধর্মীয় বা সামাজিক বিধিনিষেধের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এগুলো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রুচির বিষয়। এই ধরনের বক্তব্য ছিল ইহুদিদের অযৌক্তিক চিন্তাভাবনার অংশ, তাই ইসলামের মাধ্যমে এ ধরনের চিন্তা সম্মুলে উৎখাত করাটাই ছিল যৌক্তিক ও যথাযথ।’<sup>[৩]</sup>

সহবাসের পদ্ধতি বা পল্থা নির্ধারণ দ্বীনের কাজ নয়। দ্বীনের কাজ হলো স্বামী যেন আল্লাহ তাআলার মুখোমুখি হওয়ার কথা মনে রাখে, তাহলে সে নিয়ন্ত্র উপায়ে মলম্বার দিয়ে যৌনানন্দ লাভ থেকে এমনিতেই বিরত থাকবে। কারণ, সেটা স্ত্রীর জন্য কষ্টকর ও নোংরা জায়গা। তদুপরি এটা সমকামিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই দ্বীনের দাবি হলো—এমন কাজে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।

এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا تَأْنُوا النِّسَاءَ فِي أَذْبَارِهِنَّ

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৩

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৩

[৩] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২০৭

তোমরা স্ত্রীদের মলদ্বার দিয়ে সহবাস কোরো না [১]

আরেক স্থানে তিনি বলেন—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَةٌ فِي دُبْرِهَا: هِيَ الْوُطِيْنَةُ الصُّغْرَى

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাস করে, তার এ কুকর্মের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এটা হলো ছোট সমকামিতা [২]

উন্মু সালামা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَةٌ مُجَبِّيَّةٌ، فَسَأَلَتْ أُمُّ سَلَّمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: 'إِنْسَأُوكُمْ حَرَثٌ لَكُمْ فَأُثُوا حَرَثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ' صِمَادًا وَاحِدًا

এক মহিলা তাকে (উন্মু সালামা রায়িয়াল্লাহু আনহাকে) ওই ব্যক্তির ব্যাপারে জিজেস করলেন, যে স্ত্রীর পেছন দিক থেকে তার যোনিতে সহবাস করে। অতঃপর উন্মু সালামা রায়িয়াল্লাহু আনহা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজেস করলে তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন—‘তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে গমন করো।’[৩] তিনি বলেন, (সহবাস) একই রাস্তায় (অর্থাৎ যোনিপথে) হতে হবে [৪]

ইবনু আবুবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

جَاءَ عَمَرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ كُثُّ قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: حَوَّلْتُ رَخْلِي الْلَّيْلَةَ، قَالَ: فَلَمْ يَرُدْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، قَالَ: فَأَوْحَيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةُ: {إِنْسَأُوكُمْ حَرَثٌ لَكُمْ فَأُثُوا حَرَثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ} أَفِيلُ وَأَذِيزُ، وَأَنْقِ الدُّبْرُ وَالْحَيْنَضَةَ

[১] মুসনাদ আহমাদ : ২১৮৫৮; সহিল ইবনি হিবান : ৪১৯৮; হাদিসটি সহিল।

[২] মুসনাদ আহমাদ : ৬৯৬৭; শারহু মাআনিল আসার : ৪৪২৫; হাদিসটি হাসান।

[৩] সুরা বাকারা : ২২৩

[৪] মুসনাদ আহমাদ : ২৬৬৪৩; তাফসিলু আক্তির রাজ্ঞাক : ২৬৫; হাদিসটি হাসান।

উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি ধৰ্মস হয়ে গেছি। তিনি বললেন, কীসে তোমাকে ধৰ্মস করল? উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, রাতে আমি আমার বাহনকে উল্টো করে ব্যবহার করেছি (অর্থাৎ স্ত্রীর পেছনের দিক থেকে তার যোনিপথে সহবাস করেছি)। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথার কোনো জবাব দিলেন না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো—‘তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে গমন করো’<sup>[১]</sup> (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন,) সামনের দিক থেকে সহবাস করো এবং পেছনের দিক থেকে সহবাস করো, তবে স্ত্রীর মলদ্বার ও হায়িয়ের সময় (সহবাস) পরিহার করো<sup>[২]</sup>

### স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা

আল্লাহ তাআলা পুণ্যবতী স্ত্রীদের প্রশংসা করে বলেন—

..... ﴿٢١﴾ ...فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْنِبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...

সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা (মহান রবের ও নিজেদের স্বামীদের) অনুগতা এবং আল্লাহর হিফায়তে (অর্থাৎ তাওফিকে) লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা (স্বামীদের ধন-সম্পদ ও নিজেদের ইজ্জত-আত্ম) রক্ষাকারী<sup>[৩]</sup>

হিফায়তযোগ্য বিষয়গুলোর অন্যতম হলো, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার গোপন বিষয়াদি কারো কাছে প্রকাশ না করা। তাই এসব কথা বন্ধুবান্ধবদের আড়া বা মজলিসে বলা যাবে না। আবু সাইদ খুদরি রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৩

[২] জ্ঞানিভূত তি঱মিয়ি : ২৯৮০; মুসনাদু আহমাদ : ২৭০৩; হাদিসতি হাসান।

[৩] সূরা নিসা, আয়াত : ৩৪

إِنَّ مِنْ أَشَرِ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَتَّلِهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ .  
ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিদের অন্যতম হবে সে ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়, অতঃপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা (মানুষের কাছে) ফাঁস করে দেয়।[১]

আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি একবার আমাদের নিয়ে সালাত পড়লেন। সালাত শেষে সালাম ফিরিয়ে আমাদের দিকে মুখ করে বসে বললেন—

«هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِرَّهُ وَاسْتَرَ بِسِرَّهِ اللَّهِ»  
قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: «ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَّا فَعَلْتُ كَذَّا» قَالَ: فَسَكَنُوا ،  
قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ: «هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ؟» فَسَكَنَتْ فَتَاهَ كَعَابْ  
عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَرَاها وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا  
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ ، وَإِنَّهُنْ لَيَتَحَدَّثُنَّ ، فَقَالَ: «هَلْ تَذَرُونَ مَا مَثَلُ  
ذَلِكَ؟» فَقَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانٍ ، لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكْكَةِ فَقَضَى مِنْهَا  
حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظَرُونَ إِلَيْهِ

তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে নিজের স্ত্রীর নিকট গমনের সময় দরজা বন্ধ করে, তার ওপর পর্দা টেনে দেয় এবং আল্লাহ-প্রদত্ত পর্দার আড়ালে চলে যায় (অর্থাৎ সহবাসে লিপ্ত হয়)? সাহাবিরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি ফের জিঙ্গেস করলেন, পরে (সহবাস শেষে) সে একথা বলে বেড়ায় যে, আমার স্ত্রীর সাথে আমি এরূপ এরূপ করেছি? বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে সবাই চুপ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি নারীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন নারী আছে, যে তার সংগমের কথা নারীদেরকে বলে বেড়ায়? নারীরাও চুপ হয়ে গেল। এ সময় উন্নতবক্ষা এক তরুণী তার দুই পায়ে ভর দিয়ে ঘাড় উঁচু করে বসল, যাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম তাকে দেখতে পান এবং তার কথা শুনতে পান। তরুণীটি বলল, হে আল্লাহর রাসুল,

[১] সহিহ মুসলিম : ১৪৩৭; মুসাম্মাফু ইবনি আবি শাইবা : ১৭৮৪৯

পুরুষেরাও এসব কথা পরম্পরে আলোচনা করে এবং নারীরাও পরম্পরে এসব বলাবলি করে। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি জানো, এটার উপরা কী? অতঃপর তিনি বললেন, এটার উপরা হচ্ছে—একজন নারী শয়তান, যে পুরুষ শয়তানের সাথে রাস্তায় মিলিত হয়, অতঃপর পুরুষ শয়তানটি নারী শয়তানের থেকে তার (জৈবিক) চাহিদা মিটিয়ে নেয়, আর লোকজন তাদেরকে (সংগমরত অবস্থায়) দেখতে থাকে।[১]

এই উপরাই এমন অবিবেচনা-প্রসূত কাজের প্রতি মুসলিমদের মনে ঘৃণা তৈরিতে যথেষ্ট। কেননা, বিবেকবান কোনো মুসলিমই পুরুষ শয়তান বা নারী শয়তানের মতো হতে চাইবে না।

### জন্মনিয়ন্ত্রণ

বৈবাহিক সম্পর্কের অন্যতম কিংবা বলা যায় প্রধানতম উদ্দেশ্য মানবজাতির ক্রমধারা রক্ষা করা। আর এ ক্রমধারা কেবল বিবাহ-পরবর্তী সন্তান জন্ম দিয়ে বংশবিস্তারের মাধ্যমেই রক্ষা করা সম্ভব। ছেলে হোক বা মেয়ে, ইসলাম অধিক সন্তান গ্রহণে উৎসাহ দেয়। তবে যৌনিক কারণ ও প্রয়োজনবশত সন্তান গ্রহণে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার অনুমতিও ইসলাম দিয়েছে।[২]

[১] সুনানু আবি দাউদ : ২১৭৪; মুসনাদু আহমাদ : ১০৯৭৭; হাদিসটি হাসান।

[২] নবিযুগে সাময়িক জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য আয়ল পদ্ধতি চালু ছিল। আয়ল বলা হয়, সহবাসকালীন বীর্যপাত্রের সময় ঘনিয়ে আসলে লিঙ্গ বের করে বীর্য যোনির বাইরে ফেলে দেওয়াকে। এর বিধান নিয়ে আলিমদের মাঝে মতান্বেক্ষ রয়েছে। শাফিয়ি মাযহাবের বিশুদ্ধতম মতানুসারে নিঃশর্তভাবে স্বামীর জন্য এর অনুমতি আছে, চাই এতে স্ত্রীর সম্মতি থাকুক কিংবা না থাকুক। তবে আয়ল না করাটাই উত্তম। আর হানাফি, মালিকি ও হাফ্বলি মাযহাবের মত হলো, আয়লের ব্যাপারে স্ত্রীর সম্মতি থাকলে বৈধ, নয়তো তা বৈধ হবে না। অবশ্য ফিতনার যুগে সন্তান অসং হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কোনো স্বামী যদি সন্তান না নেওয়ার উদ্দেশ্যে আয়ল করতে চায় তাহলে হানাফি ফকিরহণ সেক্ষেত্রে স্ত্রীর সম্মতিকে জরুরি মনে করেন না। এমতাবস্থায় স্ত্রী অসম্মত হলেও স্বামীর জন্য আয়ল করার বৈধতা রয়েছে। অনুরূপ স্ত্রী যদি কফিরদের রাষ্ট্রে থাকে কিংবা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা থাকে এসব ওজরের কারণেও একদল আলিম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়াই আয়ল করা অনুমতি দিয়েছেন। [বাদায়িউস সানায়ি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩৪; রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৭৫-১৭৬; তাবরিনুল হাকামিয়িক, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬৬; আল-মুগানি, ইবনু কুদামা, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৯৮; আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া, খণ্ড : ৩০, পৃষ্ঠা : ৮১-৮২]

উল্লেখ্য যে, কোনো প্রকারের কানাহাত (মাকরুহ হওয়া) ছাড়া আয়ল করার পূর্ণাঙ্গ বৈধতা তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন সন্তান নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ওজর বা প্রতিবন্ধকতা থাকবে। অন্যথায় বিনা ওজরে

নবিযুগে আয়ল (বীর্যপাতের সময় ঘনিয়ে আসলে লিঙ্গ বাইরে এনে বীর্য যোনির বাইরে ফেলে দেওয়া) ছিল জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচলিত রীতি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্ধায় এবং ওহি আগমনের সময় এই রীতি সাহাবিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সহিলুল বুখারি ও সহিহ মুসলিমে জাবির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

كُنَّا نَغْرِيْلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

| আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আয়ল করতাম, যখন  
কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল।[১]

সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় জাবির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে,  
তিনি বলেন—

আয়ল করা হানাফি মাযহাব অনুসারে মাকরুহ বা অনুমতি। কেননা, আয়ল-সংক্রান্ত হাদিস দুই ধরনের পাওয়া যায়। কিছু হাদিসে আয়ল করাকে অনুসাহিত করে নিষেধ করা হয়েছে এবং কিছু হাদিসে এর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বাহ্যিকভাবে বিপরীতমুর্দ্দী এ হাদিসগুলোর মাঝে এভাবে সমবয় করা হয় যে, যেসব হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে নিষেধাজ্ঞা দ্বারা হারাম উদ্দেশ্য নয়; বরং মাকরুহ বা অনুমতি বোঝানো হয়েছে। আর যেসব হাদিসে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে অনুমতি বলতে বোঝানো হয়েছে, একেবারে শর্তহীন ব্যাপক বৈধতা নয়; বরং এটা হারাম নয় সেটা বোঝানো হয়েছে। সুতরাং সারকথা হলো, বিনা ওজরে আয়ল করা যদিও হারাম নয়, তবে তা মাকরুহে তানফিহি বা অনুমতি। আর বিশেষ কোনো ওজর বা প্রতিবন্ধকতা থাকলে সেক্ষেত্রে তা মাকরুহও হবে না। আর যদি কোনো অসৎ ও শরিয়াবিরোধী উদ্দেশ্যে আয়ল করা হয় তাহলে তা নাজারিয় ও হারাম হবে। যেমন মেয়েসন্তান হলে সমাজে লজ্জা পাবে কিংবা বেশি সন্তান হলে তাদের কী খাওয়াবে, এ ধরনের চিন্তাবানা থেকে আয়ল করাটা সম্পূর্ণরূপে নাজারিয়। লক্ষণীয় যে, এখানে আয়ল বলতে শুধু আরবে প্রচলিত আয়লই উদ্দেশ্য নয়; বরং বর্তমান সময়ে প্রচলিত কনডম, পিল, ইনজেকশন-সহ সাময়িক জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পদ্ধতিও এতে অন্তর্ভুক্ত। সবগুলোর একই বিধান। অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজন হলে জায়িয়, বিনা প্রয়োজনে মাকরুহ বা অনুমতি, আর শরিয়াবিরোধী বা অসৎ উদ্দেশ্যে হলে নাজারিয়। তবে অধুনা সময়ে জন্মনিয়ন্ত্রণকে যেভাবে জাতীয়ভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তা শরিয়তের চাহিদা ও নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক। ব্যক্তিগত ওজরের কারণে কাউকে অনুমতি দেওয়া আর ব্যাপকভাবে আয়োজন করে সেটাকে উৎসাহিত করার মধ্যে অনেক ফারাক রয়েছে। বিশেষত বর্তমান সময়ের জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যগুলো পুরোই শরিয়াপরিপন্থি। এখানে অধিক সন্তান হলে আর্থিক সমস্যা এবং রিয়িকের সংকটকে হাইলাইট করা হয়, যা পুরোপুরিভাবে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই জাতীয়ভাবে ঢাকচোল পিটিয়ে এটাকে প্রচার করা ও ব্যাপকভাবে সবাইকে জন্মনিয়ন্ত্রণে উৎসাহিত করা কিছুতেই বৈধ হতে পারে না। এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। [মাতৃত্ব মুলহিয়, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৬০১; জাওয়াহিলুল ফিকহ, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৮২-৮৯]

[১] সহিলুল বুখারি : ৫২০৯, সহিহ মুসলিম : ১৪৪০

كُنَّا نَعْزِلُ عَنِّي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَنْهَا

আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে আয়ল করতাম। এই সংবাদ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌছলে তিনি আমাদের এ থেকে বারণ করেননি [১]

আবু সাইদ খুদরি রায়িয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارِيًّا وَأَنَا أَغْزِلُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ ، وَأَنَا أُرِيدُ  
مَا يُرِيدُ الْيَهُودُ تَحْدِيثُ أَنَّ الْعَزْلَ مَوْعِدَةُ الصُّغْرَى قَالَ: «كَذَبْتُ يَهُودُ لَوْ  
أَرِادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ

এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমার একটি দাসী আছে, আমি তার সাথে আয়ল করে থাকি। কেননা, আমি তার গর্ভবতী হওয়া পছন্দ করি না। আর (নিজের দাসীর সাথে) অন্যান্য পুরুষ যা (অর্থাৎ সহবাস) করার কামনা রাখে আমিও তা রাখি। কিন্তু ইহুদিরা বলে থাকে, আয়ল নাকি গোপন হত্যা। তার কথা শুনে তিনি বললেন, ইহুদিরা মিথ্যা বলেছে। যদি মহান আল্লাহ (নারীগর্ভে) কোনো প্রাণী সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তাহলে তুমি তা রোধ করতে পারবে না। [২]

শেষের বক্তব্য দ্বারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝিয়েছেন, আয়ল করা সত্ত্বেও স্বামীর অজাঞ্জেই মাঝেমধ্যে দু-এক ফোঁটা বীর্য ভেতরে দিয়ে সন্তান হয়ে যেতে পারে।

উবাইদুল্লাহ ইবনু আদি ইবনি খিয়ার রায়িয়াল্লাহু আনহু [৩] থেকে বর্ণিত হয়েছে,

[১] সহিহ মুসলিম : ১৪৪০; সহিল্ল ইবনি হিবান : ৪১৯৫

[২] সুনানু আবি দাউদ : ২১৭১; মুসনাদু আহমাদ : ১১৪৭৭; হাদিসটি সহিহ।

[৩] উবাইদুল্লাহ ইবনু আদি ইবনি খিয়ার সাহাবি নাকি তাবিয়ি এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইবনু সাদ রাহিমাহুল্লাহ তাকে সাহাবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হাফিয যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু সাদ রাহিমাহুল্লাহ হাড়া অন্য কেউ তাকে সাহাবি হিসেবে উল্লেখ করেননি। ইমাম আবু নুআইম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তার পিতা আদি ইবনু খিয়ার বদরের যুদ্ধে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে। আবু নুআইম রাহিমাহুল্লাহর

তিনি বলেন—

تَذَكَّرُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْغَزْلُ ، فَأَخْتَلَفُوا فِيهِ ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدِ اخْتَلَقْتُمْ وَأَنْتُمْ أَهْلُ بَذْرِ الْجِيَازِ ، فَكَيْفَ يَا أَيُّهُ الْمُرْسَلُونَ إِذَا تَنَاجَى رَجُلَانِ ، قَالَ عُمَرُ: مَا هَذِهِ الْمُنْتَاجَةُ؟ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ تَزَعَّمُ بِالنَّاسِ بِغَدْكُمْ؟ إِذَا تَنَاجَى رَجُلَانِ ، قَالَ عُمَرُ: مَا هَذِهِ الْمُنْتَاجَةُ؟ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ تَزَعَّمُ أَنَّهَا الْمُؤْمَوْدَةُ الصُّغْرَى ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّهَا لَا تَكُونُ مُؤْمَوْدَةً حَتَّى تَمُرُّ بِالنَّارَاتِ  
 السَّبْعِ {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ} ⑯ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ⑯  
 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْعَفَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْعَفَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَهُمَا  
 ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ⑯ فَعَجِبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ  
 قَوْلِهِ وَقَالَ: جَزَّاكَ اللَّهُ خَيْرًا

একবার সাহাবা রায়িয়াল্লাহু আনহুম উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুর নিকট আয়লের বিধান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পরস্পরে মতান্তিম্য করলেন। তখন উমার

এ উক্তি উল্লেখ করে হাফিয় যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ ভিত্তিতে বলা যায় যে, উবাইদুল্লাহ ইবনু আদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে থাকবেন। (অর্থাৎ এ মতান্তিম্যের প্রমাণ হয় যে, তিনি সাহাবি হবেন। কেননা, বদর যুদ্ধে তার পিতা মারা গেলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের সময় তার বয়স সর্বনিম্ন নয় বছর হওয়ার কথা। সুতরাং সুভাবিকভাবেই তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার দেখাটি প্রমাণিত হয়।) তবে হাফিয় ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তার পিতা আদি ইবনু খিয়ার বদরের যুদ্ধে কাফির অবস্থায় নিহত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত নয়; যদিও ইবনু মাকুলা রাহিমাহুল্লাহ, ইবনু সাদ রাহিমাহুল্লাহ-সহ অনেকেই এটা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য হাফিয় ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ এটা সীকার করেছেন যে, উবাইদুল্লাহ ইবনু আদি ইবনি খিয়ার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেছেন। হাফিয় যাহাবি রাহিমাহুল্লাহও এটা সীকার করেছেন। মোটকথা, উবাইদুল্লাহ ইবনু আদি ইবনি খিয়ার সাহাবি হওয়ার বিষয়টি মতান্তিম্যপূর্ণ। কিছু আলিমের মতে তিনি সাহাবি হলেও বেশিরভাগ আলিমের মতে তিনি সাহাবি নন; বরং তিনি হলেন একজন নির্ভরযোগ্য তাবিয়ি। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। [দেখুন, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫১৪-৫১৫; ফাতহুল বারি, ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৫৬]

উল্লেখ্য যে, আমরা এখানে উবাইদুল্লাহ ইবনু আদি ইবনি খিয়ার নামটি লেখার পরে ‘রায়িয়াল্লাহু আনহু’ লিখেছি সতর্কতাসূর্প। কেননা, এ বাক্যটি সাধারণত সাহাবিদের ক্ষেত্রে লেখার নিয়ম থাকলেও অন্যান্য বড় আলিম ও বুজুর্গদের ক্ষেত্রেও লেখা যায়। যেমন ইমামে আজমের নাম উল্লেখের সময় বিভিন্ন কিতাবে লেখা হয়েছে—‘ইমাম আবু হানিফা রায়িয়াল্লাহু আনহু’। সুতরাং উবাইদুল্লাহ ইবনু আদি ইবনি খিয়ার সাহাবি হোন বা তাবিয়ি, উভয় ক্ষেত্রেই তার জন্য ‘রায়িয়াল্লাহু আনহু’ বাক্যটির ব্যবহার যথোপযুক্ত। পক্ষান্তরে ‘রাহিমাহুল্লাহ’ বাক্যটি সাধারণত সাহাবি ছাড়া অন্যান্য বড় আলিম বা বুজুর্গ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাহাবিদের শানে এ বাক্যটির ব্যবহার তেমন একটা দেখা যায় না। তাই সার্বিক বিবেচনায় এখানে ‘রায়িয়াল্লাহু আনহু’ বাক্যটির ব্যবহারই অধিক উপযুক্ত বলে মনে হয়েছে।

রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনারা বদরি ও শ্রেষ্ঠতর সাহাবা হওয়া সত্ত্বেও যদি মতভেদ করেন, তাহলে আপনাদের পর অন্যান্য লোকের কী অবস্থা হবে? হঠাতে দেখা গেল, দুজন লোক চুপিসারে কী যেন বলছে! তখন উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, চুপিসারে কী বলা হচ্ছে? উত্তরে একজন বলল, ইহুদিরা দাবি করে যে, এটা (অর্থাৎ আয়ল) হলো ছোট হত্যা। তখন আলি রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, এটি (ছোট বা বড় কোনো প্রকারের) হত্যা বলে গণ্য হবে না; যতক্ষণ না তা সাতটি স্তর অতিক্রম করে। (যে সাতটি স্তরের কথা কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন—) ‘আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান থেকে। তারপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করেছি এক নিরাপদ আধারে (অর্থাৎ মায়ের জরাযুতে)। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করেছি রস্তপিণ্ডে। অতঃপর রস্তপিণ্ডকে পরিণত করেছি গোশতপিণ্ডে। অতঃপর গোশতপিণ্ডকে পরিণত করেছি অস্থিপঞ্চরে। অতঃপর অস্থিপঞ্চরকে ঢেকে দিয়েছি গোশত দ্বারা। অবশেষে ওকে গড়ে তুলেছি অন্য এক সৃষ্টি (অর্থাৎ পরিপূর্ণ মানুষ) রূপে। অতএব নিপুণতম স্বষ্টা আল্লাহ কতইনা কল্যাণময় ও মহান!'<sup>[১]</sup> উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু তার এ বক্তব্য শুনে মুখ্য হয়ে বললেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।<sup>[২]</sup>

### জন্মনিরোধ বৈধ হওয়ার কারণগুলো

[এক] গর্ভধারণ বা গর্ভপাতের ফলে মায়ের স্বাস্থ্য বা জীবন নিয়ে যদি ঝুঁকির শঙ্কা থাকে এবং এ বিষয়টি অভিজ্ঞ চিকিৎসকের বক্তব্য বা পূর্ব-অভিজ্ঞতার দ্বারা জানা যায়, তাহলে সাময়িক জন্মনিয়ন্ত্রণ বৈধ বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تُلْقِوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ...  
[৩]

আর তোমরা নিজেদেরকে ধৰ্মসের দিকে ঠেলে দিয়ো না।<sup>[৩]</sup>

[১] সূরা মুমিনুন, আয়াত : ১২-১৪

[২] শারহু মুশকিলিল আসার : ১৯১৯; শারহু মাআনিল আসার : ৪৩৫০; আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি, খন্দ : ৫, পৃষ্ঠা : ৪২, হাদিস : ৪৫৩৬; বর্ণনাটির সনদ সহিহ।

[৩] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯৫

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

⑥ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا ...

আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা  
তোমাদের প্রতি দয়াশীল [১]

[দুই] যদি পার্থিব সৃষ্টির মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়ার শঙ্কা থাকে; যেমন সন্তান বেশি  
হলে উপার্জন বেশি করতে হবে, ফলে সে অসৎ ও হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে  
পারে এবং ব্যক্তি যদি নিজেকে প্রয়োজনের সামনে দুর্বল মনে করে, সবর করতে না  
পারে, এক্ষেত্রেও সাময়িক জন্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

١٥٠... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْفُسْرَ ...

আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান এবং তিনি তোমাদের জন্য কঠোরতা  
চান না [২]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

١٦٠... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ ...

আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনোরূপ সংকীর্ণতা চাপিয়ে দিতে চান না [৩]

[তিনি] সন্তানদের সৃষ্টি বা তাদের লালনপালনে বিঘ্নতার শঙ্কায় সাময়িক  
জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রহণের সুযোগ রয়েছে। সহিহ মুসলিমে উসামা ইবনু যাইদ রায়িয়াল্লাহু

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ২৯; ‘নিজেদেরকে হত্যা করা’—এর অর্থ আঝহত্যাও হতে পারে, যা মহাপাপ।  
আবার এটার উদ্দেশ্য আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপাচারও হতে পারে, কেননা তাও মানুষের আধিক্যাত ধর্মসের  
কারণ হয়। আবার কোনো নিরপেক্ষ মুসলিমকে হত্যা করাও উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ, সকল মুসলিম  
একটি দেহের মতো। কাজেই কোনো মুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা মানে নিজেকেই হত্যা করা।  
[তাফসিরে আহসানুল বায়ান, ঈষৎ পরিমার্জিত ও সম্পাদিত]

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫

[৩] সুরা মায়দা, আয়াত : ৬

আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنْ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنِّي أَغْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِمَ تَفْعُلُ ذَلِكَ؟» قَالَ الرَّجُلُ: أَشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا، أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ

এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, আমি আমার স্ত্রীর সাথে আয়ল করে থাকি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি এ কাজ কেন করো? লোকটি বলল, আমি তার (দুর্ধপোষ্য) সন্তানদের ক্ষতির আশঙ্কা করি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ কাজ (অর্থাৎ স্তন্যদানকারিগী নারীর গর্ভধারণ) যদি ক্ষতিকর হতো তাহলে তা পারস্য ও রোমবাসীদেরও ক্ষতিসাধন করত।<sup>[১]</sup>

এসব ব্যক্তিগত অনুশীলন সামগ্রিক পর্যায়ে প্রভাব ফেলবে না, এমনটাই হয়তো মনে হয়েছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। কারণ, তৎকালীন দুই প্রাশাস্ত্র রোম ও পারস্যের লোকরাও এ কাজে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু এতে তারা দুর্বল হয়ে পড়েন।

[চার] শারয়িতাবে গ্রহণযোগ্য আরেকটি কারণ হলো—দুর্ধপোষ্য শিশুর স্বাস্থ্যবুঁকির শঙ্কা। নতুন করে নারী গর্ভবতী হলে দুর্ধপোষ্য শিশুর জন্য স্বাস্থ্যবুঁকি তৈরি হয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময়ের সহবাসকে গোপনে শিশুহত্যা বলে অবহিত করেছেন। কারণ, এতে মায়ের বুকের দুধ নষ্ট হয়, বাচ্চার দৈহিক গঠন দুর্বল হয়। যেহেতু এই সময়ের শারীরিক সংসর্গ দুর্ধপোষ্য শিশুর জন্য ক্ষতি ডেকে আনে, তাই একে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোপন হত্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক বিষয়ে ইজতিহাদ (চিন্তাভাবনা) করতেন। কোনো বিষয় উম্মাহর জন্য উপকারী মনে হলে তার নির্দেশ দিতেন, আর ক্ষতিকর মনে হলে বারণ করতেন। এমন একটি ইজতিহাদি বিষয় হলো, যা তিনি

[১] সহিহ মুসলিম : ১৪৪৩; মুসতাখরাজু আবি আওয়ানা : ৪৩৬১

একটি হাদিসে বলেছেন—

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا ، فَإِنْ قَتَلَ الْغَنِيٌّ يُذْرِكُ الْفَارِسَ ، فَيُدْعَثِرُهُ عَنْ فَرِسِهِ

তোমরা (স্তন্যদানকারিগী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাকে পুনরায় গর্ভবতী করে) তোমাদের (দুর্ঘণ্য) সন্তানদেরকে গোপনে হত্যা কোরো না। কেননা গর্ভবস্থায় পান করা দুধের ধৰ্মসাত্ত্বক প্রভাব (দীর্ঘসময় পরে হলেও অনেক সময়) অশ্বারোহীকে ধরে বসে, এমনকি তাকে তার ঘোড়া থেকে ফেলে দেয়।<sup>[১]</sup>

তবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে হারাম করে দেননি। তিনি দেখেছেন, তৎকালীন বিভিন্ন শক্তিশালী জাতিগুলো এ কাজের দ্বারা তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বোঝা গেল, বাচ্চার ক্ষতির সন্তানবনা সব জায়গায় প্রবল নয়। অপর দিকে এত দীর্ঘ সময় সহবাস থেকে বিরত থাকা স্বামীদের জন্যও কষ্টকর। যদি স্তন্যদানকারিগী স্ত্রীদের সঙ্গে ঘোন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়, তাহলে যারা দুধপানের পূর্ণ মেয়াদ দুই বছর পূর্ণ করতে চায়, তাদের কী অবস্থা হবে? এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য আরেকটি হাদিসে বলেছেন—

لَقَدْ هَمِئْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّؤْمِ وَفَارِسَ ، فَإِذَا هُمْ يُغْيِلُونَ أَوْلَادَهُمْ ،  
فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا

আমি স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সাথে সহবাস নিষেধ করার ইচ্ছে করেছিলাম (কেননা, এতে স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে যেতে পারে, আর আমার ধারণামতে এতে তার দুধ তার দুর্ঘণ্য সন্তানের জন্য ক্ষতিকর হবে)। কিন্তু পরে আমি রোম ও পারস্যবাসী লোকদের অবস্থা দেখলাম যে, তারা তাদের সন্তানদেরকে গর্ভবতী অবস্থায় দুধ পান করায়, কিন্তু তা তাদের সন্তানসন্তির কোনোরূপ ক্ষতি করে না।<sup>[২]</sup>

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাতুল্লাহ এই হাদিসটি ও কিছুক্ষণ পূর্বে বর্ণিত ‘তোমরা (স্তন্যদানকারিগী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাকে পুনরায় গর্ভবতী করে) তোমাদের

[১] সহিল ইবনি হিবান : ৫৯৮৪; মুসনাদু আহমাদ : ২৭৫৬২; হাদিসটি হাসান।

[২] সহিল মুসলিম : ১৪৪২; সুনানু আবি দাউদ : ৩৮৮২

(দুর্ধপোষ্য) সন্তানদেরকে গোপনে হত্যা কোরো না' হাদিসটির মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, স্তন্যদানকারিণী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাকে পুনরায় গর্ভবতী করলে তার দুধ নবজাতককে এমন ক্ষতি করে, যা অশ্বারোহীকে তার অশ্ব থেকে ফেলে দেওয়ার মতো। যদিও এতে সন্তান মারা যায় না বা সরাসরি তাকে হত্যাও করা হয় না, তবু যেহেতু এ ধরনের কাজে বাচ্চার স্বাস্থ্যহানি ঘটে, তাই তিনি এটি ছাড়তে বলেছেন, তবে এটাকে হারাম ঘোষণা করেননি। পরবর্তী সময়ে তিনি একবার ভেবেছিলেন যে, দুর্ধপোষ্য শিশুর ক্ষতি এড়াবার জন্য এ ধরনের কাজ (অর্থাৎ স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সাথে সহবাস) সম্পূর্ণরূপে বারণ করে দেবেন। কিন্তু পরে আবার চিন্তা করে যখন দেখলেন, স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সাথে সহবাস নিষেধের ক্ষতি তুলানমূলক বেশি; বিশেষ করে যুবক ও অধিক যৌনশক্তির অধিকারী পুরুষের চাহিদা পূরণের জন্য স্ত্রী-সহবাসের বিকল্প কিছু নেই, তখন সহবাসের সুযোগ রাখাটাই তার কাছে অধিক যৌন্তিক মনে হলো। তাছাড়াও তিনি তৎকালীন দুটি প্রবল শক্তিধর রাষ্ট্রের জনগণকে দেখলেন যে, তারা এমনটা করে, কিন্তু এতে তাদের তেমন কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, ফলে তিনি নিষেধাজ্ঞা আরোপ থেকে বিরত থাকলেন।'<sup>[১]</sup>

আধুনিক সময়ে এসে গর্ভধারণ রোধের বিভিন্ন উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে, যাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য (দুর্ধপোষ্য বাচ্চার ক্ষতিমুক্তি) অর্জিত হয়, আবার পুরুষেরও দীর্ঘ সময় স্ত্রীসঙ্গ থেকে দূরে থাকার প্রয়োজনও পড়ে না।

এ কথার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, যারা সন্তানের দুধপানের সময় পূর্ণ করতে চায়, তাদের জন্য ইসলামের দৃষ্টিতে দুই সন্তানের মধ্যকার বিরতির জন্য আদর্শ সময় হলো ত্রিশ বা তেত্রিশ মাস। (গর্ভধারণের জন্য বরাদ্দ ছয় থেকে নয় মাস, আর দুধ পান করানোর জন্য চবিশ মাস।)

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ-সহ অন্যান্য ইমামদের<sup>[২]</sup> সিদ্ধান্ত হলো, আয়ল স্ত্রীর

[১] মিফতাহ দারিস সাআদা, ইবনুল কাইয়িম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭০-২৭১

[২] ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহও একই মত প্রকাশ করেছেন। আর ইমাম শাফিয় রাহিমাহুল্লাহ থেকে এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়। এক মতানুসারে স্ত্রীর অনুমতি থাকলে তবেই

অনুমতিক্রমে বৈধ। স্বামীর ইচ্ছার পাশাপাশি তার অনুমতি বা সম্মতি এজনই লাগবে যে, সন্তান গ্রহণ এবং যৌনসংগ্রাম উভয়টির ক্ষেত্রে স্বামীর মতো স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে। তাই আয়ল করতে তার অনুমতি লাগবে।<sup>[১]</sup>

উমার রায়ঝাল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

نَهِيٌّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَزِّلَ عَنِ الْحُرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (পুরুষদেরকে তাদের) স্বাধীন স্তৰীর সম্মতি ব্যতীত আয়ল করতে নিষেধ করেছেন।<sup>[২]</sup>

ইসলাম নারীদের এই অধিকার দিয়েছে এমন এক যুগে, যে যুগে নারীর অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। নারীদের প্রতি ইসলামের অধিকার সচেতনতার একটি নির্দর্শন হতে পারে এই বক্তব্যটি।

### গর্ভপাত

প্রয়োজন সাপেক্ষে গর্ভধারণ রোধের জন্য অগ্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামে অনুমোদিত। তবে গর্ভে বাচ্চা চলে আসার পরে তার ওপর অনাচারের কোনো অনুমোদন নেই, এমনকি এই সন্তান নিযিন্দ্র পথায় আসলেও। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন ব্যক্তিগতিশীর গর্ভস্থ সন্তানের জন্ম ও দুর্ঘপানের সময়সীমা পার হওয়ার পরেই তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করেছেন।<sup>[৩]</sup>

গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হওয়ার পরে সেই সন্তান ফেলে দেওয়া সকল ফকিরের মতেই হারাম ও জয়ন্ত গুনাহের কাজ। কোনো মুসলিমের জন্য এ ধরনের

স্বামী আয়ল করতে পারবে, নয়তো পারবে না। তবে তার থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধতম মত হলো, স্ত্রীর অনুমতি আবশ্যিক নয়, তার অনুমতি ছাড়াও স্বামী আয়ল করতে পারবে। [বাদায়িউস সানায়ি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩৪; রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৭৫-১৭৬; আল-মুগানি, ইবনু কুদামা, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৯৮; আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া, খণ্ড : ৩০, পৃষ্ঠা : ৮১-৮২]

[১] আল-মুগানি, ইবনু কুদামা, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৯৮

[২] সুনান ইবনি মাজাহ : ১৯২৮; মুসনাদু আহমাদ : ২১২; হাদিসটির সনদ যইফ।

[৩] সহিহ মুসলিম : ১৬৯৫; সুনানু আবি দাউদ : ৪৪৪২

জন্য কাজ বৈধ নয়। এটি একটি পূর্ণ জীবন্ত মানব সন্তানের প্রতি সুস্পষ্ট অবিচার। এজন্যই কেউ যদি (লাথি, ঘুষি বা অন্য কোনো আঘাতের মাধ্যমে) এই ধরনের সন্তানের গর্ভপাত করায়, আর সন্তান জীবিত অবস্থায় বের হয়ে এসে পরে মারা যায়, তাহলে এটার কারণে তাকে রাস্তপথ দিতে হবে। আর যদি মৃতই ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে তার ওপর আর্থিক জরিমানার শাস্তি আরোপিত হবে, তবে সেটা রাস্তপথের চেয়ে তুলামূলক কম। তবে (গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হওয়ার পরে সেই সন্তান ফেলে দেওয়াকে নাজায়িয ও হারাম বলার পাশাপাশি) ফরিহগণ এটাও বলেছেন, যদি নির্ভরযোগ্য উপায়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হলে মায়ের মৃত্যু নিশ্চিত; অর্থাৎ এখানে দুজনের একজন মারা যাবেই, সেক্ষেত্রে সন্তান রক্ষার জন্য মাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া যাবে না। সন্তানকে বাঁচানোর বিকল্প কোনো পদ্ধতি জানা না থাকলে তাকে ফেলে দিতে হবে। কারণ, মা হলো এই গর্ভস্থ সন্তানের মূল ও জন্মদাতা, তাই তার জীবনের নিশ্চয়তা আগে দিতে হবে। তাছাড়া তার সঙ্গে দুনিয়ার অনেকের অধিকার জড়িয়ে আছে, অন্য কোনো সন্তানসন্ততি থাকলে তাদের অধিকারও আছে। অন্যদিকে গর্ভস্থ সন্তানের জীবন অনেকটা অনিশ্চিত, দুনিয়াতে তার কোনো অধিকার এখনো সাব্যস্ত হয়নি। সুতরাং একটি অনিশ্চিত ও অধিকারবিহীন জীবনের জন্য একটি নিশ্চিত ও বহুজনের অধিকারে জড়িত একটি জীবনকে আমরা কুরবানি করতে পারি না।<sup>[১]</sup>

অনুরূপভাবে যখন নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, গর্ভস্থ ভূগতি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে জন্মাবে, এই জীবন তার নিজের এবং চারপাশের মানুষের জন্য সীমাহীন কষ্ট ও যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তাহলেও শরিয়তের দৃষ্টিতে এই ভূগ ফেলে দেওয়ার অনুমতি রয়েছে। তবে এটি গর্ভধারণের প্রথম চার মাসের মধ্যে করতে হবে (যখন ভূগের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হয় না), এর পরে করার অনুমতি নেই।

ইমাম গায়ালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘গর্ভরোধ ও গর্ভপাতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গর্ভরোধের বিষয়টি ভূগ ও জীবন্ত সন্তান হত্যার মতো জন্য নয়। কারণ, গর্ভপাত হলো অস্তিত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর কোনো প্রাণীর বিনাশ, পক্ষান্তরে গর্ভরোধের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্বই নেই। অস্তিত্বের আবার নানান স্তর রয়েছে। এর প্রথম স্তর হলো, নারীর গর্ভাশয়ে বীর্য সঞ্চারণ এবং ডিস্ট্রান্স সঙ্গে শুক্রাণু মিশ্রিত হয়ে জীবন

[১] আল-ফাতাওয়া, শাইখ শালতুত, পৃষ্ঠা : ২৮৯-২৯০

গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি। একে (বিনা ওজরে) নষ্ট করা হলো অপরাধ ও গুনাহ। আর যদি সেটি থেকে ভূগ হওয়ার পর ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে অপরাধ আরো জঘন্য হবে। ভূগের আকৃতি পূর্ণ হয়ে তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার পর গর্ভ বিনষ্ট করলে জঘন্যতা আরো বাঢ়বে। জঘন্যতার সর্বশেষ স্তর হলো, জীবন্ত গর্ভপাতের পরে তাকে হত্যা করা।<sup>[১]</sup>

### স্বামী-স্ত্রীর পারম্পরিক অধিকার

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিয়ে হলো একজন নারী ও পুরুষের মাঝে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি একটি মজবুত বন্ধন। তারা দুজন ছিল পৃথক, আল্লাহ তাদেরকে একত্র করে জোড়া বানিয়েছেন। সংখ্যার বিবেচনায় তারা প্রত্যেকে যদিও একক, কিন্তু বাস্তবে তারা পরম্পরের সুখ-দুঃখ, সুস্থ-প্রত্যাশার ভাগিদার—একটি জুটি। কুরআনে এই বন্ধনের চিত্রায়ন হয়েছে অত্যন্ত চমৎকারভাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

هُنَّ لِتَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِتَاسٌ لَهُنَّ...

তারা তোমাদের পোশাকসূরূপ এবং তোমরাও তাদের পোশাকসূরূপ [২]

এই প্রকাশভঙ্গি ও বস্ত্র্য থেকে বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যকার বন্ধন-সম্প্রীতি, গোপনীয়তা, সুরক্ষা ও সৌন্দর্যের বিষয়গুলো দারুণভাবে ফুটে উঠেছে।

এজন্য স্বামীর ওপর স্ত্রীর এবং স্ত্রীর ওপর স্বামীর কিছু অধিকার রয়েছে। প্রত্যেকের-ই এগুলো খেয়াল রাখতে হবে, এসব অধিকারের লঙ্ঘন কারো জন্য বৈধ নয়। অধিকারগুলো দুজনের জন্যই প্রযোজ্য। তবে এর মধ্যে কিছু অধিকার একান্তই স্বামীর জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِمْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ...

[১] ইহইয়াউ উলুমিদিন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫১

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৭

আর নারীদের তেমনই ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের। আর নারীদের ওপর পুরুষদের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা [১]

এই বিশেষ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বলতে উদ্দেশ্য পরিবারের কর্তৃত্ব ও দায়িত্বশীলতা, যা কেবল পুরুষদেরই জন্য নির্ধারিত।

হাকিম ইবনু মুআবিয়া আল-কুশাইরি রাহিমাহুল্লাহ তার পিতা মুআবিয়া আল-কুশাইরি রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—

فَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ ، قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِنَتْ، وَتَكْسُوْهَا إِذَا أَكْسَيْتَهُ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تَقْعِخْ، وَلَا تَهْجُزْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

একবার আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের কারো ওপর তার স্ত্রীর কী অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন, তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করবে। তুমি পোশাক পরিধান করলে তাকেও পোশাক পরিধান করবে। তার চেহারায় আঘাত করবে না, তাকে গালমন্দ করবে না এবং ঘর ছাড়া তাকে (কোথাও একাকী) ছেড়ে রাখবে না।[২]

তাই স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে অবহেলা করা কোনো অবস্থাতেই একজন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। হাদিসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রায়িয়াল্লাহু আনহুমা সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

كُفَىٰ بِالْمُرْءِ إِثْمًا أَنْ يَخْسِنَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّةً

কোনো ব্যক্তি পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যার খাদ্য যোগান দেওয়া তার দায়িত্ব, তার খাদ্য সরবরাহ থেকে বিরত থাকা।[৩]

স্ত্রীর চেহারায় আঘাতের কোনো সুযোগ নেই, কেননা এতে একজন মানুষের

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৮

[২] সুনানু আবি দাউদ : ২১৪২; মুসনাদু আহমাদ : ২০০২২; হাদিসটি হাসান।

[৩] সহিহ মুসলিম : ৯৯৬; সুনানু আবি দাউদ : ১৬৯২

সম্মানহানী ঘটে। তাছাড়া মানুষের শারীরিক সৌন্দর্যের কেন্দ্রভূমি হলো তার চেহারা, এখানে আঘাত করলে তার অবমাননা হয়। স্ত্রী অবাধ্য হলে ইসলাম যদিও তাকে সংশোধনের জন্য (সীমিত পরিসরে) প্রহারের অনুমতি দিয়েছে, তবে শরীরে দশ পড়ে এমন প্রহার বা চেহারায় আঘাত করা বা শরীরের স্পর্শকাতর কোনো স্থানে মারার কোনো অনুমতি নেই। অনুরূপভাবে স্ত্রীকে গালমন্দ করা, তাকে অপছন্দনীয় কথা শোনানো, যেমন : তুমি ধৰ্স হও ইত্যাদি বলা কোনো মুসলিমের জন্য শোভনীয় নয়।

স্ত্রীর ওপর স্বামীর আরেকটি অধিকার হলো, স্ত্রী স্বামীর শয্যা ত্যাগ করতে পারবে না। আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِذَا بَأْتَ الْمَرْأَةَ مُهَاجِرَةً فِي أَنْشَأَ زَوْجَهَا، لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

| কোনো স্ত্রী যখন (রাগ করে) তার স্বামীর শয্যা ছেড়ে অন্যত্র রাত্রিযাপন করে তখন ফেরেশতাগণ তার ওপর লানত (অভিশাপ) বর্ষণ করতে থাকে; যতক্ষণ না সে (তার স্বামীর শয্যায়) ফিরে আসে।[১]

অনুরূপ আরকেটি অধিকার হলো, স্বামীর ঘরে তার অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে প্রবেশ করতে না দেওয়া। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে পুরুষদের লক্ষ্য করে বলেছেন—

وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئُنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ

| তাদের (স্ত্রীদের) ওপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোনো লোককে আশ্রয় না দেয়, যাকে তোমরা অপছন্দ করো।[২]

মুসলাদু আহমাদ-সহ অন্যান্য হাদিসগুলোতে আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১] সহিল বুখারি : ৫১৯৪; সহিহ মুসলিম : ১৪৩৬

[২] সহিহ মুসলিম : ১২১৮; সুনান আবি দাউদ : ১৯০৫

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

| কোনো নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রামাদানের সিয়াম পালন করে, সীয় লজ্জাস্থানের হিফায়ত করে, স্বামীর অনুগত থাকে, তখন সে (কিয়ামতের দিন) জান্মাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।[১]

### দম্পতির পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা

স্ত্রীর দেওয়া (ছোটখাটো) কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা একজন মুসলিম স্বামীর কর্তব্য। স্বাভাবিকভাবে মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেরই কিছু দুর্বলতা থাকে। নারী হিসেবে এই দুর্বলতা স্ত্রীদের মধ্যে তুলনামূলক বেশি। তাদের থেকে কোনো ভুল, বিচ্যুতি বা অপছন্দের কাজ সংঘটিত হলে সেগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। তাদের দোষ চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভালো ও সুন্দর দিকগুলো স্মরণ করতে হবে। নবিজি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا يَقْرَأُكُمْ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا حُلْقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

| কোনো মুমিন পুরুষ (স্বামী) কোনো মুমিন নারীর (স্ত্রী) প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না। (কেননা) সে যদি তার কোনো একটি আচরণ অপছন্দ করে তাহলে (হয়তো) তার অন্য কোনো আচরণ পছন্দ করবে।[২]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَعَاهِشُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ إِنَّ كَرِهُهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا  
كثِيرًا ⑯

আর তোমরা তাদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের) সাথে সঙ্গাবে জীবনযাপন করো। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে এমন হতে পারে যে, তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করছ, অথচ আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন।[৩]

[১] সহিল ইবনি হিকান : ৪১৬৩; মুসলাদু আহমাদ : ১৬৬১; হাদিসতি হাসান।

[২] সহিল মুসলিম : ১৪৬৯; মুসলাদু আহমাদ : ৮৩৬৩

[৩]সুরা নিসা, আয়াত : ১৯

একদিকে স্ত্রীদের আচরণে স্বামীদেরকে ধৈর্য ও সহনশীলতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আর অন্যদিকে স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের যাবতীয় নারীসুলভ কৌশল ও মোহনীয়তা দিয়ে স্বামীদের সন্তুষ্টি অনুসন্ধানের প্রয়াস চালাতে। স্বামীকে অসন্তুষ্ট রেখে সে যেন কখনো রাত্যাপন না করে, সে ব্যাপারে তাকে কঠিনভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

ইবনু আবাস রায়িল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

نَلَّاَتْ لَا تُرْقِعُ صَلَاثَتْهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أَمْ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَامْرَأَةٌ بَائِتْ  
وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاطِطٌ ، وَأَخْوَانٍ مُّتَصَارِّمَانِ

তিনি ব্যক্তির সালাত তাদের মাথার এক বিঘত ওপরেও ওঠে না। যে ব্যক্তি লোকদের অপছন্দ সত্ত্বেও তাদের ইমামতি করে, যে নারী তার স্বামীর অসন্তুষ্টি নিয়ে রাত্যাপন করে এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী দু-ভাই [১]

### স্ত্রী অবাধ্য হলে করণীয়

পরিবার গঠনে পুরুষের খাটুনি, বিভিন্ন অবদান, দায়িত্ব পালন, মোহর ও প্রয়োজনীয় খরচাদির ফলে সে হলো ঘরের নিয়ন্ত্রক ও পরিবারের কর্তা। স্ত্রী তার অবাধ্য হলে, তার ওপর কর্তৃত খাটালে ঘরের পরিবেশ নষ্ট হবে এবং পরিবারের শৃঙ্খলা ডেঙ্গে পড়বে।

স্ত্রীর মধ্যে অবাধ্যতা, উন্ধৰ্য্যত্ব ও উগ্রতা দেখা দিলে স্বামীর কর্তব্য, সর্বাত্মকভাবে তাকে বুঝিয়ে-সুবিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করা। যদি উপদেশে কাজ না হয়, তাহলে বিছানা আলাদা করে দেওয়া। হতে পারে কিছুদিন আলাদা থাকলে তার মধ্যে নারীসুলভ অনুভূতি ও ভালোবাসা জেগে উঠবে, ফলে সে স্বামীর কথা মেনে চলতে উদ্ব�ুদ্ধ হবে। যদি এই দুটির কোনোটিই সফল না হয়, তাহলে প্রহারের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। অনেক স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রহারে কাজ হয়। তবে প্রহার বলতে তীব্রভাবে চাবুক বা লাঠি দিয়ে মারা কখনোই উদ্দেশ্য নয়। প্রহারের ধরণ নবিজি সাল্লাল্লাহু

[১] সুনানু ইবনি মাজাহ : ৯৭১; সহিলু ইবনি হিকুম : ১৭৫৭; হাদিসটি হাসান।

আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক হাদিস থেকে পাওয়া যায়। উম্মু সালামা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا حَادِمًا فَأَبْطَأَتْ ، وَفِي يَدِهِ سِوَالٌ قَوَالُ : لَوْلَا الْقِصَاصُ  
لَضَرَبْتُكِ بِهَذَا السِّوَالِ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার এক দাসীকে ডাকলেন। কিন্তু সে সাড়া দিতে বিলম্ব করল। কখন (তাকে উদ্দেশ্য করে) তিনি বললেন, যদি (কিয়ামতের দিন) প্রতিশোধের আশঙ্কা না থাকত তাহলে আমি তোমাকে এই মিসওয়াক দিয়ে আঘাত করতাম! [১]

স্ত্রীকে প্রহার করা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনু যামআ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

لَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً جَلَدَتِ الْعَبْدِ ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

তোমাদের কেউ যেন নিজের স্ত্রীকে দাসের মতো বেত্রাঘাত না করে, অতঃপর দিনশেষে আবার তার সঙ্গেই মিলিত হয়! [২]

যারা স্ত্রীদেরকে প্রহার করে, তাদের সম্পর্কে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারা উন্নত লোক নয়। যেমন ইয়াস ইবনু আব্দুল্লাহ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১] মুসনাদু আবি ইয়ালা : ৬৯২৮; আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি, খণ্ড : ২৩, পৃষ্ঠা : ৩৭৬, হাদিস : ৮৮৯; ইমাম মুনফিরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদিসটি ইমাম আবু ইয়ালা রাহিমাহুল্লাহ কয়েকটি সনদে বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে একটি সনদ জাইয়িদ বা উন্নত। [আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব, মুনফিরি : ৫৪৫৮] যাফিয হাইসামি রাহিমাহুল্লাহও আবু ইয়ালা ও তাবারানির বর্ণিত হাদিসের সনদকে জাইয়িদ বা উন্নত বলেছেন। [মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩৫৩, হাদিস : ১৮৪০৯, ১৮৪১০, ১৮৪১১] যাফিয সুযুতি রাহিমাহুল্লাহও এ হাদিসের সনদগুলোকে জাইয়িদ বা উন্নত বলেছেন। [আল-বুদুরুস সাফিরা, পৃষ্ঠা : ৩৮৬-৩৮৭, হাদিস : ১২১৬] অবশ্য শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে যইফ বা দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। [যইফুত তারগিব ওয়াত তারহিব : ১৩৭৯, ২১০০]

[২] সহিল বুখারি : ৫২০৪; সহিহ মুসলিম : ২৮৫৫

لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ» فَجَاءَ عُمَرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَئْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِإِلَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرَ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ طَافَ بِإِلَيْ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرَ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ

তোমরা আল্লাহর দাসীদেরকে (অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীদেরকে) প্রহার কোরো না। অতঃপর উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন যে, মহিলারা তাদের স্বামীদের অবাধ্য হচ্ছে। তখন তিনি তাদেরকে (মৃদু) প্রহার করার অনুমতি দিলেন। অতঃপর অনেক মহিলা এসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের কাছে স্বামীদের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করল। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মুহাম্মাদের পরিবারে কাছে অনেক মহিলা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছে। সুতরাং যারা স্ত্রীদেরকে প্রহার করে তারা তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক নয়।<sup>[১]</sup>

‘তারা তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক নয়’—হাফিয ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘এই হাদিস থেকে বোঝা গেল, প্রহারের বিষয়টি বৈধ। স্বামীর অনুগত থাকা যেখানে আবশ্যক, সেক্ষেত্রে অবাধ্যতা করতে দেখলে শাসনের জন্য প্রহার করা যাবে। তবে হুমকি-ধর্মকিতে সীমাবদ্ধ থাকাটাই উত্তম। যতক্ষণ ভয় দেখালে কাজ হয়, ততক্ষণ সরাসরি প্রহারে লিপ্ত হবে না, নয়তো দাম্পত্যজীবনের কাঙ্ক্ষিত সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে। তবে কোনো গুনাহের শাস্তি হলে ভিন্ন কথা।’<sup>[২]</sup>

এ বিষয়ে মুসলিমের একটি হাদিসে এসেছে, আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قُطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأًا، وَلَا حَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا نَيَّلَ مِنْهُ شَيْءٌ قُطُّ، فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهِكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

[১] সুনানু আবি দাউদ : ২১৪৬; সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৮৫; হাদিসটি সহিহ।

[২] ফাতহুল বারি, ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩০৪

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুহস্তে কোনো দিন কাউকে আঘাত করেননি, কোনো নারীকেও করেননি এবং কোনো খাদিমকেও করেননি। তবে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করলে ভিন্ন কথা। আর তাকে অসম্মান ও গালি দেওয়া হলে তিনি কখনো তার থেকে প্রতিশোধ নেননি। তবে আল্লাহর বিধিনিষেধ লঙ্ঘন হয় এমন কোনো বিষয় ঘটলে সেক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ নিতেন [১]

উল্লিখিত সব পন্থাই যদি ব্যর্থ হয় এবং শঙ্কা দেখা দেয় যে, তাদের মধ্যে দুরত্ত আরো বৃদ্ধি পাবে, তখন বিষয়টি সমাধানের জন্য ইসলামি সমাজের বিজ্ঞ ও কল্যাণকামী ব্যক্তিদের হাতে অর্পিত হবে। তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য স্বামীর পক্ষ থেকে একজন, আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন সৎ ও বিজ্ঞ লোক নিয়োজিত হবেন। ফাটল বন্ধে ও সমস্যার সমাধানে তাদের নিয়ত ও ইচ্ছা পরিষ্কার হলে আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে বন্ধন সৃষ্টি করে দেবেন।

এগুলো সবই আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ حِقَانًا أَطْغَىْنَّهُمْ فَلَا  
يَنْبَغِيْلَاهُنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْاً كَبِيرًا ⑯ وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِنْ  
أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوقَقِيْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا حَسِيرًا ⑰

আর স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তাদের শয়া বর্জন করো এবং তাদেরকে (মন্দু) প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তবে (বিচ্ছেদের জন্য) তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অব্বেষণ কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, মহান। আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা করো তাহলে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন সালিশ এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করো। তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত [২]

[১] সহিহ মুসলিম : ২৩২৮; আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ি : ৯১১৮

[২] সূরা নিসা, আয়াত : ৩৪, ৩৫

## তালাকের বৈধতা

উপর্যুক্ত, বিছানা পৃথককরণ ও সকল প্রচেষ্ট ব্যর্থ হওয়ার পরে ন্যায়সংগত বিচ্ছেদ ছাড়া যাবতীয় দরজা যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন বাস্তবতা ও প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে স্বামীর জন্য ইসলামি শরিয়ার দেওয়া সর্বশেষ মাধ্যমটি গ্রহণের বৈধতা তৈরি হয়। আর সেই মাধ্যমটি হলো তালাক-বিচ্ছেদ।

ইসলামে অপছন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও একান্ত অপারগতার মুহূর্তে তালাক প্রদানের বৈধতা দিয়েছে। এজন্যই শরিয়ার কোথাও এর প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়নি বা একে উত্তমও বলা হয়নি; বরং ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন—

**أَبْغَضُ الْخَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاقُ**

| আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় হালাল বস্তু হলো তালাক [১]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

**مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ**

| আল্লাহ তাআলা তালাকের চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় কিছু হালাল করেননি [২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য—‘আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় হালাল’ এ থেকে বোঝা যায়, তালাক হলো বিশেষ প্রয়োজনে প্রয়োগের বিষয়। স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে থাকা যখন অসন্তুষ্ট, বিত্তীয় যখন চূড়ান্ত, দার্শনিক বিষয়ে হক আদায় করে সহাবস্থান যখন তাদের পক্ষে অসন্তুষ্ট, তখনই কেবল বিচ্ছেদটাকে প্রয়োগের জন্য বিধিবন্ধ করা হয়েছে। প্রবাদ আছে—**إِنْ لَمْ يَكُنْ وَفَاقَ فَوْرَاقَ** অর্থাৎ মতেক্য যখন অসন্তুষ্ট, বিচ্ছেদই তখন একমাত্র পথ।

[১] সুনানু আবি দাউদ : ২১৭৮; সুনানু ইবনি মাজাহ : ২০১৮; হাদিসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, তবে মুহাদ্দিসগণ হাদিসটিকে মুরসাল হিসেবে অভিহিত করেছেন।

[২] সুনানু আবি দাউদ : ২১৭৭; মুস্তাফাকুল হাকিম : ২৭৯৪; এ হাদিসটির বর্ণনাকারীগণও নির্ভরযোগ্য, তবে মুহাদ্দিসগণ হাদিসটিকে মুরসাল হিসেবে অভিহিত করেছেন।

ଆନ୍ତରିକ ତାତାଳା ସଙ୍ଗେ—

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُعْنِي اللَّهُ كُلُّاً مِّنْ سَعْتِهِ... ١٣٠

ଆର ଯଦି ତାରା (ସ୍ଵାମୀ-ଶ୍ରୀ) ଉଭୟେ ବିଚିନ୍ନ ହେଁ ଯାଏ ତବେ ଆଲ୍ଲାହ ପ୍ରତ୍ୟେକକେ  
ନିଜ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭାବମୁକ୍ତ କରବେନ [୧]

## ইসলামপূর্ব যুগে বিবাহ-বিচ্ছেদ

বিচ্ছেদের বৈধতা প্রদানে ইসলাম একমাত্র ধর্ম নয়; দু-একটি জাতিধর্ম ছাড়া পৃথিবীর সব জায়গাতেই বিচ্ছেদের প্রচলন ছিল। কখনো অন্যায্যভাবে, কখনো ন্যায্যভাবে পুরুষ স্ত্রীর ওপর রেগে গেলে কিংবা বিরক্ত হলে তাকে ঘরছাড়া করত। স্বামীকে বাধা দেওয়া, স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ নেওয়া কিংবা তার কোনো পাওনা চেয়ে নেওয়ার অধিকার নারীর ছিল না।

ଶ୍ରିକଦେର ଖ୍ୟାତି ସଥନ ଚାରଦିକେ ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େଛିଲ, ତାଦେର ସଭ୍ୟତାଯ ଉନ୍ନତିର ଛୋଣ୍ଯା ଲେଗେଛିଲ, ତଥନ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଅବାଧେ ବିଚ୍ଛେଦେର ଚର୍ଚା ଚଲତ-କୋନୋ ଶର୍ତ୍ତ ନେଇ, କୋନୋ ବିଧିନିଷେଧ ନେଇ।

ରୋମାନଦେର କାହେ ବିଚ୍ଛେଦ ଛିଲ ବିଯେର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ । ସ୍ଵାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଅବିଚ୍ଛେଦରେ ଶର୍ତ୍ତେ ବିଯେ ବସଲେ ବିଚାରକଗଣ ସେଇ ବିଯେକେ-ଇ ଅକାର୍ଯ୍ୟକାର ଘୋଷଣା ଦିତେନ । ଅବଶ୍ୟ ରୋମାନଦେର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଜନ୍ମେର କାହେ ଧର୍ମୀୟ ବିଯେତେ ବିଚ୍ଛେଦ ଅବୈଧ ଛିଲ । ଅନ୍ୟଦିକେ ସ୍ତ୍ରୀର ଓପର ସ୍ଵାମୀର କର୍ତ୍ତୃତ ଛିଲ ସୀମାହିନ; ଏମନକି କ୍ଷେତ୍ରବିଶେଷ ସ୍ତ୍ରୀକେ ହତ୍ୟାର ଅନୁମତିଓ ଛିଲ ସ୍ଵାମୀର । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ଧର୍ମୀୟଭାବେଇ ତାରା ବିବାହ-ବିଚ୍ଛେଦ ବିଧିବନ୍ଧ କରେ ।

## ইহুদি ধর্মে বিবাহ-বিচ্ছেদ

ଇହୁଦି ଧର୍ମେ ତାଲାକ ବୈଧ । ତବେ ଏଖାନେ ତାଲାକେର ବିଷୟଟି ଅନେକ ବେଶି ବିସ୍ତୃତ । ଶ୍ରୀ ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାରେ ଲିପ୍ତ ହୁଁ, ତାହଲେ ତାକେ ତାଲାକ ଦିତେ ସ୍ଵାମୀ ବାଧ୍ୟ । ସ୍ଵାମୀ ଯଦି ତାକେ କ୍ଷମାଓ କରେ ଦେଯ ତବୁ ତାଲାକ ଦିତେ ହବେ । ଅନୁରୂପଭାବେ ଦଶ ବଛର ବିଯେ ହେଯେଛେ, କୋଣୋ

[১] সুরা নিসা, আয়ত : ১৩০

সন্তানসন্ততি হয়নি, তাহলেও আইন অনুযায়ী স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য [১]

### খ্রিস্টধর্মে বিবাহ-বিচ্ছেদ

খ্রিস্টধর্ম হলো সেই বিরল সভ্যতা, যেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ অবৈধ ঘোষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে খ্রিস্টধর্মের অবস্থান ইহুদি ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইনজিলে ইসা আলাইহিস সালামের জবানিতে তালাক, তালাকদাতা ও তালাকপ্রাপ্ত নরনারীর বিয়ের অবৈধতা বর্ণিত হয়েছে।

মথির ইনজিলে এসেছে—

॥

বলা হয়েছে, যে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে তাকে তালাকনামা দিক। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ ব্যভিচারের দোষ ছাড়া অন্য কোনো কারণে স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে তাকে ব্যভিচারিণী হওয়ার পথে নামিয়ে দেয়। আর যাকে তালাক দেওয়া হয়েছে, সেই স্ত্রীকে যে বিয়ে করে, সেও ব্যভিচারে লিপ্ত হয় [২]

মার্কের ইনজিলে এসেছে—

॥

যে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করে, সে মূলত তার সঙ্গে ব্যভিচার করে। আর যখন স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করে, সেও মূলত ব্যভিচারে লিপ্ত হয় [৩]

ইনজিলে এই কঠোর নিষেধাজ্ঞার কারণ দর্শানো হয়েছে এভাবে—

॥

আল্লাহ তাআলা (স্বামী-স্ত্রীর মাঝে) যে বন্ধন তৈরি করেছেন, তাকে ছিন্ন করার অধিকার মানুষ রাখে না [৪]

[১] আল-ইসলামু দীনুন আশুন খালিদুন (دینِ عَامِ خَالِدٍ) বা ইসলাম সর্বজনীন ও শাশ্঵ত ধর্ম, শাহিদ ফরিদ অজদি রাহিমাহুল্লাহ, পৃষ্ঠা : ১৭২-১৭৩

[২] ইনজিল মথি, ৫ : ৩১-৩২

[৩] ইনজিল মার্ক, ১০ : ১১-১২

[৪] ইনজিল মার্ক, ১০ : ৯

শেষের কথাটি যদিও বিশুদ্ধ, তবে একে তালাক হারামের হেতু হিসেবে উপস্থাপন হলো অঙ্গুত বিষয়। বন্ধনের বিষয়টি আল্লাহ তাআলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়, কারণ তিনি এর বৈধতা দিয়েছেন, কিন্তু চুক্তি তো সম্পাদিত হয় মূলত মানুষের হাতেই। এখন আল্লাহ তাআলাই যদি প্রয়োজনবশত তালাকের অনুমতি দেন, তাহলে তো তালাকও তার পক্ষ থেকেই হবে; যদিও তালাকদাতা মূলত মানুষই। এর দ্বারা স্ফট হয় যে, সম্পর্ক ও বিচ্ছিন্নতার সিদ্ধান্তদাতা মূলত আল্লাহ তাআলাই। তিনি কোনো কিছু একত্রে রাখতে চাইলে তা বিচ্ছিন্ন হবে না। খ্রিস্টধর্মে ব্যভিচারের কারণে সৃষ্টি বিচ্ছেদ তো আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেন, তাহলে অন্য কোনো (যৌনিক) কারণে কেন তাদের মাঝে তালাক-বিচ্ছেদ বৈধ হবে না?

### তালাকের ব্যাপারে খ্রিস্টানদের মতভেদ

ইনজিলে ব্যভিচারের কারণে বিচ্ছেদকে নিষিদ্ধতার বাইরে রাখা হয়েছে। কিন্তু ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা এই ব্যতিক্রম বিধানের ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়। তারা বলে যে, তালাক সর্বদাই অবৈধ। এই বিধানের কোনো ব্যতিক্রম আছে বা ক্ষেত্রবিশেষ তালাক বৈধ, বিষয়টি এমন নয়। খ্রিস্টধর্মে তালাকের কোনো স্থান নেই। তাহলে— ব্যভিচারের কারণে তালাকের অর্থ—এখানে মূলত বিবাহচুক্তিই বাতিল হয়ে দিয়েছে। যেহেতু বিয়ে রহিত হয়ে দিয়েছে, যদিও বাহ্যিকভাবে দেখতে এটা বিয়ের মতো মনে হয়; কিন্তু এটা মূলত ব্যভিচার। এমন মুহূর্তে স্বামীর জন্য অনুমতি রয়েছে কিংবা বলা যায় তার জন্য অপরিহার্য হলো এই নারীকে ত্যাগ করা।<sup>[১]</sup>

কিন্তু প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানরা ব্যভিচার, স্বামীর সঙ্গে প্রতারণাসহ আরো বেশ কিছু কারণে তালাকের অনুমোদনের প্রবন্ধ। তবে এসব অনুমোদিত কারণগুলোর কোনোটিই ইনজিলে বর্ণিত হয়নি। এরা যে কারণেই তালাকের অনুমতি দিক না কেন, এরা সবাই তালাকদাতা পুরুষ ও তালাকপ্রাপ্তা নারীকে দাম্পত্য-জীবনের অধিকার বণ্টিতের পক্ষে।

স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে ইনজিলের বক্তব্য অনুসারে মিশরের অর্থডক্স চার্চ কাউন্সিল থেকে তালাকের অনুমতি পাওয়া দিয়েছে। এ ছাড়া তিনি বছরের বেশি বন্ধ্যাত্,

[১] (من شرح قسم الأبحاث الدينية بالمعهد القبطي الكاثوليكي لإنجيل متى) বা কপটিক ক্যাথলিক ইনসিটিউটকৃত মথির সুসমাচারের ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা : ২৯

দুরারোগ্য ব্যাধি, মীমাংসার অযোগ্য ঝগড়া ইত্যাদির কারণেও তারা তালাকের বৈধতা দিয়েছে। এগুলো সবই ইনজিলের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত বিধান, যা পরবর্তী সময়ে বিধিবন্ধ করা হয়েছে।

আর এ কারণেই রক্ষণশীল খ্রিস্টানরা উল্লিখিত অতিরিক্ত কারণসমূহের ভিত্তিতে তালাকের বৈধতার বিষয়টি অস্বীকার করে এবং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য আহ্বান জানায়। যেমনিভাবে তারা (ইনজিলের বিধি অনুসারে) সর্বাবস্থায় তালাকদাতা ও তালাকপ্রাপ্তদের বিয়ের অনুমোদন দিতে অসীকৃতি জানায়।

স্বামী দরিদ্র হওয়ায় এক খ্রিস্টান নারী বিচ্ছেদের আবেদন করলে মিসরের খ্রিস্তীয় আদালত তার আবেদনের জবাবে বলেছে, ‘আশ্চর্য বিষয়, চার্চের কিছু ধর্মীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং জাতীয় চার্চ কাউন্সিলের সদস্যগণ যুগের সঙ্গে তাল মিলাতে গিয়ে দুর্বল বিশ্বাসীদের কথা মেনে নিয়ে এমন সব কারণে তালাকের বৈধতা দিয়েছে, ইনজিলে যার কোনো প্রমাণ বর্ণিত হয়নি। অথচ খ্রিস্তীয় ধর্মের বক্তব্য অকাট্য যে, ব্যভিচার ব্যতিরেকে অন্য কোনো কারণে তালাক বৈধ নয়। তালাকদাতা বা তালাকপ্রাপ্ত যেকারো সঙ্গে বিয়ে অবৈধ; বরং এই বিয়েই হলো ব্যভিচার।’<sup>[১]</sup>

### খ্রিস্টধর্মে তালাক বিষয়ক কঠোরতার পরিণতি

তালাক বিষয়ক কঠোরতা মানুষের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক চাহিদার অবমূল্যায়ন ও উপেক্ষার নামান্তর। এর ফলে খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম ও ইনজিলের বিধানকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে দীন থেকে বেরিয়ে গিয়েছে ছাড়া গরুর মতো। আল্লাহর তৈরিকৃত বন্ধন ছিড়ে ফেলা ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো উপায় অবশিষ্ট থাকেনি। তখন পশ্চিমা খ্রিস্টানরা তালাকের এই চিরস্থায়ী জেলখানা থেকে মুক্তির জন্য কিছু রাস্তীয় আইন বানিয়ে নেয়। কিন্তু তাদের অনেকেই বিশেষভাবে আমেরিকানরা তালাককে খেলনার মতো ব্যবহার করে (যেন তারা ইনজিলকে চ্যালেঞ্জ করছে)। তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ কারণে তারা বিচ্ছেদ ঘটাতে শুরু করে। বিয়ের মতো পবিত্র বন্ধনের মধ্যে বিশৃঙ্খলার পরিমাণ দেখে তাদের বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়ে যে, খুব শীত্রই হয়তো সমাজ থেকে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন হারিয়ে যাবে। বিবাহ-বিচ্ছেদ বিষয়ক এক বিচারকের বক্তব্য হলো, অচিরেই এই দেশে

[১] জারিদাতুল আহরাম (جريدۃ الْاہرام) বা পিরামিড পত্রিকা, তারিখ : ১লা মার্চ, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ।

পারিবারিক জীবনব্যবস্থা অস্তিত্বের সংকটে পড়বে। তার জায়গা দখলে নেবে অবাধ যৌনতা ও চরম অনিয়ম। বিয়ে বর্তমানে ব্যাবসায়িক চুক্তির মতো হয়ে গিয়েছে। তুচ্ছ কারণে চুক্তিকারীরা বিয়ে ভেঙে ফেলেছে। এক্ষেত্রে তারা ধর্মের কোনো দিক-নির্দেশনার প্রতিই শ্রদ্ধাশীল নয়। বর্তমান সময়ের নর-নারীদের মধ্যে কোনো ধর্ম বা ভালোবাসার বালাই নেই। তারা কেবল সাময়িক সুখ ও যৌনতার জন্যই সম্পর্ক করছে আর ভাঙছে।

এটাই চরম বাস্তবতা! আধুনিক রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলা প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের চিত্রই এমন—ধর্মীয় শিক্ষা যেখানে চরমভাবে উপেক্ষিত। পশ্চিমা খ্রিস্টান সমাজ ছাড়া অন্য কোনো সমাজেই এমন নজির খুব একটা দেখা যায় না। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, অমিপৃজকসহ পৃথিবীর প্রায় সব জাতিই ব্যক্তিগত জীবনে তাদের ধর্মীয় বিধিবিধান মেনে চলার চেষ্টা করে। তাদের মধ্যে অনেক সমাজে ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় আইন কিছু হয়তো থাকে, যেগুলো তাদের ধর্মের সঙ্গে মেলে না; কিন্তু পশ্চিমাদের মতো ব্যক্তিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োগ এত প্রবলভাবে অন্য কোনো ধর্মের মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।

ব্যক্তিগত সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিচ্ছেদ বিষয়ে, একমাত্র খ্রিস্টানরা এত ব্যাপকভাবে ধর্মীয় বিধান ছেড়ে রাষ্ট্রীয় আইনের আশ্রয় নিয়েছে। কারণ, তারা বুঝতে পেরেছিল যে, এ বিষয়ে তাদের ধর্মে বাস্তবতা, মানবিক চাহিদা ও প্রয়োজন উপেক্ষিত হয়েছে। আর তাই এই বিধান তাদের জীবনের জন্য উপযুক্ত নয়।<sup>[১]</sup>

### সাময়িকের জন্য খ্রিস্টীয় নিষেধাঞ্জা

তালাক বিষয়ে ইনজিলের তথ্য যদি বিশুধ্য হয়, যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এই বিধান বিকৃতির শিকার হয়নি, তবু কেউ যদি বর্তমান ইনজিল নিয়েও চিন্তা করে, পরিষ্কারভাবে তার মনে ধারণা জমাবে যে, সমগ্র মানবজাতির জন্য শাশ্বত কোনো বিধান দেওয়ার ইচ্ছা ঈসা আলাইহিস সালামের কথার মধ্যে ছিল না। ইহুদিদেরকে আল্লাহ তাআলা অনেক সুবিধা দিয়েছিলেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তারা সীমালঙ্ঘন করেছিল। তন্মধ্যে অন্যতম হলো তালাক। এসব অন্যায় রোধ ও তার শাস্তি

[১] হুকুম ইনসান ফিল ইসলাম (حقوق الإنسان في الإسلام) বা ইসলামে মানবাধিকর, ড. আলি আব্দুল গয়াহিদ, পৃষ্ঠা : ১৪৩

দেওয়ার জন্যই ঈসা আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে এসেছিলেন।

মথির সুসমাচার, উনবিংশ অধ্যায়ে এসেছে—

৬

ঈসা আলাইহিস সালাম গালিল প্রদেশ ছেড়ে জর্ডান নদীর অন্য পাড়ে ইহুদি প্রদেশে গেলেন। তখন কয়েকজন ফরিশি ঈসা আলাইহিস সালামকে পরীক্ষার জন্য তার কাছে এসে বলল, কোনো কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া কি কারো জন্য বৈধ? জবাবে তিনি বললেন, আপনারা কি পড়েননি যে, সৃষ্টিকর্তা প্রথমে মানুষকে নর-নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন আর বলেছিলেন, এজন্যই মানুষ বাবা-মাকে ছেড়ে স্ত্রীর সঙ্গে এক হয়ে থাকবে, আর তারা দুজন এক শরীর হবে? এর ফলে তারা (স্বামী-স্ত্রী) আর দুইজন নয়; বরং একদেহ একমন; আল্লাহ যা একসঙ্গে যোগ করেছেন, মানুষ তা আলাদা না করুক। তখন ফরিশিরা তাকে বলল, তাহলে মুসা আলাইহিস সালাম কেন (নারীকে) তালাক-নামা দিয়ে ছেড়ে দিতে বলেছেন? তিনি বললেন, প্রথমে বিষয়টি এমন ছিল না, কিন্তু তোমাদের অন্তরের নির্মতার জন্য তিনি তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আমি তোমাদেরকে বলছি, যে তার স্ত্রীকে ব্যভিচার ব্যতিরেকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে, সে মূলত ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, আর যে তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বিয়ে করে, সেও ব্যভিচার করে। তখন তার শিষ্যরা বললেন, এই যদি হয় নারীর সঙ্গে পুরুষের অবস্থা, তাহলে তো বিয়ে না করাই উত্তম।<sup>[১]</sup>

এই আলোচনা থেকে বোৰা যায়, ঈসা আলাইহিস সালাম তালাকের বৈধতা বিষয়ে ইহুদিদের সীমালঙ্ঘনের শাস্তি দেওয়ার জন্য তাদের ওপর ব্যভিচার ব্যতিরেকে তালাক হারাম করে দিয়েছিলেন। এটা ছিল একটি সাময়িক বিধান, পরবর্তী সময়ে মুহাম্মাদ সাল্লাম্মাত্তু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত সর্বজনীন ও শাশ্঵ত বিধান দ্বারা যার অবসান ঘটবে।

ঈসা আলাইহিস সালাম এমন কঠোর একটি বিধান সমগ্র মানবজাতির জন্য চিরায়তরূপে চাপিয়ে দেবেন, এটা কখনোই যৌক্তিক মনে হয় না। কেননা, তার অনুচর ও সবচেয়ে আন্তরিক শিষ্যরাও এই বিধান শুনে একে অত্যন্ত কঠোর মনে

[১] মথি, অধ্যায় : ১৯, আয়াত ১-১০

করে বলেছিল, ‘এই যদি হয় সুমী-স্ত্রীর অবস্থা, তাহলে তো বিয়ে না করাই উচ্চম।’ তাদের এমন উক্তির কারণ হলো, খ্রিষ্টধর্ম মতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মানে বন্দিদশায় আবদ্ধ হওয়া। স্ত্রীর প্রতি যত ঘৃণা-বিদ্বেষই তৈরি হোক, জীবন যতই সংকীর্ণ হোক না কেন, উভয়ের সৃভাবপ্রকৃতি ও মতামত যত ভিন্নই হোক—এই বন্ধন কখনোই ভাঙবার নয়।

প্রাচীন এক বিজ্ঞন বলেন, ‘ভয়ানক বিপদগুলোর একটি হলো—এমন ব্যক্তির সঙ্গে থাকা, যে তোমার সঙ্গে দ্বিমত করে, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যায় না।’

আরব কবি মুতানাবির বলেন—

স্বাধীন মানুষের জন্য দুনিয়ার অন্যতম কষ্টদায়ক বিষয় হলো  
এমন শত্রুর দর্শন, যার সঙ্গে বন্ধুত্বের কোনো উপায় নেই।

### তালাক হ্রাসে শারমি বিধিনিষেধ

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তালাক সীমাবদ্ধ রাখতে ইসলামি শরিয়ায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে। বিনা প্রয়োজনে তালাক কিংবা তালাকপূর্ব অন্যান্য স্তর অতিক্রমের আগে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত দিলে সেটাও ইসলামে হারাম ও নিষিদ্ধ কার্য বলে বিবেচিত। অনেক ফকিহ বলেছেন, এতে ব্যক্তি নিজে এবং স্ত্রী উভয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিনা কারণে দুজনের কল্যাণের পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। তাই এটি নিজের মালিকানাভুক্ত সম্পদ বিনষ্টের মতো হারাম বলে বিবেচিত হবে। তাহাড়াও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ

| নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং অন্যেরও ক্ষতি করবে না।[১]

নতুনত্বের সুদ পাওয়ার জন্য তালাক প্রদানকারী ও তালাক গ্রহণকারিনীদের কর্মকাণ্ড আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দ করেন না। আবু মুসা আশআরি রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

[১] সুনান ইবনি মাজাহ : ২৩৪১; মুসনাদু আহমাদ : ২৮৬৫; হাদিসটি হাসান।

সাজ্জাম বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ عَزُّ وَجَلٌ لَا يُحِبُ الظُّوَاقِينَ وَلَا الظُّوَاقَاتِ

| নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নতুন স্বাদপ্রত্যাশী পুরুষদেরকে এবং নতুন স্বাদপ্রত্যাশী নারীদেরকে পছন্দ করেন না।[১]

আব্দুল্লাহ ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—

الطلاقُ عَنْ وَطْرٍ

| তালাক হলো প্রয়োজনের তাগিদে (প্রয়োগের বিষয়) [২]

**হায়িয বা নিফাসের সময় তালাক নিষিদ্ধ**

মীমাংসার সকল স্তর ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর তালাক প্রদানের সুযোগ আসার অর্থ এই নয়, যখন ইচ্ছা তখনই তালাক শরিয়ায বৈধ; বরং এর জন্যও উপযুক্ত সময় নির্ধারিত রয়েছে।

ইসলামি শরিয়ার মতে উপযুক্ত সময় হলো, যখন নারী হায়িয (রজঃস্রাব) ও নিফাস (প্রসবোন্তর রক্তক্ষরণ) থেকে পৰিত্র অবস্থায থাকবে। পাশাপাশি সর্বশেষ এ পৰিত্রতা থাকাকালীন তার সাথে সহবাস না হতে হবে। তবে গর্ভবতী নারীর গর্ভধারণের বিষয়টি স্পষ্ট হলে সেক্ষেত্রে (সহবাসের প্রাণ ও তাঙ্কণিক) তালাক দেওয়া যাবে (সন্তানপ্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা করার বাধ্যবাধকতা নেই)।

হায়িয (রজঃস্রাব) ও নিফাস (প্রসবোন্তর রক্তক্ষরণ) চলাকালীন তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, এ সময়টায স্বামী স্ত্রীসঙ্গ থেকে দূরে থাকে এবং মানসিকভাবে অস্থির থাকে। এই দূরত্ব বা মানসিক অস্থিরতা অনেক সময় তালাক প্রদানে স্বামীকে প্ররোচনা দিতে পারে। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তালাক দিতে হলে রজঃস্রাব বা প্রসবোন্তর রক্তক্ষরণ থেকে মুক্ত হওয়ার পর, সহবাসের পূর্বে ঠাণ্ডা মাথায তাকে তালাক দিতে হবে।

[১] মুসনাদুল বাঞ্জার : ৩০৬৪, ৩০৬৬; আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৭৮৪৮; হাদিসটি দুর্বল।

[২] তা'লিকু সহিহিল বুখারি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৫, হাদিস নম্বর ৫২৬৯ সংশ্লিষ্ট (তালাক) অধ্যায়।

রঞ্জঃস্মাবের সময় যেমন তালাক দেওয়া হারাম, তেমনিভাবে সহবাসকৃত পবিত্রতার মধ্যেও তালাক দেওয়া হারাম। কারণ, হতে পারে এই সহবাসের মাধ্যমে স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে গিয়েছে। আর স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে জানা থাকলে সন্তানের দিকে তাকিয়ে হয়তো সে তালাক দেওয়া হতে বিরত থাকবে এবং সহবস্থানে রাজি হয়ে যাবে। (এজন্য তালাক দিতে চাইলে স্ত্রী রঞ্জঃস্মাব বা প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ থেকে পবিত্র হওয়ার পর সহবাসের আগেই দিতে হবে।)

সহবাসমুক্ত পবিত্রতার সময় কিংবা স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পরেও তালাকের সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে বোৰা যাবে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব ও অপছন্দনীয়তা অত্যন্ত গভীর, তাই এখন তালাক দিতে কোনো সমস্যা নেই।

সালিম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন—

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَعَقَّيَظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «لَيُرَا جِفْهَا، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيقَنَ فَتَطْهَرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطِيقَهَا فَلِيُطِلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا، فَتُنْلِكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمْرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি তার স্ত্রীকে ঝুতুবতী অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। অতঃপর উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু ঘটনাটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উল্লেখ করলেন। এতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত নাখোশ হলেন। এরপর তিনি বললেন, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। এরপর পবিত্রাবস্থা না আসা পর্যন্ত যেন তাকে নিজের কাছে রেখে দেয়। এরপর রঞ্জঃস্মাব এসে আবার পবিত্র হলে তখন যদি সে তালাক দিতে চায় তাহলে স্ত্রীর পবিত্রাবস্থায় তাকে স্পর্শ (অর্থাৎ সহবাস) করার পূর্বে সে যেন তাকে তালাক দেয়। এটিই হলো ইদত বিবেচনায় রেখে প্রদত্ত তালাক, যা পালনের নির্দেশ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন [১]

এই নির্দেশ কুরআনেও এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطْلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ... ①

[১] সহিল বুখারি : ৪৯০৮, সহিহ মুসলিম : ১৪৭১

হে নবি, (আপনি আপনার উম্মতকে বলে দিন,) তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছে করো তখন তাদের ইদতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দাও [১]

কেবল পবিত্র অবস্থায় তালাক দিলেই ইদতের প্রতি লক্ষ্য রাখা সম্ভব।

অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বললেন—

مُرْهَ قَلْبِرَا حِفْعَهَا ، ثُمَّ لِيُطْلِقَهَا طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلًا

তুমি তাকে (অর্থাৎ তোমার ছেলে আব্দুল্লাহকে) নির্দেশ দাও, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। অতঃপর (পরবর্তী সময়ে তালাক দিতে চাইলে) সে যেন তাকে পবিত্র অবস্থায় বা গর্ভাবস্থায় তালাক দেয় [২]

### নিষিদ্ধ সময়ে তালাকের বিধান

এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ বস্তব্য হলো, তালাক তো হয়ে যাবে, তবে তালাকদাতা গুনাহগার হবে [৩] অন্য আরেকদল ফকির বলেন, তালাক হবে না [৪] কেননা,

[১] সূরা তালাক, আয়াত : ১

[২] সহিহ মুসলিম : ১৪৭১; জামিউত তিরমিয়ি : ১১৭৬

[৩] এটা হানাফি, মালিকি, শাফিয়ি ও হাফ্জি-সহ অধিকাংশ আলিমের মত। তাদের মতে, স্ত্রীকে পবিত্রাবস্থায় সহবাসের পর কিংবা ঝুতুবতী অবস্থায় তালাক দিলে সে তালাক প্রতিত হয়ে যায়। তবে সে তালাক প্রত্যাহার করার বিধান নিয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। হানাফিদের বিশুদ্ধতম মতানুসারে তালাক প্রত্যাহার করা ওয়াজিব বা আবশ্যিক। অবশ্য ইমাম কুদুরি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম কাসানি রাহিমাহুল্লাহ-সহ অন্যান্য কিছু হানাফি ফকিরের মতানুসারে এটা ওয়াজিব নয়; বরং মুসতাহাব। শাফিয়ি মায়দ্যব অনুসারে তালাক প্রত্যাহার করা সুন্নাত। হাফ্জি মায়দ্যব অনুসারে তালাক প্রত্যাহার করা মুসতাহাব। আর মালিকিগণ এখানে মাসআলাটিকে দু'ভাগে ভাগ করেন। তাদের মতে, হায়িয় ও নিফাসের সময়ে তালাক দিলে সে তালাক প্রত্যাহার করা আবশ্যিক। এ তালাক প্রত্যাহার করতে তাকে বাধ্য করা হবে। আর পবিত্রাবস্থায় সহবাসের পর তালাক দিয়ে থাকলে সে তালাক প্রত্যাহার করা আবশ্যিক নয়। তাকে তালাক প্রত্যাহারে বাধ্য করা যাবে না। [রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৩৩; বাদায়িতস সানায়ি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৪; আল-মাওসুআতুল ফিলহিয়া, খণ্ড : ২৯, পৃষ্ঠা : ৩৫]

[৪] এটা অধিকাংশ আলিমের বিপরীতে বিচ্ছিন্ন একটি মত। উম্মাহর প্রায় সকল বিদ্বৎ আলিমদের মত বাদ দিয়ে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন মত অনুসরণের সুযোগ নেই। তাছাড়াও এ মতের পক্ষে যে হাদিস পোশ করা হয়েছে,

আল্লাহ তাআলা তো এই সময় তালাক বৈধই করেননি, এর অনুমতিও দেননি, এটি তার দেওয়া শরিয়ার মধ্যেই নেই, তাহলে তালাক হয় কী করে?

ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রজঃস্বাব চলাকালীন তালাক প্রদানকে আপনি কীভাবে দেখেন? তিনি প্রশ্নকর্তাকে তার নিজের স্ত্রীকে রজঃস্বাবের সময় তালাক প্রদানের ঘটনা শুনিয়ে বললেন—

فَرَدْهَا عَلَيْ ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا

অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ তালাক প্রত্যাহার করে নিতে বলেছেন) এবং এটাকে কিছু মনে করেননি [১]

### তালাকের নামে শপথ হারাম

কোনো কিছু সম্পাদন, বর্জন কিংবা স্ত্রীকে ভয় দেখানোর জন্য বলা—‘তুমি যদি

সেটাও সহিহ নয়; বরং এটা অন্যান্য বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপরীত হওয়ায় মুহাদ্দিসিনগণ এটাকে প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রহণযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।

[১] সুনানু আবি দাউদ : ২১৮৫; মুসনাদু আহমাদ : ৫৫২৪; হাদিসটির শীঁয়া (এটাকে কিছু মনে করেননি) অংশটি সহিহ নয়; বরং এটা মুনকার বা প্রত্যাখ্যাত। কেননা, এ অংশটি হাদিসটির অন্যান্য সকল বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক। সকল বর্ণনায় এসেছে, হায়িয় অবস্থায় প্রদত্ত তালাক প্রতিত হয়ে গেছে। কিন্তু কেবল এ বর্ণনায় এসেছে, তালাক প্রতিত হয়নি। এজন্য ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম ইবনু আবিল বার রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম খাত্বাবি রাহিমাহুল্লাহ, হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ হাদিসটির এ অংশটিকে অগ্রহণযোগ্য ও মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং হাদিসটির এ অংশ দ্বারা কোনো মাসআলার পক্ষে দলিল দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই। আর হাদিসটিকে যদি সহিহ বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে হাদিসটির শীঁয়া (এটাকে কিছু মনে করেননি) অংশটির ব্যাখ্যা হবে—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ তালাককে শরিয়াসম্মত মনে করেননি। কেননা, এটা ছিল শরিয়া-বহির্ভূত পদ্ধতিতে প্রদত্ত তালাক। তবে শরিয়ার নিয়ম-বহির্ভূত পদ্ধতিতে তালাক দিলেও তার তালাক প্রতিত হয়ে গিয়েছিল। এজন্যই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ তালাককে প্রত্যাহার করার আদেশ দিয়েছিলেন। তালাক প্রতিত না হলে সেটাকে প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেওয়াটা অনর্থক হয়ে যায়। তাছাড়াও বুখারির অন্য একটি বর্ণনায় সুয়ে ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকেই সীকৃতি এসেছে যে, হায়িয় অবস্থায় তার প্রদত্ত তালাককে এক তালাক হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। [এসংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা দেখুন—তাখরিজু মুসনাদি আহমাদ, তাহকিক : শুআহিব আরনাউত, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩৭০-৩৭৩, হাদিস নম্বর ৫৫২৪ সংশ্লিষ্ট টীকা]

এই কাজ করো তাহলে তালাক’—এগুলো সবই হারাম [১] ইসলামে শপথের জন্য বিশেষ শব্দ রয়েছে, এসব শব্দ ছাড়া শপথ বৈধ নয়। বিশেষ শব্দ হলো আল্লাহর নাম। ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

| যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করে সে শিরক করল [২]

অন্য আরেকটি বর্ণনায় ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ كَانَ حَالِفًا ، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَضْمُنْ

[১] হানাফি মাযহাবের অধিকাংশ আলিমের কাছে নিজের ক্ষেত্রে তালাকের মাধ্যমে শপথ করা জাইয়। তবে একদল আলিম এটাকে মাকরুহ বলেছেন। যেমন কেউ বলল, আমি যদি অমুক গুনাহের কাজ করি তাহলে আমার স্ত্রী তালাক। এমতাবস্থায় সে গুনাহের কাজটি করলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। এটা হলো নিজের ক্ষেত্রে তালাকের মাধ্যমে শপথ করার বিষয়। আর তালাকের মাধ্যমে অপরকে শপথ করানোর ক্ষেত্রে বিধান হলো, হানাফি মাযহাবের যাহিরুর রিওয়ায়াত অনুযায়ী এটা নাজারিয়। ফাতাওয়ায়ে কাজিখানে এটাকে হারাম বলা হয়েছে। যাখিরা ও খুলাসাতে বলা হয়েছে, এটাকে অধিকাংশ মাশায়িখ নাজারিয় বলেছেন। ফুসুলুল উসরুশানিতে এটাকে নিষিদ্ধ বিষয় বলা হয়েছে। তবে পরবর্তী সময়ের কিছু আলিম বিচারকের জন্য অপরূপ অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনের মুহূর্তে তালাকের মাধ্যমে শপথ করানোর অনুমতি দিয়েছেন। কেননা, ঈমানের দুর্বলতা ও তাকওয়া কম থাকায় মানুষ শপথের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার নামের সম্মান রক্ষা করতে পারে না। আল্লাহর নামে যিথো শপথ করতে ভয় পায় না, এতে সে কোনো পরোয়াও করে না। কিন্তু যদি বলা হয়, তুমি সত্য কথা বলো, নইলে তোমার স্ত্রী তালাক তাহলে সে সত্য কথা বলতে বাধ্য হয়। যেমন উদাহরণসূর্য চুরির ব্যাপারে কারো সংশ্লিষ্টতা যাচাইয়ের জন্য বিচারক বা সালিস বলল যে, তুমি বলো- ‘আমি যদি অমুক বস্তুটি চুরি করে থাকি তাহলে আমার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক’। এমতাবস্থায় সে যদি সত্যিই চুরি করে থাকে তাহলে সে কখনো এ বাক্যটি বলবে না। কারণ, এটা বললে তার স্ত্রী তিন তালাকপ্রাপ্তি হয়ে তার জন্য একেবারে হারাম যাবে। এটার ভয়ে সে নিজের চুরির সীকারোন্তি দিতে বাধ্য হবে। আর যদি সে বাস্তবে চুরি না করে থাকে তাহলে এ বাক্যটি বলতে তার কোনো বাধা নেই। সে নির্বিধায় বাক্যটি উচ্চারণ করতে পারবে। কেননা, সে যেহেতু বাস্তবে চুরি করেনি তাই উন্নত বাক্যটি উচ্চারণ করার কারণে তার স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক প্রতিত হবে না। [আল-হিদায়া, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৫৮; আল-ইনায়া, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৯৬; ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৫৯; ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম : ৮/১৯৬-১৯৭; তাবয়িনুল হাকামিক, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩০২; রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৪২ মিনহতুল খালিক মাআল বাহরির রায়িক, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩০১; দুরারুল হুকাম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৮]

[২] সুনানু আবি দাউদ : ৩২৫১; মুসলিম আহমাদ : ৬০৭২; হাদিসটি সহিহ।

যে ব্যক্তি শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহ তাআলার নামেই শপথ করে, অন্যথায় চুপ থাকে।<sup>[১]</sup>

### ইদত পালনের সময় স্ত্রী কোথায় থাকবে?

স্ত্রী ইদত পালনের সময়ে স্বামীগৃহে থাকবে। এ সময় বিনা প্রয়োজনে স্বামীগৃহ থেকে বের হওয়া তার জন্য হারাম। অনুরূপভাবে অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে ঘর থেকে বহিকার করাও স্বামীর জন্য নাজায়িয। এটার কারণ হলো, ইদতরত অবস্থায় স্ত্রী তার স্বামীর কাছে থাকলে স্বামী তালাক প্রত্যাহার করে তাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে পারে; যদি এক তালাক বা দুই তালাক হয়ে থাকে। স্ত্রী স্বামীর কাছে থাকলে তার মধ্যে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা জেগে উঠতে পারে। স্ত্রীর সম্পর্ক পরিপূর্ণভাবে ছিন হওয়ার আগেই সে যেন তালাক নিয়ে একাধিকবার চিন্তা করে এবং ভাবে। এভাবে ধীরে ধীরে নির্দেশিত ইদতের সময় শেষ হয়ে যায়, যাতে তার গর্ভমুক্তির বিষয়টি জানা যায়। এতদিনের দাম্পত্যজীবন যাতে একমুহূর্তেই শেষ হয়ে না যায়। অন্তর পরিবর্তনশীল। ভাবনারাও ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তিও কখনো খুশি হয়। ঘৃণাকারীও কখনো ভালোবাসে।

এই বিষয়টি কুরআনে এসেছে এভাবে, আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَنْقُوا اللَّهَ رَبِّكُمْ مَلَأَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ يُّبُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ  
وَتَأْكِلْ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَذْ ظَلَمٌ نَفْسُهُ لَا تَذَرِي لَعْلَ اللَّهُ يُحِدِّثُ بَعْدَ  
ذِلِّكَ أَمْرًا

আর তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা তাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে) তাদের বাসগৃহ হতে বহিকার কোরো না এবং তারা নিজেরাও যেন বের না হয়; যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। আর যে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে, সে নিজের ওপরই অত্যাচার করে। আপনি জানেন না, হয়তো আল্লাহ এর পর কোনো উপায় করে দেবেন।<sup>[২]</sup>

[১] সহিল বুখারি : ২৬৭৯; সাহিহ মুসলিম : ১৬৪৬

[২] সূরা তালাক, আয়াত : ১

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ছাড়া ভিন্ন কোনো উপায় না থাকলে তালাকও হতে হবে ন্যায়সংগত ও সুন্দরভাবে। তালাক দিতে গিয়ে অন্যের ক্ষতি, কারো অধিকার খর্ব বা মিথ্যাচার সমর্থনযোগ্য নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فِإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأْمِسْكُوهُنَّ إِمْرَأُوْفِيْ بِمَعْرُوفٍ... ①

অতঃপর যখন তারা (অর্থাৎ তোমাদের এক বা দুই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ) তাদের ইন্দিতের শেষ সীমায় পৌঁছে, যখন তোমরা তাদেরকে ন্যায়ানুগভাবে (স্ত্রী হিসেবে) রেখে দাও অথবা ন্যায়ানুগভাবে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দাও [১]

আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন—

الطَّلاقُ مَرَّتَانِ طَقْمَسَاتٍ إِمْرَأُوْفِيْ تَسْرِيْحٌ بِإِخْسَانٍ... ②

তালাক দু-বার। অতঃপর (স্ত্রীকে) হয় ন্যায়ানুগভাবে (স্ত্রী হিসেবে) রাখবে অথবা সুন্দরভাবে মুক্ত করে দেবে [২]

আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে আরো বলেন—

وَلِلْمُطَّلِّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ سَلِحًا عَلَى الْمُتَّقِينَ ③

আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য থাকবে ন্যায়ানুগভাবে ভোগ্য সামগ্রী (অর্থাৎ ভরণ-পোষণের খরচ)। মুক্তাকিদের জন্য (এটা) অবশ্যকর্তব্য [৩]

**তালাক হবে তিন বারে**

ইসলাম একজন মুসলিমকে তিনবারে সর্বোচ্চ তিনটি তালাক দেওয়ার অধিকার দিয়েছে। (স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে এক তালাকই যথেষ্ট, এটার জন্য সর্বোত্তম

[১] সুরা তালাক, আয়াত : ২

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৯

[৩] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৪১

উপায় হলো,) সে স্ত্রীকে সহবাসমুক্ত পরিত্রাবস্থায় একটি তালাক দেবে। এরপর নারী ইদত পালন (অর্থাৎ তিন হায়িয় পার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা) করবে। ইদতের মধ্যে স্বামীর যদি স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে মনে চায়, তাহলে সে ফেরত আনতে পারবে। কিন্তু সে যদি ফিরিয়ে না নেয় এবং ইদতের সময় শেষ হয়ে যায়, তাহলেও স্বামী তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে, তবে বিয়ে নবায়নের মাধ্যমে। আর তার ব্যাপারে স্বামীর যদি কোনো প্রয়োজন না থাকে, তাহলে তালাকপ্রাপ্তা নারী অন্য পুরুষের সঙ্গে বিয়ে বসতে পারবে।

প্রথম তালাকের পরে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার পর আবার যদি তাদের মধ্যে মনোমালিন্য ও ঝগড়াবিবাদ দেখা দেয় এবং তাদের মধ্যে মীমাংসার যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহলে পূর্বে উল্লেখিত পন্থায় (দ্বিতীয়) তালাক দিয়ে দেবে। ইদতের মধ্যে বিয়ে নবায়ন ছাড়া আর ইদতের পরে বিয়ে নবায়নের মাধ্যমে আবার তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে।

দ্বিতীয়বার ফেরত আনার পরে (আবারও প্রয়োজন হলে তখন স্ত্রীকে) তৃতীয় তালাক দিতে পারবে। তৃতীয় তালাক দিলে স্পষ্ট হবে—তাদের অভ্যন্তরীণ বিরাগ ও কলহ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। সম্প্রীতি ও বন্ধন তাদের মধ্যে অসম্ভব। এজন্য ইসলামে তৃতীয় তালাকের পরে স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে আনার কোনো সুযোগ নেই।

তবে তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদত পালনের পর যদি অন্য আরেকজনের সঙ্গে জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে সঠিক পন্থায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, অতঃপর সে দ্বিতীয় স্বামীও তাকে তালাক দেয় বা সে মারা যায় তখনই কেবল প্রথম স্বামীর সাথে তার বিয়ে বৈধ হবে। কিন্তু তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে যদি কেউ প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ বানানোর উদ্দেশ্যে বিয়ে করে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে প্রথম স্বামীর সাথে তার বিয়ে বৈধ হবে না।[১]

[১] তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কেউ যদি এই শর্তে বিয়ে করে যে, সে বিয়ে করে কিছুদিন পরে তাকে তালাক দিয়ে দেবে, যাতে সে প্রথম স্বামীর জন্য বিয়ের উপযুক্ত হয়ে যায়, তাহলে এ বিয়ের বৈধতা ও কার্যকারিতার ব্যাপারে ফকিহগণের মতবেদ রয়েছে। বস্তুত এ ধরনের শর্তযুক্ত বিয়ে নাজায়িয় হওয়ার ব্যাপারে সকল ফকিহ একমত। কেননা হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এ ধরনের বিয়েতে প্রথম স্বামী ও দ্বিতীয় স্বামী উভয়কে আলাই তাআলা অভিসম্পাত করেছেন। সুতরাং এটা যে নাজায়িয় অব্দ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে নাজায়িয় বলতে হারাম নাকি মাকরুহে তাহরিমি, সেটা নির্ণয়ে মতভেদ রয়েছে। যানাফিদের নিকট এটা মাকরুহে তাহরিমি, আর মালিকি, শাফিয়ি ও হাফলি মাযহাব মতে এটা

এই কারণে যে ব্যক্তি একসঙ্গে তিন তালাক বা একশব্দে তিন তালাক দেয়, সে মূলত বিশুদ্ধ পথ থেকে বিচ্যুত এবং আল্লাহর শরিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বিশুদ্ধ স্ত্রে মাহমুদ ইবনু লাবিদ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

أَخِيرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ نَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا ،  
فَقَامَ عَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ : «أَيْلُغْ بُكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ ؟ » حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ : يَا  
رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَفْتَلُهُ ؟

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্বন্ধে খবর দেওয়া হলো যে, সে তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর বললেন, আমি তোমাদের মাঝে থাকা অবস্থায়ই কি আল্লাহর কিতাবের সাথে তামাশা করা হবে? তখন একব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমি কি তাকে হত্যা করব না? [১]

---

হারাম। আর এ বিয়ের কার্যকারিতা অর্থাৎ এ বিয়ের মাধ্যমে তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য বিয়ের উপযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে ফকিহগণ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহু ও ইমাম যুকার রাহিমাল্লাহু মতে, এ ধরনের শর্ত করে বিয়ে করাটি মাকরুহ বা নাজরিয় কাজ হলেও বিয়ে শুধু হয়ে যাবে এবং এ দ্বিতীয় স্বামী থেকে তালাক পাওয়ার পর সে প্রথম স্বামীর জন্য বিয়ের উপযুক্ত হয়ে যাবে। হানাফিদের দ্বিতীয় শীর্ষ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হাসান রাহিমাল্লাহু মতে, এ ধরনের শর্তযুক্ত বিয়ে শুধু হয়ে যাবে বটে, তবে এটার কারণে দ্বিতীয় স্বামী থেকে তালাক পাওয়ার পর সে প্রথম স্বামীর জন্য বিয়ের উপযুক্ত হবে না। আর হানাফিদের দ্বিতীয় শীর্ষ ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাল্লাহ-সহ মালিকি, শাফিয়ি ও হান্দলি ফকিহগণসহ অধিকাংশ আলিমদের মতে, এ ধরনের শর্তযুক্ত বিয়ে শুধু নয়; বরং বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এ বাতিল বিয়ের কারণে দ্বিতীয় স্বামী থেকে তালাক পাওয়ার পরও সে প্রথম স্বামীর জন্য বিয়ের উপযুক্ত হবে না। কেননা, তার শর্তযুক্ত দ্বিতীয় বিবাহ সহিহ-ই হয়নি। এটা হলো তালাকের শর্ত করে বিয়ে করলে তার বিধান। আর যদি তালাকের বিয়য়টি বিয়ের আগে সরাসরি আলোচনা করে থাকে কিংবা পরোক্ষভাবে ইঙ্গিতে বলে থাকে, কিন্তু বিয়ের সময় এটা উল্লেখ না করে ইচ্ছাটি গোপন রাখে তাহলে সেক্ষেত্রে ফকিহগণের দুটি মত পাওয়া যায়। হানাফি ও শাফিয়ি মাযহাব মতে, এ ধরনে বিয়ে সহিহ। সুতরাং এ বিয়ের দ্বারা তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী থেকে তালাক পাওয়ার পর প্রথম স্বামীর জন্য বিয়ের উপযুক্ত হয়ে যাবে। তবে শাফিয়িগণ এ ধরনের বিয়েকে মাকরুহ বলেছেন। আর মালিকি ও হান্দলি মাযহাব মতে, এটাও বাতিল বিয়ে। সুতরাং এ ধরনের বিয়ের দ্বারা তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী থেকে তালাক পাওয়ার পরও প্রথম স্বামীর জন্য বিয়ের উপযুক্ত হবে না। [আল-মাওসুত্তুল ফিকহিয়া, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ২৫৭]

[১] সুনানুন নাসাই : ৩৪০১; আস-সুনানুল কুবরা, নাসাই : ৫৫৬৪; হাদিসটি সহিহ।

## ইদতের পর কী করণীয়?

প্রথম বা দ্বিতীয় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদত যখন শেষের দিকে, তখন স্বামীর সামনে দুটি করণীয় আছে—

এক. তাকে ন্যায়সংগত উপায়ে রেখে দেওয়া। এর মানে হলো—ভালো উদ্দেশ্যে ও সংসারের নিয়তে তাকে স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে আনা, ক্ষতি বা কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়।

দুই. ফিরিয়ে না আনলে, ইদত পালনের সময়ে বা পরে তার কোনো ক্ষতি না করে, কষ্ট না দিয়ে এবং পরস্পরের অধিকার বিষয়ে কোনো কলহে না জড়িয়ে সুন্দরভাবে ও ন্যায়সংগত উপায়ে তার রাস্তা ছেড়ে দেওয়া।

ইদতের মেয়াদ দীর্ঘায়িত করে স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার কুমতলবে এবং যথাসন্ত্ব অধিক সময় পর্যন্ত অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে থেকে বঞ্চিত রাখার অসৎ উদ্দেশ্যে ইদতের শেষ মুহূর্তে এসে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়াটা বৈধ নয়। যথাসন্ত্ব ইদতের মেয়াদকে দীর্ঘায়িত করার এমন জন্য রীতি জাহিলিয়গে প্রচলিত ছিল। আল্লাহ তাআলা এভাবে স্ত্রীদেরকে কষ্ট দিতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন।

স্ত্রীদের কষ্ট প্রদান বিষয়ে আল্লাহর তাআলার হুশিয়ারি বুকে কাঁপন ধরানোর মতো। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন—

إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلْغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأْمِسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا  
ثُمَسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَغْتَدِّوْ وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ قَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَحْذِّدُوا أَيَّاتِ اللَّهِ هُزُوا  
وَأَذْكُرُوا يَغْمَثَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةٌ يَعْظِمُكُمْ بِهِ وَأَتَقُوا اللَّهَ  
وَاغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে (এক বা দুই) তালাক দেবে, অতঃপর তারা (অর্থাৎ তোমাদের এক বা দুই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ) তাদের ইদতের শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে, তখন তোমরা তাদেরকে ন্যায়ানুগভাবে (স্ত্রী হিসেবে) রেখে দাও অথবা ন্যায়ানুগভাবে তাদেরকে বিছিন করে দাও। আর তাদের ক্ষতি করে সীমালঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখো না। যে ব্যক্তি এমনটা করে সে নিজের প্রতি জুলুম করে। আর তোমরা আল্লাহর বিধানসমূহকে হাসি-ঠাটারূপে গ্রহণ কোরো না। আর তোমরা স্মরণ

করো তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, তাঁর কিতাব ও হিকমাহ (জ্ঞানগর্ভ বাক্য তথা সুন্নাহ) যা তিনি তোমাদের প্রতি নাফিল করেছেন, যদ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন। আর আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো,  
নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।<sup>[১]</sup>

এই আয়াতের মধ্যে সাতটি বাক্য রয়েছে, প্রতিটি বাক্যের মধ্যে হুঁশিয়ারির পর হুঁশিয়ারি, উপদেশের পর উপদেশ, ভীতিপ্রদর্শনের পর ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে। শোনার মতো কান থাকলে এবং বোঝার মতো হৃদয় থাকলে গ্রহণের জন্য এই একটি আয়াতই যথেষ্ট।

**তালাকপ্রাপ্তা নারী পছন্দমতো বিয়ে করতে পারবে কি?**

ইদ্দতের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে নারীর পছন্দ অনুযায়ী বিয়েতে স্বামী, অভিভাবক বা অন্য কেউ বাধা দেওয়ার অধিকার রাখে না। প্রস্তাবদাতা ও প্রস্তাবগ্রহীতা শারয়ি ও সামাজিকভাবে প্রচলিত পন্থায় বিয়ে করতে চাইলে তার আগ্রহের বিয়েতে বাধা দেওয়ার অধিকার কারো নেই।

অনেক তালাকদাতা স্বামী তার তালাকপ্রাপ্তা প্রাপ্তন স্ত্রীর ওপর খবরদারি ও দাপট দেখানোর জন্য তাকে বা তার পরিবারকে হুমকি ধর্মকি দেয়। এগুলো হলো জাহিলি যুগের বর্বর ও নোংরা অনুশীলন।

অনুরূপভাবে অনেক সময় স্ত্রীকে স্বামী ফিরিয়ে নিতে চায়। স্ত্রীও তার কাছে যেতে চায়। তারা পরস্পরে সমরোতা করে ন্যায়সংগত উপায়ে আবার একত্রে থাকতে চায়। কিন্তু স্ত্রীর পরিবার বা অভিভাবক সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ স্বামী-স্ত্রীর সমরোতা করে চলার পথে অভিভাবকদের এভাবে বাধা হয়ে দাঁড়ানো বৈধ নয়।

এ বিষয়ে কুরআনে আরো বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذَا طَلَقْتُمُ الِّبَسَاءَ فَلَا تَغْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنَّهُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৩১

আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে (এক বা দুই) তালাক দেবে, অতঃপর তারা (অর্থাৎ তোমাদের এক বা দুই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ) তাদের ইদতের শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে, তখন তারা যদি ন্যায়ানুগভাবে পরস্পর সম্মত হয়, তাহলে স্ত্রীগণ তাদের (তালাকদাতা পূর্বের) স্বামীদেরকে পুনর্বিবাহ করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিয়ো না। এ দ্বারা তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে। এটাই তোমাদের জন্য শুধুতম ও পবিত্রতম। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।<sup>[১]</sup>

### নাখোশ স্ত্রী কি স্বামীকে তালাক দিতে পারবে?

স্ত্রী তার স্বামীতে অসন্তুষ্ট। কোনোভাবেই স্বামীর সঙ্গে সে থাকতে পারে না। এই নারী তাকে প্রদত্ত বিয়ের মোহর-উপটোকন ইত্যাদি ফেরত দিয়ে স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে। মোহর ইত্যাদি ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত পরিমাণই বিবেচ্য হবে। তবে স্বামীর কর্তব্য হলো, মোহর-উপটোকন ইত্যাদি বাবদ স্ত্রীকে প্রদত্ত সম্পদের চেয়ে বেশি সম্পদ না নেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا يَحِلُّ لِكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَا مُهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خَفْتُمْ  
أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ...<sup>১১</sup>

আর স্ত্রীগণকে তোমরা (মোহর-উপটোকন-সুরূপ) যা দিয়েছিলে তার কোনো কিছু ফেরত নেওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তবে যদি তাদের উভয়ের আশঙ্কা হয়, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না তাহলে ভিন্ন কথা। সুতরাং তোমরা যদি (বাস্তবিকই) আশঙ্কা করো যে, আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তাহলে (সেক্ষেত্রে) স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে (স্বামীর বিবাহের বন্ধন থেকে) নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে (স্বামী-স্ত্রীর) কারো কোনো পাপ নেই।<sup>[২]</sup>

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৩২

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৯

ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، مَا أَغْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرْدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَقْبِلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِقْهَا تَطْلِيقَةً

সাবিত ইবনু কাইস রায়িয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, চরিত্রগত বা দ্বীনি বিষয়ে সাবিত ইবনু কাইসের প্রতি আমি দোষারোপ করছি না। তবে আমি ইসলামের মধ্যে থেকে কুফরি করা (অর্থাৎ নিজের অপছন্দের স্বামীর সঙ্গে বসবাস করে তার অবাধ্য হওয়া) পছন্দ করছি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি (মোহর হিসেবে তোমাকে প্রদত্ত) তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সাবিত ইবনু কাইস রায়িয়াল্লাহু আনহুকে) বললেন, তুমি বাগানটি প্রহণ করো এবং তাকে এক তালাক দিয়ে দাও [১]

বিনা প্রয়োজনে এবং প্রহণযোগ্য কোনো কারণ ও অসুবিধা ছাড়া স্বামীর থেকে তালাক প্রহণে তাড়া দেওয়া স্ত্রীর জন্য হারাম। সাওবান রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أَيُّمَا امْرَأَةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ عَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَمَ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

যে নারী কোনো সমস্যা ছাড়া অহেতুক তার স্বামীর নিকট তালাক চায় তার জন্য জানাতের সুগন্ধও হারাম [২]

### স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়া হারাম

স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়া এবং তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা, যাতে সে স্বামী প্রদত্ত মোহর পুরোটা বা আংশিক ফিরিয়ে দেয়, এটা হারাম। তবে সে যদি স্পষ্ট নির্জনতায়

[১] সহিল বুখারি : ৫২৭৩, ৫৩৭৬; সুনানুল নাসাখি : ৩৪৬৩

[২] জামিউত তিরমিয়ি : ১১৮৭; সুনান আবি দাউদ : ২২২৬; হাদিসটি সহিহ।

জড়িয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَغْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَّبُوا بِيَغْضِ مَا آتَيْنُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاجِحَةٍ مُّبِينَ...  
.....

আর তোমরা তাদের প্রতি কঠোরতা কোরো না, যাতে তোমরা তাদেরকে (মোহর ও উপটোকনসুরূপ) যা দিয়েছ তা হতে কিছু গ্রহণ করতে পারো। তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতা (অর্থাৎ ব্যভিচার বা স্বামীর অবাধ্য আচরণ) করে তাহলে ভিন্ন কথা (অর্থাৎ সেক্ষেত্রে তালাকের বিনিময়ে স্ত্রীকে প্রদত্ত দেনমোহর স্বামী ফিরিয়ে নিতে পারবে) [১]

স্বামী নিজ আগ্রহে অন্য নারীকে বিয়ের উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে তালাক দিলে সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে প্রদত্ত মোহর ইত্যাদি কোনো কিছু ফেরত নেওয়া হারাম। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجَ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِخْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا  
أَنَّا أَخْذُونَهُ بِهُنَّاً وَإِنَّمَا مُمِنَّا ⑥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَنَ بِغَضْبِكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْذَنَ  
مِنْكُمْ مِّيَثَاقًا غَلِيظًا ⑦

আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির করো এবং তাদের একজনকে (ইতিঃপূর্বে মোহর-উপটোকন-সুরূপ) প্রচুর অর্থ-সম্পদও দিয়ে থাকো, তবু তা থেকে (স্ত্রীর কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও নিজে থেকেই তাকে তালাক দেওয়ায়) কিছুই ফেরত নিয়ো না। তোমরা কি যিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে? আর কীভাবে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা একে অপরের সাথে (সহবাসের মাধ্যমে) একান্তে মিলিত হয়েছ এবং তারা (অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীগণ) তোমাদের কাছ থেকে (বিবাহ বন্ধনের) সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে? [৮]

### স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগের শপথ বৈধ নয়

স্বামীর সঙ্গে থাকা নারীর একটি অধিকার। এই অধিকার যাতে বিনষ্ট না হয়, তাই

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ১৯

[২] সুরা নিসা, আয়াত : ২০, ২১

স্ত্রীর সহসীমার বাইরে তার সঙ্গ ছেড়ে থাকা স্বামীর জন্য বৈধ নয়।<sup>[১]</sup> আরবের লোকরা কখনো কখনো স্ত্রীকে রাগানোর জন্য শপথ করে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করত। স্বামীর যতদিন ইচ্ছা স্ত্রীর কাছে যেত না। ইসলাম এই সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। শরিয়া এখানে চার মাসের সময় বেঁধে দিয়েছে। এই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই যদি স্বামীর মনে দয়া জাগে এবং সে সিদ্ধান্ত পালিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়, তাহলে আল্লাহ তার অপরাধ ও একগুঁয়েমি ক্ষমা করে দেবেন, তাওবার দরজা তার জন্য খোলা থাকবে। অবশ্য শপথ ভঙ্গের জন্য তাকে শপথের কাফফারা আদায় করতে হবে।

এই সময়সীমা অতিক্রম হয়ে গেল, কিন্তু তার সংকল্পে কোনো পরিবর্তন আসেনি, শপথও ভঙ্গ করেনি, তাহলে স্ত্রীর অধিকারে অবহেলার শাস্তি হিসেবে তার স্ত্রী সৃষ্টিক্রিয়ভাবে তালাক হয়ে যাবে।

একদল ফকিরের মতে, এই সময় পার হলেই তালাক হয়ে যাবে। কোনো শারয়ি

[১] স্বামীসঙ্গ লাভ এটা স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার। বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো বৈধভাবে জৈবিক চাহিদা পূরণ করে নিজের চারিত্বকে রক্ষা করা। সুতরাং অন্যান্যভাবে স্বামী বা স্ত্রী কারো জন্যই এ অধিকার নট করার কোনো অধিকার নেই। অতএব স্বামী যদি কোনো গ্রহণযোগ্য ওজর বা সমস্যা ছাড়াই তার স্ত্রীর সাথে চার মাস পর্যন্ত সহবাস না করে তাহলে এটা স্ত্রীর ওপর সুস্পষ্ট জুলুম হবে। এজনাই শরিয়তে স্ত্রীর সাথে চার মাস পর্যন্ত সহবাস না করার শপথকে নিষিদ্ধ ও জুলুম হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ, এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সহবাস ছাড়া থাকাটা স্ত্রীর জন্য অনেক কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় এবং এতে তার প্রাপ্য অধিকার খর্ব হয়। হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত ফকির ইমাম কাসানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

لَأَنْ حَقَّهَا فِي الْجَمَاعِ فَصَارَ ظَالِمًا بِمَنْعِهِ ، فَلَا يَنْدَفِعُ الظُّلْمُ إِلَّا بِهِ

কেননা, স্ত্রীর যোনিপথে সহবাস করা এটা স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার। সুতরাং সহবাসে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় স্বামী যেহেতু জালিম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, তাই (চার মাসের মধ্যে) একমাত্র সহবাস করলেই তার এ জুলুম দূর হবে। [বাদায়িউস সানায়ি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৭৩] তবে এটা তখনই জুলুম বলে বিবেচিত হবে, যখন স্বামী সহবাস করার সক্ষমতা ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সহবাস না করে স্ত্রীকে কষ্ট দেবে। গ্রহণযোগ্য কোনো ওজর থাকলে সেক্ষেত্রে তা জুলুম হবে না। ইমাম কাসানি রাহিমাহুল্লাহ এসংক্রান্ত একটি মাসআলার দলিল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—

وَلَنَا أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْجَمَاعِ حَقِيقَةً فَيَصِيرُ ظَالِمًا بِالْمَنْعِ ، فَلَا يَنْدَفِعُ الظُّلْمُ عَنْهَا إِلَّا بِإِيْفَائِهَا  
، حَقَّهَا بِالْجَمَاعِ ،

অর্থাৎ আমাদের দলিল হলো, স্বামী বাস্তবিকভাবে সহবাস করতে সক্ষম। সুতরাং সহবাসে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় সে জালিম হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই (চার মাসের মধ্যে কমপক্ষে একবার) সহবাস করার মাধ্যমে স্ত্রীর অধিকার পূরণ করা ব্যক্তিত তার এ জুলুম দূর হবে না।’ [বাদায়িউস সানায়ি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৭৪]

কাষি বা বিচারকের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন নেই [১] তবে আরেকদল ফকিরের মতে, চার মাস অতিক্রম হলে বিষয়টি বিচারকের দরবারে গড়াবে। তিনি স্বামীকে তালাক বা স্ত্রীকে রাজি-খুশি করিয়ে ফিরিয়ে আনবার অবকাশ দেবেন। তার যেটা ইচ্ছা সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে। [২]

স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার এই শপথকে শরিয়ার পরিভাষায় বলা হয় ইলاء (ঈলা)। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাত্ত্বালা বলেন—

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرْبُصٌ أَزْبَعَةٌ أَشْهُرٌ فَإِنْ قَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦﴾  
عَزَّمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

যারা নিজেদের স্ত্রীদের একান্ত সান্নিধ্যে না যাওয়ার শপথ গ্রহণ করে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ আছে। সুতরাং যদি তারা (উক্ত সময়ের মধ্যে স্ত্রীর একান্ত সান্নিধ্যে) ফিরে আসে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যদি তারা তালাক দেওয়ার সংকল্প করে ফেলে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [৩]

চার মাস একটি পর্যাপ্ত সময়। এতটুকু সময় স্বামীকে সুযোগ দেওয়ার কারণ হলো, সে যেন চিন্তাভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, স্ত্রীকে রাখবে কি রাখবে না। অন্যদিকে একজন নারী স্বামী ছাড়া থাকার মেয়াদও চার মাস। এ প্রসঙ্গে তাফসিরবিদগণ উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা উল্লেখ করে থাকেন।

[১] এটা হানাফি মাযহাবের ফাতওয়া। হানাফি ফকিরহগণ বলেন, স্বামী চার মাস পর্যন্ত স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকার শপথ করার পর এ সময়ের মধ্যে যদি সহবাস না করে থাকে তাহলে চার মাস অতিক্রান্ত হওয়া মাত্রই তার স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন প্রতিত হয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। [আল-ইখতিয়ার লি-তালিল মুখ্তার, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৫২-১৫৩]

[২] এটা মালিকি, শাফিয়ি ও হাস্বলি মাযহাবের ফাতওয়া। তাদের ফকিরহগণ বলেন, স্বামী চার মাস পর্যন্ত স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকার শপথ করার পর এ সময়ের মধ্যে যদি সহবাস না করে থাকে তাহলে চার মাস অতিক্রান্ত হওয়া মাত্রই তার স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক প্রতিত হবে না; বরং বিষয়টি বিচারকের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। বিচারক সকল বিবরণ শুনে স্বামীকে আদেশ করবেন, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। যদি সে ফিরিয়ে নিতে অসীকার করে তাহলে তাকে তালাক প্রদান করার আদেশ করবে। যদি সে তালাক দিতেও অসীকার করে তাহলে বিচারক নিজেই স্বামীর পক্ষ থেকে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবে। [আল-মাসুআতুল ফিকহিয়া, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৩২]

[৩] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৬-২২৭

বর্ণিত আছে, ‘উমার রায়িয়াল্লাহ আনহু এক রাতে (প্রজাসাধারণের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য) শহরের অলিগলি দিয়ে ঘূরছিলেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন, এক নারী কবিতা আবৃত্তি করছে—

হায়! তিমির এই রাত হয়েছে দীর্ঘ, চারিদিকে নেমে এসেছে আঁধার,  
বিনিদ্র রঞ্জনী কাটে আমার, নিকটে যে নেই প্রিয়তম আনন্দ করার।

আল্লাহর শপথ! অন্তরে যদি না থাকত আল্লাহর ভয়, অন্য কিছু নয়,  
প্রেমের দোলাচলে ক্ষণেক্ষণে উঠত কেঁপে আমার এ খাটের চারপাশ।  
আমার প্রতিপালকের ভয় আর লজ্জার আবরণ রেখেছে বিরত আমায়,  
বড় চিন্তা লাগে, ভয় হয় মোর স্বামীর মান-সম্মানে যদি লাগে আঘাত।

পরের দিন উমার রায়িয়াল্লাহ আনহু সেই নারীকে ডেকে পাঠালেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্বামী কোথায়? সে বলল, আপনি তাকে (জিহাদের জন্য) ইরাকে প্রেরণ করেছেন। তখন তিনি কিছু নারীকে ডাকতে বললেন। তারা আসলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, একজন নারী স্বামী ছাড়া কতদিন ধৈর্য ধরে থাকতে পারে? তারা বলল, দুই মাস পর্যন্ত। তিনি মাস হলে তার ধৈর্যশক্তি কমে আসে। আর চার মাস হলে তার ধৈর্যশক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন উমার রায়িয়াল্লাহ আনহু (বিবোহিত) পুরুষের যুদ্ধকালীন মেয়াদ (সর্বোচ্চ) চার মাস নির্ধারণ করে দিলেন। যুদ্ধের মেয়াদ চার মাস পূরণ হলে তিনি যোদ্ধাদেরকে (তাদের স্ত্রীদের নিকট) ফিরিয়ে আনতেন এবং অন্য যোদ্ধাদেরকে সেখানে মোতায়েন করতেন।<sup>[১]</sup>

### পিতামাতা ও সন্তান

#### ইসলাম বংশ-সংরক্ষণের পক্ষে

সন্তান হলো পিতার নয়নমণি, তার বৈশিষ্ট্য-বাহক। বাবার জীবন্দশায় সে হলো—তার চোখের শীতলতা, মৃত্যুর পরে তার অস্তিত্বের প্রমাণ ও স্থায়িত্বের নির্দশন। সন্তান বাবার চেহারা, দেহভঙ্গি, বৈশিষ্ট্য, গুণগুণের ধারক হয়। তার ভালো-মন্দ, উত্তম-অনুস্তুম সুভাবের উত্তরাধিকারী। সন্তান হলো পিতৃত্বদ্যের অংশ, কলিজার টুকরা।

[১] তাফসিল কুরতুবি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১০৮

এজন্য আল্লাহ তাআলা ব্যভিচারে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে বিয়ের বিধান দিয়েছেন, যাতে বংশ রক্ষা হয়, সন্তানের বংশ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি না হয়, সন্তানের জানা থাকে—কে তার বাবা, বাবার যাতে জানা থাকে—কারা তার মেয়ে আর কারা তার ছেলে।

বিয়ের মাধ্যমে নারী একজন পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। স্বামীর সঙ্গে প্রতারণা বা গর্ভে অন্য কারো সন্তানের জায়গা প্রদান হারাম হয়ে যায়। এখন এই নারীর গর্ভে যত সন্তান জন্ম নেবে, তারা সবাই স্বামীর সন্তান বলে বিবেচিত হবে। এখানে স্বামীর দাবি বা স্ত্রীর স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الْوَلْدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَزُ

| শয়া যার সন্তান তার, আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে (সন্তান না পাওয়ার) বঙ্গনা [১]

### স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের ব্যাপারে শারয়ি বিধান

শয়া যার সন্তান তার—এজন্য শারয়িভাবে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে আসা সন্তান স্বামীর পক্ষ থেকে অসীকারের কোনো সুযোগ নেই। কারণ, এই অসীকৃতির ফলে স্ত্রী ও সন্তানের গায়ে মারাত্মক রকমের অভিযোগ আরোপিত হয়। তাই কোনো সন্দেহ, ধারণা বা ভিত্তিহীন প্ররোচনার উপর ভিত্তি করে এ ধরনের কথা বা পদক্ষেপ গ্রহণ বৈধ নয়। তবে বিভিন্ন শক্তিশালী ও মজবুত প্রমাণ যদি পাওয়া যায়, যেগুলো নাকচ করা স্বামীর পক্ষে অসম্ভব, সেখানে ইসলামি শরিয়া চায় না—এমন কাউকে সে ভরণপোষণ দিক, যাকে সে সন্তান বলে মানেই না। যাকে বাবা উত্তরাধিকারী মনে করে না, কিন্তু (সন্তান বলে মেনে নিলে) তাকে তার উত্তরাধিকারী বানাতেই হবে। সর্বনিম্ন বিষয় হলো, সারা জীবন সন্তানের ব্যাপারে বাবার মনে সন্দেহ থেকেই যাবে।

এ ধরনের বিপদ থেকে উত্তরণের পথও ইসলাম বাতলে দিয়েছে, যাকে ইসলামি আইনশাস্ত্রে বলা হয় **نَعْل** (লিআন)। যে নিশ্চিত জানে, বা যার মধ্যে প্রবল ধারণা জন্মে যে, তার স্ত্রী অন্য কারো সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে সন্তান নিয়ে এসেছে, কিন্তু এই অপরাধের শাস্তি নিশ্চিতের জন্য তার কাছে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ

[১] সহিল বুখারি : ২০৫৩; সহিহ মুসলিম : ১৪৫৭

না থাকে, তাহলে সে এ বিষয়টি বিচারকের দ্রবারে মীমাংসার জন্য পেশ করতে পারবে। বিচারক তাদের মাঝে কুরআনে বর্ণিত লিভান (পরস্পরকে অভিশাপ দেওয়া) পদ্ধতির মাধ্যমে ফয়সালা দেবে। পবিত্র কুরআনে লিভানের ব্যাপারে বিধান দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ  
بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الصَّادِقِينَ ① وَالخَامِسَةُ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ②  
وَيَنْدِرُ عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشَهَّدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الْكَاذِبِينَ ③ وَالخَامِسَةُ أَنْ  
غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ④

আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে; অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কোনো সাক্ষী নেই, তাহলে তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে সাক্ষ্য দেবে, নিশ্চয়ই সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। আর পঞ্চমবারে বলবে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে অবশ্যই তার ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক। আর স্ত্রী থেকে (ব্যভিচারের) শাস্তি রাহিত হবে, যদি সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয়ই তার স্বামী মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। আর পঞ্চমবারে বলবে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে তার ওপর অবশ্যই আল্লাহর গফব নেমে আসুক [১]

এরপর বিচারক তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন, আর সন্তান তার মায়ের বলে বিবেচিত হবে (অর্থাৎ সন্তানটি জারজ বলে বিবেচিত হবে, স্বামী থেকে তার গর্ভজাত সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে না)।

**দণ্ডক সন্তান কি আপন সন্তানের সীকৃতি পাবে?**

নিজ স্ত্রীর সন্তান অসীকারের সুযোগ যেমন ইসলামে নেই, তেমনিভাবে নিজের ঔরসজাত সন্তান ছাড়া অন্য কাউকে নিজ-সন্তান বলে দাবির অধিকারও ইসলাম দেয় না। জাহিলি মুগে আরবের লোকেরা অন্যান্য জাতির মতোই যাকে ইচ্ছা তাকেই নিজের সন্তান বলে ঘোষণা দিয়ে দণ্ডকের মাধ্যমে বংশভুক্ত বানিয়ে নিতো। সবার

[১] সুরা নূর, আয়াত : ৬-৯

মধ্যে ঘোষণা দিয়ে যেকোনো শিশু বা যুবককে তারা নিজ সন্তান হিসেবে নিতে পারত। এরপর থেকে সেই শিশু বা যুবক তার সন্তান ও পরিবারের অঙ্গভূত হয়ে যেত এবং তার জন্য সাব্যস্ত হতো আপন সন্তানদের মতো যাবতীয় অধিকার। সে ওই পরিবারের নামসহ পারিবারিক সকল অধিকারের ধারক হতো। এই শিশু বা যুবকের জন্মদাতা প্রকৃত পিতা সমাজে পরিচিত থাকলেও অন্যের পোষ্যপুত্র হতে তার কোনো সমস্যা হতো না।

ইসলাম আগমনের সময়েও আরব সমাজে দন্তক গ্রহণের প্রচলন ব্যাপকভাবে সমাদৃত ছিল। এমনকি জাহিলি যুগে যাইদ ইবনু হারিসা নামে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও একজন পোষ্যপুত্র ছিল। জাহিলি যুগের কোনো এক লুটতরাজে যাইদ ইবনু হারিসা রায়িয়াল্লাহু আনহু আরবদের হাতে বন্দি হয়েছিলেন। সেসময় তিনি ছিলেন খুবই অল্লবয়স্ক বালক। খাদিজা রায়িয়াল্লাহু আনহার ভাতিজা হাকিম ইবনু হিযাম রায়িয়াল্লাহু আনহু ফুপুকে উপহার হিসেবে দেওয়ার জন্য তাকে ক্রয় করেছিলেন। খাদিজা রায়িয়াল্লাহু আনহা আবার বিয়ের পরে এই গোলামটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাদিয়ে হিসেবে দিয়ে দেন।

বেশ কিছুদিন পরে যাইদ রায়িয়াল্লাহু আনহুর বাবা ও চাচা তার অবস্থান জানতে পারে। তারা এসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাকে নিয়ে যাওয়ার আবদার জানাল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অবকাশ দিলেন—সে চাইলে তার বাবা-চাচার সঙ্গে চলে যেতে পারে কিংবা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে থেকে যেতে পারে। যাইদ রায়িয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে থাকার সুযোগটিই বেছে নিলেন। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্প্রদায়কে সাক্ষ্য রেখে যাইদ রায়িয়াল্লাহু আনহুকে দাসত্তের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে দন্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। সেদিন থেকে তিনি (জাহিলি যুগের নিয়মানুসারে) ‘যাইদ ইবনু মুহাম্মাদ’ নামে পরিচিত হলেন। ইসলাম আগমনের পর আয়াদকৃত দাসদের মধ্যে তিনিই প্রথম ঈমান আনেন।

### জাহিলি দন্তকের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান

ইসলামের দৃষ্টিতে দন্তকপুত্রকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ বাস্তবতাবিরোধী একটি মিথ্যাচার। এই মিথ্যাচার একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে একটি পরিবারের সদস্য

বানিয়ে দেয়। সে এই পরিবারের নারীদের সঙ্গে মাহরামের মতো ওঠাবসা করে; অথচ তারা তার মাহরাম নয়। দক্ষ গ্রহীতার স্ত্রী তার মা নয়, তার মেয়ে তার বোন নয়, তার বোন তো তার ফুফু নয়; বরং শরিয়তের দৃষ্টিতে সে সকলের জন্য গায়রে মাহরাম একজন পুরুষ।

এই কথিত সন্তান তার কথিত পিতা বা মাতা থেকে উত্তরাধিকারী হয়; অথচ প্রকৃত হকদারগণ বষ্ণিত হয়। উড়ে এসে জুড়ে বসা এই সন্তানটির প্রতি প্রকৃত আত্মীয়গণ ভীষণরকম ক্রুদ্ধ হয়। কেননা, সে তাদের অধিকারে ছিনিয়ে নিচ্ছে, তাদের পাওনা সম্পদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই ক্রোধ ও হিংসা দানা বেধে ধীরে ধীরে এক সময় বিশৃঙ্খলা, সম্পর্কহীনতা ও রক্তসম্পর্ক ছিন্নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে এই জাহিলি রীতি ও চিরদিনের জন্য গড়া এই সম্পর্ক ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল অনুষঙ্গ হারাম। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا جَعَلَ أَذْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ مِنْ وَاللَّهِ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ① اذْغُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنَّ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ ②

আর তোমাদের পালকপুত্রদেরকে তিনি তোমাদের (উরসজ্ঞাত প্রকৃত) পুত্র করেননি। এগুলো তো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আর আল্লাহ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন। তোমরা তাদেরকে তাদের (প্রকৃত) পিতৃপরিচয়ে ডাকো; আল্লাহর দৃষ্টিতে এটিই অধিক ন্যায়সংগত। অতঃপর যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের দ্বিনি ভাই এবং তোমাদের বন্ধু।’<sup>[১]</sup>

লক্ষ করুন—

وَمَا جَعَلَ أَذْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ

(আর তোমাদের পালকপুত্রদেরকে তিনি তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তো

[১] সুরা আহ্�মাব, আয়াত : ৪, ৫

তোমাদের মুখের কথা মাত্র।) কুরআনের এই বাক্যটি নির্দেশ করছে, পোষ্যপুত্র এটি হলো একটি মুখের বুলি ও গালভরা কথা মাত্র, এর পেছনে কোনো বাস্তবতা নেই।

মৌখিক বুলি কোনো বাস্তবতা বা সত্যকে পাটাতে পারে না। অনাত্মীয়কে আত্মীয় এবং পোষ্যপুত্রকে উরসজাত পুত্রে রূপান্তর তার পক্ষে অসম্ভব। মৌখিক অনুশীলনের দ্বারা পালকপুত্রের মধ্যে পালক-পিতার রন্ত সঞ্চারিত হবে না, পিতার মধ্যে পুত্রসুলভ ভালোবাসা সৃষ্টি হবে না, সন্তানের মধ্যেও পিতৃত্বসুলভ আবেগ তৈরি হবে না। বস্তুত তার মধ্যে পিতার পারিবারিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব কিছুই স্থানান্তরিত হয় না।

উরসজাত পুত্রসংশ্লিষ্ট বিশেষ বিধিবিধান, যথা পিতার সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া, পিতার জন্য পুত্রবধু হারাম হওয়া এগুলো কিছুই পোষ্যপুত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। পোষ্যপুত্রের জন্য উত্তরাধিকারে কোনো অংশ নেই। মিরাসপ্রাপ্তির জন্য রন্তসম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক বা জন্মগত আত্মীয়তার বাইরে কুরআনে আর কোনো কারণ বর্ণিত হয়নি। রন্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأُولُو الْأَرْجَامِ بَعْضُهُمْ أُولَئِي بَغْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...  
[১] ...وَأُولُو الْأَرْجَامِ بَعْضُهُمْ أُولَئِي بَغْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...

আর আল্লাহর বিধানে রন্তসম্পর্কীয় আত্মীয়গণ (অনাত্মীয়দের অপেক্ষা)  
একে অন্যের অধিক হকদার।[১]

বিয়ের ক্ষেত্রে কুরআন ঘোষণা দিয়েছে যে, উরসজাত সন্তানের স্ত্রী-ই (অর্থাৎ নিজের আপন ছেলের স্ত্রী তথা পুত্রবধুই) শুধু মাহরাম হিসেবে বিবেচিত হবে, পোষ্যপুত্রের স্ত্রীগণ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

...وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ...

আর তোমাদের জন্য (বিয়ে করা চিরস্থায়ীভাবে) হারাম করা হয়েছে  
তোমাদের উরসজাত ছেলের স্ত্রীদেরকে।[১]

[১] সূরা আনফাল, আয়াত : ৭৫

[২] সূরা নিমা, আয়াত : ২৩

তাই পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে বাবা বিয়ে করতে পারবে; কারণ পালকপুত্র তো বাবার দিক থেকে সম্পূর্ণ অনাঞ্চায় একজন ব্যক্তি। সুতরাং পালকপুত্র তার স্ত্রীকে তালাক দিলে তার কথিত পিতার সাথে তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বিয়েতে শরিয়তে কোনো বাধা নেই।

### মৌখিক ঘোষণা এবং বাস্তবায়ন

পালকপুত্র-সংক্রান্ত প্রচলনগুলো অনেকটা সামাজিক রীতির মতেই আরব সমাজের গভীরে শেকড় গেড়ে বসেছিল। তাই পালকপুত্রের স্ত্রীর সঙ্গে পালকপিতার বিয়ের অনুমোদন অনেকের জন্যই বেশ কষ্টকর ছিল। এজন্য আল্লাহ তাআলা এই নিয়ম ভাঙার কথা শুধু বলেই ক্ষান্ত থাকেননি, তাঁর নবির মাধ্যমে এর বাস্তবায়নও ঘটিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে মুমিন-অন্তরের সকল দ্বিধা মিটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সুয়াং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই মনোনীত হলেন এই সংজ্ঞিন দায়িত্ব পালনের জন্য। যাতে এর সঙ্গে জড়িত যাবতীয় সংশয়-সন্দেহ নিঃশেষ হয়ে যায়। যেন মুমিনদের বিশ্বাস পোক্ত হয় যে, হালাল শুধু সেটাই, যা আল্লাহ হালাল করেছেন; আর হারাম শুধু সেটাই, যা আল্লাহ হারাম করেছেন।

পূর্বেই আমরা বলে এসেছি যাইদ ইবনু হারিসা রায়িয়াল্লাহু আনহু এ বিধান নাফিল হওয়ার পূর্বে ‘যাইদ ইবনু মুহাম্মাদ’ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুপাতো বোন যয়নাব বিনতু জাহাশ রায়িয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে মনোমালিন্য খুব বেড়ে যায়। যাইদ রায়িয়াল্লাহু আনহু তার স্ত্রীর ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রচুর পরিমাণে অভিযোগ জানাতে লাগলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহির মাধ্যমে আগেই অবগত হয়েছিলেন যে, যাইদ রায়িয়াল্লাহু আনহু যয়নাব রায়িয়াল্লাহু আনহাকে তালাক দেবে এবং তিনি তাকে বিয়ে করবেন। কিন্তু মানবিক দুর্বলতাবশত সমালোচনার আশঙ্কায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন, ‘তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ো না, আল্লাহকে ভয় করো।’

এই ঘটনার পরেই কুরআনে নিজ জ্ঞানের বিপরীতে যাইদ রায়িয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশের কারণে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজের ব্যাপারে কিছুটা

তিরস্কার ও সতর্কবার্তা জানিয়ে আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই তিরস্কারের পরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজের এই ভিত্তিহীন সংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন এবং জাহিলিয়গের অবশিষ্ট অমূলক রীতি ও সংস্কৃতিকে চিরতরে গুড়িয়ে দিতে প্রস্তুত হন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتْخَفِي  
فِي تَفْسِيكَ مَا اللَّهُ مُبِدِيهٌ وَاتْخَشِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ سَقْلَمًا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَا  
زَوْجَ جَنَاحَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَذْعِيَّا إِلَيْهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَا  
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَغْفُولاً ﴿٥٧﴾

আর স্মরণ করুন, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যার  
প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাকে বলেছিলেন, ‘তুমি তোমার স্ত্রীকে  
(বিবাহবন্ধনে) রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো।’ আর আপনি  
আপনার অস্তরে গোপন করছিলেন এমন কিছু, যা আল্লাহ প্রকাশ করতে  
চান। আপনি লোকদের (সমালোচনার) ভয় পাছিলেন, অথচ আল্লাহকে  
ভয় করাই আপনার পক্ষে অধিকতর সংগত। তারপর যখন যায়েদ তার  
(স্ত্রী যয়নাবের) সাথে বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে (অর্থাৎ  
আপনার পালকপুত্র যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যয়নাবকে) আপনার সঙ্গে  
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিলাম, যাতে মুমিনদের পালকপুত্ররা তাদের  
স্ত্রীদের সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব নারীকে বিবাহ করার  
ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে। আর আল্লাহর আদেশ  
কার্যকর হয়েই থাকে।[১]

তিরস্কারের পরেই কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়া সাল্লামের এই বিয়ের সমর্থন ও তার বৈধতাকে মজবুত করে, এ সংক্রান্ত সব  
ধরনের দ্বিধা দূর করার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا قَرَضَ اللَّهُ لَهُ مُسْئَنَةً اللَّهُ فِي الْذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلٍ هُوَ كَانَ  
أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ  
يَوْكَفِنِ يَالَّهِ خَسِيبًا ﴿٥٩﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِ الْكُفَّارِ وَلَكِنَ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ  
النَّبِيِّينَ يَوْكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِمَا ﴿٦٠﴾

আল্লাহ তাঁর নবির জন্য যা বিধিবদ্ধ করেছেন, তা করতে তাঁর জন্য কোনো বাধা নেই। (নবি-রাসূলদের মধ্য হতে) পূর্বে যারা অতীত হয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রেও এটিই ছিল আল্লাহর বিধান। আর আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত, অবশ্যভাবী। তারা (পূর্বের নবি-রাসূলগণ) আল্লাহর বাণী প্রচার করতেন, তাকে ভয় করতেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করতেন না। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট। মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যকার কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে সর্বজ্ঞতা।<sup>[১]</sup>

### লালনপালন ও দেখভালের জন্য দন্তক-গ্রহণ

জেনেশুনে আরেকজনের সন্তানকে নিজ পরিবার ও বংশভূক্ত করে তাঁর জন্য ওরসজাত সন্তানের যাবতীয় বিধি-বিধান তথা উন্নরাধিকার, পরিবারের সবার সাথে পর্দাহীনভাবে অবাধে ওঠাবসা, বিয়ে হারাম ইত্যাদি সাব্যস্ত করা ইসলামে সুস্পষ্ট হারাম।

তবে আরেক ধরনের দন্তক আছে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। যেমন : অনেকে এতিম বা পথশিশুকে দন্তক নেয়। তাকে নিজের সন্তানের মতোই মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে লালন করে। ভরণপোষণ, শিক্ষা-দীক্ষার ভার সবই নিজ কাঁধে তুলে নেয়। সে অনেকটা আপন সন্তানের মতোই লালিত-পালিত হয়। কিন্তু পরিবারের কাছে সে তাদের বংশভূক্তও হয় না, আবার তাঁর জন্য ওরসজাত প্রকৃত সন্তানের বিধানগুলোও প্রযোজ্য করা হয় না। এটি অবশ্যই একটি ভালো ও প্রশংসনীয় নিয়ম। যারা এই কাজ করবে, তাঁরা প্রতিদান হিসেবে জানাত পাবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন—

وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَىِ، وَفَرَّجَ يَنْهَىَا شَيْئًا

আমি ও এতিমের প্রতিপালনকারী জানাতে এমনিভাবে নিকটে থাকবে। এই বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দুটি দ্বারা ইঞ্জিত করলেন এবং আঙুল দুটির মাঝে কিঞ্চিত ফাঁক রাখলেন।<sup>[২]</sup>

[১] সুরা আহ্�মাব, আয়াত : ৩৮-৪০

[২] সহিল বুখারি : ৫৩০৪; সুনানু আবি দাউদ : ৫১৫০

‘লাকিত’ (لقيط) হলো পথশিশু, যাকে ‘ইবনুন নাবিল’ (ابن سبيل) ও কলা হয়। এ ধরনের শিশুদের ব্যাপারে খেয়াল রাখতে ইসলামে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যদি কোনো লোক নিঃসন্তান হয় এবং সে তার পালকপুত্রকে সম্পদের কিছু অংশ দিয়ে যেতে চায়, তাহলে সে জীবিত থাকাকালীন পালকপুত্রকে যা ইচ্ছা তা দান করে যেতে পারে, অথবা তার মৃত্যুর পরে তার সন্তুষ্য সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে তাকে দেওয়ার জন্য অসিয়ত করে বেতে পারে।

### কৃত্রিম প্রজননের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?

ইসলাম ব্যভিচার ও দণ্ডকপুত্র গ্রহণকে হারান ঘোষণা দিয়ে মানুবের বৎস-পুরুষের রক্ষা করেছে। আর এর মাধ্যমেই পরিবারবহির্ভূত নকল উপাদান থেকে মুন্দিমদের পরিবারব্যবস্থা নির্মল ও পবিত্র হয়েছে। পরিবারব্যবস্থাকে নির্মল ও সুচ্ছ রাখতেই ইসলাম স্বামী ছাড়া অন্য পুরুবের বীর্য নিয়ে কৃত্রিম প্রজনন ও হারাম ঘোষণা করেছে। বরং এটি আরো জগন্য অপরাধ ও গুরুতর গুনাহের কাজ।

শাহিখ শালতুত বলেন, ‘স্বামী ছাড়া অন্য পুরুবের বীর্য নিয়ে কৃত্রিম প্রজনন জগন্য অপরাধ ও গুরুতর গুনাহের কাজ। এক বিবেচনায় কৃত্রিম প্রজনন তো ব্যভিচারের মতোই। কারণ, ব্যভিচার এবং কৃত্রিম প্রজননের মূল ও শেব ফলাফল একই। আর তা হলো—নারীর গর্ভে শারীরিকভাবে অনুমোদিত বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়াই একটি লোকের বীর্যের অনুপ্রবেশ ঘটছে। অপরাধ সংঘটনের প্রক্রিয়ার মধ্যে ঘাটতি না থাকলে এই কৃত্রিম প্রজনন শরিয়ার বিধানের বিবেচনায় ব্যভিচার বলে সাব্যস্ত হতো, যে ব্যাপারে ইসলামি শরিয়ত হৃদ বা দণ্ডবিধির ব্যবস্থা রেখেছে এবং আসমানি বিধান নাবিল করেছে।

উল্লিখিত প্রক্রিয়ার স্বামী ছাড়া অন্যের বীর্য নিয়ে কৃত্রিম প্রজনন অবৈধ। এটি দণ্ডক নেওয়ার চেয়েও অধিক গুরুতর অপরাধ ও নিকৃষ্ট কাজ। কারণ, কৃত্রিম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জন্মানো সন্তানের মধ্যে শরিয়ার দণ্ডক নিবিদ্ধের উপকরণ পুরোপুরিই বিদ্যমান। যেনন এক বৎসের মধ্যে আরেক বৎসের উপাদানের অনুপ্রবেশ, এছাড়াও অতিরিক্ত হিসেবেরয়েছে ব্যভিচারের সঙ্গে সাদৃশ্য। এমন ঘৃণ্য কাজকে শরিয়াহ, আল্লাহ-প্রদত্ত বিধান এবং একজন উন্নত বুঝির মানুব কখনোই সমর্থন করতে পারে না। এ ধরনের কাজে লিপ্ত হলে মানুব ধীরে ধীরে একসময় পাশবিকতার স্তরে

নেমে যাবে, যেখানে পারস্পরিক সম্মানের কোনো স্থান থাকবে না।<sup>[১]</sup>

আপন বাবা ছাড়া অন্যকে বাবা বলা যাবে কি?

পিতার জন্য সন্তানের বৎশ অসীকারের যেমন সুযোগ ইসলামে নেই, তেমনিভাবে বাবা ছাড়া অন্য কারো দিকে নিজের বৎশ সম্পত্তি করাও বৈধ নয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় এটি একটি লানতযোগ্য জঘন্য কাজ বলে বর্ণিত হয়েছে। আলি রায়িয়াল্লাহু তাআলা আনহু খুতবার মিস্তারে দাঁড়িয়ে তার সংরক্ষিত সহিফা থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য শোনান—

وَمَنِ ادْعَى إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ أَنْتَمَى إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَعَنْهُ لِغَنَّةُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ  
أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبِلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا ، وَلَا عَذْلًا

যে ব্যক্তি নিজের (জন্মদাতা প্রকৃত) পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পিতা বলে দাবি করবে অথবা যে ক্রীতদাস নিজের (আসল) মনিবকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মনিব বলে দাবি করবে, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমগ্র মানব জাতির লানত। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার কোনো ফরজ কিংবা নফল কোনো ইবাদতই কবুল করবেন না।<sup>[২]</sup>

সাদ ইবনু আবি ওয়াকাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنِ ادْعَى إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

যে ব্যক্তি নিজের (জন্মদাতা প্রকৃত) পিতা ব্যতীত অন্য কাউকে নিজের পিতা বলে দাবি করে। অথচ সে জানে যে, সে তার (জন্মদাতা প্রকৃত) পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম।<sup>[৩]</sup>

[১] আল-ফাতাওয়া, শাহিদ শালতুত, পৃষ্ঠা : ৩২৮-৩২৯

[২] সহিহ মুসলিম : ১৩৭০; জামিউত তিরমিয়ি : ২১২৭

[৩] সহিহল বুখারি : ৬৭৬৬, সহিহ মুসলিম : ৬৩

## সন্তানদের হত্যা কোরো না

যথাযথভাবে বংশধারা সংরক্ষণের পরে ইসলাম সন্তান ও পিতার পারস্পরিক কিছু অধিকার নির্ধারণের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। এজন্য ইসলাম পিতা ও সন্তান উভয়ের ওপর কিছু বিষয় অপরিহার্য করে দিয়েছে। অনুরূপ তাদের পরপরের অধিকার রক্ষার্থে তাদের জন্য কিছু বিষয় নিষিদ্ধও করেছে।

সুতরাং জন্মের পর বেঁচে থাকাটা সন্তানের অধিকার। তাকে হত্যা বা জীবন্ত পুত্রে ফেলা—জাহিলি যুগের আরবরা যেটা করত—সন্তানের জীবনের ওপর এ ধরনের সীমালঙ্ঘনের কোনো অধিকার পিতা-মাতা কারোরই নেই। সন্তান সে পুত্র হোক বা কন্যা, সবাই এক্ষেত্রে সমান। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ تُخْنُنُ نَرْزَقَهُمْ وَإِلَيْكُمْ إِنَّ قَاتِلَهُمْ كَانَ خِطَّاءً كَيْبِرًا ①

আর দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে মেরে ফেলো না। তাদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই রিযিক দিয়ে থাকি। নিচয়ই তাদের প্রাণহরণ মারাত্মক অপরাধ [১]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

وَإِذَا الْمَوْعِدَةُ سُئِلَتْ ② بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

যখন (কিয়ামত দিবসে) জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্য করা হয়েছে? [২]

এ জন্য কাজের কারণ অর্থনৈতিক অথবা লোকজনের ভয় যেটাই হোক না কেন, ইসলামে এই জন্য কাজটি অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ, একই সাথে এটি একটি হত্যা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন এবং একটি দুর্বল প্রাণের ওপরে সীমালঙ্ঘন। এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিযিকের ভয়ে সন্তান-হত্যাকে

[১] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৩১

[২] সুরা তাকভির, আয়াত : ৮-৯

শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ বলে অভিহিত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ  
রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الذَّئْبٍ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ بِنًّا وَهُوَ خَلْقُكَ» فُلْتُ : نَمْ  
أَيُّ ؟ قَالَ : «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعْكَ

আমি (নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর  
রাসূল, কোন গুনাহ সবচেয়ে মারাত্মক? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য শরিক বা  
অংশীদার দাঁড় করানো; অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি (পুনরায়)  
জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন গুনাহ? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার সাথে  
খাবে, এ আশঙ্কায় তোমার সন্তানকে হত্যা করা।[১]

এই অপরাধের নিষিদ্ধতা এবং এটাসহ অন্যান্য অপরাধ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে  
পুরুষদের মতো নারীরাও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত  
(আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেছিলেন। কুরআনে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَأِغْتَنِكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا  
يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أُولَادَهُنَّ...  
⑯

হে নবি, মুমিন নারীগণ যখন আপনার কাছে এসে বাইআত (আনুগত্যের  
শপথ) গ্রহণ করে এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো শরিক  
(অংশীদার) স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের  
সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।[২]

অনুরূপ সন্তানের আরেকটি অধিকার হলো, তার সুন্দর একটি নাম রাখা। এমন  
কোনো নাম রাখা উচিত নয়, যার কারণে বড় হলে তার কষ্ট পেতে হয়। পিতার জন্য  
সন্তানের এমন নাম রাখা নিষিদ্ধ, যে নামের মধ্যে গাইরুল্লাহ বা মাখলুকের দাসত্বের  
অর্থ পাওয়া যায়। যেমন আব্দুল্লাহি (নবির গোলাম), আব্দুল মাসিহ, (মাসিহের

[১] সহিল বুখারি : ৭৫৩২; সহিহ মুসলিম : ৮৬

[২] সুরা মুমতাহিনা, আয়াত : ১২

গোলাম) আব্দুল হুসাইন (হুসাইনের গোলাম) ইত্যাদি। ইসলামে সন্তানদের এ ধরনের নাম রাখার অনুমতি নেই।

অনুরূপ সন্তানের আরেকটি অধিকার হলো, তার যথাযথ দেখভাল করা এবং তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা। সন্তানের এসব অধিকারও যাতে বিনষ্ট না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَإِلِّمَانُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَوَلِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

জেনে রেখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম বা শাসনকর্তা, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল; তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার ও তার সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে দায়িত্বশীল; সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে [১]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

كُفَّىٰ بِالْمُزْءُونِ إِنَّمَا أَنْ يَخِسَّ عَمَّنْ يَمْلِكُ فُوقَهُ

কোনো ব্যক্তি পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যার খাদ্য যোগান দেওয়া তার দায়িত্ব, তার খাদ্য সরবরাহ থেকে বিরত থাকা [২]

আনাস ইবনু মালিক রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১] সহিল বুখারি : ৭১৩৮, সহিহ মুসলিম : ১৮২৯

[২] সহিহ মুসলিম : ৯৯৬; সুনান আবি দাউদ : ১৬৯২

إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، أَحْفِظْ ذَلِكَ أَمْ ضَيْعَ؟ حَتَّى يُسَأَلَ الرَّجُلُ عَلَى  
أَهْلِ بَيْتِهِ

| নিশ্চয় আল্লাহ তাজালা প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন—সে দায়িত্ব পালন করেছে, নাকি অবহেলা করেছে। এমনকি পরিবারের লোকজন সম্পর্কেও কর্তা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[১]

### সন্তানদের মাঝে সমতা বাধ্যতামূলক

দান-উপহারের ক্ষেত্রে পিতার জন্য সন্তানদের মধ্যে সমতা বজায় রাখা আবশ্যিক, যাতে তারাও পিতামাতার প্রতি দায়িত্বের ক্ষেত্রে সমান থাকে। বিনা প্রয়োজনে কাউকে অতিরিক্ত কোনো কিছু দেওয়া, কিন্তু অন্যদেরকে তা থেকে বণ্ণিত রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এতে তাদের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্রোহ সৃষ্টি হতে পারে। মাঝের করণীয় একেত্রে বাবার মতোই।

নুমান ইবনু বাশির রায়িয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

اغْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ ، اغْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ ، اغْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ

| তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমতা বজায় রাখো, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমতা বজায় রাখো, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমতা বজায় রাখো।[২]

এই হাদিসের একটি পেছনের ঘটনা আছে। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন জাবির রায়িয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন—

قَالَتْ امْرَأةٌ بَشِيرٌ: أَنْحَلَ ابْنِي غَلَامَكَ وَأَشْهَدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غَلَامِي ،

[১] আস-সুনানুল কুবরা, নাসাখি : ৯১২৯; সহিল ইবনি হিকমান : ৪৪৯৩; হাদিসটি হাসান।

[২] মুসনাম আহমাদ : ১৮৪৫২; সুনানু আবি দাউদ : ৩৫৪৪; সুনানু আবি দাউদ : ৩৬৮৭; হাদিসটি সহিহ।

وَقَالَتْ: أَشْهِدُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَلَهُ إِخْرَجَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَفَكُلُّهُمْ أَغْطَنَتْ مِثْلَ مَا أَغْطَنَتْهُ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَيْسَ يَصْلَحُ هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهِدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ»

বশির রায়িয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী একবার তাকে (অর্থাৎ তার স্বামী বশির রায়িয়াল্লাহু আনহুকে) বললেন, আমার পুত্রকে (অর্থাৎ নুমান ইবনু বশির রায়িয়াল্লাহু আনহুমাকে) আপনার গোলামটি দান করে দিন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার পক্ষে সাক্ষী রাখুন। তখন তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, অমুকের কন্যা (অর্থাৎ আমার স্ত্রী) আমার কাছে আবদার করেছে, যেন আমি তার পুত্রকে আমার গোলামটি দান করে দিই। আর সে বলেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার পক্ষে সাক্ষী করুন। তখন তিনি জিজেস করলেন, তার (অর্থাৎ তোমার ছেলে নুমানের) কি আরো ভাই আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাদের সকলকে কি প্রদান করেছ, যেরূপ তাকে দিয়েছ? তিনি বললেন, না। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে এটি সঠিক কাজ হবে না। আর আমি হক (অর্থাৎ ন্যায়সংগত কাজ) ছাড়া অন্য কোনো কাজের সাক্ষী হবো না।[১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, (এ দানের পক্ষে সাক্ষী বানাতে চাইলে) আল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বশির রায়িয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِيْ ، وَذَكَرْ مُجَالِدْ فِي حَدِيْثِهِ : إِنْ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَغْدِلْ  
يَتِيْهِمْ كَمَا أَنْ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبْرُوْكَ

আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে এর সাক্ষী রাখো। মুজালিদ রাহিমাহুল্লাহ তার বর্ণিত হাদিসে অতিরিক্ত উল্লেখ করেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার ওপর তাদের হক রয়েছে যে, তুমি তাদের মধ্যে সমতা বজায়

[১] সহিহ মুসলিম : ১৬২৪; সুনান আবি দাউদ : ৩৫৪৫

রাখবে; যেমন তাদের ওপর তোমার অধিকার রয়েছে যে, তারা সবাই তোমার সাথে সদাচার করুক।<sup>[১]</sup>

আরেক বর্ণনায় এসেছে, (এ দানের পক্ষে সাক্ষী বানাতে চাইলে) আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বাশির রায়িয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

فَانْقُوا إِلَهَ وَاغْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

(তুমি যেহেতু তোমার সব সন্তানকে সমানভাবে দান করোনি;) অতএব তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং আপন সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করো।<sup>[২]</sup>

ইমাম আহমাদ ইবনু হাস্বল রাহিমাল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সন্তানদের কেউ প্রতিবন্ধী ইত্যাদি শারীরিক সমস্যা থাকলে প্রয়োজনে তাদের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।

### মিরাস বর্ণনে শারয়ি বিধান

ইনসাফ বা ন্যায়প্রতিষ্ঠা জরুরি এমন আরেকটি বিষয় হলো মিরাস। তাই (মুত্যৱ আগেই সমুদয় সম্পত্তি নিজের প্রিয় সন্তানকে দিয়ে) ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো সন্তানকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করা পিতার জন্য জায়িয নয়। অনুরূপভাবে কন্যাসন্তান কিংবা তার অপ্রিয় স্ত্রীর সন্তানদেরকেও এভাবে মিরাস থেকে বঞ্চিত করা অবৈধ।

মিরাসের উপযুক্ত কোনো আত্মীয়কে কৌশলে মিরাস থেকে মাহরুমের সুযোগ নেই। মিরাসের যাবতীয় বিধিবিধান আল্লাহ তাআলা নিজে ইনসাফ ও প্রজ্ঞার সঙ্গে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। ওয়ারিশদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা অধিকার ধার্য হয়েছে। আদেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ-প্রদত্ত সীমার কোনোরূপ

[১] সুনান আবি দাউদ : ৩৫৪২; মুসনাদ আহমাদ : ১৮৩৭৮; হাদিসটির প্রথম অংশটি সহিহ, তবে মুজালিদের বর্ণিত অতিরিক্ত অংশটুকু দুর্বল। কেননা, এটা তার একক বর্ণনা, যা নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনাকারী বর্ণনা করেননি। আর মুজালিদ এমন কোনো শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী নয়, যার একক বর্ণনা বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়।

[২] সহিল বুখারি : ২৫৮৭, সহিহ মুসলিম : ১৬২৩

লঙ্ঘন না করে। সম্পদ বণ্টনে এই সীমালঙ্ঘনের অর্থ হলো, আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও ফয়সালায় অন্যায্যতা খুঁজে বের করা।

আল্লাহ তাআলা মিরাসের বিষয়গুলো কুরআনের তিনটি আয়াতে বর্ণনা করে দিয়েছেন। প্রথম আয়াতের শেষে মহান আল্লাহ বলেন—

اَنَاۤ اُكْنِمۤ وَابْنَاۤ كُنۤمۤ لَاۤ تَذَرُونۤ اَيُّهُمۤ أَقْرَبُ لَكُمۤ نَفْعًاۤ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِۤ إِنَّ اللَّهَۤ كَانَ عَلَيْهِمَا حَكِيمًاۤ

তোমরা তো জানো না, তোমাদের মাতা-পিতা ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের উপকারের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটবর্তী। এ আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত বিধান। নিচয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় [১]

দ্বিতীয় আয়াতের শেষে আল্লাহ তাআলা বলেন—

غَيْرَ مُضَارِّ حَوْصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِۤ قَوْالَهُ عَلِيهِمْ حَلِيمٌ ۝ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِۤ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَۤ وَرَسُولَهُۤ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاۤ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ يَغْصِبِ اللَّهَۤ وَرَسُولَهُۤ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَاۤ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

আর এটা যেন কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়। এ হলো আল্লাহর নির্দেশ। বস্তুত আল্লাহ সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল। এসব হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জানাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আর এটাই হলো মহাসাফল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে।  
আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি [২]

মিরাসের শেষ আয়াতের পরিসমাপ্তিতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

۝...يُتَبَّعِنَ اللَّهُۤ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّواۤ وَاللَّهُۤ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ১১

[২] সুরা নিসা, আয়াত : ১২-১৪

আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, যাতে তোমরা বিভাস্তিতে পতিত না হও। আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত [১]

মিরাস বণ্টনে শরিয়ার বিধান না মানার অর্থ হলো—শারয়ি সীমারেখা লঙ্ঘন এবং আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার চুক্তি থেকে বিচ্যুতি। তার জন্য অপেক্ষা করছে আল্লাহর প্রস্তুতকৃত মর্মস্তুদ শাস্তি। যেমন আল্লাহ বলেন—

وَمَنْ يَغْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُذْخَلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑯

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনিক শাস্তি [২]

### পিতামাতার অবাধ্যতা কবিরা গুনাহ

সন্তানের ওপর পিতামাতারও কিছু অধিকার আছে। যেমন আনুগত্য দেখানো, সদাচার করা ও কোমল আচরণ করা ইত্যাদি। এগুলো এমন বিষয়, যা প্রকৃতিগতভাবেই সন্তানের মধ্যে থাকাটা স্বাভাবিক। তারা আমাদের জন্য যা করেছেন, তার স্মৃকৃতি ও প্রতিদান হিসেবেই এসব তাদের প্রাপ্য। গর্ভধারণ, স্তন্যদান, লালনপালনের জন্য মায়ের অবদান ও কষ্ট তো সবার কাছেই স্পষ্ট। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَوَصَّيْنَا إِلِّيْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْنَهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْنَهَا وَحَمَلْتُهُ وَفَصَالْتُهُ ثَلَاثُونَ  
شَهْرًا... ⑯

আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করে এবং কষ্ট করে প্রসব করে। আর তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর (সর্বনিম্ন) সময়কাল ৩০ মাস [৩]

[১]সুরা নিসা, আয়াত : ১৭৬

[২]সুরা নিসা, আয়াত : ১৪

[৩]সুরা আহকাফ, আয়াত : ১৫

আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحْقَقُ النَّاسِ  
بِخُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ  
أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ

এক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল,  
হে আল্লাহর রাসূল, আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার কে? তিনি  
বললেন, তোমার মা।

লোকটি বলল, তারপর কে?

তিনি বললেন, তোমার মা।

সে আবার বলল, তারপর কে?

তিনি বললেন, তোমার মা।

সে পুনরায় বলল, তারপর কে?

এবার তিনি বললেন, অতঃপর তোমার বাবা।<sup>[১]</sup>

পিতামাতার অবাধ্যতা ইসলামে জ্ঞান্যতম কবিতা গুনাহ। শিরকের পরেই এ গুনাহের  
স্তর বলে অভিহিত করেছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অনুরূপ বিষয়  
কুরআনেও এসেছে।

সহিল বুখারি ও সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, আবু বাকরা রায়িয়াল্লাহু আনহু  
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أَلَا أَنِّي أَنْهَاكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ» قَلَنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: 'إِلَّا شَرَكَ بِاللَّهِ، وَعُغْفُوقَ  
الوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُنَكِّئًا فَجَلَسَ قَالَ: أَلَا وَقُولُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقُولُ الزُّورِ،  
وَشَهَادَةُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا، حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْكُنْ

[১] সহিল বুখারি : ৫৯৭১; সহিহ মুসলিম : ২৫৪৮

আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় (কবিরা) গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করব না? আমরা বললাম, অবশ্যই সতর্ক করবেন, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক (অংশীদার) গণ্য করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা। এ কথা বলার সময় তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। এরপর (সোজা হয়ে) উঠে বসলেন এবং বললেন, শুনে রাখো (আরেকটি কবিরা গুনাহ হলো) মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। অতঃপর কথাটি ক্রমাগত বলেই চললেন। এমনকি একপর্যায়ে আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি হয়তো (আজ) থামবেন না।[১]

ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

تَلَاقَنَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْنَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لِوَالدَّينِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرْجِلَةُ،  
وَالدَّيْوُثُ

তিনি ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকবেন না—পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের বেশধারী নারী ও দায়ুস (পরিবারে অঞ্জলিতার অনুমোদনদাতা) পুরুষ।[২]

আবু বাকরা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مَا شَاءَ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى  
يُعِجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ

সকল অপরাধের শাস্তি আল্লাহ তাআলা চাইলে কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করতে পারেন, তবে পিতামাতার অবাধ্যতার শাস্তি এর ব্যতিক্রম। কারণ, এর শাস্তি আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর আগে দুনিয়াতেই ভোগ করান।[৩]

[১] সহিল বুখারি : ৫৯৭৬; সহিহ মুসলিম : ৮৭

[২] সুনানুল নাসাই : ২৫৬২; মুসনাদু আহমাদ : ৬১৮০; হাদিসটি হাসান।

[৩] মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৭২৬৩; আল-আদাবুল মুফরাদ : ৫৯১; শুআবুল ঈমান : ৭৫০৫; হাদিসটি

পিতামাতা যখন বাধ্যকে উপনীত হয়, ক্ষীণ হয়ে আসে তাদের শক্তি, প্রয়োজন পড়ে অতিরিক্ত যত্নের, তখন তাদের কথা ও ব্যথাগুলোর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে কুরআনে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَغْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَنْلَعِنُّ عِنْدَكُمْ الْكِبِيرُ أَحْدُهُمَا أَوْ  
كِلَّاهُمَا فَلَا تُقْلِلْ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُوًّا لَّا كَرِيمًا ⑯ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ  
مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْزَحْهُمَا كَمَا رَبَّيْأْنِي صَغِيرًا ⑯

আর আপনার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বাধ্যকে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উহ’ (অর্থাৎ বিরক্তিসূচক কোনো) শব্দটিও বলো না। আর তাদেরকে ধরক দিয়ো না এবং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়বন্ত থাকো এবং (রবের কাছে তাদের জন্য দুআ করে) বলো, হে আমার রব, তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন; যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে।<sup>[১]</sup>

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হুসাইন ইবনু আলি রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَيْئًا مِّنَ الْعُقُوقِ أَدْتَى مِنْ أَفِ لَحَرَمَةٍ

আল্লাহ তাআলা যদি জানতেন যে, পিতামাতার অবাধ্যতায় ‘উহ’ শব্দ থেকেও নিম্নস্তরের কোনো শব্দ আছে, তাহলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সেটাকে হারাম করে দিতেন।<sup>[২]</sup>

যাসান।

[১] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৩-২৪

[২] আল-ফিরদাউস বি-মাসুরিল খিতাব, দাইলামি : ৫০৬৩; তাফসিলুস সামারকান্দি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৬৪-২৬৫; ফাতহুল কাদির, শাওকানি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৬২; বর্ণনাটি সহিহ নয়। বরং হাদিস বিশেষজ্ঞগণ এটাকে মওজু (জাল) কিংবা মারাঞ্চক দুর্বল হাদিস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। [দেখুন, তানমিহ্রুশ শারিয়াতিল মারফুজা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৩৩, কিতাবুল আহকাম ওয়াল হুদুদ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, হাদিস : ৭১]

## পিতামাতার সম্মানহানি করা কবিরা গুনাহ

তয়ংকর বিষয় হলো, অভিশাপ ও গালিগালাজের কাদায় পিতামাতাকে জড়ানোকে নবিজি সাল্লামাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু হারাম বলেই ক্ষান্ত থাকেননি; বরং তিনি একে কবিরা গুনাহ বলে সাব্যস্ত করেছেন। আবুল্লাহ ইবনু আমর রাখিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লামাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يُلْعَنَ الرَّجُلُ وَالدَّيْنِ  
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يُلْعَنُ الرَّجُلُ  
وَالدَّيْنِ؟ قَالَ: «يَسْبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، وَيَسْبُ أُمَّةً فَيَسْبُ أُمَّةً»

নিচ্যই কবিরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নিজের পিতামাতাকে লানত (অর্থাৎ অভিসম্পাত ও গালমন্দ) করা। জিজেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, আপন পিতা-মাতাকে কোনো লোক কীভাবে লানত (অর্থাৎ অভিসম্পাত ও গালমন্দ) করতে পারে? তিনি বললেন, সে অন্যের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে (প্রতিশোধ হিসেবে) তার পিতাকেও গালি দেয়, এভাবে সে অন্যের মাকে গালি দেয়, তখন সে (প্রতিশোধ হিসেবে) তার মাকেও গালি দেয়।[১]

পিতামাতাকে গালি দেওয়ার কারণ হওয়াই এত বড় অপরাধ! এখন চিন্তা করে দেখুন, কেউ যদি নিজে তার পিতামাতাকে সরাসরি গালি দেয়, তাহলে সেটা কত মারাত্মক অপরাধ হবে?

## পিতামাতার অনুমতি ছাড়া নফল জিহাদে যাওয়া যাবে কি?

পিতামাতার সন্তুষ্টির প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে ইসলামে বিধান দেওয়া হয়েছে, তাদের অনুমতি ছাড়া সন্তানের জন্য নফল জিহাদে যাওয়াও বৈধ নয়।[২]

[১] সহিল বুখারি : ৫৯৭৩, সহিহ মুসলিম : ৯০

[২] এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে, যখন জিহাদ ফরজে আইন হবে না। তবে জিহাদ যদি ফরজে আইন হয়ে যাব তখন কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় প্রত্যেকেই জিহাদে বের হয়ে যাওয়াটা আবশ্যিক। সন্তান তার পিতামাতার অনুমতির অপেক্ষা করবে না, স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর অনুমতি লাগবে না এবং গোলাম তার মনিবের আদেশের অপেক্ষায় থাকবে না। বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী মুসলিমদের সর্বাধিনয়ক আমিরের ডাকে সাড়া দেবে এবং তাকে সাধ্যানুসারে সাহায্য করবে। তবে পিতামাতার অবস্থা যদি এমন হয় যে, তাদের সেবা-শুরুৱা দরকার, নইলে তারা মারা যাবেন বা ভয়ানক জীবন-সংকটে পড়বে

অথচ তাহাজ্জুদ বা সিয়াম কিছুই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ফয়লত ও গুরুত্বের সমকক্ষ নয়।

আবুল্লাহ ইবনু আমর রায়িয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ : «أَحَبُّ  
وَالْإِدَالَةَ ؟» ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَفِيهِمَا فَجَاهَدْ

এক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে জিহাদে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছে? সে বলল, হ্যাঁ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে তাদের খিদমতের জন্যই জিহাদ (অর্থাৎ প্রচেষ্টা) করো [১]

আরেক বর্ণনায় এসেছে, আবুল্লাহ ইবনু আমর রায়িয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَفْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَبِي إِعْكَافٍ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ ، أَبْتَغَيِ  
الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ ، قَالَ : فَهَلْ مِنْ وَالْدَّيْنِكَ أَحَدٌ حَيٌّ ؟» ، قَالَ : نَعَمْ ، بَلْ كِلَاهُمَا ، قَالَ :  
«فَتَبَتَّغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ ؟» ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَازِغٌ إِلَى وَالْدَّيْنِ قَاهِسٌ  
صُحْبَتَهُمَا

এক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আগমন করল। এরপর সে বলল, আমি আপনার নিকট হিজরত ও জিহাদের জন্য বাহিআত হতে চাই। (এর দ্বারা) আমি আল্লাহর কাছে পূর্বস্কার ও বিনিময় আশা করি। তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কেউ জীবিত আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, তারা উভয়েই জীবিত। তিনি আবার বললেন, সত্যিই কি তুমি আল্লাহর নিকট

এবং তাদের সেবা-শুণ্ডুরা ও দেখাশোনা করার মতো তাদের একমাত্র সন্তান ছাড়া আর কেউ নেই, তাহলে সেক্ষেত্রে পিতামাতার জ্ঞান বৰ্ণানোর জন্য তাদের পাশে সন্তানের থাকাটা জরুরি। এরকম বিরল বিশেষ মুহূর্তে তার জন্য জিহাদের আবশ্যিকীয়তা শিথিল হয়ে যাবে। আর জিহাদ যদি ফরজে আইন না হয়, তাহলে তখন সবার জন্য জিহাদ করাটা ফরজ থাকে না; বরং মুসলিমদের একদল এ বিধান পালন করলে সকলের পক্ষ থেকেই দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। এটাকে বলা হয় ফরজে কিফায়া। সুতরাং একদল জিহাদের কাজ আল্লাম দিলে এমতাবস্থায় অন্যদের জিহাদে যাওয়াটা যেহেতু নফল, তাই পিতামাতা জীবিত থাকলে এটার জন্য তাদের অনুমতি নেওয়া জরুরি। [আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া, খণ্ড : ১৬, পৃষ্ঠা : ১৩২-১৩৪]

[১] সংহিতা বুখারি : ৩০০৪; সহিহ মুসলিম : ২৫৪৯

প্রতিদান কামনা করো? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তুমি তোমার মাতা-পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের দুজনের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করো।<sup>[১]</sup>

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবুল্লাহ ইবনু আমর রায়িয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

جاء رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: حِثْ أَبَا يَعْلَكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَوْكِثُ أَبَوَيِّ يَنْكِيَانِ، فَقَالَ: «اْرْجِعْ عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا»

এক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি আপনার কাছে হিজরতের জন্য বাইআত হতে এসেছি এবং আমার মাতা-পিতাকে কানারত অবস্থায় রেখে এসেছি। তিনি বললেন, তুমি ফিরে যাও। তাদেরকে যেভাবে কাঁদিয়েছ সেভাবে তাদেরকে হাসাও।<sup>[২]</sup>

আবু সাইদ খুদরি রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنْ رَجُلًا هاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟» ، قَالَ: أَبْوَايِّ ، قَالَ: «أَذِنَا لَكَ؟» ، قَالَ: «لَا» ، قَالَ: «اْرْجِعْ إِنْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَإِلَّا فِرَّهُمَا

এক ব্যক্তি ইয়ামেন থেকে হিজরত করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হলো। তিনি তাকে জিঞ্জেস করলেন, ইয়ামেনে কি তোমার কেউ আছে? জবাবে সে বলল, আমার পিতা-মাতা আছে। তিনি পুনরায় জিঞ্জেস করলেন, তারা তোমাকে (জিহাদের জন্য) অনুমতি দিয়েছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তবে তুমি ফিরে গিয়ে তাদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করো। তারা যদি তোমাকে অনুমতি দেয় তাহলে জিহাদে অংশগ্রহণ করো, অন্যথায় তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকো।<sup>[৩]</sup>

[১] সহিহ মুসলিম : ২৫৪৯; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৭৮২৯

[২] সুনানু আবি দাউদ : ২৫২৮; সুনানু নাসারি : ৪১৬৩; হাদিসটি সহিহ।

[৩] সুনানু আবি দাউদ : ২৫৩০; সহিহ ইবনি হিবান : ৪২২; হাদিসটি হাসান।

## পিতামাতা মুশরিক হলে করণীয়

পিতামাতার সঙ্গে সদাচার বিষয়ে ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো সর্বাবস্থায় তাদের সাথে অসদাচরণ হারাম। তারা মুশরিক এবং আল্লাহর অবাধ্য হলেও। এমনকি তারা যদি সন্তানকে দীন থেকে সরানোর জন্য প্রয়াস চালায়, চূড়ান্তভাবে শিরিকে লিপ্ত হয়ে সন্তানকেও সেদিকে আহ্বানকারী হয়, তবু তাদের সাথে অসদাচরণের অনুমতি নেই। শিরিক বা গুনাহের ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করার অনুমতি না থাকলেও পার্থিব জীবনে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা যাবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنْ وَفِصَالُهُ فِي عَامِينِ أَنِ اشْكُرْ لِي  
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ<sup>⑯</sup> وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا  
ثُطِغُهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتْبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنْابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُمْ  
<sup>⑯</sup> بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

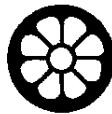
আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কট্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু-বছরে। সুতরাং তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (তোমাদের সকলের) প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে। আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শিরিক (অর্থাৎ অংশীদার সাব্যস্ত) করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে বসবাস করো সন্তানে। আর যে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অনুসরণ কর। অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে অবহিত করব [১]

এই দুই আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—বাবা-মা শিরিকের নির্দেশ দিলে তা মানা যাবে না। কারণ, স্বৃষ্টির অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে সৃষ্টির আনুগত্যের কোনো সুযোগ নেই। আর আল্লাহর সঙ্গে শিরিকের চেয়ে বড় কোনো অবাধ্যতা আছে কি? সুতরাং আল্লাহর অবাধ্যতা (অর্থাৎ ইসলামের বিধিনিষেধ) ছাড়া বাকি সকল

[১]সুরা লুকমান, আয়াত : ১৪-১৫

বিষয়ে তাদের অনুগত হয়ে থাকতে হবে এবং তাদের সঙ্গে সদাচার করতে হবে। তবে সতর্ক থাকতে হবে, তাদের কারণে নিজের ঈমান-আমলের ওপর যেন কোনো আঁচড় না লাগে। এক্ষেত্রে একজন বিশ্বাসী সন্তানের দায়িত্ব হলো, (তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পর তারা ইসলাম গ্রহণ না করলে) সে পুণ্যবান মুমিনদের অনুসূরী হয়ে তাদেরকে আল্লাহ তাআলার হাতে সোপর্দ করে দেবে। শেষ বিচারের দিন, যেদিন পিতা তার সন্তানের আর সন্তান তার পিতার কোনো কাজে আসবে না, সেদিন তাদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার মুআমালা হবে। পিতা-মাতার প্রতি সুন্দর আচরণের এ হলো ইসলামের চূড়ান্ত পর্যায়, কোনো ধর্মই যে স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি।





চতুর্থ অধ্যায়

## সামাজিক জীবনে হালাল-হারাম

### আকিদা ও বিশ্বাস

ইসলামি সমাজের মূলভিত্তি হলো সঠিক আকিদা-বিশ্বাস। বিশুদ্ধ আকিদার মূল ও পুরো ইসলামের সারবস্তু হলো তাওহিদ বা একত্ববাদ। এই বিশুদ্ধ আকিদা ও নির্ভেজাল একত্ববাদ রক্ষাই ছিল ইসলামি শরিয়ার সর্বপ্রথম প্রয়াস ও প্রধান লক্ষ্য। মুসলিম সমাজকে শিরক ও অন্যান্য সকল ভ্রান্তি থেকে মুক্ত রাখার স্বার্থেই পৌত্রিকতার ছড়ানো অবিশ্বাস ও কুসংস্কারের সঙ্গে ইসলামের বিরোধ ছিল অনিবার্য।

### সবার ওপরে ইসলাম

মুসলিমদের মধ্যে ইসলামের রোপিত প্রথম বীজ হলো, মানবজাতির বাসস্থল এই বিশাল পৃথিবী যেভাবে পরিচালক ও শৃঙ্খলাহীন চলতে পারে না, তেমনিভাবে সবার ইচ্ছামতো চলাও এর পক্ষে অসম্ভব। কারণ, একেকজনের চাহিদা একেকরকম, তাহাড়া তাদের অন্ধত্ব ও সীমাবদ্ধতার সমস্যা তো আছেই। এ ব্যাপারে কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে—

وَلَوْ أَتَيْتُهُمْ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بِلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ  
عَنْ ذِكْرِهِمْ مُغَرِّضُونَ (১)

আর যদি সত্য তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হতো তাহলে আসমানসমূহ, জমিন ও এদের মধ্যবর্তী সবকিছুই বিপর্যস্ত হয়ে যেত; বরং আমি তাদেরকে দিয়েছি তাদের উপদেশবাণী (কুরআন)। কিন্তু তারা তাদের উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।<sup>[১]</sup>

এই বিশ্বচরাচর আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত কিছু নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলা মেনে আবৃত হয়। এসব নির্ধারিত নিয়ম ও রীতিনীতি কখনোই পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় না; যেমনটি কুরআনের একাধিক আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿فَلَن تَجِد لِسْتَنِ اللَّهِ تَبَدِّي لَا وَلَن تَجِد لِسْتَنِ اللَّهِ تَخُوِي لَا...﴾

বস্তুত আপনি আল্লাহর পদ্ধতিতে কখনো কোনো পরিবর্তন পাবেন না  
এবং আল্লাহর রীতি-নীতিতে কোনো পরিবর্তনও পাবেন না।<sup>[২]</sup>

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

﴿وَلَا تَجِد لِسْتَنَا تَخُوِي لَا...﴾

আর আপনি আমার নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবেন না।<sup>[৩]</sup>

প্রকৃত মুসলিমগণ কুরআন-হাদিস থেকে এই সব রীতিনীতি ও নিয়ম-পদ্ধতির প্রতি সম্মান জানাতে শিখে গিয়েছে। তারা এসব নিয়ম-পদ্ধতির পেছনে আল্লাহ তাআলার বর্ণিত বস্তু শুনেই তারা ক্ষান্ত থাকেন। ধর্মব্যবসায়ী, মিথ্যুক ও মাজারিদের আবিষ্কৃত গুপ্তকথায় তারা কর্ণপাত করেন না।

**ভিত্তিহীন কথার বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধ**

নবিযুগে সমাজে কিছু মিথ্যুক ছিল, যারা সমাজে জ্যোতিষী ও গণক হিসেবে পরিচিত।

[১] সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৭১

[২] সূরা ফাতির, আয়াত : ৪৩

[৩] সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৭৭

তাদের দাবি হলো—জিন ইত্যাদির মাধ্যমে তারা ভূত-ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতে পারে। জ্যোতিষ ও গণকশাস্ত্রের মতো মিথ্যাচার—যার কোনো জ্ঞানগত, ঐশ্বরিক বা গ্রন্থকেন্দ্রিক ভিত্তি নেই, এসবের মূলোৎপাটনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাজ করেছেন। তার প্রতি আল্লাহ তাআলা ওহি প্রেরণ করে মানুষকে জানতে বলেছেন যে, অদৃশ্যের খবর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبَعْثُونَ ⑥

আপনি বলুন, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের কোনো জ্ঞান রাখে না এবং তাদেরকে কখন পুনরুত্থিত করা হবে  
(সেটাও) তারা জানে না [১]

এই আয়াত থেকে বোঝা গেল, ফেরেশতা, জিন বা মানুষ কেউই আসলে গায়ের বা অদৃশ্যের বিষয়ে কিছু জানে না।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে গায়েবের কোনো খবর জানেন না, সে ব্যাপারটি তিনি আল্লাহ তাআলার নির্দেশে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আছে—

فُلْ لَا أَمْلِكُ لِتَقْسِيِ نَفْعًا وَلَا ضَرًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَغْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَتَكِنْتُ مِنْ  
الْخَيْرِ وَمَا مَسَنَى السُّوءُ إِنَّمَا إِلَّا نَذِيرٌ وَتَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ⑦

আপনি বলুন, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমি আমার নিজের কোনো উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না। আর আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম, তাহলে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো কেবল ঈমানদার লোকদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী [২]

আল্লাহ তাআলা সুলাইমান আলাইহিস সালামের অনুগত জিনদের সম্পর্কে খবর

[১] সূরা নামল, আয়াত : ৬৫

[২] সূরা আরাফ, আয়াত : ১৮৮

দিয়ে বলেন—

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَيْثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ⑥...

তারা (অর্থাৎ জিনেরা) যদি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকত, তাহলে  
ওরা (এতকাল যাবৎ) লাঞ্ছনিক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না।[১]

সুতরাং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জানানো ছাড়া কোনো মাখলুকের গায়েব বা  
অদৃশ্য সম্পর্কে জানার দাবি মানেই মিথ্যাচার। এটা আল্লাহ তাআলা, সকল মানুষ  
ও বাস্তবতার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট মিথ্যা। আব্দুল্লাহ ইবনু আবুস রাফিয়াল্লাহু আনহুমা  
থেকে একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

جَاءَ بَعْضُ الْوُقُودِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَاهَرَ أَنَّهُ مِنْ يَزْعَمُونَ الْإِطْلَاعَ عَلَى  
الْغَيْبِ ، فَخَبَأُوا لَهُ شَيْئًا فِي أَيْدِيهِمْ وَقَالُوا لَهُ : أَخْبِرْنَا مَا هُوَ ؟ فَقَالَ لَهُمْ فِي صَرَاحَةٍ : إِنِّي  
لَسْتُ بِكَاهِنٍ ، وَإِنَّ الْكَاهِنَةَ وَالْكَهَانَةَ وَالْكُهَانَةَ فِي النَّارِ

একটি প্রতিনিধি দল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো।  
তারা ধারণা করেছিল, তিনি হয়তো সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত, যারা অদৃশ্য  
জানার দাবি করে। ফলে তারা তাদের হাতের মধ্যে কিছু একটা লুকিয়ে রেখে  
তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমদেরকে বলুন তো দেখি, আমাদের হাতে কী  
আছে! তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট ভাষায় বললেন, নিশ্চয়ই আমি কোনো  
গণক নই। আর গণক, ভাগ্য গণনা ও ভবিষ্যদ্বন্দ্বাগণ অবশ্যই (কিয়ামতের দিন)  
জাহানামে প্রবেশ করবে।[২]

### জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস করা কুফুরি

জ্যোতিষী ও গণকদের বিরুদ্ধে শুধু যুদ্ধ ঘোষণাতেই ইসলাম সীমাবদ্ধ থাকেনি;  
বরং তাদের কাছে গমনকারী, তাদেরকে প্রশ্নকারী, তাদের ধারণাপ্রসূত কথাবার্তা

[১] সুরা সাবা, আয়াত : ১৪

[২] নাওয়াদিরুল উসুল ফি আহাদিসির রাসুল, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ২১৬-২১৭; হাদিসটির সনদ সম্পর্কে কিছু  
জানা যায় না, তাই এটার মানও বলা যাচ্ছে না। শাহিখ আলবানি রাহিমাল্লাহ হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন,  
আমি এর সনদ সম্পর্কে জানতে পারিনি। [গয়াতুল মারাম : ২৮৩]

ও আন্তিমে সত্যায়ন করে তাদেরকে সমান গুনাহগার সাব্যস্ত করেছে। নবিজি সাল্লাল্লাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ أَتَى عَرَفًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ، لَمْ تُقْبِلْ لَهُ صَلَاةً أَزْبَعِينَ لَيْلَةً

যে ব্যক্তি কোনো জ্যোতিষীর কাছে গেল এবং তাকে (ভাগ্য গণনা, অদৃশ্যের খবর বা ভবিষ্যদ্বাণী জাতীয় কোনো ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করল, ৪০ রাত পর্যন্ত তার কোনো সালাত কবুল হবে না।<sup>[১]</sup>

আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাতু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন—

مَنْ أَتَى كَاهِنًا ، أَوْ عَرَفًا ، فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি কোনো গণক বা জ্যোতিষীর কাছে গেল, অতঃপর সে যা বলে তা সত্য বলে বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি অবতীর্ণ বিষয় অস্বীকার করল।<sup>[২]</sup>

কেননা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাতু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে যে, গায়েবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার। আল্লাহ তাআলা না জানালে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তিনিই যদি গায়েব বা অদৃশ্যের খবর না জানেন তাহলে তো অন্যদের বেলায় প্রশ্নই ওঠে না। এ ব্যাপারে পরিত্র কুরআনে আছে—

فُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَغْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلِكٌ إِنْ أَنْتُ بِإِلَّا مَا  
بُوَحَى إِلَيَّ فُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿١﴾

(হে নবি,) আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ভাস্তুরসমূহ আছে, আর আমি গায়েবও জানি না এবং তোমাদেরকে

[১] সহিহ মুসলিম : ২২৩০; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৬৫১০

[২] মুসলানু আহমাদ : ৯৫৩৬; মুস্তাদরাকুল হাকিম : ১৫; হাদিসতি হাসান।

আমি এটাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। বস্তুত আমার প্রতি যা ওহিরূপে প্রেরণ করা হয়, আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি। আপনি (তাদেরকে জিঞ্জেস করে) বলুন, অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান হতে পারে? অতএব তোমরা কি চিন্তা করবে না?<sup>[১]</sup>

---

একজন মুসলিম কুরআন থেকে এই স্পষ্ট ও দ্যর্থহীন বক্তব্য জানার পরেও যদি এমন বিশ্বাস রাখে যে, কিছু মানুষ গায়ের এবং তাকদিরের কথা জানে, তাহলে তো সে বাস্তবিকই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ বিষয় অসীকার করল।

### তিরের মাধ্যমে ভাগ্য-পরীক্ষা

যেহেতু গায়েবের খবর একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন, আল্লাহ না জানালে কোনো মাখলুকের পক্ষে তা জানার অবকাশ নেই, এ কারণেই ইসলামে তিরের মাধ্যমে ভাগ্য-পরীক্ষা হারাম করা হয়েছে। তিরের মাধ্যমে ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত আরবি শব্দ হলো—بِالْإِسْتِقْسَامِ بِالْأَذْكَرِ বা তিরসমূহ দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ। مُلْجَأٌ (আয়লাম)-কে আরবিতে دَحْ (কিদাহ)-ও বলা হয়। مُلْجَأٌ (আয়লাম) শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো مَلْجَأٌ (যালাম)। এটার অর্থ হলো, শুভ-অশুভ নির্ণয়ের তির।

জাহিলি যুগে আরবরা তিরসমূহ দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করত। এখানে তিনটি তির থাকত। এর প্রথমটিতে লেখা থাকত—‘আমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন।’ দ্বিতীয়টিতে লেখা থাকত—‘আমার প্রভু নিষেধ করেছেন।’ আর তৃতীয়টিতে লেখা থাকত—‘আমার প্রভু (আদেশ বা নিষেধের বিষয়টি) উপেক্ষা করেছেন।’

সফর, বিয়ে ইত্যাদি বড় কোনো কাজের আগে তারা তাদের দেবদেবীর পূজার ঘরে যেতে। সেখানেই এই তিরগুলো থাকত। এরপর তারা তির ঘোরাত। সুতরাং যদি নির্দেশ-সূচক তির বের হয়ে আসত, তাহলে তারা সেই কাজ বাস্তবায়ন করত। আর যদি নিষেধাজ্ঞা-সূচক তির বের হয়ে আসত, তাহলে তারা সেই কাজ হতে বিরত থাকত। আর যদি উপেক্ষা-সূচক তিরটি বের হয়ে আসত তাহলে তারা

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ৫০

তিরগুলো ঘোরাতেই থাকত, যতক্ষণ না আদেশ-সূচক বা নিষেধাজ্ঞা-সূচক কোনো তির বের হয়ে আসে।

সমাজে প্রচলিত অধুনা ভাগ্য-পরীক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি, যেমন : বালু, চাড়া, চাপাতা, কার্ড, হস্তরেখা ইত্যাদির মাধ্যমে ভাগ্য-পরীক্ষাও এর আওতাভুক্ত হয়ে হারাম বলে বিবেচিত হবে।

মৃত জন্ম, রক্ত, শূকরের গোশত ইত্যাদি হারাম খাবারের তালিকা উল্লেখের পরে আল্লাহ তাআলা বলেন—

...وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ...  
②

আর (তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে) জুয়ার তির দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা। এসব গুনাহের কাজ [১]

আবু দারদা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَن يَلِجَ الدَّرَجَاتِ الْغَلِيَ مِنْ تَكَهَّنٍ أَوْ اسْتَقْسَمَ أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرٍ تَطَيِّرُ

ওই ব্যক্তি কখনোই জানাতের সুউচ্চ মর্যাদাসমূহ লাভ করতে সক্ষম হবে না, যে (জ্যোতিষী বা গণক হয়ে) ভবিষ্যদ্বাণী করে অথবা যে তিরের মাধ্যমে ভাগ্য নির্ণয় করে কিংবা কোনো কিছুকে অশুভ লক্ষণ মনে করায় তার সফর স্থগিত করে।[২]

## জাদুবিদ্যা

এরই ধারাবাহিকতায় ইসলাম জাদু ও জাদুকরদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। যারা জাদুবিদ্যা অর্জন করে, তাদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে—

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضْرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ...  
③

[১] সূরা মায়দা, আয়াত : ৩

[২] মুসলাদুশ শাহিয়িন : ২১০৪; আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ২৬৬৩; শুআবুল ঈমান : ১১৩৪, ১০২৫৪; হাদিসটি হাসান।

তারা তা-ই শিখত যা তাদের ক্ষতি করত এবং কোনো উপকারে আসত না [১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাদুকর্মকে ধ্বংসাত্মক কবিরা গুনাহ বলে অভিহিত করেছেন। এসব কাজের দ্বারা ব্যক্তির আগে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আখিরাতের আগে দুনিয়াতেই মানুষ ধ্বংসের মুখে পড়ে। আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوَبِّقَاتِ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشَّرُكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّخْرُ ،  
وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَّا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَيمِ ، وَالْتَّوْلِي يَوْمَ  
الرَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُخْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে বিরত থাকো। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, সেগুলো কী? তিনি বললেন, আল্লাহর সঙ্গে শরিক (অংশীদার) সাব্যস্ত করা, জাদু, অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা, যা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, এতিমের সম্পদ গ্রাস করা, রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং সরল সৃভাবের সতী-সাধ্বী মুমিন নারীদের প্রতি (ব্যভিচার ও অশ্লীলতার) অপবাদ আরোপ [২]

জাদুকে কেমনো কোনো ফকির কুফর বা কুফরের উপকরণ বলেছেন। আবার কোনো কোনো ফকির সমাজকে জাদুর অনিষ্ট থেকে মুক্ত রাখতে জাদুকর হত্যা আবশ্যক বলেছেন [৩]

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১০২

[২] সহিল বুখারি : ২৭৬৬; সহিল মুসলিম : ৮৯

[৩] হানাফি, হাব্বলি মাযহাব অনুসারে জাদুবিদ্যা কুফরি কর্ম। সুতরাং যে ব্যক্তি জাদুবিদ্যা শিখবে কিংবা এটার ব্যবহার করবে সে কাফির বলে বিবেচিত হবে; চাই সে জাদুকে হারাম মনে করুক বা জায়িয। মালিকি মাযহাব মতে, জাদুবিদ্যায় যদি কুফরি থাকে অথবা এটা দ্বারা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয়, তাহলে সে কাফির বলে বিবেচিত হবে। আর শাফিয়ি মাযহাবের মতানুসারে, জাদুবিদ্যা কুফরি কর্ম নয়; বরং এটা হারাম। সুতরাং জাদুকরকে কাফির বলা যাবে না এবং তাকে হত্যাও করা যাবে না; যতক্ষণ না সে এটাকে জ্ঞায়িয় মনে করে কিংবা এমন বিশ্বাস রাখে, যা শরিয়তে কুফর বলে স্বীকৃত। কেবল এই দুই অবস্থায় সে কাফির বলে বিবেচিত হবে। হানাফিদের মধ্যে ইয়াম ইবনুল হুমাম রাহিমাহ্লাহ ও কিছু ফকির ইয়াম শাফিয়ি রাহিমাহ্লাহ এ মত গ্রহণ করেছেন। পূর্বোক্ত দুটি অবস্থা ছাড়াও ইয়াম ইবনুল হুমাম রাহিমাহ্লাহ

জাদুকরদের অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার দুআ কুরআনেই আল্লাহ তাআলা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। কুরআনে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পড়তে বলা হয়েছে—

### وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ①

আর (আমি আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি,) প্রথিতে ফুঁৎকার  
দিয়ে জাদুকারণীদের অনিষ্ট থেকে [১]

গিটের মধ্যে ফুঁ দেওয়া জাদুর একটি বিশেষ পদ্ধতি। মুমিনদের জন্য জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া যেমন হারাম, তেমনি কোনো রোগমুক্তি বা বিপদ থেকে উত্থার পাওয়ার জন্য জাদুকরদের কাছে যাওয়া বা জাদুর আশ্রয় নেওয়াও হারাম (বরং

আরো একটি অবস্থায় জাদুকরকে কফির বলেছেন। আর সেটা হলো, যদি সে এমন বিশ্বাস রাখে যে, শ্যাতন্ত্র তার ইচ্ছানুসারে কাজ করে। সুতরাং এক্ষেত্রেও সে কফির বলে বিবেচিত হবে।

আর তার শাস্তির ব্যাপারে কথা হলো, হানাফি মাযহাবের মতানুসারে তাকে দুই অবস্থায় হত্যা করতে হবে। এক. যদি তার জাদুতে বিশ্বাসগত বা কর্মগত কোনো কুফর থাকে। দুই. যদি সে এমন জাদুবিদ্যার অনুশীলনে আস্ত্রনিয়োগ করে, যা পৃথিবীতে অনিষ্ট ও ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং মানুষের ক্ষতিসাধন করে; যদিও তার জাদুতে কোনো কুফরি না থাকে। সুতরাং যদি কারো জাদুর বিষয়টি তার সীকারোন্তি বা সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়, তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে, তাকে তাওবা করতে বলা হবে না। তাওবা করলেও তার হত্যা রাহিত হবে না। চাই সে ইতিঃপূর্বে মুসলিম হয়ে থাকুক বা জিন্মি (দারুল ইসলামে জিজিয়া দিয়ে বসবাসকারী কফির)। তবে তাকে পাকড়াও করার আগে যদি সে তাওবা করে নেয়, তাহলে তার তাওবা কবুল করা হবে প্রবং তার হত্যা রাহিত হয়ে যাবে। আর মালিকি মাযহাব মতে, জাদুকরকে হত্যা করা হবে, যদি তার কর্মকে কুফর বলে রায় দেওয়া এবং বিষয়টি বিচারকের কাছে প্রমাণিত হয়। তবে সে যদি জিন্মি হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না; বরং অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হবে। অবশ্য সে তার জাদু দ্বারা কোনো মুসলিমের ক্ষতি করে থাকলে কিংবা কোনো জিন্মিকে হত্যা করে থাকলে সেক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা হবে। আর শাফিয়ি মাযহাব অনুসারে, জাদুকরের জাদুর মধ্যে যদি কুফরি কিছু না পাওয়া যায় তাহলে এটা গুনাহের কাজ ও হারাম; তাই তাকে হত্যা করা যাবে না। তবে সে যদি তার জাদু দ্বারা কাউকে হত্যা করে এবং সীকার করে যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে হত্যার করার জন্য জাদু করেছে, সেক্ষেত্রে তাকে কিসাস হিসেবে হত্যা করা হবে। আর হাফ্লি মাযহাবের মত হলো, জাদুকরকে হত্যা করা হবে; যদি সে তার জাদু দ্বারা কাউকে হত্যা না করে থাকে। তবে তাকে হত্যার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। এক. তার কর্মকে কুফর বলে রায় দেওয়া হবে, অথবা সে জাদুকে জায়িয় মনে করবে। দুই. ইতিঃপূর্বে সে মুসলিম হতে হবে। সুতরাং সে যদি জিন্মি হয় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে না। অবশ্য তার জাদু দ্বারা কাউকে হত্যা করলে সেক্ষেত্রে কিসাসস্বরূপ তাকে হত্যা করা হবে। [রদ্দুল মুহত্তার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৪০; তাবয়িনুল হাকায়িক, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৯৩; আল-বিনায়া শাম্রুল হিদায়া, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৯৭; আল-মাত্সুআতুল ফিকহিয়া, খণ্ড : ২৪, পৃষ্ঠা : ২৬৪-২৬৭]

[১] সুন্না ফালাক, আয়াত : ৪

ক্ষেত্রবিশেষে কুফর)। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন লোকদের থেকে তার দায়মুস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। ইমরান ইবনু হুসাইন রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَهَّرَ أَوْ تُطَهَّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهُّنَ أَوْ تُكَهُّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُجْرَ لَهُ

যে ব্যক্তি অশুভ লক্ষণ প্রহণ করে বা যার জন্য অশুভ লক্ষণ প্রহণ করা হয়, যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করে বা যার জন্য ভাগ্য গণনা করা হয়, যে ব্যক্তি জাদু করে বা যার জন্য জাদু করা হয়, সে আমাদের দলভূক্ত নয়।[১]

আবুল্লাহ ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

مَنْ أَتَى عَرَاقًا أَوْ سَاجِرًا أَوْ كَاهِنًا فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

যে ব্যক্তি কোনো গণক বা জাদুকর বা জ্যোতিষীর কাছে গেল, এরপর তাকে (ভাগ্য গণনা, অদৃশ্যের খবর বা ভবিষ্যদ্বাণী জাতীয় কোনো ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করল, অতঃপর সে যা বলে তা সত্য বলে বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি অবতীর্ণ বিষয় অস্বীকার করল।[২]

আবু সাইদ খুদরি রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ حَمْسٍ: مُذْمِنُ حَمْرٍ ، وَلَا مُؤْمِنُ بِسِخْرٍ ، وَلَا قَاطِعُ رَجْمٍ ، وَلَا  
كَاهِنٌ ، وَلَا مَنَانٌ

পাঁচ শ্রেণির লোক জানাতে প্রবেশ করতে পারবে না—মদ্যপ, জাদুতে বিশ্বাসী, আত্মীয়তার বধন ছিন্কারী, জ্যোতিষী ও দান করে খোঁটা-দানকারী।[৩]

[১] মুসনাদুল বাজ্জার : ৩৫৭৮; আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৪৮৪৪; হাদিসটি হাসান।

[২] মুসনাদু আবি ইয়ালা : ৫৪০৮; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৬৪৯৭; বর্ণনাটি হাসান।

[৩] মুসনাদু আহমাদ : ১১১০৭; মুসনাদুল হারিস : ৩১; হাদিসটি হাসান।

নিষিদ্ধতা এখানে কেবল জাদুকরের ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়; বরং জাদুতে বিশ্বাসী, এর সমর্থক ও সত্যায়নকারী প্রত্যেকেই এসব নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত। নিষেধাজ্ঞা ও কদর্যতা আরো বৃন্ধি পাবে, যখন জাদু কোনো নিষিদ্ধ কাজে ব্যবহৃত হবে। যেমন : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ, কারো শারীরিক ক্ষতি ইত্যাদি যেগুলো সাধারণত জাদুকরদের মধ্যে প্রচলিত।

### তাবিজ ব্যবহার কর্তৃকু শরিয়তসম্মত?

এই ধারার আরেকটি বিষয় হলো, রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখার বিশ্বাসে তাবিজ-কবচ বোলানো।<sup>[১]</sup> বিংশ শতাব্দীতে এসেও অনেকে ঘরের দরজায় গরুর শিং, ঘোড়ার

[১] তাবিজ-কবচের ব্যাপারে মাসআলা হলো, যদি তাতে কুফরি বা শিরকি বাক্য থাকে তাহলে জ্ঞাতসারে সেগুলো ব্যবহার করা শিরক, যেমনটি কিছু হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি তাতে এমন কিছু লেখা থাকে, যা দুর্বোধ্য, কিছুই বোঝা যায় না তাহলে এটাও নাজায়িয। আর যদি তাতে কুরআনের আয়াত, আল্লাহ তাআলার নাম ও সিফাত বা হাদিসে বর্ণিত কোনো দুআ লেখা থাকে তাহলে সেটা ব্যবহারের বৈধতা নিয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। একদল বলেন, এটার ব্যবহার জায়িয। এটা আমর ইবনু আস রায়িয়াল্লাহ আনহুর মত। আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহার বর্ণিত হাদিস থেকে বাহ্যিকভাবে এটাই প্রতীয়মান হয়। ইমাম আবু জাফর আল-বাকির রাহিমাল্লাহ এবং এক বর্ণনা মতে, ইমাম আহমাদ রাহিমাল্লাহও এ মত পোষণ করেন। আরেকদল বলেন, এটার ব্যবহার জায়িয নেই। এটা ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহ আনহু ও ইবনু আব্বাস রায়িয়াল্লাহ আনহুর মত। হুয়াইফা রায়িয়াল্লাহু আনহু, উকবা ইবনু আমির রায়িয়াল্লাহু আনহু ও আব্দুল্লাহ ইবনু উকাইয রায়িয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিসসমূহ থেকে বাহ্যিকভাবে এটাই প্রতীয়মান হয়। তাবিয়িন ও পরবর্তীদের মধ্যেও একদল এ মত পোষণ করেন। তন্মধ্যে ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহ আনহুর ছ্যাত্রগণ এবং এক বর্ণনা মতে, ইমাম আহমাদ রাহিমাল্লাহ অন্যতম। সকল দলিল ও পর্যালোচনা সামনে রাখলে সার্বিক বিবেচনায় বোঝা যায়, যদি তাবিজের মধ্যে কুরআনের আয়াত, আল্লাহ তাআলার নাম ও সিফাত কিংবা হাদিসে বর্ণিত কোনো দুআ লেখা থাকে তাহলে এটার ব্যবহার যদিও জায়িয, তবে তা তাবিজ আকারে ব্যবহার না করাই উক্তম এবং তা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আল্লামা নুরুদ্দিন সিরি রাহিমাল্লাহ বলেন, একদল আলিমের মতে, যেসব হাদিসে তাবিজ-কবচকে শিরক বা নাজায়িয বলা হয়েছে, সেখানে তাবিজ-কবচ বলতে তা-ই বোঝানো হয়েছে, যা জাহিলি যুগে প্রচলিত ছিল। যেমন : বিভিন্ন পুঁতিদানা, হিংস্র জানোয়ারের নখ বা হাড় ইত্যাদি। তবে কুরআনের আয়াত, আল্লাহ তাআলার নাম ও সিফাত বা হাদিসে বর্ণিত কোনো দুআ দ্বারা তাবিজ-কবচ বানালে সেটার ব্যবহার বৈধ। আরেককদল আলিমের মতে, হাদিসে যে তাবিজ-কবচকে শিরক বা নাজায়িয বলা হয়েছে, সেটা তখন হবে যখন অন্তরে এ বিশ্বাস রাখবে যে, এসব তাবিজ-কবচ তার উপকার বা ক্ষতি করতে পারে। সুতরাং কেউ যদি বরকতের উদ্দেশ্যে এগুলো ব্যবহার করে তাহলে কোনো সমস্যা নেই, সেটা জায়িয হবে। এ ব্যাপারে সর্বোত্তম ও সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি হলো, কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে বর্ণিত দুআ পড়ে ঝাড়ঁক করা। এভাবে ঝাড়ঁক করার বিষয়টি বেশ কিছু বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কায় আবু বকর ইবনুল আরাবি রাহিমাল্লাহ বলেন, কুরআনের আয়াত বোলানো সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি নয়। এসব ক্ষেত্রে সুন্নাহসম্মত নিয়ম হলো, আয়াত বা দুআ পাঠ করা, তা দিখে ঝুলিয়ে রাখা নয়। [ মাআলিমুস সুনান, খাত্তাবি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২৬; তুহফাতুল আহওয়াজি,

খুর ঝুলিয়ে রাখে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতারকরা মানুষের অঙ্গতা ও সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের জন্য তাবিজ-কবচ লিখে দেয়। এতে তারা বিভিন্ন আঁকিবুঁকি হিজিবিজি লিখে দেয়। বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র পড়ে এবং বলে বেড়ায় যে, এগুলো মানুষকে জিন, ভূতপ্রেত, বদনজর ও হিংসা ইত্যাদি থেকে রক্ষা করবে।

আত্মরক্ষা ও চিকিৎসার জন্য শরিয়ত-অনুমোদিত বৈধ পদ্ধতি রয়েছে। এগুলো ছেড়ে প্রতারক মিথ্যকদের পথ ও পথ্থা অনুসরণকারীদের নিন্দা জানানো হয়েছে। আনাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ ، خَلَقَ الدَّوَاءَ ، فَتَدَاوُوا

| নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা যেখানে রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করেছেন, সেখানে তিনি প্রতিবেধকও সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো।[১]

সহিল বুখারির বর্ণনায় এসেছে, আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا دِرْجَةً شِفَاءً

| আল্লাহ তাআলা এমন কোনো রোগ দেননি, যার জন্য তিনি আরোগ্যের ব্যবস্থা পাঠাননি।[২]

সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, জাবির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ

| প্রতিটি রোগেরই প্রতিবেধক রয়েছে।[৩]

খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২০০-২০১; আওনুল মাবুদ, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ২৫০; হাশিয়াতুস সিন্দি আলা সুনানিন নাসায়ি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১১২]

[১] মুসলাদু আহমাদ : ১২৫৯৬; মুসাম্মাফু ইবনি আবি শাইবা : ২৩৮৮১; হাদিসাটি সহিহ।

[২] সহিল বুখারি : ৫৬৭৮; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৪৩৯

[৩] সহিহ মুসলিম : ২২০৪; সুনানু আবি দাউদ : ৩৮৭৪; সহিল ইবনি হিবান : ৬০৬৩

অন্য হাদিসে আছে, জাবির ইবনু আবিল্লাহ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

إِنَّ كَانَ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ، فَفِي شَرْبَةٍ عَسَلٌ، أَوْ شَرْطَةٍ مِّنْ جَمِّ، أَوْ لَذْعَةٍ  
مِّنْ نَارٍ

যদি তোমাদের ওষুধগুলোর কোনোটিতে কল্যাণ থাকে, তাহলে তা আছে মধুপানে বা শিঙা লাগানোতে কিংবা আগুন দিয়ে দাগ লাগানোতে (অর্থাৎ আগুন দ্বারা সেক দেওয়া বা গরম লোহা দ্বারা দাগ দেওয়া, যা আগেকার চিকিৎসাস্মৰ্ত্তে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ) [১]

হাদিসে বর্ণিত এই তিনটি জিনিস সরাসরি বা পরোক্ষভাবে বর্তমান সময়ের আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থার বিভিন্ন পদ্ধতিকে শামিল করে। যেমন : মুখ দিয়ে সেবনযোগ্য সকল ওষুধ, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে অস্ত্রোপচার, আগুনের সেক, ইলেক্ট্রিক শক ইত্যাদি। অন্যদিকে চিকিৎসা ও আত্মরক্ষার জন্য কবিরাজদের দেওয়া তাবিজ, রক্ষাকবচ, মাদুলি পরা এবং অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য নানা রকমের মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেওয়া সবই অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি। এসব কাজ আল্লাহর বিধান ও তার তাওহিদ বা একত্বাদের শিক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

উকবা ইবনু আমির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

جَاءَ فِي رَكْبِ عَشَرَةٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَائِعٌ تِسْنَعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ يَنْعِيَةِ رَجُلٍ  
مِّنْهُمْ، فَقَالُوا: مَا شَاءَ هَذَا الرَّجُلُ لَا تُبَايِعُهُ؟ فَقَالَ: «إِنَّ فِي عَصْدِهِ ثَمِيمَةً» فَقَطَعَ الرَّجُلُ  
الثَّمِيمَةَ، فَبَيَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ عَلَقَ فَقَدْ أَشْرَكَ

১০ জন লোকের একটি কাফেলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে (বাইআত হওয়ার জন্য) এলো। তিনি ৯ জনের বাইআত নিলেন, অবশিষ্ট একজনের থেকে বিরত থাকলেন। তারা জিজেস করলেন, তার সমস্যা কী যে, আপনি তার বাইআত নিচ্ছেন না? তখন তিনি বললেন, তার বাহুতে তাবিজ লাগানো আছে! অতঃপর লোকটি তাবিজ কেটে ফেলল। এরপর আল্লাহর রাসুল

[১] সহিহুল বুখারি : ৫৭০২, সহিহ মুসলিম : ২২০৫

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাইআত প্রহণ করে বললেন, যে এসব তাবিজ পরল, সে শিরক করল।[১]

আরেক হাদিসে এসেছে, উকবা ইবনু আমির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

مَنْ عَلَقَ نَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ عَلَقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ

যে ব্যক্তি শরীরে তাবিজ খোলায়, আল্লাহ যেন তার কাজ পূর্ণ না করেন! আর যে ব্যক্তি মাদুলি খোলায়, আল্লাহ যেন তাকে নিরাপদ না রাখেন।[২]

ইমরান ইবনু হুসাইন রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ عَلَى عَضِيدٍ رَجُلٍ حَلْقَةً ، أَرَاهُ قَالَ مِنْ صُفْرٍ ، فَقَالَ : وَبِحَثَّ مَا هَذِهِ ؟ قَالَ : مِنَ الْوَاهِنَةِ ؟ قَالَ : أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهُنَّا أَنِيدُهَا عَنْكَ ؛ فَإِنَّكَ لَوْ مِتْ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبْدًا .

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোকের বাহুতে একটি মাদুলি দেখতে পেলেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমার মনে হয়, তিনি (অর্থাৎ ইমরান ইবনু হুসাইন রায়িয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন, সেটি পিতলের ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার জন্য আফসোস! তোমার হাতে এটা কী? লোকটি বলল, এটা দুর্বলতা রোধের জন্য। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, শোনো, এই জিনিস তোমার দুর্বলতা কেবল বৃদ্ধিই করবে। ফেলে দাও এটা। কেননা, এটা শরীরে থাকা অবস্থায় যদি তুমি মারা যাও, তাহলে (আধিরাত ধৰ্ষস হয়ে যাওয়ায়) তুমি কখনোই সফল হবে না।[৩]

এই ধরনের শিক্ষা সাহাবিদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল তীব্রভাবে। এজন্য

[১] মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৭৫১৩; মুসনাদু আহমাদ : ১৭৪২২; হাদিসটি সহিহ।

[২] মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৭৫০১; মুসনাদু আহমাদ : ১৭৪০৪; হাদিসটি হাসান।

[৩] মুসনাদু আহমাদ : ২০০০০; সহিল ইবনি হিক্বান : ৬০৮৫, ৬০৮৮; হাদিসটির সনদ যইফ।

তারা এই সব অনর্থক বিচ্ছুতি ও ভাস্তির অনুসরণ ও এগুলোর সত্যায়ন থেকে নিজেদেরকে অনেক উৎবের্ব নিয়ে গিয়েছিলেন।

ঈসা ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবু লাইলা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكِيمٍ أَبِي مَغْبِدِ الْجُهْنَىِّ، أَعْوَدُهُ وَبِهِ حُمْرَةً، قَفَلْنَا: أَلَا تَعْلِقُ  
شَيْئًا؟ قَالَ: الْمَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَعْلِقُ شَيْئًا  
وُكِلَ إِلَيْهِ»

আমি আবু মা'বাদ আব্দুল্লাহ ইবনু উকাইম আল-জুহানি রায়িয়াল্লাহু আনহুর অসুস্থ অবস্থায় তাকে দেখতে গেলাম। তার হাম (জ্বরসহ সারা দেহে ঘামাচির মতো লাল গুটিকা) হয়েছিল। তখন আমরা বললাম, কিছু তাবিজ-কবচ ঝোলাবেন নাকি? তিনি বললেন, এর চেয়ে মৃত্যুই অধিক নিকটবর্তী (অর্থাৎ এটা ব্যবহারের চেয়ে মৃত্যুও ভালো)। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি (তাবিজ-কবচ জাতীয়) কোনো কিছু ঝুলিয়ে রাখে তাকে তার প্রতিই সোপর্দ করা হয়।<sup>[১]</sup>

ইয়াহুয়া ইবনু জায়য়ার রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন—

دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ وَفِي عُنْقِهَا شَيْءٌ مُعَوَّذٌ، فَجَذَبَهُ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ أَصْبَحَ آلُ  
عَبْدِ اللَّهِ أَغْنِيَاءَ أَنْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَى وَالثَّمَائِمَ، وَالْتَّوْلَةَ شِرْكٌ» قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ،  
هَذِهِ الرُّقَى وَالثَّمَائِمُ قَدْ عَرَفْتَا هُنَّا، فَمَا الْتَّوْلَةُ؟ قَالَ: «شَيْءٌ يَصْنَعُهُ الْإِنْسَانُ يَتَحَبَّبِنَ إِلَى  
أَزْوَاجِهِنَّ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহু একদিন তার স্ত্রীর কাছে প্রবেশ করলেন, যে অবস্থায় তার গলায় তাবিজ-কবচ জাতীয় কিছু একটা ঝুলছিল। তখন তিনি সেটি টেনে কেটে ফেললেন, অতঃপর বললেন, আব্দুল্লাহর পরিবার আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শরিক (অংশীদার) সাব্যস্ত করা থেকে মুক্ত হলো, যে

[১] জামিউত তিরমিয়ি: ২০৭২; মুসনাদু আহমাদ: ১৮৭৮১; হাদিসটি হাসান।

ব্যাপারে তিনি কোনো প্রমাণ অবর্তীর্ণ করেননি। এরপর বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মন্ত্র, তাবিজ-কবচ ও তিওয়ালা হলো শিরক। উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞেস করল, আবু আব্দুর রহমান, তাবিজ-মাদুলি তো চিনলাম, কিন্তু তিওয়ালা জিনিসটা কী? তিনি বললেন, এটা হলো এমন জিনিস, যা (সাধারণত) নারীরা তাদের স্বামীদের কাছে প্রিয় হওয়ার জন্য করে থাকে।<sup>[১]</sup>

ইমাম খাতাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘তিওয়ালা হলো এক ধরনের জাদু। ইসলামি শরিয়তে তাবিজ-কবচ বা ঝাড়ুক শুধু ওইগুলো নিষিদ্ধ, যেগুলো অনারবি দুর্বোধ্য ভাষায় হয়; ফলে জানা যায় না যে, এতে কী বলা হয়েছে। সুতরাং এতে জাদু বা কুফরি কালাম থাকার আশঙ্কায় এগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ। কিন্তু যেগুলো স্পষ্ট অর্থবোধক হয় এবং তাতে আল্লাহর যিকিরি ও বিভিন্ন দুআ-কালাম থাকে সেগুলোর ব্যবহার মুসতাহাব এবং বরকতময়। বরকতের উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা যাবে।’<sup>[২]</sup>

সুতরাং তাবিজ-কবচ ও ঝাড়ুককে আল্লাহর যিকিরি ও বিভিন্ন দুআ-কালাম থাকলে শরিয়তে তা অনুমোদিত। এগুলো মূলত আল্লাহ তাআলার কাছে আরোগ্যের দুআ ও প্রার্থনা; নয়তো সন্তাগতভাবে এগুলো কোনো ওষুধ বা চিকিৎসা নয়। যেহেতু জাহিলি যুগের তাবিজে জাদু, শিরক ও দুর্বোধ্য কালাম থাকত, তাই সেগুলোর ব্যবহার হারাম।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী যয়নব রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

كَانَتْ عَجْوَزْ تَدْخُلُ عَلَيْنَا تَرْقِي مِنَ الْحُمْرَةِ ، وَكَانَ لَنَا سَرِيرٌ طَوِيلُ الْقَوَائِمِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ تَنْخِنَخَ وَصَوْتَ ، فَدَخَلَ يَوْمًا فَلَمَّا سَمِعَتْ صَوْتَهُ احْتَجَبَتْ مِنْهُ ، فَجَاءَ قَجْلَسَ إِلَى جَانِبِي فَمَسَنَّيْ فَوَجَدَ مَسَنَّ خَيْطَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَفَلَتْ: رَقَّ لِي فِيهِ مِنَ الْحُمْرَةِ فَجَذَبَهُ وَقَطَعَهُ قَرْمَى بِهِ وَقَالَ: لَقَدْ أَصْبَحَ الْعَبْدُ اللَّهِ أَغْنِيَاءَ عَنِ الشَّرِكِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَّى ، وَالْتَّمَائِمَ ، وَالْتَّوْلَةَ شِرْكٌ» ، قَلَتْ: فَإِنِّي حَرَجْتُ بَوْمَا فَأَبْصَرْتِي فُلَانْ ، فَدَمَعْتُ عَيْنِي الَّتِي تَلِيهِ ، فَإِذَا رَقَبْتُهَا سَكَنَتْ دَمْعَتْهَا ، وَإِذَا تَرَكْتُهَا

[১] সহিহ ইবনি হিবান: ৬০৯০; মুস্তাদরাকুল হাকিম: ৭৫০৪, ৭৫০৫; হাদিসটি হাসান।

[২] মাআলিমুস সুনান, খাতাবি, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২২৬

دَمْقَتْ، قَالَ: ذَاكِ الشَّيْطَانُ، إِذَا أَطْعَنِيهِ تَرْكَكِ، وَإِذَا عَصَيْتِهِ طَعَنَ بِأَصْبَعِهِ فِي عَيْنِكِ،  
وَلَكِنْ لَوْ فَعَلْتِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَيْرًا لَكِ، وَأَجَدَرَ أَنْ  
تُشْفَيَنَ تَضَحِّيَنَ فِي عَيْنِكِ الْمَاءَ وَتَقُولِينَ: أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِيِّ.  
لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءٌ لَا يُعَادِرُ سَقْمًا

এক বৃদ্ধা মহিলা আমাদের এখানে আসত এবং সে হাম (জুরসহ সারা দেহে  
ঘামাটির মতো লাল গুটিকা) রোগের জন্য ঝাড়ফুক করত। আর আমাদের একটি  
লম্বা পা-বিশিষ্ট খাট ছিল। আবুল্লাহ রায়িয়াল্লাহু আনহুর অভ্যাস ছিল, তিনি ঘরে  
প্রবেশের আগে শব্দ করে কাশি দিতেন। একদিন আমার ঘরে বৃদ্ধা মহিলাটি  
ছিল। তখন আবুল্লাহও চলে এলো। বৃদ্ধা মহিলা তার গলার আওয়াজ শুনতে  
পেয়ে পর্দার আড়ালে চলে গেল। তিনি এসে আমার পাশে বসলেন এবং আমাকে  
স্পর্শ করলে একগাছি সুতার উপস্থিতি টের পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,  
এসব কী? আমি বললাম, হাম রোগের জন্য সুতা পড়া বেঁধেছি। তখন তিনি  
সেটা আমার গলা থেকে টেনে ছিড়ে ফেললেন এবং তা ছুড়ে ফেলে বললেন,  
আবুল্লাহর পরিবার আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শরিক (অংশীদার) সাব্যস্ত করা  
থেকে মুক্ত হলো। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে  
শুনেছি, মন্ত্র, তাবিজ-কবচ ও তিওয়ালা (গিটিযুক্ত মন্ত্রপূত সুতা) হলো শিরক।  
আমি বললাম, আমি একদিন বাইরে যাচ্ছিলাম, তখন অমুক লোক আমাকে  
নজর দিলো। ফলে যে চোখে তার নজর পড়েছে সে চোখ দিয়ে পানি ঝরতে  
লাগল। আমি (এ বৃদ্ধা মহিলার শিখিয়ে দেওয়া) মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে তা থেকে  
পানি ঝরা বন্ধ হয় এবং মন্ত্র পড়া বন্ধ করলেই আবার পানি পড়তে থাকে। তিনি  
বললেন, এটা শয়তানের কাজ। তুমি শয়তানের আনুগাত্য করলে সে তোমাকে  
রেহাই দেয় এবং তার আনুগাত্য না করলে সে তোমার চোখে আঙুল দিয়ে  
খোঁচা দিতে শুরু করে। কিন্তু তুমি যদি তা-ই করতে, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন, তবে তা তোমার জন্য অধিক উত্তম হতো  
এবং আরোগ্য লাভেও অধিক সহায়ক হতো। তুমি তোমার চোখে পানি ছিটিয়ে  
দাও আর এ দুআটি বলো—

أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيِّ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءٌ لَا يُعَادِرُ سَقْمًا

কষ্ট দূর করে দিন, হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান করুন, কেননা আপনিই আরোগ্য দানকারী। আপনার নিরাময় ব্যতীত আর কোনো নিরাময় নেই। আপনি এমন নিরাময় দান করুন, যা কোনো রোগ-ব্যাধিকে আর অবশিষ্ট রাখবে না।[১]

### অশুভ লক্ষণ

কোনো বস্তু, স্থান, সময় ও ব্যক্তি ইত্যাদিকে ধারণাবশত অনেক সমাজে অশুভ মনে করা হয়। যেমন সালিহ আলাইহিস সালামকে তার সম্প্রদায় বলেছিল কুরআনের ভাষায়—

قالُوا اطَّيَرْنَا بِكَ وَمِنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْسِدُونَ ⑯

তারা বলল, আমরা তোমাকে এবং তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে অশুভ (অপয়া বা অলক্ষুণে) বলে মনে করছি। তিনি (অর্থাৎ সালিহ আলাইহিস সালাম) বললেন, তোমাদের অকল্যাণ-অশুভ তো আল্লাহর ইখতিয়ারে।

বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায়, যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।[২]

ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের ওপর কোনো বিপদ আপত্তিত হলে তারা মুসা আলাইহিস সালাম ও তার অনুসারীদেরকে অলক্ষুণে হওয়ার দোষ দিত। কুরআনের ভাষায়—

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطْبِرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑯

এরপর যখন তাদের কাছে কোনো কল্যাণ আসত, তখন তারা বলত, এটা তো আমাদের প্রাপ্য। আর যখন কোনো অকল্যাণ পৌঁছত তখন তারা মুসা ও তার সঙ্গীদের অলক্ষুণে বলে মনে করত। শুনে রাখো, তাদের অকল্যাণ-অশুভ তো কেবল আল্লাহরই ইখতিয়ারে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।[৩]

[১] সুলানু ইবনি মাজাহ : ৩৫৩০; মুসনাদু আহমাদ : ৩৬১৫; হাদিসটি হাসান।

[২] সুরা নামল, আয়াত : ৪৭।

[৩] সুরা আয়াফ, আয়াত : ১৩১।

পথন্ত্রষ্ট ও কাফির সম্প্রদায়ের ওপর আয়াব অবতীর্ণ হলে প্রায় সময় তারা নবি-রাসুলদেরকে অশুভ-অপয়া বলে নিন্দা করত। যেমন : কুরআনে এক জনপদের অধিবাসীদের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা তাদের নিকট আগত রাসুলদেরকে অশুভ বলে তাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল; কুরআনের ভাষায়—

قالُوا إِنَّا نَطَيَرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَزَجْمَنَّكُمْ وَلَيَمْسَنَّكُمْ مِنْا عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑯

তারা (অর্থাৎ রাসুলদের দাওয়াতপ্রাপ্ত গ্রামের অধিবাসীরা) বলল, আমরা তো তোমাদেরকে অশুভ মনে করি। তোমরা যদি (তোমাদের দাওয়াত ও প্রচারণা থেকে) নিবৃত্ত না হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্পর্শ করবে  
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি [১]

এ ধরনের উক্তি শুনে সেসব অবাধ্য সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে নবি-রাসুলদের উক্তি ছিল (কুরআনের ভাষায়)—

قالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكْرُنِمْ بَلْ أَنْثُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ⑯

তারা (রাসুলগণ) বললেন, তোমাদের অশুভ তোমাদেরই সাথে। এটা কি এজন্য (বলা হচ্ছে) যে, তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে? বরং তোমরা হলে এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় [২]

অর্থাৎ তোমাদের অশুভ-অকল্যাণ ও অনিষ্টের কারণ তোমাদের সঙ্গেই আছে। আর সেটা হলো তোমাদের কুফরি, অবাধ্যতা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ লঙ্ঘন।

অশুভ-অলঙ্ঘন মনে করার ব্যাপারে জাহিলি যুগে আরবদের অবস্থা ছিল অনেক ব্যাপক। নানা অবিশ্বাস-কুসংস্কার তাদের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল ব্যাপকভাবে। ইসলাম এসে লোকদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য এগুলোর শিকড়-সহ

[১] সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ১৮

[২] সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ১৯

উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশুভ লক্ষণ গ্রহণকে জাদু ও ভাগ্য গণনার সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করেছেন। যেমন : ইমরান ইবনু হুসাইন রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَنْسَ مَنِ تَطَيِّرَ أَوْ تُطَيِّرَ لَهُ ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكَهِّنَ لَهُ ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُجْرَ لَهُ

যে ব্যক্তি অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে বা যার জন্য অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা হয়, যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করে বা যার জন্য ভাগ্য গণনা করা হয়, যে ব্যক্তি জাদু করে বা যার জন্য জাদু করা হয়, সে আমাদের দলভূক্ত নয়।<sup>[১]</sup>

কাবিসা ইবনু মুখারিক রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الْعِيَافَةُ ، وَالطِّبِّيرَةُ ، وَالْطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ

পাখি ওড়ানোর মাধ্যমে ভালো-মন্দ নির্ণয়, কোনো কিছুকে অশুভ লক্ষণ মনে করা এবং পাথর নিষ্কেপের মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ সবই শয়তানি কর্মকাণ্ড।<sup>[২]</sup>

[১] মুসনাদুল বাজ্জার : ৩৫৭৮; আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৪৮৪৪; হাদিসটি হাসান।

[২] সুনানু আবি দাউদ : ৩৯০৭; মুসনাদু আহমাদ : ১৫৯১৫, ২০৬০৩, ২০৬০৪; সহিলু ইবনি হিবান : ৬১৩১। এ হাদিসটির সনদের মান নির্ণয়ে হাদিস-বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম ইবনু মুফলিহ রাহিমাহুল্লাহ, আলামা শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ, শাইখ ইবনু বাজ রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ হাদিস-বিশেষজ্ঞ এ হাদিসটির সনদকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন। [দেখুন—রিয়ায়ুস সালিহিন, নববি : ১৬৭০; মাজমুউল ফাতওয়া, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ৩৫, পৃষ্ঠা : ১৯২; আল-আদাবুশ শারিয়া, ইবনু মুফলিহ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৬৪; আল-ফাতহুর রাক্কানি, শাওকানি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২৮; মাজমুউল ফাতওয়া ইবনু বাজ, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৯১] তবে শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ ও শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটির সনদকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা, এতে ‘হাইয়ান’ নামের একজন মাজহুল (অজ্ঞাত) বর্ণনাকারী আছে। [গায়াত্রুল মারাম, আলবানি : ৩০১; তাখরিজু মুসনাদি আহমাদ, খণ্ড : ২৫, পৃষ্ঠা : ২৫৬, হাদিস নম্বর ১৫৯১৫ সংশ্লিষ্ট আলোচনা, খণ্ড : ৩৪, পৃষ্ঠা : ২০৮, হাদিস নম্বর ২০৬০৩ সংশ্লিষ্ট আলোচনা, তাহকিক : শুআইব আরনাউত] শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদিসটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে, তবে হাদিসটির মতন (মূলভাষ্য) ঠিক আছে। [মাজমুউল ফাতওয়া ইবনি উসাইমিন, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৫১৭]

সকলের মতামত ও সনদের বাস্তবিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, শাস্ত্রীয় মূলনীতি অনুসারে

অশুভ লক্ষণ গ্রহণ একটি অবাস্তব ও ধারণা-প্রসূত বিষয়। এর মাধ্যমে মানুষ দুর্বলতা, অনুমান ও সন্দেহের পেছনে ছুটতে শুরু করে। অন্যথায় একজন বুদ্ধিমান ও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ কী করে কোনো ব্যক্তি, জায়গা, পাথি, চোখের ইশারা বা কোনো শব্দের মধ্যে অমঙ্গলের লক্ষণ খুঁজে পেতে পারে?

মানবিক দুর্বলতাগুলো মানুষ সাধারণত সুরক্ষার করতে চায় না। বিভিন্ন সুযোগে সেই দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা ঢাকার জন্য সে বিভিন্ন বস্তুকে অশুভ ও অমঙ্গলজনক হিসেবে ঠাওরাতে চায়। কারণ, সীমাবদ্ধতার সুরক্ষারোন্তি তো তার চিন্তার মাঝেই নেই—সে বরং বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়। এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটে অযোগ্যের কাঁধে কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোৰা চাপলে।

এ বিষয়ে একটি মারফু তথা নবিজি সান্নাহাতু আলাইহি ওয়া সান্নামের হাদিস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। হারিসা ইবনু নুমান রায়িয়ান্নাতু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সান্নাহাতু আলাইহি ওয়া সান্নাম বলেছেন—

ثلَاثَةٌ لَا يَسْلِمُ مِنْهُمْ أَحَدٌ: الطَّيْرُ ، وَالظُّنُنُ ، وَالحَسَدُ فِإِذَا تَطَيَّرَتْ فَلَا تَرْجِعُ ، وَإِذَا ظَنَنَتْ فَلَا تَبْغِيْقُ ، وَإِذَا حَسَدَتْ فَلَا تَبْغِيْغُ

তিনটি জিনিস থেকে কেউই মুক্ত থাকতে পারে না। যথা : অনুমান, লক্ষণ গ্রহণ এবং হিংসা। সুতরাং অলঙ্কুণে মনে করে কোনো কিছু থেকে বিরত থেকো না। অনুমান করলে, অনুসন্ধানে বের হয়ো না। হিংসা হলে সীমালঙ্ঘন কোরো না।<sup>[১]</sup>

এই হাদিস থেকে বোৰা যায়, এই তিনটি বিষয় মূলত মানুষের অন্তঃকরণ চিন্তা ও কল্পনানির্ভর বিষয়, যার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো যোগসূত্র নেই।

হাদিসটির সনদগত দুর্বলতার বিষয়টি প্রমাণিত। তবে এ দুর্বলতার মাত্রা যেহেতু খুবই সামান্য, চাইলে এটার সনদকে এক দৃষ্টিকোণ থেকে হাসান বলারও অবকাশ আছে। এজন্যই বিজ্ঞ অনেক হাদিস-বিশারদ এর সনদকে দুর্বল না বলে হাসান বলে অভিহিত করেছেন। তবে সনদে সামান্য দুর্বলতা থাকলেও এর মূল বন্ধব্য সুসাব্যস্ত ও প্রমাণিত। হাদিসটির মূলভাষ্যের পক্ষে একাধিক সহিহ হাদিস রয়েছে এবং শরিয়তের মূলনীতি ও ইসলামের মেজাজও এটার পক্ষে সমর্থন জোগায়। সুতরাং সার্বিক দিক বিবেচনা করলে হাদিসটিকে হাসান লি-গাহিরিহি বলা যায়। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

[১] আল-মুজামুল কাবির : ৩২২৭। উম্মুনুল আখবার : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা : ১১। আল-আহাদ ওয়াল-মাসানি, ইবনু আবি আসিম : ১৯৬২; হাদিসটির সনদ দুর্বল।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الطَّيْرَةُ شِرْكٌ ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ ، تَلَائِنٌ ، وَمَا مِنَ إِلَّا وَلَكِنَ اللَّهُ يُذْهِبُ بِالْتَّوْكِيلِ

কোনো বস্তুকে অশুভ মনে করা শিরক, কোনো বস্তুকে অপয়া ভাবা শিরক। একথা তিনি তিনবার বললেন। (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহু বোঝাতে চাচ্ছেন,) আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার মনে অশুভ চিন্তা আসে না (অর্থাৎ কারো মনে অশুভ চিন্তা জেগে উঠা স্বাভাবিক), কিন্তু আল্লাহর ওপর ভরসা রাখার কারণে তিনি (মুমিনদের অন্তর থেকে) তা দূর করে দেন।<sup>[১]</sup>

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহু বোঝাতে চাইছেন, প্রত্যেকের মনেই কমবেশি অশুভ লক্ষণ গ্রহণের চিন্তা আসে। কিন্তু মনে উদয় হওয়া (এমন অন্যস্লামিক) চিন্তার বিপরীতে আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা রাখলে তিনি এসব চিন্তা দূর করে দেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দেন।

### জাহিলি রীতিনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ইসলাম একদিকে চিন্তা-চেতনা, চারিত্রিক ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষতির কথা বিবেচনায় নিয়ে জাহিলি যুগের ভাস্ত আকিদা-বিশ্বাস, ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। অন্যদিকে পক্ষপাত, গর্ব-অহংকার, গোত্রীয় মর্যাদা রক্ষার নামে আরবদের মাঝে প্রচলিত নানা ধরনের অন্যায়-অনাচার ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটনের কাজেও অবদান রেখেছে ইসলাম।

### ইসলামে গোত্র-প্রীতির কোনো স্থান নেই

এক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম পদক্ষেপ ছিল, গোত্র-প্রীতির যাবতীয় পথ বন্ধ করা। মুমিনদের জন্য গোত্রীয় লড়াই এবং এর আহ্বান সবই হারাম। যে এমন কাজে জড়াবে তার থেকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দায়মুস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৩৯১০; জামিউত তিরমিয়ি : ১৬১৪; মুসনাদু আহমাদ : ৩৬৮৭; হাদিসটি সহিহ।

وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَأْيَهِ عَمِيَّةً ، يَغْصَبُ لِلْغَصَبَةِ ، وَيُقَاتَلُ لِلْغَصَبَةِ ، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي

আর যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন ও অষ্ট নেতৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে, সুদলপ্রীতির জন্য রাগান্বিত হয় এবং সুদলপ্রীতির জন্যই যুদ্ধ করে, সে আমার উম্মতের অঙ্গভূক্ত নয়।[১]

জুন্দাব ইবনু আব্দিল্লাহ বাজালি রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَأْيَهِ عَمِيَّةً ، يَدْعُو عَصَبَةً ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً ، فَقِتْلَةُ جَاهِلَيَّةٍ

সুদলপ্রীতির দিকে আহান কিংবা সুদলপ্রীতিকে সাহায্য করতে গিয়ে যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন ও অষ্ট নেতৃত্বের পতাকাতলে (যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের হাতে) নিহত হয়, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু।[২]

বিশেষ কোনো বর্ণ, বিশেষ কোনো জাতি এবং কোনো ভূখণ্ডের সুতন্ত্র কোনো মূল্যায়ন ইসলামে নেই। তাই একজন মুমিনের জন্য কোনো বর্ণ, সম্প্রদায় বা অঞ্চলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য লড়াই করা বৈধ নয়।

আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে এমন কারো জন্য বৈধ নয়—কেবল বংশীয় সম্প্রতার জন্যই তাদের পক্ষে যুদ্ধে নেমে যাওয়া; চাই তারা হকপন্থি হোক কিংবা বাতিলপন্থি, জালিম হোক কিংবা মাজলুম।[৩]

[১] সহিহ মুসলিম : ১৮৪৮; মুসতাখরাজু আবি আওয়ানা : ৭১৭২

[২] সহিহ মুসলিম : ১৮৫০; সুনানুল নাসাই : ৪১১৫

[৩] অর্থাৎ হক-বাতিল এবং জালিম-মাজলুম নির্ণয় না করে কেবল নিজ দলের হওয়ার কারণেই পক্ষপাতিত্ব করাটা নাজরিয়। তবে হকপন্থি বা মাজলুম হওয়ার কারণে নিজের গোত্র বা দলের পক্ষে দাঁড়ালে সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই; বরং তা প্রশংসনীয় ও উত্তম কাজ। তবে লক্ষ রাখতে হবে, এমনটা যেন সকলের ক্ষেত্রেই করা হয়। শুধু নিজের দলের হলে পক্ষপাতিত্ব করা আর ভিন্ন দলের হলে বিরোধিতা করা বা নীরব থাকা প্রকৃত মুমিনের শান হতে পারে না। একজন সত্যিকার মুমিন সর্বদাই হকপন্থি ও মাজলুমের পক্ষে দাঁড়াবে, তার পক্ষে লিখবে ও কথা বলবে; যদিও সে ভিন্ন গোত্র বা দলের হয়। এমনটা করতে পারলেই বোঝা যাবে, তার মধ্যে সুদলপ্রীতি নয়; বরং প্রকৃত ইনসাফ রয়েছে।

ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

قَلْتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْعَصَبَيْةُ؟ قَالَ: أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ

| আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! গোত্রপ্রীতি আবার কী? উত্তরে তিনি বললেন,  
| গোত্রপ্রীতি হচ্ছে জুলুমের ক্ষেত্রে তোমার সম্প্রদায়কে সাহায্য করা।<sup>[১]</sup>

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلَّهِ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أُوْلَاءِ الدِّينِ  
وَالْأَقْرَبُونَ...<sup>[২]</sup>

| হে মুমিনগণ, আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে তোমরা ন্যায়ের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে;  
যদিও তা (অর্থাৎ আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদান) তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার  
ও আত্মীয়সৃজনের বিরুদ্ধে হয়।<sup>[৩]</sup>

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَغْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ<sup>[৪]</sup>

| আর কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন ন্যায়বিচার বর্জনে  
প্রয়োচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে। এটা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী।<sup>[৫]</sup>

জাহিলি যুগে প্রচলিত একটি কথা ছিল যে, ‘তোমার ভাই নিপীড়ক বা নিপীড়িত যা-ই হোক, তার সাহায্যে এগিয়ে আসো।’ বাহ্যত এটা সুদলপ্রীতির কথা বোঝায়। জাহিলি যুগের মানুষ এভাবেই বুঝে সে অনুসারে নিজ গোত্রের পক্ষে সাহায্য করত; চাই সে জালিম হোক বা মাজলুম। কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুবহু এই কথাটিকে বহাল রাখলেও এটার অর্থ উল্টোদিকে ঘূরিয়ে দিয়েছেন। আনাস ইবনু মালিক রায়িয়াল্লাহু আনহু

[১] সুনান ইবনি মাজাহ : ৩৯৪৯; মুসনাদু আহমাদ : ১৬৯৮৯; হাদিসটি হাসান।

[২] সুরা নিসা, আয়াত : ১৩৫

[৩] সুরা মায়দা, আয়াত : ৮

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

اَنْصُرْ اَخَاكَ طَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اَنْصُرْهُ اِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، اَفَرَبِيتْ  
إِذَا كَانَ طَالِمًا كَيْفَ اَنْصُرْهُ ؟ قَالَ : تَحْجُزْهُ ، اَوْ تَمْنَعْهُ ، مِنَ الظُّلْمِ فَإِنْ ذَلِكَ نَصْرَهُ

তোমার ভাইকে সাহায্য করো; সে জালিম (নিপীড়ক) হোক বা মাজলুম (নিপীড়িত)। তখন এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসুল, মাজলুম হলে তাকে সাহায্য করব, এটা তো ঠিক আছে। কিন্তু জালিম হলে তাকে কীভাবে সাহায্য করবো? তিনি বললেন, তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে বা বাধা দেবে, আর এটাই হলো তার সাহায্য।<sup>[১]</sup>

এ থেকে বোধ গেল—মুসলিমদের মধ্যে কোনো অঞ্চল বা বর্ণকেন্দ্রিক যুদ্ধের আহ্বান হলো জাহিলি আহ্বান। এর সঙ্গে ইসলাম ও কুরআন-সুন্নাহর কোনো সম্পৃক্ষতা নেই।

ঈমানি চিন্তা ও ইসলামি ভাতৃত ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক যেমন ইসলাম সীকার করে না, তেমনই মানুষদের মাঝে ঈমান ও কুফর ছাড়া অন্য কোনো পার্থক্যও ইসলাম সমর্থন করে না। বস্তুত ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষণকারী কাফিরই একজন মুসলিমের প্রকৃত শত্রু। হতে পারে, সেই কাফির তার দেশীয় প্রতিবেশী, তার গোত্রীয় লোক কিংবা সহোদর ভাই।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءُهُمْ أَوْ  
أَبْنَاءُهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ...  
⑯

যে সকল লোক আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না—হোক না তারা (অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীরা)  
তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা এদের জাতি-গোষ্ঠী।<sup>[২]</sup>

[১] সহিল বুখারি : ৬৯৫২; আমিউত তিরমিয়ি : ২২৫৫

[২] সূরা মুজাদালা, আয়াত : ২২

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتْجِدُوا أَبْأَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلَيَاءَ إِنِ اسْتَحْجُبُوا الْكُفَّارَ عَلَى الْإِيمَانِ  
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑥

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের পিতৃবর্গ ও ভ্রাতৃবৃন্দ যদি ঈমানের মোকাবেলায় কুফরকে পছন্দ করে, তবে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই জালিম।[১]

### বর্ণ-গোত্রের বিচারে সবাই সমান

আবুয়র ও বিলাল হাবশি রায়িয়াল্লাহু আনহুমা দুজনই ছিলেন প্রথম সারির সাহাবি। কোনো এক কারণে একবার তারা খুব রেগে গেলেন। ইমাম বুখারি রাহিমাল্লাহ বর্ণনা করেন, রাগের বশে আবু যর বিলালকে বলে বসলেন, ‘হে কালো দাসীর ছেলে! বিলাল তখন এ ব্যাপারে নবিজির কাছে অভিযোগ জানালেন। নবিজি আবু যরকে জিজেস করলেন, তুমি কি তার মায়ের নাম তুলে তাকে গালি দিয়েছ? নিশ্চয় তোমার মধ্যে এখনো জাহিলিয়াত রয়ে গেছে।[২]

অন্য আরেকটি বর্ণনায় আবু যর রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন—

انظِرْ . فَإِنَّكَ لَيْسَ بِخَيْرٍ مِنْ أَخْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلْهُ بِتَقْوَى

দেখো, তুমি শ্বেতাঙ্গ কিংবা কৃষ্ণাঙ্গ কারো থেকেই উত্তম নও। তবে হ্যাঁ, তুমি তাকওয়ার মাধ্যমে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারো।[৩]

আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন—

[১] সুরা তাওবা, আয়াত : ২৩

[২] শুআবুল ঈমান : ৪৭৭২; হাদিসটি সহিহ।

[৩] মুসনাদ আহমাদ : ২১৪০৭; মাজমাউয় যাওয়ায়িদ : ১৩০৭৮; হাদিসটি যাসান।

النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ

| সকল মানুষই আদম-সন্তান, আর আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে  
মাটি থেকে।[১]

এর মাধ্যমে মুমিনদের জন্য জাহিলি যুগের মতো বংশ ও গোত্রীয় গৌরব প্রকাশের  
দরজা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বংশীয় গৌরব ও বাপ-দাদার নাম নিয়ে  
অন্যকে হেয় প্রতিপন্থ করা এবং এটা নিয়ে অহংকার করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে  
নিষিদ্ধ। যেমন কেউ বলল, আমি অমুকের ছেলে অমুক এবং আমি অমুক অভিজাত  
বংশের লোক, আর তুমি তো নিষ্পত্তিশৈলীর অমুক বংশের লোক! আমি শ্বেতাঙ্গা,  
আর তুমি কৃষ্ণাঙ্গা! আমি আরব, আর তুমি অনারব! অন্যের ওপর এভাবে গর্ব করে  
কথা বলা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম।

বংশ ও বাপ-দাদার নাম নিয়ে গর্ব করার কী আছে, সকল মানুষ যখন এক  
আদমেরই সন্তান! বংশমর্যাদার বিষয়টি এক দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও বা মেনে নেওয়া  
হয়, কিন্তু একজন মানুষ এই পিতা থেকে জন্মাক বা ওই পিতা থেকে, এতে  
সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব বা দোষের কী আছে?

উকবা ইবনু আমির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمَسَبَّةٍ عَلَىٰ أَحَدٍ ، كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ ، طَفُّ الصَّاعِ لَمْ تَمْلَئُهُ ، لَيْسَ  
لِأَحَدٍ عَلَىٰ أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِدِينٍ أَوْ تَقْوَىٰ

| নিচয়ই তোমাদের এই বংশপরিচয় কারো নিন্দা বা গালিগালাজের বিষয় নয়।  
(কেননা) তোমরা প্রত্যেকেই আদম আলাইহিস সালামের সন্তান। ওজনের পাল্লা  
তোমরা পরিপূর্ণ করোনি (অর্থাৎ তোমরা প্রত্যেকেই আদম আলাইহিস সালামের  
সাথে সম্পূর্ণ হওয়ার দিক থেকে সমস্তরের, কেবল বংশমর্যাদা দিয়ে তোমরা  
কেউই পূর্ণতায় পৌঁছতে পারবে না)। বস্তুত দ্বীন ও তাকওয়া ছাড়া কারো ওপর  
কারো কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।[২]

[১] জামিউত তিরমিয়ি : ৩৯৫৫; মুসনাদু আহমাদ : ৮৭৩৬; হাদিসাটি হাসান।

[২] মুসনাদু আহমাদ : ১৭৪৪৬; শুআবুল স্টীমান : ৪৭৮৩; হাদিসাটি হাসান।

অন্য আরেকটি বর্ণনায় উকবা ইবনু আমির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

النَّاسُ لِآدَمَ وَحَوَاءَ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْأَلُكُمْ عَنْ أَخْسَابِكُمْ وَلَا عَنْ أَنْسَابِكُمْ ، أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاصُكُمْ

সকল মানুষ আদম আলাইহিস সালাম ও হাওয়া আলাইহাস সালাম থেকে এসেছে। তারা সবাই ওজনের পাল্লার মতো, যা তারা পরিপূর্ণ করেনি। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তোমাদের বংশগৌরব ও নসবনামা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না। তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু [১]

বাপ-দাদার নামে গর্বকারীদের ওপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্রোধ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَخُمُّ جَهَنَّمَ ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَانَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلِ الَّذِي يُدَهِّدُهُ الْخِرَاءُ بِأَنْفِهِ ، إِنَّ اللَّهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ غُبْيَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْأَبْيَاءِ ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ شَفِيقٌ وَفَاجِرٌ شَفِيقٌ ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرْابٍ

যে সমস্ত লোক নিজেদের বাপ-দাদাকে নিয়ে গর্ব করে, তারা যেন অবশ্যই তা থেকে বিরত থাকে। তারা তো এখন জাহানামের কয়লায় পরিণত হয়েছে। অথবা তারা আল্লাহ তাআলার নিকট গুৰৱে পোকার চেয়েও অধিক জঘন্য বলে গণ্য হবে, যে পোকাগুলো নাক দিয়ে গোবর ঘাঁটে। তোমাদের থেকে আল্লাহ তাআলা জাহিলি যুগের গর্ব-অহংকার ও বাপ-দাদাদের নিয়ে গর্ব করার প্রথাকে বিলুপ্ত করেছেন। এখন সে আল্লাহভীরু মুমিন হবে, নয়তো হবে দুর্ভাগ্য পাপাচারী। সমস্ত মানুষ আদম আলাইহিস সালামের সন্তান, আর আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে [২]

[১] মুসন্নাদুর বুইয়ানি : ২০৭; আমসালুল হাদিস, আবুশ শাইখ আসবাহানি : ১৬১; হাদিসটি সহিহ।

[২] জামিউত তিরমিয়ি : ৩৯৫৫; মুসন্নাদু আহমাদ : ১০৭৮১; হাদিসটি হাসান।

ফিরআউন, কায়সার ও কিসরাদের মতো জাহিলি যুগে আরব-অন্যান্যের যেসব পূর্বপুরুষ কুফরের ওপর মৃত্যুবরণ করেছে, তারা জাহানামের কয়লা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের নিয়ে দণ্ডকারীদের নিন্দা বর্ণিত হয়েছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদিসে।

হজের মাসে, তাশরিফের দিনে, সম্মানিত শহরে, হাজার হাজার মনোযোগী শ্রেতার সামনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার যে ঐতিহাসিক বিদায়ি ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণে ঘোষিত মৌলিক বিষয়গুলোর একটি ছিল—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَأَفْضُلَ لِعَرَبِيَّ عَلَى عَجَمِيِّ، وَلَا  
لِعَجَمِيِّ عَلَى عَرَبِيَّ، وَلَا لِأَخْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَخْمَرَ، إِلَّا بِالْقُوَّىِ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَانُكُمْ

হে লোকসকল, নিশ্চয়ই তোমাদের রব একজন এবং নিশ্চয়ই তোমাদের আদি পিতাও একজন। শুনে রাখো! একমাত্র তাকওয়া ছাড়া অন্যান্যের ওপর কোনো আরবের কিংবা আরবের ওপর কোনো অন্যান্যের, কৃষ্ণাঙ্গের ওপর কোনো শ্বেতাঙ্গের কিংবা শ্বেতাঙ্গের ওপর কোনো কৃষ্ণাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু [১]

### মৃতদের জন্য বিলাপ করা যাবে কি?

জাহিলি যুগের যেসব প্রচলনের বিরোধিতায় ইসলাম সদা সরব ছিল তার একটি হলো মৃত্যুকেন্দ্রিক তাদের বিলাপ, উচ্চেঃসুরে কান্না, দুঃখ ও বেদনা প্রকাশে সীমালঙ্ঘন। ইসলাম মুমিনদের শিখিয়েছে যে, মৃত্যু হলো এক জগৎ থেকে আরেক জগতের উদ্দেশ্যে একটি ভ্রমণ। মৃত্যু মানে কোনো ধর্মসও নয় আবার নিশ্চিহ্ন হওয়াও নয়। বিলাপ ও অধৈর্যতা যেমন কারো জীবন ফিরিয়ে দেবে না, তেমনই আল্লাহর সিদ্ধান্তেও তা কোনো পরিবর্তনও আনতে পারবে না। তাই মুমিনের কর্তব্য হলো, প্রতিটি বিপদাপদের মতো মৃত্যুর ক্ষেত্রেও ধৈর্য ধরে সাওয়াবের প্রত্যাশায় থাকা। একে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করো। তার মুখে বারবার আবৃত্তি হবে কুরআনে এ আয়াত—

[১] শুআবুল ঈমান : ৪৭৪; মুসনাদু আহমাদ : ২৩৪৮৯; হাদিসটি সহিহ।

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই কাছে ফিরে যাব [১]

মৃত্যশোকে জাহিলি যুগের অনুশীলিত ও প্রচলিত কর্মকাণ্ড সবই হারাম ও বর্জনীয়। এথেকে নবিজি সাল্লাল্লাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দায়মুস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

**لَيْسَ مِنَّا مِنْ لَطْمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ**

যে ব্যক্তি (কোনো মৃত ব্যক্তির শোকে) গালে চপেটাঘাত করে, জামার গলাবন্ধ ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহিলি যুগের মতো (কানা করে) চিংকার-চ্যাঁচামেচি করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় [২]

একজন মুসলিমের জন্য শোকের পোশাক পরিধান, সাজসজ্জা বর্জন, বেশভূষা বা স্বাভাবিক পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তন কোনো কিছুই বৈধ নয়। তবে স্ত্রীর ক্ষেত্রে মাসআলা ব্যক্তিক্রম। কেননা, ইসলামি শরিয়ত অনুসারে, স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর জন্য ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন অপরিহার্য। এই বিধান দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখার সুর্থে। এ সময়ের মধ্যে নারী সাজসজ্জা গ্রহণ করতে পারবে না, বিয়ে প্রত্যাশীরা তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বিরুদ্ধ করতে পারবে না। ইসলামের দৃষ্টিতে এই সময়টার সঙ্গে পূর্ববর্তী বিয়ের অনেকগুলো বিষয় সম্পৃক্ত।

মৃত ব্যক্তি যদি স্বামী ছাড়া অন্য কোনো নিকটাত্ত্বায় হয়, যেমন : বাবা, পুত্র বা ভাই, তাহলে নারীর জন্য ৩ দিনের বেশি শোক পালন বৈধ নয়।

যাইনাব বিনতু আবি সালামা রাহিমাহাল্লাতু তাআলা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৬

[২] সহিল বুখারি : ১২৯৪; সহিল মুসলিম : ১০৩

دَخَلْتُ عَلَى أُمّ حَيْبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ثُوْقَيْ أَبُوهَا أَبُو سَفْيَانَ بْنُ حَزْبٍ، فَدَعَتْ أُمّ حَيْبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةً، خَلْوَقًّا أَوْ غَيْرَهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَّةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيَّهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا كَيْ بِالْطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِأَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবিবা রায়িয়াল্লাহু আনহার নিকট প্রবেশ করলাম, যখন তার পিতা আবু সুফইয়ান ইবনু হারব রায়িয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুবরণ করলেন। (ইতোমধ্যে মৃত্যুর ৩ দিন পার হয়ে গেলে) তখন উম্মু হাবিবা রায়িয়াল্লাহু আনহা জাফরান ও অন্যান্য উপাদান দ্বারা তৈরি হলদে রংমিশ্রিত সুগন্ধি নিয়ে আসতে বললেন। তিনি একটি মেয়েকে এটা থেকে কিছু মাখালেন। এরপর তার নিজের চেহারার উভয় দিকে কিছু মাখলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধি মাখার কোনোই প্রয়োজন নেই। তবে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোনো নারীর জন্য কারো মৃত্যুতে ৩ দিনের বেশি শোক পালন করা হালাল হবে না। তবে স্বামীর মৃত্যুতে সে ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করবে।<sup>[১]</sup>

স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর শোক পালন একটি ফরজ ও আবশ্যিক বিধান, এতে কোনো শিথিলতা চলবে না। এ বিধানটি বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সহিলুল বুখারি ও সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় উম্মু সালামা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন--

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي ثُوْقَيْ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، مَرْئَتِينِ أَوْ ثَلَاثَتِينِ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا

এক নারী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। আর এদিকে সে তার চোখে

[১] সহিলুল বুখারি : ৫৩৩৪; সহিহ মুসলিম : ১৪৮৬

ব্যথা অনুভব করছে। এমতাবস্থায় সে কি তার চোখে সুরমা লাগাতে পারবে? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না। সে নারী দুইবার অথবা ত৩ বার প্রশ্নটি করেছে আর প্রত্যেকবারই তিনি বলেছেন, না, পারবে না।<sup>[১]</sup>

এতে বোৰা গেল, নির্ধারিত এই ৪ মাস ১০ দিনের পুরো সময়ে বিধবা স্ত্রীর জন্য সাজসজ্জা ও শোভা গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম।

তবে বিলাপ ও অধৈর্যতা প্রকাশ না করে শোকাতুর হওয়া এবং চিৎকার-চ্যাঁচামেচি না করে কান্না করা স্বাভাবিক ব্যাপার, এতে কোনো গুনাহ নেই। উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু শুনতে পেলেন, কিছু নারী খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রায়িয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুতে কেঁদেছেন। এক লোক তাদেরকে বাধা দিতে চাইলে উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন—

دَعْهُنْ يَنْكِينَ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَفْعٌ أَوْ لَفْقَةٌ

আবু সুলাইমান (অর্থাৎ খালিদ ইবনু ওয়ালিদ) রায়িয়াল্লাহু আনহুর জন্য তাদেরকে কাঁদতে দাও; যতক্ষণ না মাথায় মাটি নিক্ষেপ ও চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করে।<sup>[২]</sup>

### পারস্পরিক লেনদেন

সৃষ্টিগতভাবে মানুষ পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। প্রয়োজনীয় সকল কিছুর মালিকানা সাধারণত একজন মানুষের থাকে না। সমাজের একজনের কাছে থাকে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস, অন্যদের কাছে অন্য আরো কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস। তাদের ভেতর ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদান, সমাজে প্রচলিত যাবতীয় লেনদেনের চিন্তা আল্লাহ চেলে দিয়েছেন; যাতে মানুষের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়, সম্পদ ও পণ্য উৎপাদনের চক্র সচল থাকে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রেরিত হলেন তখন আরবে বিভিন্ন ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে যেগুলো শরিয়তের সঙ্গে

[১] সহিল বুখারি : ৫৩৩৬; সহিহ মুসলিম : ১৪৮৮

[২] তালিকু সহিহিস বুখারি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮০; শারহ সুন্নাহ, বাগাবি, খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ৪৩৫

সাংঘর্ষিক নয়, সেগুলো ইসলামের অনুমোদন ও স্বীকৃতি পেয়েছে। আর অবশিষ্ট যেগুলোর সঙ্গে ইসলামের দ্রষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যগত অমিল রয়েছে, সেগুলো ইসলামে নিষিদ্ধ হয়েছে। এই নিষেধের পেছনে নানা কারণ থাকতে পারে। যেমন : গুনাহের কাজে সহযোগিতা, প্রতারণা, অনেতিক সুযোগ গ্রহণ, কারো প্রতি জুলুম ইত্যাদি।

### নিষিদ্ধ বস্তু কেনাবেচা হারাম

সাধারণত নিষিদ্ধ কাজের জন্য সংগৃহীত বস্তু বা সচরাচর মানুষ যেসব বস্তু গুনাহের কাজে ব্যবহার করে, তার ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে হারাম। যেমন : শূকর, মদ, অন্যান্য নিষিদ্ধ খাবার-পানীয়, মূর্তি, ভাস্কর্য, ক্রুশ ইত্যাদি। কারণ, এগুলো ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিলে আল্লাহর অবাধ্যতা ও গুনাহের সুযোগ তৈরি হয়। এর মাধ্যমে মূলত মানুষকে নিষিদ্ধ কাজে প্ররোচনা দেওয়া এবং মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়ার রাস্তা দেখানোর মতো অপরাধ হয়।

নিষিদ্ধ বস্তুর বিক্রয় ও সংগ্রহ হারামের মাধ্যমে এসব বস্তুর প্রতি অবহেলা প্রকাশ পায় এবং এসবের আলোচনা সমাজে বিস্তৃত হয়ে যায়। ফলে মানুষ সহজেই এসব জিনিস থেকে দূরে থাকতে পারে। এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ حَرَمَ بَيْنَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

| নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল শরাব, মৃত জন্ম, শূকর ও মূর্তির ক্রয়-  
বিক্রয় হারাম করেছেন [১]

তিনি আরো বলেছেন—

وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَمَ عَلَىٰ قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَةً

| আর নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোনো জাতির জন্য কোনো বস্তু খাওয়া হারাম করেন  
তখন তিনি তার মূল্যও হারাম করে দেন [২]

[১] সহিল বুখারি : ২২৩৬; সহিহ মুসলিম : ১৫৮১

[২] মুনাফু আবি দাউদ : ৩৪৮৮; মুসনাদ আহমাদ : ২৬৭৮; হাদিসটি সহিহ।

## প্রতারণাপূর্ণ বিক্রয় সম্পর্ক নিষিদ্ধ

প্রতারণাপূর্ণ বিক্রয় হলো প্রত্যেক এমন চুক্তি, যেখানে ঝগড়া-বিবাদের সন্তাননা রয়েছে। যেমন : পণ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা এমন একটি প্রতারণা, যার ফলে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে বা কোনো একজন বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়তে পারে। ঝগড়া-বিবাদের পথ স্থায়ীভাবে বন্ধ রাখার উদ্দেশ্যে এ ধরনের প্রতারণাপূর্ণ বিক্রয় থেকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন।

এজন্য উটের গর্ভে না-আসা বাচ্চা, গর্ভে থাকা বাচ্চা, আকাশের উড়ন্ত পাখি, পানিতে ভাসমান মাছ এবং যে ক্রয়-বিক্রয়ে অস্পষ্টতা ও পণ্য অনিদিষ্ট থাকে, সে-বিষয়েই নিষেধাজ্ঞা এসেছে।<sup>[১]</sup>

এমন আরেকটি বিষয়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেয়াল করলেন যে, ফল পরিপূর্ণ ও ব্যবহার-উপযোগী হওয়ার আগেই লোকজন ফল বেচে দেয়। কিছুদিন পরে দেখা যায়, কোনো দুর্ঘটনাবশত ফলগুলো নষ্ট হলে ক্রেতা-বিক্রেতা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যায়। বিক্রেতা তখন বলে, ‘আমি তো ফল ভালো থাকতেই বিক্রি করেছি’; আর এদিকে ক্রেতা বলে, ‘তুমি আমার কাছে ফল বিক্রি করেছ,

[১] আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, পাথরের টুকরা নিক্ষেপের মাধ্যমে (জাহিলি যুগে প্রচলিত বিশেষ পদ্ধতির) ক্রয়-বিক্রয় এবং ধোঁকাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয়কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। [সহিহ মুসলিম : ১৫১৩]

অনুবৃত্তি আবদুল্লাহ ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘হাবালুল হাবালা’-এর ক্রয়-বিক্রয় থেকে বারণ করেছেন।’ [সহিহুল বুখারি : ২১৪৩]

হাদিসে বর্ণিত ‘হাবালুল হাবালা’-এর দুটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এক. কোনো পণ্য বাকিতে ক্রয় করা এবং মূল্য পরিশোধের তারিখ এভাবে নির্ধারণ করা যে, গর্ভবতী উন্নী মাদী বাচ্চা প্রসব করার পর সেই মাদী বাচ্চাটি বড় হয়ে যখন সেও গর্ভবতী হবে তখন মূল্য পরিশোধ করা হবে। দুই. গর্ভবতী উন্নীর গর্ভস্থ বাচ্চাকে প্রসবের আগেই বিক্রি করা। এ উভয় পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় ইসলামে অবৈধ। কেননা, প্রথম ব্যাখ্যানুসারে মূল্য পরিশোধের দিন-তারিখ অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত। তাই এমন চুক্তিতে মূল্য পরিশোধ নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে ঝগড়া-বিতর্কের সমূহ আশঙ্কা বিদ্যমান। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে পণ্যটি অনুপস্থিত ও অজ্ঞাত। হতে পারে, উন্নীর পেটে কোনো বাচ্চাই নেই, কোনো কারণে হয়তো তার পেট ফুলে গেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে তো গর্ভস্থ বাচ্চাটির কোনো অস্তিত্বই নেই। অথবা এটাও হতে পারে যে, উন্নীর গর্ভে বাচ্চা থাকলেও তা মৃত অবস্থায় আছে কিংবা জীবিত থাকলেও প্রসব করার সময় হয়তো বাচ্চাটি মারা যাবে। নিঃসন্দেহে এ ধরনের অস্পষ্ট কথায় ঝগড়া-বিবাদের আশঙ্কা থাকে অনেক বেশি। এতে প্রতারণার আশঙ্কা প্রবলভাবে বিদ্যমান। এজন্যই ইসলামে এ ধরনের প্রতারণাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছে।

কিন্তু আমি তো কোনো ফল পাইনি!’ লোকদের এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিপক্ব ও ব্যবহার-উপযোগী হওয়ার আগে ফল ক্রয়-বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

نَهَىَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الشَّمْرَةِ حَتَّىٰ يَنْدُوَ صَلَاحُهَا، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: حَتَّىٰ تَذَهَّبَ عَاهَةُ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফল-ফসল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না তার উপযোগিতা প্রকাশ পায়। ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুকে ফলের উপযোগিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, যতক্ষণ না ফল নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দূর হয়।[১]

তবে ক্রেতা যদি বলে যে, বিক্রয়ের পর সে দেরি করবে না, তৎক্ষণাত ফল কেটে নিয়ে যাবে, তাহলে ঠিক আছে। (সেক্ষেত্রে ফলের উপযোগিতা প্রকাশ না পেলেও তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। কেননা, এখানে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে বাগড়া-বিবাদের কোনো আশঙ্কা নেই।)

মুকুল সাদা তথা পরিপক্ব হয়ে (বন্যা, ঝাড় ও শিলাবৃত্তি থেকে) বিপদমুক্ত হওয়ার আগে শস্য-ফল বিক্রি করতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىَ عَنْ بَيْعِ السُّبْلِ حَتَّىٰ يَبْيَضَ، وَيَأْمُنَ الْعَاهَةُ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিপক্ব হওয়ার আগে ও (বন্যা, ঝাড় ও শিলাবৃত্তি থেকে) দুর্যোগমুক্ত হওয়ার পূর্বে (ফল বা শস্যের) মুকুল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।[২]

আরেক বর্ণনায় আনাস ইবনু মালিক রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি

[১] সহিল বুখারি : ১৪৮৬; সহিহ মুসলিম : ১৫৩৪

[২] সহিহ মুসলিম : ১৫৩৫; সুনানু আবি দাউদ : ৩৩৬৮

বলেন—

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ التَّمَرَّةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَخْدُوكُمْ مَالَ أَخِيهِ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ তাআলা ফল ধরানো বন্ধ করে দেন, তাহলে তোমাদের কেউ (অর্থাৎ বিক্রেতা) কীসের বদলে তার (ক্রেতা) ভাইয়ের সম্পদ (অর্থাৎ ফলের মূল্য) গ্রহণ করবে? [১]

ক্রয়-বিক্রয়ে সব ধরনের অস্পষ্টতাই নিষিদ্ধ নয় [২] কেননা, কিছু বস্তু বিক্রির সময় সামান্য হলেও অস্পষ্টতা থাকতে পারে। যেমন : কেউ একটি বাড়ি কিনলে তার পক্ষে বাড়ির ভিত ও দেওয়ালের ভেতরে দেখা সম্ভব নয়। বস্তুত নিষিদ্ধ হলো— বড় রকমের অস্পষ্টতা ও প্রতারণা, যার ফলে ঝগড়া-বিবাদের আশঙ্কা থাকে বা অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হয়।

সুতরাং লেনদেনে অস্পষ্টতা সামান্য [৩] হলে ক্রয়-বিক্রয় হারাম হবে না [৪] ইমাম

[১] সাহিহ বুখারি : ২১৯৮; সহিহ মুসলিম : ১৫৫৫

[২] ইমাম কারাফি রাহিমাল্লাহ বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধোঁকা ও অস্পষ্টতা তিন প্রকারের। এক অধিক ধোঁকা ও অস্পষ্টতা। এটা সকলের ঐকমত্যে নাজারিয। যেমন আকাশের উড়ন্ট পাখির ক্রয়-বিক্রয। দুই। সামান্য ধোঁকা ও অস্পষ্টতা। এটা সকলের ঐকমত্যে জারিয। যেমন : ঘরের ভিত ও জুবার সুতা। তিন মাঝারি স্তরের ধোঁকা ও প্রতারণ। এর ব্যাপারে ফকিহগণের মতভেদ রয়েছে যে, এটা প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে নাকি দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে। [আল-ফুরুক, কারাফি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৬৫-২৬৬]

ইমাম ইবনু বুশদ রাহিমাল্লাহ বলেন, সকল ফকিহ এ ব্যাপারে একমত যে, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধোঁকার মাত্রা যদি বেশি হয় তাহলে তা নাজারিয, আর যদি সামান্য হয় তাহলে তা জারিয। [বিদ্যায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬৮]

[৩] কোনটা সামান্য আর কোনটা গুরুতর, সেটা বোঝার উপায় হলো ওরফ বা সামাজিক প্রচলন। সুতরাং সমাজের চোখে যা সামান্য, সেটাই সামান্য। আর সমাজের চোখে যা গুরুতর, সেটাই গুরুতর হিসেবে বিবেচিত হবে।

[৪] ইমাম নববি রাহিমাল্লাহ বলেন, ধোঁকা ও অস্পষ্টতা থাকার কারণে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হওয়া না হওয়ার ভিত্তি হলো—যদি এতটুকু ধোঁকা ও অস্পষ্টতা সহকারেই ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঢ়কর হয় কিংবা ধোঁকা ও অস্পষ্টতার পরিমাণ সামান্য হয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয় ধোঁকা ও অস্পষ্টতা থাকা সত্ত্বেও উক্ত লেনদেন বৈধ বলে বিবেচিত হবে। [আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব, নববি,

মালিক রাহিমাহুল্লাহর মতে মাটির ভেতর যেসব ফসল জন্মায়—গাজর, মূলা, পিয়াজ ইত্যাদি। একই শসা, তরমুজ ইত্যাদি এগুলোর বিক্রয় ক্ষেত্রে থাকাবস্থায়ই বৈধ। তিনি বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ে অস্পষ্টতা থাকলেও মানুষের যদি সেভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজন হয় তাহলে তা বৈধ। তবে শর্ত হলো, তার অস্পষ্টতা সৃষ্টি হতে হবে এবং সমাজে এমন লেনদেন মেনে নেওয়ার প্রচলন থাকতে হবে।<sup>[১]</sup>

### দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

ইসলাম বাজারকে তার আপন গতিতে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে। চাহিদা ও যোগান অনুসারে প্রাকৃতিকভাবে দ্রব্যমূল্য ওঠানামা করুক, এটাই ইসলামের চাওয়া। এজন্যই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্ধশায় একবার পণ্যদ্রব্যের মূল্য বেড়ে গেলেও তিনি দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেননি। আনাস ইবনু মালিক রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

غَلَّا السِّعْدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَعَزَنَا ،  
فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ ، الْقَابِضُ ، الرَّازِقُ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلِنِسَ  
أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একবার দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেলে সাহাবিরা আরজ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, (দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেছে, অতএব) আপনি আমাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহই হলেন মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারী; তিনিই তা সংকোচনকারী ও সম্প্রসারণকারী এবং তিনিই (ক্রেতা-বিক্রেতা সবার) রিয়িকদাতা। আর আমি আমার রবের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করার আশা রাখি যে, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে তার জীবন ও সম্পদের উপর জুলুম করার কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে না।<sup>[২]</sup>

বক্তব্য : ৯, পৃষ্ঠা : ২৫৮]

[১] শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর মূলনীতিগুলো অন্যদের তুলনায় অধিক চমৎকার ও উৎকৃষ্টতর। কারণ, তিনি মূলনীতিগুলো গ্রহণ করেছেন সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব রাহিমাহুল্লাহ থেকে, যার উপাধি ছিল ‘লেনদেনের বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ফকির। [আল-কায়য়ামিয়ান সুরানিয়াত, পৃষ্ঠা : ১৭২ - ১৭৩] ইমাম আহমাদ ইবনু হাফল রাহিমাহুল্লাহর মতও প্রাপ্ত অনুরূপ।

[২] দানিউত তিমিয়ি : ১৩১৪; সুনানু ইবনি মাজাহ : ২২০০; হাদিসটি সহিহ।

রাসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদিসের মাধ্যমে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, বিনা প্রয়োজনে ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ একটি জুলুম। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাতের জন্য এই বোৰা থেকে মুক্তি থাকাটা অপরিহার্য। তবে বাজারে যদি কৃতিম সংকট তৈরি হয়, যেমন : কিছু ব্যবসায়ী পণ্য গুদামজাত করে দ্রব্যমূল্য নিয়ে তামাশা করে, তখন ব্যক্তিস্বাধীনতার চেয়ে সমাজের সামষ্টিক কল্যাণের প্রতি মনোযোগ দেওয়া অধিক জরুরি হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন ও চাহিদার দিকে তাকিয়ে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কোনো অসুবিধা নেই। যাতে জনসাধারণ অতিরিক্ত মুনাফালোভী গুদামজাতকারীদের ফাঁদ থেকে মুক্তি পায়। এ বিষয়টি ফিকহি মূলনীতির দ্বারা সমর্থিত।

পূর্বে হাদিসের কারণে সব ধরনের মূল্য নিয়ন্ত্রণই হারাম সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং কোনো সমস্যা দূরীকরণ বা ব্যাবসায়িক সিভিকেটের বড়সড় জুলুমে বাধা দানের জন্য দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।<sup>[১]</sup> ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাল্লাহ-সহ অনেক বিশেষজ্ঞ আলিম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, পণ্যের অন্যায় মূল্য নির্ধারণ হারাম, আর ন্যায় মূল্য নির্ধারণ জায়িয়।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাল্লাহ বলেন, ‘অন্যায় মূল্যে লোকজনকে কোনো কিছু বিক্রয়ে বাধ্য করা কিংবা নায় মূল্যে বৈধ কোনো কিছু বিক্রয়ে বাধা দান ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম। তবে মূল্য নিয়ন্ত্রক দায়িত্বশীল যদি পণ্যের ন্যায় মূল্য নির্ধারণ করে দেয়, যেমন বিক্রেতাদের স্বাভাবিক মূল্যে বিক্রয়ে বাধ্য করে এবং তাদের স্বাভাবিক লাভের অতিরিক্ত অন্যায় মূল্যে বিক্রয়ে বাধা দেয়, তাহলে সেটা জায়িয়। এই নির্দেশ মেনে চলা ব্যবসায়ীদের জন্য অপরিহার্য। আলোচিত হাদিসটিতে প্রথম প্রকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণের নিন্দা বর্ণিত হয়েছে। বিক্রেতারা সুলভ মূল্যে পণ্য বেচাকেনা করলেও মাঝেমধ্যে পণ্যের সুলভতা ও পণ্যের চাহিদা বেশি থাকার দরুন মূল্য স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেতে পারে। এটা মূলত আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণে। এক্ষেত্রে মানুষকে পূর্বের মূল্যে বিক্রয়ে বাধ্য করাটা অন্যায় ও জুলুম। দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো, পর্যাপ্ত পণ্য থাকার পরেও বিক্রেতারা সুলভ মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রয় করতে চায়। সিভিকেট করে তারা চড়ামূল্য ছাড়া পণ্য বাজারজাত রাজি নয়। এক্ষেত্রে মূল্য নিয়ন্ত্রণের অর্থ হলো—তাদেরকে সুলভ মূল্যে পণ্য বিক্রিতে বাধ্য করা। এর দ্বারা মূলত তাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার

[১] তুহফাতুল মুলুক ফি ফিকহি মাযহাবিল ইমাম আবি হানিফা, পৃষ্ঠা : ২৩৫

নির্দেশিত সমতাই প্রতিষ্ঠিত হয়।<sup>[১]</sup>

### মঙ্গুতকারীদের ওপর লানত!

ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা, পণ্য বিক্রয়ে বাজারের চাহিদা অনুসারে স্বাভাবিক গতিশীলতা ইসলামেও কাম্য। কিন্তু ব্যক্তিগত মুনাফা ও প্রাচুর্যের লোভে জনসাধারণের কথা চিন্তা না করে তাদের জন্য বরাদ্দ সম্পদ ও মৌলিক প্রয়োজনীয় পণ্যও লুটের ধান্দায় থাকা এবং কৃত্রিম অভাব তৈরি করে বাজার নিয়ন্ত্রণে নেওয়া সবই ইসলামে কঠোরভাবে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ।

এজন্য গুদামজাতের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে অত্যন্ত কঠোর ভাষায়। ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ اخْتَكَرَ طَعَامًا أَزْبَعَنَ لَيْلَةً، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَبَرِئَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ

যে ব্যক্তি ৪০ দিন পর্যন্ত খাদ্যপণ্য গুদামজাত করে রাখল, সে আল্লাহ থেকে সম্পর্কহীন হয়ে গেল এবং আল্লাহও তার থেকে সম্পর্কহীন হয়ে গেলেন।<sup>[২]</sup>

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন—

لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

[১] মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ২৮, পৃষ্ঠা : ৭৬

[২] মুসলাদু আহমাদ : ৪৮৮০; মুসলাদু আবি ইয়ালা : ৫৭৪৬; হাদিসটির সনদ যইফ। হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদিসটির মতন বা মূল ভাষ্যের পক্ষে অনেক সমর্থক হাদিস রয়েছে, যেগুলো এ হাদিসটির বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে। [আল-কওলুল মুসাদাদ ফিয়-যাবির আন মুসলাদি আহমাদ, পৃষ্ঠা : ২০; আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪৫৪] সুতরাং অন্যান্য একাধিক হাদিসের সমর্থন থাকায় এটাকে হাসান লি-গাইরিহি বলা যায়, যা মুহাদিসদের নিকট প্রমাণযোগ্য পর্যায়ের হাদিস বলে বিবেচিত। অবশ্য শাহীখ শুআইব আরনাউতি রাহিমাহুল্লাহ সমর্থক হাদিসগুলোকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে এবং কিছু সমর্থক হাদিসকে মূল হাদিসের বক্তব্যের সমর্থক মনে না করে হাদিসটির মতন বা মূল ভাষ্যের বিশুদ্ধতাকে অস্বীকার করেছেন। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। [তাখরিজু মুসলাদি আহমাদ, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৪৮৫-৪৮৬, তাহকিক : শুআইব আরনাউত ও তার সঙ্গীগণ]

| অপরাধী ছাড়া কেউ পণ্য মজুত করে রাখে না।<sup>[১]</sup>

‘অপরাধী’ (খাতে) কোনো হালকা শব্দ নয়। ফিরআউন ও হামানের মতো চরম অবাধ্য লোকদেরকে কুরআনে এই শব্দে সঙ্ঘোধন করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

❷ إِنْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْهُوَدَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ

নিচয়ই ফিরআউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী।<sup>[২]</sup>

মজুতকারীদের মানসিকতা খুবই নিকৃষ্ট এবং তার স্বার্থবাদিতা একেবারে সুস্পষ্ট। মুআজ ইবনু জাবাল রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُخْتَكِرُ، إِنَّ أَرْخَصَ اللَّهُ الْأَسْعَارَ حَزَنٌ، وَإِنْ أَغْلَاهَا اللَّهُ فَرَحْ

| মজুতকারী বান্দা কতই না খারাপ! যদি আল্লাহ মূল্যহ্রাস করে দেন তাহলে সে বিষম হয়, আর যদি তিনি মূল্যবৃদ্ধি করে দেন তাহলে সে খুশী হয়।<sup>[৩]</sup>

উমার ইবনুল খাতাব রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُخْتَكِرُ مَلْعُونٌ

| পণ্য-আমদানীকারক রিযিকপ্রাপ্ত, আর পণ্য-মজুতদার অভিশপ্ত।<sup>[৪]</sup>

[১] সহিহ মুসলিম : ১৬০৫; সুনানু আবি দাউদ : ৩৪৪৭

[২] সুরা কাসাস, আয়াত : ৮

[৩] আল-মুজামুল কাবির, তাৰারানি, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ৯৫, হাদিস : ১৮৬; শুআবুল ঈমান : ১০৭০২; হাদিসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

[৪] সুনানু ইবনি মাজাহ : ২১৫৩; সুনানুদ দারিয়ি : ২৫৮৬; হাদিসটির সনদ যইফ।

ব্যবসায়ীরা দুই ধরনের—

» একজন পণ্য মজুত করে রাখে। বাজারে পণ্যের চাহিদা তীব্র হলে সে চড়া মূল্যে বিক্রি করে। লোকজন স্বাভাবিক মূল্যে পণ্য না পেলে ব্যবসায়ীদের প্রার্থিত মূল্যে পণ্য কিনতে বাধ্য হয়। এই মূল্য কখনো হতে পারে কিছুটা বেশি, আবার কখনো হতে পারে সীমাত্তিরিষ্ঠ। এটাই হলো পণ্য মজুতের আসল বাস্তবতা।

» আরেকজন প্রতিদিন পণ্য এনে সীমিত লাভে বেচে দেয়। এরপর আরেকটা পণ্য এনে আবার সীমিত পরিসরে লাভবান হয়। এভাবে একের পর এক পণ্য আনতে থাকে আর লাভবান হতে থাকে। এভাবে তার ব্যবসা অধিক বরকতময় এবং মানুষের জন্য অধিক কল্যাণকর হয়। পাশাপাশি সে রিয়িক তো পেয়েই থাকে; যেমনটা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন।

পণ্য মজুত ও দ্রব্যমূল্য বিষয়ে একটি বর্ণনা এসেছে হাসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি বলেন—

تَقْلِيْلَ مَغْفِلُ بْنُ يَسَّارٍ ، فَدَخَلَ إِلَيْهِ عَبْيَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ يَعْوُدُهُ ، قَالَ : هَلْ تَعْلَمُ يَا مَغْفِلُ أَنِّي سَفَكْتُ دَمًا ؟ قَالَ : مَا عَلِمْتُ ، قَالَ : هَلْ تَعْلَمُ أَنِّي دَخَلْتُ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِيْنَ ؟ قَالَ : مَا عَلِمْتُ ، قَالَ : أَجْلِسُونِي ، ثُمَّ قَالَ : اسْمَعْ يَا عَبْيَيْدَ اللَّهِ حَتَّى أَحْدِثَ شَيْئًا لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَلَا مَرَّيْنِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِيْنَ لِيُغْلِيْهُ عَلَيْهِمْ ، فَإِنْ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظُمِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ عَيْنَ مَرَّةً وَلَا مَرَّيْنِ

‘মাকিল ইবনু ইয়াসার রায়িয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন (উমাইয়া গভর্নর) উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ তাকে দেখতে তার গেল। সে বলল, হে মাকিল, আপনি কি জানেন যে, আমি কোনো নিষিদ্ধ রক্ত প্রবাহিত করেছি?’

মাকিল রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি জানি না।

উবাইদুল্লাহ বললো, আপনি কি জানেন যে, আমি মুসলিমদের দ্রব্যমূল্যে হস্তক্ষেপ করেছি?

মাকিল রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি জানি না।

এরপর মাকিল রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমরা আমাকে বসাও! এরপর তিনি বললেন, হে উবাইদুল্লাহ, শোনো, যাতে আমি তোমাকে এমন হাদিস বর্ণনা করতে পারি, যা আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দুয়েকবার নয়; বরং একাধিক বার শুনেছি। আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—মুসলিমদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি তাদের পণ্যের মূল্যে হস্তক্ষেপ করে, আল্লাহর জন্য দায়িত্ব হয়ে পড়ে কিয়ামতের দিন তাকে বিস্তীর্ণ আগুনের ওপরে বসানো।

উবাইদুল্লাহ বলল, আপনি কি এটা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন?

মাকিল রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, হ্যাঁ, দুয়েকবার নয়; বরং একাধিক বার শুনেছি।<sup>[১]</sup>

এই সকল হাদিসের ভাষ্য থেকে আলিমগণ গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পণ্য মজুত নিষিদ্ধ হওয়ার শর্ত দুটি। এক. পণ্য মজুতের দ্বারা সেই সময়ে স্থানীয়রা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। দুই. জনসাধারণের কাছে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করার উদ্দেশ্য থাকা, যাতে ব্যবসায় অধিক মুনাফা অর্জিত হয়।<sup>[২]</sup>

### দালালের কারণে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বর্গতি

মজুতের মতো আরেকটি বিষয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। সেটা হলো, শহুরে ব্যক্তি গ্রাম্য লোকের পণ্য নিয়ে অধিক মূল্যে বিক্রি করে দেওয়া। এর চিত্রটা দাঁড়াবে যেমনটা আলিমগণ বলেছেন—নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য নিয়ে একজন গ্রাম্য লোক শহরে এলো। তার উদ্দেশ্য সে বাজারের স্বাভাবিক দামে পণ্টি বিক্রি করবে। কিন্তু পথিমধ্যে শহরের মধ্যসৃতভোগী একলোক তার সঙ্গে দেখা করে বলল, ‘তোমার পণ্য আমার কাছে দাও, আমি কিছুক্ষণ পর আরো বেশি দামে এগুলো বেচে দেবো।’ যদি গ্রাম্য লোক নিজে বিক্রি করত তাহলে সে স্বাভাবিক দামে বিক্রি করত। লোকজন পণ্য কিনতে

[১] মুসলাদু আহমাদ : ২০৩১৩; আস-সুনানুল ফুসুরা, বাইহাকি : ১১১৫০; হাদিসটি হাসান।

[২] আল-ইখতিয়ার লি-তালিলিল মুখতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৬১

পারত তুলনামূলক সাশ্রয়ী দামে। এতে শহরবাসীরা উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি গ্রাম্যলোকও উপকৃত হতো।<sup>[১]</sup>

এই দালালি বা মধ্যসূত্রভোগের প্রচলন তখনকার সমাজে খুবই সাধারণ ঘটনা ছিল। আনাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

نُهِيَّا أَنْ يَبْيَعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أُوْ أَبَادٍ

আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, শহুরে ব্যক্তি যেন গ্রাম্য লোকের পক্ষ হয়ে (অধিক লাভে তার পণ্য) বিক্রি না করে; যদিও সে (গ্রাম্য ব্যক্তি) তার ভাই বা পিতা হোক।<sup>[২]</sup>

এ হাদিস থেকে বোৰা গেল যে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের চেয়ে মানুষের সামষ্টিক কল্যাণের গুরুত্ব বেশি।

জাবির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا يَبْيَعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَغْضَهُمْ مِنْ بَغْضِ

শহুরে কোনো ব্যক্তি যেন গ্রাম্য লোকের পক্ষ হয়ে পণ্য বিক্রি না করে। তোমরা লোকদেরকে (আপন অবস্থায়) ছেড়ে দাও; মহান আল্লাহ তাদের এক দলকে অপর দলের মাধ্যমে রিযিক দান করবেন।<sup>[৩]</sup>

‘তোমরা লোকদেরকে (আপন অবস্থায়) ছেড়ে দাও; মহান আল্লাহ তাদের এক দলকে অপর দলের মাধ্যমে রিযিক দান করবেন’—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই মহান উক্তি ব্যবসার ময়দানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি তৈরি করে দিয়েছে। সেটা হলো—বাজার, দ্রব্যমূল্য ও পণ্যের আদান-প্রদানকে স্বাভাবিক

[১] রদ্দুল মুহত্তার, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১০২; ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪৭৮

[২] সহিহ মুসলিম : ১৫২৩; সুনানুন নাসাই : ৪৪৯৩

[৩] সহিহ মুসলিম : ১৫২২; সুনানু আবি দাউদ : ৩৪৪২

চক্র ও প্রাকৃতিক যোগান-চাহিদার ওপর ছেড়ে দিতে হবে। সেখানে কোনো ধরনের কৃত্রিম হস্তক্ষেপ ও দালালি থাকতে পারবে না।

তাউস রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

سَأَلَتْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: «لَا يَبْيَعُنَ حَاضِرٌ لِبَادٍ» فَقَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ سِفَارًا

আমি ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘শহুরে কোনো ব্যক্তি যেন গ্রাম লোকের পক্ষ হয়ে পণ্য বিক্রি না করে—এ বাণীটির অর্থ কী? তখন তিনি বললেন, সে যেন তার পক্ষে দালাল না হয়।<sup>[১]</sup>

ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহুর বন্ধবের উদ্দেশ্য হলো, শহুরে ব্যক্তি যদি গ্রাম লোককে মূল্য জানিয়ে দেয়, তাকে সদুপদেশ দেয় এবং দালালদের মতো কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করা ব্যতীরেকেই তাকে বাজারের হালচাল বাতলে দেয়, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, সে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সদুপদেশ দিয়েছে। আর সদুপদেশ তো দ্বীনের অংশ; বরং পুরো দ্বীনটাই হলো নাসিহাহ বা সদুপদেশ। যেমন : একটি বিশুদ্ধ হাদিসে তামিম আদ-দারি রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الدِّينُ النَّصِيْحَةُ

| দ্বীন হলো সদুপদেশ ও কল্যাণ কামনা।<sup>[২]</sup>

অন্য হাদিসে আবু ইয়াযিদ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

وَإِذَا اسْتَنْصَعَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَعْ لَهُ

[১] সহিল বুখারি : ২১৬৩; সহিহ মুসলিম : ১৫২১

[২] সহিহ মুসলিম : ৫৫; সুনান নাসায়ি : ৪১৯৭

আর তোমাদের কেউ যখন তার (মুসলিম দীনি) ভাইয়ের কাছে সদুপদেশ চায়, সে যেন তাকে সদুপদেশ দেয়।<sup>[১]</sup>

দালালৰা সাধারণত পারিশ্রমিক লাভের জন্য কাজ করে। প্রায়ই তারা জনগণের সামষ্টিক কল্যাণের কথা ভুলে গিয়ে ব্যক্তিস্বার্থের কথা চিন্তা করে। এজন্যই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দালালি করতে নিষেধ করেছেন।

### দালালি বা মধ্যস্থতা করা কি বৈধ?

দালালি হাদিসে নিষিদ্ধ এই ক্ষেত্রে ছাড়া অন্যান্য জায়গায় দালালি বা মধ্যস্থতায় কোনো সমস্যা নেই। কারণ, এটা এক ধরনের দিক-নির্দেশনা এবং ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যকার বোঝাপড়ার কাজ। এর ফলে তাদের দুজনের বা একজনের অনেক কাজ সহজ হয়ে যায়।

বর্তমান সময়ে এসে যবসার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমদানি-রপ্তানি-বিষয়ক বাণিজ্যিক জটিলতা বৃদ্ধি, পাইকারি ও খুচরা পণ্যের ছড়াছড়ি ইত্যাদি এসব ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীরা বিশাল ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই মধ্যস্থতাকারী তার কাজের পারিশ্রমিক নেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। পারিশ্রমিক হতে পারে নির্ধারিত অর্থে অথবা লভ্যাংশের শতকরা হারে কিংবা দুইপক্ষ যেভাবে সম্ভত হয়। সবই জায়িয়, এতে কোনো অসুবিধা নেই।

### ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

وَلَمْ يَرَ أَبْنُ سِيرِينَ ، وَعَطَاءُ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبْيَضِرِ السِّمْسَارِ بْنُ سَعْدًا وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ :  
لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : بِغَيْرِ هَذَا التَّوْبَ ، فَمَا زَادَ عَلَىْ كَذَّا وَكَذَّا ، فَهُوَ لَكَ . وَقَالَ أَبْنُ سِيرِينَ : إِذَا  
قَالَ : بِغَيْرِ كَذَّا ، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْعٍ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ يَنْبَغِي وَيَنْتَكَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ

ইবনু সিরিন, আতা ইবনু আবি রবাহ, ইবরাহিম ও হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ দালালির পারিশ্রমিক নেওয়াতে কোনো সমস্যা মনে করেননি। ইবনু আব্রাহাম রায়িয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি কেউ বলে, তুমি এ কাপড়টি বিক্রি করে দাও। এত

[১] শারহ মাআনিল আসার : ৫৫২৩ ; মুসনাদু আহমাদ : ১৫৪৫৫ ; হাদিসটি সহিহ।

এত মূল্যের চেয়ে যা বেশি হবে তা তোমার, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই।<sup>[১]</sup> ইবনু সিরিন রাহিমাল্লাহু বলেন, যদি কেউ বলে, এটা এত দামে বিক্রি করে দাও। এতে যা লাভ হবে, তা তোমার, অথবা লাভ তোমার ও আমার মধ্যে সমান হারে বণ্টিত হবে, তবে এতে কোনো সমস্যা নেই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলিমগণ তাদের পরস্পরের শর্তানুযায়ী কাজ করবে।<sup>[২]</sup>

তবে মধ্যস্থতা বৈধ হওয়ার দুটি শর্ত রয়েছে। এক. ব্যক্তিগত স্বার্থে, বা দু-পক্ষের একজনের স্বার্থে অপরজনের ক্ষতি করা যাবে না। দুই. পরিশ্রম ও কষ্ট অনুসারে পারিশ্রমিক নেওয়া, মানুষের প্রয়োজন ও সরলতার সুযোগে তাদেরকে না ঠকানো।

### বাণিজ্যিক কাজে সুযোগসম্বান্দ ও প্রতারণা হারাম

দালালির একটি প্রকারের নাম হলো নাজাশ। এটা শরিয়তে নিষিদ্ধ কর্ম। ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজাশ তথা প্রতারণামূলক দালালি করা থেকে নিষেধ করেছেন।<sup>[৩]</sup>

[১] হানাফি মাযহাবের বিশুদ্ধ মতানুসারে দালালি বা মধ্যস্থতার পারিশ্রমিক গ্রহণ বৈধ। তবে শর্ত হলো, পারিশ্রমিক সুপ্রস্তুত হতে হবে। সেটা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকও হতে পারে, যেমন কেউ বলল, এই গাড়িটি ৫ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দিলে তোমাকে ১০ হাজার টাকা দেবো। অথবা শতকরা হারেও হতে পারে, যেমন কেউ বলল, এই গাড়িটি যত টাকায় বিক্রি করবে তোমাকে তার ৫% টাকা দেবো। এরপর সে গাড়িটি ১০ লক্ষ টাকায় বিক্রি করল। তাহলে সে চুক্তি অনুসারে ৫০ হাজার টাকা পাবে। আর দালালি বা মধ্যস্থতার পারিশ্রমিক যদি সুপ্রস্তুত না হয় তাহলে চুক্তি বৈধ হবে না। যেমন কেউ বলল, আমার এ বাড়িটি তুমি বিক্রি করে দাও। ১০ লক্ষ টাকা আমার, আর এর বেশি যা তুমি বিক্রি করে নিতে পারো সেটা তোমার। এ ধরনের দালালি চুক্তি বৈধ নয়। এখানে পারিশ্রমিক অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত। কেননা, সে বাড়িটি ১০ লক্ষ টাকার বেশি বিক্রি করতে পারবে কি না তা অনিশ্চিত। তাই এমনটা হতে পারে যে, সে ১০ লক্ষ টাকায় বাড়িটি বিক্রি করতে বাধ্য হলো; অথচ চুক্তি অনুসারে সে কোনো পারিশ্রমিকই পেল না। এজন্যই দালালির এ পদ্ধতিটি বৈধ নয়। [রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৬৩; আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়াহ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৫০-৪৫১; আল-বাহরুর সায়িক, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২২৬; ইলাউস সুনান, খণ্ড : ১৬, পৃষ্ঠা : ২০৭-২০৯; ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া, খণ্ড : ১৬, পৃষ্ঠা : ৬১৮-৬১৯; আহসানুল ফাতাওয়া, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৭৩-২৭৪]

[২] তালিকু সহিহিল বুখারি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৯২, অধ্যায় : দালালির পারিশ্রমিক (হাদিস : ২২৭৪ সংশ্লিষ্ট)

[৩] সহিহুল বুখারি : ২১৪২, সহিহ মুসলিম : ১৫১৬

‘নাজাশ’-এর ব্যাখ্যায় ইমাম মালিক রাহিমাল্লাহ বলেন—

وَالْتَّجْشُّعُ أَنْ تُفْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهَا، وَلَيْسَ فِي نَسْكٍ أَشْتَرَأُوهَا فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ

| আর নাজাশ বলা হয়—তোমার অঙ্গের পণ্য ক্রয়ের কোনো ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও পণ্যের (ন্যায়) দামের চাইতে অধিক দেওয়ার ভান করা, যাতে অন্য ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করে (ধোঁকায় পড়ে) অধিক দামে ক্রয় করে।[১]

এ জাতীয় কাজ বহু ক্ষেত্রে অন্যদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য বিক্রেতাদের যোগসাজশে হয়ে থাকে। লেনদেন যেন ধোঁকামুক্ত হয়, সেজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পণ্য বাজারে পৌঁছানোর আগে বেচতে নিষেধ করেছেন। ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ أَنْ تَشْلُّفِي السِّلْعَ حَتَّىٰ تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ

| ব্যাবসায়িক পণ্য বাজারে পৌঁছার আগে (বাজারমূল্যের চেয়ে কম দামে ক্রয়ের উদ্দেশ্যে) এগিয়ে যাওয়া থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন।[২]

কারণ, এতে বিক্রেতা বাজারের ন্যায় মূল্য সম্পর্কে অঙ্গ থাকার ফলে প্রতারিত হওয়ার সুযোগ থাকে। আর একারণেই কেউ পণ্য বাজারে পৌঁছার আগেই কম দামে পণ্য কিনে নিলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিক্রেতাকে এ সুযোগ দিয়েছেন যে, যখন সে বাজারে পৌঁছবে তখন তার আগের চুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকবে। আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا تَلْقَوْا الْجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَاهُ فَإِنْ شَرِيَ مِنْهُ ، فَإِذَا أَتَى سِدْدَهُ السُّوقَ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ

| তোমরা (ক্রয় করার উদ্দেশ্যে) আমদানিকৃত পণ্যের দিকে এগিয়ে যেয়ো না।  
সুতরাং যে ব্যক্তি আমদানিকৃত পণ্যের দিকে এগিয়ে দিয়ে সেখান থেকে পণ্য কিনে

[১] মুআত্তা মালিক : ৯৭; জামিউল উসুল, ইবনুল আসির : ৩৩৪; বাদাইউস সানায়ি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৩৩

[২] সহিহ মুসলিম : ১৫১৭; মুসনাদু আহমাদ : ২০১১৯

নেয়, এরপর পণ্যের মালিক যখন বাজারে দিয়ে পৌঁছবে তখন (পণ্যের ন্যায় দাম জানার পর) তার জন্য বিক্রয় বহাল রাখা বা বাতিল করার অধিকার থাকবে।<sup>[১]</sup>

### কোনো প্রতারক ব্যক্তি নবিজির উম্মত নয়

ক্রয়-বিক্রয় ও সব ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক লেনদেনে প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি ইসলামে হারাম। একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো, সকল কাজ-কারবারে সততা ও বিশ্বস্ততা বজায় রাখা। মনে রাখতে হবে যে, পার্থিব যেকোনো উপার্জনের চেয়ে মানুষের মঙ্গল কামনাই হলো অধিক মূল্যবান।

হাকিম ইবনু হিয়াম রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

البِيَعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقاً وَبَيَّنَا بُورَكَ لَهُمَا فِي يَبْعِيهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَبَا  
مُحِقَّتْ بَرَكَةُ يَبْعِيهِمَا

ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পরে বিছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের (চুক্তি বহাল বা বাতিল করার) অবকাশ থাকবে। সুতরাং যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে এবং (পণ্যের দোষগ্রুটি) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বারাকাহ আসবে। আর যদি তারা মিথ্যা বলে এবং (পণ্যের দোষ-গ্রুটি) গোপন করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বারাকাহ থাকবে না।<sup>[২]</sup>

আরেকটি হাদিসে ওয়াসিলা ইবনু আসকা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبْغِي شَيْئًا ، إِلَّا بَيْئَنَ مَا فِيهِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلَّا بَيْئَنَهُ

পণ্যের দোষ-গ্রুটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়া ব্যতীত কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো বস্তু বিক্রয় করা বৈধ নয়। আর যে ব্যক্তি পণ্যের দোষ-গ্রুটির কথা জানে, তার জন্য তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা ব্যতীত (নীরব থাকা) বৈধ হবে না।<sup>[৩]</sup>

[১] সহিহ মুসলিম : ১৫১৯; সুনানুল নাসাই : ৪৫০১

[২] সহিল বুখারি : ২১১০, সহিহ মুসলিম : ১৫৩২

[৩] মুস্তাদরাকুল হাকিম : ২১৫৭; মুসনাদু আহমাদ : ১৬০১৩; হাদিসটি হাসান।

আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَّا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابِعُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ عَشَ فَلَيْسَ مِنِّي

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার খাদ্যশস্যের একটি স্তুপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এরপর তিনি স্তুপের ভেতর হাত প্রবেশ করালেন। ফলে হাতের আঙুলগুলো (পানিতে) সিক্ত হয়ে গেল। তিনি বললেন, হে খাদ্যশস্যের মালিক, এটা কী? লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসুল, এতে বৃটির পানি লেগেছে। তিনি বললেন, তাহলে সেগুলো তুমি স্তুপের ওপরে রাখলে না কেন? যাতে লোকেরা তা দেখতে পারে। (জেনে রেখো,) যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয়, সে আমার দলভূক্ত নয়।<sup>[১]</sup>

অন্য বর্ণনায় ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ وَقَدْ حَسِنَةُ صَاحِبُهُ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا طَعَامٌ رَدِيءٌ قَالَ: بَغْ هَذَا عَلَى حِدَةٍ، وَهَذَا عَلَى حِدَةٍ، فَمَنْ عَشَ فَلَيْسَ مِنِّي

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার খাদ্যশস্যের (দোকানের) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। খাদ্যশস্যের মালিক খুব সুন্দর করে তা সাজিয়ে রেখেছিল। এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলোর ভেতরে হাত প্রবেশ করালে দেখতে পেলেন সেগুলো নিম্নমানের খাদ্যশস্য। তখন তিনি বললেন, এটা (অর্থাৎ নিম্নমানের খাদ্যশস্য) আলাদা করে বিক্রি করো এবং ওটা (অর্থাৎ উৎকৃষ্টমানের খাদ্যশস্য) আলাদা করে বিক্রি করো। আর (মনে রেখো,) যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভূক্ত নয়।<sup>[২]</sup>

সালাফের কার্যক্রমে এর পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছিল। পণ্ডের ত্রুটি তারা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিতেন, গোপন রাখতেন না কিছুই। তারা সত্য বলতেন, মিথ্যা বলতেন

[১] সহিহ মুসলিম : ১০২; জামিউত তিরমিয়ি : ১৩১৫

[২] মুসনাদু আহমাদ : ৫১১৩; আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ২৪৯০; হাদিসটি সহিহ।

না। তারা মানুষের ভালো চাইতেন, কাউকে ধোঁকা দিতেন না।

ইবনু সিরিন রাহিমাহুল্লাহ একটি মেষ বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে বলে দেন যে, এতে কোনো দোষ নেই, তবে এটি পা দিয়ে খাবার উল্টিয়ে ফেলে।

হাসান ইবনু সালিহ রাহিমাহুল্লাহ একটি বাঁদি বিক্রয় করেন। বিক্রির সময় ক্রেতাকে বলে দেন—একবার তার রস্তবমি হয়েছিল [১]

একবার রস্তবমি হয়েছিল, সেটাও লুকিয়ে রাখতে তাদের মুমিন হৃদয় সায় দেয়নি। জানা কথা যে, এর ফলে মূল্য কমে যেতে পারে।

### অতিরিক্ত শপথ বৈধ নয়

ধোঁকাবাজির জন্য শপথের আশ্রয় নেওয়া অতি জঘন্য হারাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবসায়ীদেরকে অধিক শপথ করতেই নিষেধ করেছেন। বিশেষ করে, মিথ্যা শপথ করতে। তিনি বলেন—

الحَلِفُ مُنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

| (মিথ্যা) শপথ পণ্য চালুকারী, কিন্তু তা (ব্যবসার) বারাকাহ নিশ্চিহ্নকারী।[২]

লেনদেনের সময় অতিরিক্ত শপথ অপচন্দনীয় হওয়ার কারণ হলো—প্রথমত এর ফলে ক্রেতাদের ধোঁকা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে, দ্বিতীয়ত অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলার নামের বড় ও মহত্ত্ব নষ্ট হয়ে যায়।

### ওজনে কমে দেওয়ার পরিণতি

ধোঁকাবাজির একটি প্রকার ওজনে ও পরিমাণে কম দেওয়া। লেনদেনের এ দিকটির কথা কুরআনে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ হয়েছে। সুরা আনআমের শেষে দশটি উপদেশের মধ্যে এটিও উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكِلْفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعُهَا

[১] ইহইয়াউ উলুমিদিন, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৭৭

[২] সহিত্তুল বুখারি : ২০৮৭, সহিহ মুসলিম : ১৬০৬

আর তোমরা পরিমাপ ও ওজন ন্যায়সংগত পরিপূর্ণ করো। আমি কাউকে  
তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না।<sup>[১]</sup>

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

**وَأُوفُوا الْكِيلَ إِذَا كُلْتُمْ وَرِزْقًا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلًا**

আর মেপে দেওয়ার সময় তোমরা পরিমাপ পরিপূর্ণ করে দাও এবং সঠিক  
দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো। এটাই উভয় এবং পরিগামে উৎকৃষ্ট।<sup>[২]</sup>

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

**وَإِنَّ لِلْمُطْفِقِينَ ⑥ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِونَ ⑦ وَإِذَا كَانُوهُمْ أَوْ رَزَّوْهُمْ  
يُخْسِرُونَ ⑧ أَلَا يَظْنُ أُولَئِكَ أَهُمْ مَبْغُوثُونَ ⑨ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ⑩ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ  
الْعَالَمِينَ ⑪**

যারা ওজনে কম দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ। যারা লোকের কাছ থেকে  
যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় নেয়। আর যখন লোকজনকে মেপে  
দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি ভেবে দেখে না  
যে, তারা পুনরুত্থিত হবে? সেই মহাদিবসে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব  
প্রতিপালকেরসামনে।<sup>[৩]</sup>

যথাযথ ন্যায়তা তো আমাদের সামর্থ্যের বাইরে, তবু ওজনে ও পরিমাণে যথাসম্ভব  
ন্যায়তা ও সমতা বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। এজন্য কুরআনে ন্যায়সংগতভাবে  
পরিমাপ ও ওজন পরিপূর্ণ করার নির্দেশের পরেই বলা হয়েছে, ‘আমি কাউকে তার  
সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না।’<sup>[৪]</sup>

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ১৫২

[২] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৩৫

[৩] সুরা মুতাফফিল, আয়াত : ১-৬

[৪] সুরা আনআম, আয়াত : ১৫২

কুরআনে একটি সম্প্রদায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা লেনদেনে অনিয়ম করত খুব। ওজনে ও পরিমাপে কম দিয়ে তারা মানুষকে ঠকাত। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন, যিনি তাদেরকে সংশোধন ও ন্যায়পরায়ণতার পথে ডাকবেন; যেমনিভাবে তাদেরকে একত্রবাদের দিকে আহ্বান জানাবেন। এরা ছিল শুআইব আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়, যাদের মধ্যে তিনি একজন দাটি ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বারবার বলেছেন।  
কুরআনের ভাষায়—

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكْوِنُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١﴾ وَزِيَّوَا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا  
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَغْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣﴾

ওজন পূর্ণ করো এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা মাপে কম দেয়। আর তোমরা সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো। মানুষকে তাদের (ক্রয়কৃত) বস্তু কম দিয়ো না এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না।<sup>[১]</sup>

একজন মুসলিম তার ব্যক্তিজীবনে, মানুষের সাথে সম্পর্ক ও লেনদেনে কেমন হবে, তার উৎকৃষ্ট নির্দশন হলো এই আয়াত। তার জন্য বৈধ নয় দুইজনকে দুইভাবে মেপে দেওয়া—নিজের ও প্রিয়জনদের জন্য একভাবে মাপা আর বাইরের লোকদের জন্য ভিন্নভাবে মাপা। সে নিজের জন্য ও প্রিয়জনদের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত দেয়, আর অন্যদের ক্ষেত্রে মাপে কম দিয়ে ঠকায়। এটা কখনোই একজন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।

### চোরাই ও ছিনতাইকৃত পণ্য কেনা বৈধ নয়

অপরাধ রোধে ও অপরাধীকে চাপে রাখার জন্য কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয়—জেনেশুনে চোরাই, ছিনতাই ও জবরদখলকৃত পণ্য ক্রয় করা। কারণ, এতে ছিনতাইকারী, চোর ও জবরদখলকারীকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করা হয়। আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১] সূরা শুআরা, আয়াত : ১৮১-১৮৩

مَنِ اشْتَرَى سَرَقَةً، وَهُوَ يَغْلِمُ أَنْهَا سَرَقَةً، فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَإِنْمَا

যে ব্যক্তি জেনেশুনে চোরাই জিনিস কিনল, সে চুরির অপরাধ ও তার পাপে  
শরিক হলো।[১]

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও সে গুনাহের ভাগীদার থাকবে। কারণ, ইসলামের  
দৃষ্টিতে সময়ের দীর্ঘতা কোনো হারামকে হালাল বানাতে পারে না এবং চোরাই  
মাল থেকে মালিকের অধিকার কখনোই রহিত হয় না; যদিও মানবরচিত আইনে  
বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলে মালিকের অধিকার রহিত হয়ে যায়।

### সুদ একটি জঘন্য অপরাধ

ব্যবসার মাধ্যমে সম্পদের বৃদ্ধি ঘটানো ইসলামে বৈধ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

হে মুমিনগণ, তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কোরো না।

তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা।[২]

যারা ব্যবসার জন্য আল্লাহর জমিনে ঘুরে বেড়ায় ও ভ্রমণ করে, তাদের প্রশংসায়  
মহান আল্লাহ বলেন—

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) অনুসন্ধানে জমিনে ভ্রমণ করবে।[৩]

কিন্তু খাণ দিয়ে সুদ প্রহণের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধির রাস্তা ইসলামে সর্বোত্তমাবে বন্ধ।  
কম-বেশি সকল পরিমাণ ও সব ধরনের সুদই ইসলামে হারাম। সুদ নিষিদ্ধ হওয়া  
সত্ত্বেও ইহুদিরা সুদ প্রহণ করত, তাই এ ব্যাপারে তাদের নিন্দা করা হয়েছে কঠোর

[১] মুস্তাদরাকুল হাকিম : ২২৫৩; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১০৮২৬; হাদিসটির সনদ যইফ।

[২] সুরা নিমা, আয়াত : ২৯।

[৩] সুরা মুয়াম্বিল, আয়াত : ২০।

ভাষায়। কুরআনের শেষ দিকে অবতীর্ণ আয়াতগুলোর মধ্যে দুটি আয়াত হলো—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا تَقْرِبُوا اللَّهَ وَدَرْءُوا مَا يَقْعِدُ إِنَّ الرَّبَّا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١﴾ إِنَّ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَّنُوا  
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَوْلَانِي ثُبَّثُمْ قَلْكِمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢﴾

---

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও—যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। অতঃপর যদি তোমরা তা না করো তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর যদি তোমরা তাওবা করো তাহলে তোমাদের (সুদ বাদে বাকি) মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং জুলুমের শিকারও হবে না।<sup>[১]</sup>

---

সুদ ও সুদখোরদের বিরুদ্ধে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সামাজিকভাবে এর সর্বব্যাপী ক্ষতির কথা বুঝিয়েছেন।

ইবনু আবুস রায়িল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِذَا ظَهَرَ الرِّزْقُ وَالرَّبَّا فِي قَرْيَةٍ ، فَقَدْ أَخْلَوْا بِأَنفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

যখন কোনো জনপদে ব্যভিচার ও সুদ ছড়িয়ে পড়ে, তখন তারা (অর্থাৎ সে জনপদের অধিবাসীরা) নিজেদের জন্য আল্লাহর আয়াব বৈধ করে নেয়।<sup>[২]</sup>

সুদ নিষিদ্ধের ক্ষেত্রে ইসলামই প্রথম আসমানি ধর্ম নয়। ইহুদি ধর্মেও সুদ নিষিদ্ধের বিধান পাওয়া যায়। ওল্ড টেস্টামেন্ট বলা হয়েছে—

“

তোমার ভাই যখন অভাবগ্রস্ত হবে তখন তুমি দায়িত্ব বহন করো। তবে (এর বিনিময়ে) তার থেকে কোনো লাভ বা উপকার তালাশ কোরো না।<sup>[৩]</sup>

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭৮-২৭৯

[২] মুস্তাফাকুল হাকিম : ২২৬১; শুআবুল ইমান : ৫১৪৩; হাদিসটি হাসান।

[৩] ওল্ড টেস্টামেন্ট (বুক অব এঙ্গেডাস), ২২ : ২৪

প্রিষ্ঠধর্মেও সুদ নিষেধের বিধান পাওয়া যায়। লুকের ইনজিলে বলা হয়েছে—

॥

তোমরা ভালো কাজ করো এবং কোনো মুনাফা বা উপকারের আশা না করে  
ঝণ দাও; তাহলে তোমাদের প্রতিদান হবে অসীম।<sup>[১]</sup>

কিন্তু আফসোসের বিষয় ওল্ড টেস্টামেন্টের বিধান বিকৃতির হাত থেকে রেহাই পায়নি। তারা ‘তোমার ভাই যখন অভাবগ্রস্ত হবে’—এই বাক্যের ভাই হিসেবে নির্ধারণ করেছে কেবল ইহুদিকে। এজন্য তারা ওল্ড টেস্টামেন্টের বুক অব ডিউটারোনমি-তে উল্লেখ করেছে—

॥

অন্য জাতির লোককে সুদে ঝণ দিতে পারো, কিন্তু তোমার ইহুদি ভাইকে সুদে  
ঝণ দিয়ো না।<sup>[২]</sup>

**সুদ কেন এত বেশি ভয়াবহ?**

মানবজাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক কল্যাণের কথা বিবেচনায় রাখতে গিয়েই মূলত সুদ নিষেধের ক্ষেত্রে ইসলামের এই কঠোর অবস্থান। মুসলিম তাত্ত্বিক আলিমগণ বিভিন্ন সময়ে সুদ নিষেধের যৌক্তিক অনেক কারণ দর্শিয়েছেন। সময়ের বিবর্তনে তাদের সেসব বিশ্লেষণ বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা কেবল বিখ্যাত তাফসিরবিদ ইমাম ফখরুল্লাহ রায়ি রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য উল্লেখ করছি।

**ইমাম ফখরুল্লাহ রায়ি বলেন—**

[এক] সুদের মধ্যে বিনিময় ছাড়া অন্যের সম্পদ প্রাপ্তির ব্যাপার থাকে। দুই দিরহামের বিনিময়ে একটি দিরহাম বিক্রয় মূলত অতিরিক্ত একটি দিরহাম আঘসাতেরই নামান্তর। সম্পদ মানুষের অত্যাবশ্যকীয় বস্তু, অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ কেড়ে নেওয়া জ্যব্য অপরাধ। হাদিসে এসেছে—‘একজন মুসলিমের সম্পদ তার প্রাপ্তির

[১] নিউ টেস্টামেন্ট (গসপেল অব লুক), ৬ : ২৪-২৫

[২] ওল্ড টেস্টামেন্ট (বুক অব ডিউটারোনমি), ১৯ : ২৩

মতোই সম্মানিত ও হারাম’[১] অতএব, কারো সম্পদ কোনো বিনিয়য় ছাড়া গ্রহণ করা হারাম।

[দুই] সুদনির্ভরতা মানুষকে নিষ্কর্মা বানিয়ে দেয়। একজন মানুষ যদি লোকজনকে সুদের ওপর ঝণ দিয়ে শুয়ে বসে খেতে পারে, তাহলে কোন দুঃখে সে শ্রমসাধ্য কাজ করতে যাবে? তখন সে আর কোনো পরিশ্রম, ব্যবসা কিংবা শিল্পকর্মে হাত দেবে না। জানা কথা যে, মানুষের প্রয়োজন পূরণ হয় ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন পেশা, শিল্পকর্ম ও নির্মাণ কাজ ইত্যাদি দ্বারা। সুদদাতারা যখন এসব কাজে অনাগ্রহী হবে তখন সমাজের কাঠামো ধীরে ধীরে ভেঙে পড়বে। (অর্থনৈতিক দিকে থেকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।)

[তিনি] সুদযুক্ত ঝণ চালু থাকলে সমাজ থেকে সুদমুক্ত ঝণের ধারা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। এখন তো সুদ নিষিদ্ধ, তাই সুদমুক্ত ঝণ প্রদানে মুমিনের মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা জাগে না। কিন্তু সুদ হালাল হলে প্রত্যেকেই সুদের ওপর ঝণ দিত। তখন মানুষের মধ্যে সহযোগিতা, উদারতা ও ভালো কাজের ধারাই বন্ধ হয়ে যেত। (নৈতিক দিক থেকে এটি একটি যৌক্তিক কারণ।)

[চারি] সাধারণত ঝণদাতা হয় ধনী আর ঝণগ্রহীতা হয় অভিবী গরিব। সুদের অনুমোদন দেওয়া মানে ধনীর সামনে অভিবীকে মনমতো শোষণের রাস্তা খুলে দেওয়া। আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত দয়ালু, তাই তিনি কখনোই এমন জুলুমের অনুমতি দিতে পারেন না। (এটা হলো একটি সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ দিক) [২]

শেষ পয়েন্টটি থেকে আমরা জানতে পারলাম, সুদ মূলত সচ্ছলের স্বার্থে অসচ্ছলকে শোষণের কাজ করে। ফলে ধনী আরো ধনী হয় এবং গরিব আরো গরিব হয়। পাশাপাশি সমাজে বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ তৈরি হয়। উচ্চ শ্রেণির প্রতি নিচু শ্রেণির মধ্যে নানা ক্ষেত্র-রাগ দানা বাঁধতে থাকে। পরম্পরের প্রতি জমতে শুরু করে ঘৃণা-বিদ্বেষ। তখনই বিভিন্ন বিদ্রোহ ও ধর্মসংঘর্ষ কাজের সূচনা হয়। নিকট ইতিহাসেও রাষ্ট্রীয়, আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও পল্লীজীবনে সুদ ও সুদখোরদের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

[১] মুসনাদু আহমাদ : ৪২৬২

[২] তাফসিলুর রায়, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৭৪, ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত।

## সুদের সাথে জড়িতদের ওপর আল্লাহর লানত!

সুদখোর হলো ঝণদাতা, যে লোকদেরকে ঝণ দেয়, এরপর লোকজন থেকে অতিরিক্ত-সহ ঝণের অর্থ ফেরত নেয়। নিঃসন্দেহে সে আল্লাহ তাআলা ও মানুষের কাছে অভিশপ্ত। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে সুদখোরই একমাত্র অপরাধী নয়; বরং যে ব্যক্তি ঝণগ্রহণ করে অতিরিক্তসহ যে অর্থ ফেরত দেয়, সে এবং সুদের লেখক, সুদি লেনদেনের সাক্ষী সবাই-ই গুনাহগার ও অপরাধী। হাদিসে এসেছে, জাবির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

لَعْنَ اللَّهُ أَكِلُ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلُهُ ، وَكَاتِبُهُ ، وَشَاهِدُهُ

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  
আল্লাহ তাআলা অভিসম্পাত করেছেন সুদখোরের ওপর, সুদদাতার ওপর, এর  
লেখকের ওপর এবং এর সাক্ষীদায়ের ওপর [১]

তবে কেউ যদি একান্ত নিরূপায় হয়ে সুদের ওপর প্রয়োজনীয় ঝণ নেয় এবং সুদছাড়া  
ঝণ নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে শুধু সুদখোরই গুনাহগার  
হবে। অবশ্য এর জন্য কিছু শর্ত আছে—

[এক] প্রকৃতপক্ষেই তার একান্ত কোনো প্রয়োজন থাকতে হবে। শুধু বিলাসিতা  
বা স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য হলে সুদের ওপর ঝণ নেওয়া বৈধ হবে না। খাদ্য, বস্ত্র বা  
চিকিৎসা-সামগ্ৰীর মতো আবশ্যকীয় বস্তুর যদি অভাব তৈরি হয়, তাহলেই কেবল  
তাকে একান্ত প্রয়োজন বলা যেতে পারে।

[দুই] এই অনুমতি ও ছাড় প্রয়োজনীয় পরিমাণের মধ্যেই সীমিত থাকবে। সুতরাং  
প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামান্য ঝণও নেওয়া যাবে না। যেমন : কারো ৯ হাজার টাকা  
লাগবে, তার জন্য ১০ হাজার টাকা ঝণ নেওয়া বৈধ হবে না।

[তিনি] অন্যদিক থেকে দেখলে বিষয়টি হলো—অর্থনৈতিক এই দুরবস্থা থেকে  
বের হওয়ার জন্য তাকে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তার আশপাশের  
মুসলিমদের কর্তব্য তার সাহায্যে এগিয়ে আসা। সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বনের

[১] মুসলাদু আহমাদ : ৩৭২৫; সহিহ মুসলিম : ১৫৯৮; মুসতাখরাজু আবি আওয়ানা : ৫৪৫৩; হাদিসের  
সনদ সহিত।

পরেও যদি সুন্মুক্ত ঋণ না পায়, তাহলে সে প্রয়োজন অনুপাতে সুদে ঋণ নিতে পারবে, তবে সেক্ষেত্রেও সীমালঙ্ঘন কাম্য নয়।

[চার] প্রয়োজনবশত সুদের ওপর ঋণ নিলেও এই সুদি কাজ-কারবারের প্রতি বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা বজায় রাখতে হবে। ঘৃণিত এ ঋণের ওপর ততক্ষণই থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহ এ থেকে পরিত্রাণের কোনো ব্যবস্থা করে দেন।

### ঋণ থেকে পানাহ চাইতেন নবিজি

মুসলিম হিসেবে একজন মানুষের জানা উচিত, জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা হলো সমতা ও ভারসাম্য বজায় রাখা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ⑯

আর তোমরা অপচয় কোরো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেননা [১]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

وَلَا تُبَدِّزْ تَبَذِيرًا ⑯ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كُفُورًا ⑯

আর কিছুতেই অপব্যয় কোরো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানদের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ [২]

কুরআনে যখন মুমিনদেরকে খরচের ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে তারা যেন তাদের সম্পদের একটি অংশ দান করে। উপর্যন্নের কিছু অংশ দান করলে কেউ অভাবগ্রস্ত হবে না, এই ভারসাম্য ও সমতার কারণে মুমিন কখনো ঋণের দারস্থ হবে না। তাছাড়া ঋণকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীষণ রকম অপছন্দ করতেন। কেননা, ঋণ মানেই হলো দুশ্চিন্তা ও বোৰা। নবিজি

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ১৪১

[২] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৬-২৭

সান্নাহাতু আলাইহি ওয়া সান্নাম ঝণের বোকা থেকে মুক্ত থাকার জন্য আন্নাহর কাছে  
দুআ করতেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّينِ

আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উয়ু বিকা মিন গলাবাতিদ দাউন।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে ঝণের প্রাবল্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি [১]

আবু সাইদ রায়িয়ান্নাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَغُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ، وَالدِّينِ» قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَغْدِلُ الدِّينَ بِالْكُفْرِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ

আমি রাসুলুল্লাহ সান্নাহাতু আলাইহি ওয়া সান্নামকে বলতে শুনেছি, আমি কুফর ও ঝণ হতে আন্নাহর আশ্রয় প্রার্থনা  
করছি। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আন্নাহর রাসুল, আপনি কি ঝণকে কুফরের  
সমপর্যায়ের বিষয় মনে করছেন? রাসুলুল্লাহ সান্নাহাতু আলাইহি ওয়া সান্নাম  
বললেন, হ্যাঁ [২]

আয়িশা রায়িয়ান্নাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সান্নাহাতু আলাইহি  
ওয়া সান্নাম সালাতে এই বলে দুআ করতেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتِيمِ وَالْمَغْرَمِ

আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উয়ু বিকা মিনাল মা'সামি ওয়াল মাগরম।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে গুনাহ ও ঝণ হতে পানাহ চাই।

তখন একজন প্রশ্নকারী তাকে বলল, হে আন্নাহর রাসুল, আপনি ঝণ হতে এত  
বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করেন কেন? তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তি যখন ঝণগ্রস্ত হয়,

[১] সুনানুন নাসাই : ৫৪৭৫; মুসনাদু আহমাদ : ৬৬১৮; হাদিসটি হাসান।

[২] সুনানুন নাসাই : ৫৪৭৩; মুসনাদু আহমাদ : ১১৩৩৪; হাদিসটির সনদ যইফ।

তখন সে কথা বললে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদ করলে তা ভঙ্গ করে।[১]

এখানে ঝণগ্রহণের চারিত্রিক সমস্যার কথাও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট করে দিয়েছেন। নবিজি যার ব্যাপারে জানতেন, সে ঝণগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে এবং পরিশোধের ব্যবস্থাও করে যায়নি, তার জানায়া তিনি পড়াতেন না। এটা তিনি এ কারণে করতেন যেন মানুষ ঝণকে ভয় পায়। তবে পরবর্তী সময়ে গনিমত ও যুদ্ধলঞ্চ সম্পদ আসা শুরু হলে, তিনি নিজেই ঝণ পরিশোধ করে দিতেন।[২]

আবুল্লাহ ইবনু আমর রায়িয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

يُغْفِرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدِّينَ

| ঝণ ব্যতীত শহিদের সকল গুনাহই ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[৩]

এই সব নির্দেশনা থেকে শেখার বিষয় হলো—তীব্র প্রয়োজন ছাড়া ঝণ নেওয়া যাবে না। আর ঝণ নিলেও পরিশোধের নিয়তে নিতে হবে।

আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ أَخْذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخْذَ يُرِيدُ إِثْلَاقَهَا أَتْلَقَهُ اللَّهُ

যে ব্যক্তি পরিশোধের নিয়তে মানুষের সম্পদ (ঝণ হিসেবে) নেয় আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে ব্যক্তি বিনষ্ট করার নিয়তে তা গ্রহণ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে ধৰ্স করেন।[৪]

[১] সহিল বুখারি : ২৩৯৭; সহিহ মুসলিম : ৫৮৯

[২] সহিল বুখারি : ২২৯৮; সহিহ মুসলিম : ১৬১৯

[৩] সহিহ মুসলিম : ১৮৮৬; মুস্তাদরাকুল হাকিম : ২৫৫৪

[৪] সহিল বুখারি : ২৩৮৭; মুসনাদু আহমাদ : ৮৭৩৩

সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাসী একজন প্রকৃত মুসলিম একান্ত বাধ্য ও নিরূপায় না হলে যেখানে সুদমুস্ত ঝণ নিতেই আগ্রহী হয় না, সেখানে তার জন্য সুদভিত্তিক ঝণ গ্রহণ কী করে সম্ভব?

### বাকির পণ্য অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করা কি বৈধ?

প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে—একজন মুসলিম নগদ মূল্যে যেমন পণ্য কিনতে পারে, তেমনি বাকিতেও কিনতে পারে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বাকিতে পণ্য কিনেছেন। আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنَّ الَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ইহুদির কাছ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে মূল্য পরিশোধের শর্তে কিছু খাবার কেনেন এবং সেই লোকটার কাছে নিজের লোহার বর্ম বন্ধক রাখেন।<sup>[১]</sup>

তবে বাকিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দেরিতে আদায়ের জন্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা—যেমনটা কিসিতে বিক্রয়কারীরা করে থাকে, সে ব্যাপারে কোনো কোনো ফকিহ বলেছেন, এটা হারাম। কারণ, এখানে সময়ের বিপরীতে মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা সুদের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে।

তবে অধিকাংশ ফকিহ এটাকে বৈধ বলেছেন। কারণ, ক্রয়-বিক্রয়ের মূল হলো বৈধ হওয়া। আর যেহেতু এ ব্যাপারে সরাসরি কোনো নিয়েধাজ্ঞা আসেনি, তাই এতে কোনো সমস্যা নেই। তাছাড়া বেশ কিছু বিবেচনায় এটি সুদের সাথে সদৃশও নয়। যেকোনো বিষয়ের কথা চিন্তা করে মূল্য বৃদ্ধি করার অধিকার বিক্রেতার রয়েছে। অবশ্য বৃদ্ধিটা যদি সীমাত্তিরিক্ত হয়ে যায়, তাহলে আবার সেটা হারাম হবে।

ইমাম শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যাইদ ইবনু আলি রাহিমাহুল্লাহ, মুআইয়িদ বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ এবং হানাফি ও শাফিয়ি মাযহাবের অধিকাংশ ফকিহের মতে এটা বৈধ। কারণ, এসংক্রান্ত দলিল-প্রমাণাদির ব্যাপকতা বৈধতার কথাই বলে। আর

[১] সহিল বুখারি : ২০৬৮; সহিহ মুসলিম : ১৬০৩

এটাই সুস্পষ্ট ও সঠিক ঘত।’[১]

আকদে সালাম—আগে মূল্য, পরে পণ্য

এটা হলো বাকিতে বিক্রির ঠিক বিপরীত ধরনের চুক্তি। অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ অগ্রিম টাকা নিয়ে নির্ধারিত সময় পরে তার বিনিময়ে পণ্য সরবরাহ করা। শরিয়তে এ ধরনের লেনদেন বৈধ। এটাকে ইসলামি ফিকহি পরিভাষায় ‘আকদে সালাম’ বা নির্দিষ্ট সময় পর পণ্য হস্তান্তর চুক্তি বলা হয়।

এই ধরনের লেনদেন আরবের তৎকালীন সমাজে বিপুলভাবে প্রচলিত ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে কিছু সংশোধনী ও শর্ত যুক্ত করেছেন, যাতে এই চুক্তির আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো শরিয়তের কাঙ্ক্ষিত আওতার মধ্যে চলে আসে। ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

قَدِيمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْنِلُفُونَ بِالْتَّمِيرِ السَّتَّيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ :  
مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ ، فَفِي كَيْنِي مَغْلُومٌ ، وَوَزْنٌ مَغْلُومٌ ، إِلَى أَجَلٍ مَغْلُومٍ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মক্কা থেকে হিজরত করে) মদিনায় এলেন। সেসময় মদিনাবাসীরা খেজুরের জন্য ২-৩ বছরের মেয়াদে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে রাখত। এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি কোনো পণ্যের জন্য অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করতে চায়, সে যেন নির্দিষ্ট পরিমাপে, নির্দিষ্ট ওজনে ও নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদে চুক্তি করে।[২]

ওজন, পরিমাণ ও সময় নির্ধারণের ফলে ঝগড়া ও ধোঁকাবাজির আশঙ্কা আর থাকবে না। এরকম আরেকটি বিষয়—তাদের অভ্যাস ছিল, তারা নির্দিষ্ট একটি বা একাধিক গাছের ফলের জন্য অগ্রিম টাকা দিত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের চুক্তি থেকে নিষেধ করলেন। কারণ, হতে পারে এই বছর কাঙ্ক্ষিত গাছ ঝড়ের কবলে পড়ে বা অন্য কোনো কারণে কোনো ফলই দিতে পারল না, তখন তাদের মধ্যে ঝগড়া বাধার আশঙ্কা প্রবল। তাই এই লেনদেনের জন্য বিশুদ্ধ পদ্ধতি হলো ওজন বা পরিমাণ ধার্য করে দেওয়া, চুক্তির জন্য নির্দিষ্ট

[১] নাইলুল আওতার, শাওকানি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৮১

[২] সহিল বুখারি : ২২৪০; সহিহ মুসলিম : ১৬০৪

গাছ বা খেতের কোনো একপাশ নির্ধারিত না করা।

সুতরাং যদি কখনো খেজুর গাছ বা ফসলি জমির মালিকের নিশ্চিত লাভ থাকে, কিন্তু ক্রেতার পণ্য পাওয়াটা অনিশ্চিত থাকে, যেমন কেউ একান্ত নিরূপায় হয়ে নির্দিষ্ট কোনো গাছের ফল বা নির্দিষ্ট কোনো জমির ফসলের বিনিময়ে তাকে অগ্রিম টাকা দিয়ে চুক্তি করতে বাধ্য হলো, তাহলে সেই চুক্তি হারাম বলে বিবেচিত হবে।

### মুদারাবা—একজনের শ্রম, আরেকজনের পুঁজি

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা পরিমিত এবং প্রয়োজনমতো দিয়েছেন। এজন্য অনেক সময় আমরা দেখি, কারো যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু সম্পদ নেই অথবা থাকলেও খুব বেশি নেই; অন্যদিকে কারো প্রচুর সম্পদ আছে, কিন্তু যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নেই। অথবা থাকলেও খুবই সামান্য। এখন ধনীর সম্পদ যদি অভিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তির হাতে সমর্পিত হয়, তিনি সম্পদ বৃদ্ধি করবেন এবং বিনিময়ে নির্দিষ্ট লভ্যাংশ পাবেন, তাহলে কেমন হয়? এই চক্রের মাধ্যমে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সম্পদ দ্বারা আর ধনী ব্যক্তি অভিজ্ঞতা দ্বারা উপকৃত হলেন। বিশেষ করে, বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। দুয়েকজনের পক্ষে এত বিপুল পরিমাণ টাকা যোগান দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু সমাজে বহু মানুষ এমন আছে, যাদের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা এমনি এমনি পড়ে আছে, যেগুলো কাজে লাগানোর সামর্থ্য বা সময় কোনোটাই তাদের হাতে নেই। এক্ষেত্রে এই অলস টাকাগুলো অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের হাতে পরিচালিত এসব বড় বড় প্রকল্পে কাজে লাগিয়ে দিলে কেমন হবে?

আমরা বলি, ইসলামি শরিয়াহ সম্পদ ও অভিজ্ঞতা বা সম্পদ ও কাজের সমন্বয়কে নিয়ে করে না; যেমনটি ইসলামি ফিকহে সবিস্তরে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই সমন্বয়ের জন্য ইসলাম একটি সমতা ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা নির্ধারিত করেছে। পুঁজিদাতা সমন্বয় চুক্তিতে আবদ্ধ হলে শ্রমদাতার মতো তার কাঁধেও এই চুক্তির সমস্ত লাভ-ক্ষতির দায়ভার চলে আসবে।

এই ধরনের চুক্তি ইসলামি ফিকহের পরিভাষায় মুদারাবা বা কিরাজ নামে পরিচিত। ইসলামের বিধান হলো—সমন্বয় চুক্তিতে লাভ হলে উভয়ে যেমন লভ্যাংশে অংশীদার হবে, তেমনই ক্ষতি হলে উভয়ে ক্ষতিতেও অংশীদার হবে। লভ্যাংশের পরিমাণ উভয়ের সম্মতিতে শতকরা হারে নির্ধারিত হবে। তারা আধাআধি, এক

তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ অথবা এর থেকে কমবেশি যেভাবে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করে নিতে পারে। এতে করে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সম্ভব হবে এবং এতে কম হোক বা বেশি লাভ উভয়ের জন্যই থাকবে।

ব্যবসায় লাভ হলে উভয়ের মধ্যে শর্ত অনুযায়ী বণ্টিত হবে। আর লস হলে তা লভ্যাংশ থেকে কাটা যাবে। লোকসান যদি লভ্যাংশকে গ্রাস করে মূলধনে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে তা মূলধন থেকেই যাবে। শ্রমদাতাকে আলাদাভাবে আর্থিক জরিমানা আদায় করতে হবে না। পুঁজি-বিনিয়োগকারী অর্থনৈতিক লোকসান একাই গুনছে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ, শ্রম-বিনিয়োগকারী (অর্থনৈতিক লোকসান না গুনলেও) নিজের ব্যয়িত শারীরিক ও মানসিক শ্রমের লোকসান তো গুনছে।

মুদারাবাভিত্তিক ব্যবসার ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি এটা। লভ্যাংশ যতই বাড়ুক বা ক্ষতি যত বেশিই হোক, পুঁজি-বিনিয়োগকারীর জন্য সর্বদাই নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ থাকবে—এটা তো স্পষ্ট ভারসাম্যহীনতা। এরকম করা হলে সেক্ষেত্রে শুধু পুঁজিই মূল্যায়িত হতো, অভিজ্ঞতা ও শ্রম মূল্যায়িত হতো না। এটি দুনিয়ার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বিরোধিতার নামান্তর। কারণ, দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়ম হলো, সে কখনো অর্জনের খাতা পূর্ণ করে দেবে, আবার কখনো তা শূন্য করে রাখবে। পুঁজি-বিনিয়োগকারীর শ্রমও নেই, আবার ঝুঁকিমুক্তভাবে নিশ্চিত উপার্জনও করবে, এটা তো নিষিদ্ধ সুদের মূলকথা। কেননা, সুদ এমন এক অর্থ উপার্জনের পন্থা, যেখানে কোনো শ্রম নেই, ঝুঁকি নেই, কিন্তু নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন হয়।

এজন্য নবিজি সাল্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্গাচাষের মধ্যে জমির নির্দিষ্ট কোনো অংশের ফসল বা উৎপন্ন ফসলের একটি নির্ধারিত অংশ, যেমন : ১০ মণ, ২০ মণ এরকম নির্দিষ্টভাবে কারো জন্য নির্ধারিত রাখতে বারণ করেছেন। কারণ, এটি সুদের মতোই, যেখানে একজনের লাভ নিশ্চিত, আর অন্যজনের অনিশ্চিত। হতে পারে, জমিতে ফসল উৎপন্নই হলো ওই নির্ধারিত পরিমাণ বা একেবারেই উৎপন্ন হলো না, তখন তো একজন লালে লাল, আরেকজন বেসামাল। এ ধরনের ভারসাম্যহীনতা ইসলামের দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য নয়।

ফসলের নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ সৃতত্ত্বভাবে সংরক্ষণের শর্ত থাকলে বর্গাচুক্তিই বাতিল হয়ে যাবে, এ বিষয়ে নবিজি সাল্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আছে। মুদারাবা লেনদেনে কারো জন্য নির্ধারিত লভ্যাংশ অবধারিত রাখা হারাম, এ বিষয়ে সকল ফকিহ একমত। আমার মনে হয়, এই নিষেধাজ্ঞার পেছনের

মূলকথাটি বর্গাচাষের এখান থেকেই সংগৃহীত। এজন্য মুদারাবা চুক্তি ভঙ্গের কারণ হিসেবে হুবহু বর্গাচাষের কারণগুলোই উল্লেখিত হয়েছে।

ফরিদগণ বলেন, ‘মুদারাবা চুক্তিতে শতকরা হারে লভ্যাংশ নির্ধারণ না করে যদি কারো জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করা হয় তাহলে হতে পারে ওই নির্ধারিত পরিমাণ অর্থই লাভ হলো; ফলে সে একাই পুরো লভ্যাংশের মালিক বনে যাচ্ছে। আবার হতে পারে কোনো লাভই হলো না; ফলে মূলধন থেকে তার নির্ধারিত অর্থ দিতে হবে। আবার হতে পারে, কখনো ব্যবসায় প্রচুর লাভ হলো, তখন সে তার নির্ধারিত অঞ্চল লভ্যাংশ পেয়ে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করবে।’<sup>[১]</sup>

এই বিবেচনা ও দর্শনের ভিত্তিতে চিন্তা করলে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের নীতিমালা পুঁজি-বিনিয়োগকারী ও শ্রম-বিনিয়োগকারী উভয়ের জন্যই পুরোপুরি ন্যায়সংগত এবং যথোপযুক্ত। কারণ, এখানে সবকিছুই স্পষ্ট, জটিলতামুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ।

### শিরকত—যৌথভাবে পুঁজি বিনিয়োগ

যেকোনো হালাল ব্যবসায় একাকী বিনিয়োগ করে একাকীই উপার্জন করা যেমন বৈধ, তেমনিভাবে মুদারাবার ভিত্তিতে শ্রম-বিনিয়োগকারী কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে নিজের সকল অর্থ বা আংশিক অর্থ খাটানোও জায়িয়। অনুরূপভাবে শিরকতের ভিত্তিতে দুই তিনজন বা আরো বেশি লোকজন মিলে কোনো ব্যাবসায়িক বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রকল্পেও টাকা বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এ ধরনের শিরকত বা অংশীদারত্ব পুরোপুরিই বৈধ, এতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, বহু কাজ ও প্রকল্প রয়েছে, যেখানে একাধিক মানুষের চিন্তা, সহায়তা ও পুঁজি দরকার হয়। একা একজনের পক্ষে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু কয়েকজনের চিন্তা, সহায়তা ও পুঁজি মিলে বহুদূর যাওয়া সম্ভব। আল্লাহ তাআলা তো বলেন—

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى...  
①

আর তোমরা পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে পরম্পরকে সাহায্য করো।<sup>[২]</sup>

[১] আল-মুগনি, ইবনু কুদামা, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৮

[২] সুরা মায়দা, অয়াত : ২

ব্যক্তি ও সমাজের উপকারে আসে বা তাদের কেনো অপকার থেকে বাঁচায়, এমন প্রতিটি কাজই পুণ্য ও তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে, যদি তা শরিয়ত-অনুমোদিত পন্থায় নেক নিয়তে সম্পাদিত হয়।

এই ধরনের যৌথ উদ্যোগ ও প্রকল্প ইসলামে শুধু অনুমোদিতই নয়; বরং এতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দুনিয়াতে বারাকাহ ও সাহায্য এবং আখিরাতে প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তবে শর্ত হলো—আল্লাহর বেঁধে দেওয়া বৈধতার সীমারেখা মেনে এবং সুদ, প্রতারণা, জুলুম, লোভ, অবিশ্বস্ততা সর্বোত্তমাবে পরিহার করে চলতে হবে। এ বিষয়ে হাদিসে কুদসিতে আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَتَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَحْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَةٌ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ  
تَيْنِهِمَا

নিচ্যরই মহান আল্লাহ বলেন, আমি দুই অংশীদারের মধ্যে তৃতীয় অংশীদার হিসেবে থাকি; যতক্ষণ না তাদের কেউ তার সঙ্গীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। যখন একজন অপরজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তখন আমি তাদের থেকে সরে যাই।[১]

### তা'মিন—ইন্সুরেন্স বা বীমা

আধুনিক লেনদেনের একটি প্রকারের নাম হলো ইন্সুরেন্স তথা নিরাপত্তার গ্যারান্টি চুক্তি। ইন্সুরেন্স বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, যেমন লাইফ ইন্সুরেন্স, বিভিন্ন দুর্ঘটনার জন্য নিরাপত্তা ইন্সুরেন্স ইত্যাদি। এ ধরনের নানা ইন্সুরেন্স কোম্পানির বিধান কী? ইসলামে কি এর স্বীকৃতি আছে?

এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে আমাদের একটি বিষয় সম্পর্কে আগে জানতে হবে। সেটা হলো, ইন্সুরেন্স কোম্পানির সঙ্গে ইন্সুরেন্সকারী ব্যক্তির সম্পর্কটা আসলে কীসের? অন্যভাবে বললে, ইন্সুরেন্স গ্রাহক কোম্পানির মালিকদের শেয়ারে অংশীদার কি না? যদি অংশীদার হয়ে থাকে, তাহলে তো ইসলামের শিক্ষা

[১] সুনানু আবি দাউদ: ৩০৮৩; মুস্তাদরাকুল হাকিম: ২৩২২; হাদিসটি হাসান। অবশ্য একদল মুহাদ্দিস হাদিসটিকে মুরসাল হিসেবে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা-ই ভালো জানেন।

অনুসারে প্রত্যেক গ্রাহক সেই কোম্পানির লাভ-ক্ষতির অংশীদার হবে।

এ ব্যাপারে কথা হলো, দুর্ঘটনার ইন্সুরেন্সে গ্রাহক বাংসরিক একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা ইন্সুরেন্স কোম্পানিকে প্রদান করে। এরপর দেখা গেল, পুরো বছরে ইন্সুরেন্সকৃত বস্তু, যেমন দোকান, প্রতিষ্ঠান, জাহাজ ইত্যাদি নিরাপদ থাকল, কোনো ক্ষতির শিকার হলো না। তাহলে ইন্সুরেন্স কোম্পানি সম্পূর্ণ টাকার মালিক বনে যায়, কোনো টাকাই গ্রাহককে ফেরত দেয় না। আর ইন্সুরেন্সকৃত বস্তু যদি সেই বছরের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে কোম্পানি তার গ্রাহককে ক্ষতিপূরণ হিসেবে চুক্তিকৃত টাকা পরিশোধ করে। সুতরাং বোরা গেল, এর সঙ্গে শরিয়ত-অনুমোদিত ব্যবসা বা যৌথ শরিকানার দূরতম সম্পর্কও নেই!

অনুরূপ লাইফ ইন্সুরেন্সের জন্য কেউ এককালীন ২ লক্ষ টাকার ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হলো। ঘটানাক্রমে প্রথম কিসিত পরিশোধের পরেই তার মৃত্যু ঘনিয়ে এলো। এক্ষেত্রে সে তথা তার ওয়ারিশরা পরিপূর্ণ ২ লক্ষ টাকা পাবে। এটা যদি কোনো ব্যবসায়িক চুক্তি হতো, তাহলে সে তার পরিশোধিত অংশ ও তার লভ্যাংশের বেশি এক পাউন্ডও পেত না। তাছাড়া কোম্পানির আরোপিত পাউন্ডের কিছু অংশ বা অধিকাংশ পরিশোধের পরে বাকিটা পরিশোধ করতে না পারলে, তার সম্পূর্ণ টাকা কোম্পানির মালিকানায় চলে যাবে, সে এক টাকাও ফেরত পাবে না। এই ধরনের (অন্যায় ও জুয়াভিত্তিক) নিয়মের ক্ষেত্রে কম করে বললেও বলতে হবে, এটি একটি অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল শর্ত।

এখন কেউ যদি বলে, ইন্সুরেন্স কোম্পানি ও গ্রাহক দুজনেই তো তাদের মর্জিঅনুসারে এতে সম্মত হয়েছে, আর তাদের ভালোর ব্যাপারে তারা নিজেরাই বেশি জানে। সুতরাং এটা বৈধ হবে না কেন? তার এ কথার উত্তরে বলতে হয়, সুদি লেনদেনকারী এবং জুয়াড়িরাও তো পরস্পরের সম্মতিতেই এই ধরনের কাজ করে থাকে। এজন্য কি তাদের সুদ ও জুয়ার চুক্তি বৈধ হয়ে যাবে? না, কক্ষনো তা বৈধ হবে না; বস্তুত লেনদেনের ভিত্তি তো হবে ভারসাম্য ও ন্যায্যতা। অতএব প্রতারণা ও জুলুমভিত্তিক লেনদেনে কিংবা শুধু একপক্ষের লাভযুক্ত চুক্তিতে তাদের নিজেদের সন্তুষ্টির বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে ভারসাম্য ও ন্যায্যতাই হলো চুক্তির বৈধতার ভিত্তি। অতএব ইসলাম-অনুমোদিত চুক্তি বা লেনদেনে না কারো ক্ষতি করার অবকাশ আছে, আর না নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

## ইঞ্জিনের কোম্পানি কি ইসলাম-সম্মত?

ইঞ্জিনের কোম্পানির সঙ্গে গ্রাহকের সম্পর্ক কোনো দিক থেকেই আমাদের কাছে শরিকানা ব্যবসার মতো মনে হয়নি। তাহলে তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে আমরা কী বলে পরিচয় করিয়ে দেবো? এটা কি দানের সাথে সম্পৃক্ত? এই প্রতিষ্ঠানগুলো কি তবে দাতব্য সংস্থা? যেখানে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি দানের উদ্দেশ্যে এখানে টাকা দিয়ে থাকে, যাতে তারা পরপরের বিপদে-আপদে সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে?

উভর জানার আগে আমরা দেখে নিই যে, দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অর্থ জমা রাখার নিয়ম কী। সাধারণত কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অর্থ জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত মেনে চলতে হয়—

» প্রত্যেকের ধার্যকৃত টাকা দানের নিয়তে ভাড়ত্তের দাবি থেকে আদায় করবে। যাতে প্রয়োজনার্থী লোকদের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনে সেখান থেকে ব্যয় করা যায়।

» সংগৃহীত অর্থ বিনিয়োগ করতে চাইলে কেবল শরিয়ত-অনুমোদিত ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করা যাবে।

» দাতাদের কারো ওপর বিপদ আপত্তি হলে সে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে—এমন শর্তে দান বৈধ নয়; বরং তার ক্ষতির সমপরিমাণ বা যতটুকু সম্ভব হয়, ততটুকু সে সহায়তা পাবে।

» স্বেচ্ছায় দান হলো এক ধরনের হেবা। আর স্বাভাবিক অবস্থায় হেবা ফেরত নেওয়া বৈধ নয়। অতএব কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে সেখানে শরিয়ার বিধি-বিধানের ব্যাপারে লক্ষ রাখা কর্তব্য [১]

আমাদের দেশে কিছু সংঘ ও সেবাসংস্থা রয়েছে, যারা এই শর্তগুলো মেনে চলে। লোকজন এখানে মাসিক একটি চাঁদা দেয়, সে এখান থেকে কিছু পায় না বা দানকৃত অর্থ ফেরতও নিতে পায় না এবং কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে সে নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনো ক্ষতিপূরণও দাবি করতে পারে না।

[১] আল-ইসলাম ওয়াল-মানাহিজুল ইশতিরাকিয়াহ (الإِسْلَامُ وَالْمَنَاجِعُ الْاِشْتِرَاكِيَّةُ) বা ইসলাম ও অংশীদারত্বপূর্ণ কার্যপ্রণালী, মুহাম্মাদ আল-গায়লি, পৃষ্ঠা : ১৬৬-১৬৭

কিন্তু আমরা যদি লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাই, ইন্ড্যারেল কোম্পানি বিশেষ করে লাইফ ইন্ড্যারেলের মধ্যে এসব শর্ত বজায় রাখা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কারণ—

» ইন্ড্যারেল গ্রাহকগণ কখনোই দানের নিয়তে টাকা জমা দেয় না, তাদের মাথায় দানের প্রশ্নই আসে না।

» ইন্ড্যারেল কোম্পানিগুলো তাদের সংগৃহীত সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সুদি লেনদেনে বিনিয়োগ করে থাকে। আর সুদি কোনো লেনদেনের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া একজন মুসলিমের জন্য যে বৈধ নয়, এ ব্যাপারে শিথিলপন্থি ও কঠোরতাকারী উভয় পক্ষের লোকই একমত।

» গ্রাহক নির্ধারিত সময় অতিক্রম হওয়ার পরে তার সঞ্চিত সকল টাকা অতিরিক্ত লভ্যাংশ-সহ ফেরত পায়, এটা তো স্পষ্ট সুদ। অনুরূপভাবে ইন্ড্যারেল কোম্পানি সাহায্য সংস্থার আওতাভুক্ত হওয়া সম্ভব নয়; কারণ, এখানে সামর্থ্যবান ধনীরা অভাবীদের চেয়ে অধিক সম্পদপ্রাপ্ত হয়। সামর্থ্যবান ব্যক্তি মোটা অঙ্ক ইন্ড্যারেল হিসেবে দিয়েছিল, তাই মৃত্যু অথবা দুর্ঘটনার সময় সে অধিক সম্পদ পায়; অথচ সাহায্য সংস্থার দাবি হলো, অভাবীরা অন্যদের থেকে তুলনামূলক বেশি সহায়তা পাবে।

» কেউ যদি ইন্ড্যারেল চুক্তি ভেঙে টাকা ফেরত চায়, তাহলে তার সঞ্চিত অর্থ থেকে একটি বিরাট অঙ্ক কেটে নেওয়া হয়। অথচ এ ধরনের কর্তনের নিয়ম ইসলামি কোনো নীতিমালার আওতায় পড়ে না।

### ইন্ড্যারেলকে বৈধ করা করার উপায়

দুর্ঘটনা-সংশ্লিষ্ট ইন্ড্যারেলকে একটি ইসলামি লেনদেনের কাছাকাছি কাঠামোতে দাঁড় করানো সম্ভব। লেনদেনটি হলো, হিবা বিল-ইওয়াজ (ببة بالعوض) বা বিনিময়ের শর্তে দান। ইন্ড্যারেল কোম্পানিতে গ্রাহক তার জমাকৃত অর্থ দান হিসেবে দেবে, তবে শর্ত থাকবে তার বিপদাপদে কোম্পানি সেখান থেকে তাকে সহায়তা ও ক্ষতিপূরণ দেবে। কিছু কিছু মাযহাবে এ ধরনের লেনদেনের বৈধতা পাওয়া যায়। ইন্ড্যারেল কোম্পানির পলিসি এভাবে পরিবর্তিত হলে এবং কোম্পানি সব ধরনের সুদযুক্ত লেনদেন থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিলে একে বৈধতা দানের সুযোগ আছে।

তবে আমার মতে লাইফ ইন্ড্যুরেন্স কোনোভাবেই ইসলামি লেনদেনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না। এটা ইসলামের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক একটি জিনিস। তাই এর বৈধতার চিন্তা সুন্দর পরাহত।

### ইসলামে ইন্ড্যুরেন্স-ব্যবস্থা

ইসলামের সঙ্গে প্রচলিত অবকাঠামো মেনে চলা ইন্ড্যুরেন্স কোম্পানি-পলিসির সংঘর্ষ স্পষ্ট। তবে এর মানে ইসলাম মানুষের জন-মালের নিরাপত্তা বিধানের বিরোধিতা করে থাকে, বিষয়টা আদৌ এমন নয়; বরং এগুলোর সাথে ইসলামের সংঘর্ষ তার পলিসি, পন্থা ও পদ্ধতিতে। সুতরাং কখনো যদি ইসলামি লেনদেনের সঙ্গে সংঘর্ষমুক্ত কোনো ইন্ড্যুরেন্স কোম্পানি অস্তিত্ব লাভ করে, তাহলে ইসলাম তাকে সাদরে ও সানন্দে গ্রহণ করে নেবে।

এ ব্যাপারে কথা হলো, ইসলাম মুসলিম ও তার কর্তৃতাধীন সকলের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে। সেটা কখনো হতে পারে পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমে, আবার কখনো হতে পারে সরকারি সহায়তা ও বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সহযোগিতায়। বাইতুল মাল হলো ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় প্রহণকারী সকলের জন্য একপ্রকার আম-ইন্ড্যুরেন্স-ব্যবস্থা।

ইসলামি শরিয়ায় আমরা এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, বিভিন্ন দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সময় ব্যক্তিগত উদ্যোগে আক্রান্তদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, যাদের জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ—তাদের একজন হলেন দুর্যোগাক্রান্ত ব্যক্তি। দুর্যোগগ্রস্ত হলে কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে, যাতে তারা ক্ষতিপূরণ দেন অথবা কষ্টের বোৰা কিছুটা লাঘব করেন। যেমন : মৃত্যুর পরে আমরা অসহায় ওয়ারিশদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য ও দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেখতে পাই। আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، افْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : {إِنَّمَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ  
مِنْ أَنفُسِهِمْ} فَإِنَّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَا لَا فَرِيْثَةٌ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا ، وَمَنْ تَرَكَ دِيْنًا أَوْ  
ضَيَّعَهُ ، فَلْيَأْتِي فَأَنَا مَوْلَاهُ

দুনিয়া ও আখিরাতে আমি প্রত্যেক মুমিনেরই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতর। যদি তোমরা চাও তাহলে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করো—*اللَّبِيْأُّوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ*<sup>[১]</sup> নবি মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্ঠতর [১] তাই কোনো মুমিন মারা গেলে এবং সম্পদ রেখে গেলে তার নিকটাঞ্চীয় যারা আছে তারা তার সম্পদের ওয়ারিশ হবে। আর যদি সে ঝণ কিংবা কোনো অসহায় পরিবার-পরিজন রেখে যায়, তাহলে সে যেন আমার নিকট আসে; আমিই তার অভিভাবক [২]

মুসলিমদের ইন্দ্রজলের ক্ষেত্রে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলো, যাকাতের মধ্যে ‘গারিমিন’ বা ঋণগ্রস্তদের জন্য অংশ নির্ধারণ। কয়েকজন তাফসিরবিদ ‘গারিমিন’-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যাদের ঘর পুড়ে গিয়েছে বা বন্যায় সম্পদ ও ব্যবসার পুঁজি ইত্যাদি ভেসে গিয়েছে। কিছু ফকির বলেছেন, এই ব্যক্তিদেরকে যাকাতের অর্থ এ পরিমাণ দেওয়া যাবে যে, তারা তাদের পূর্বের সচল অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে; যদিও তার পরিমাণ হাজার-লক্ষ টাকা হোক না কেন।

### আবাদি জমি কাজে লাগানো

শরিয়ত-অনুমোদিত পন্থায় একজন মুসলিমের মালিকানায় যদি কোনো জমি চলে আসে, তাহলে তাতে সে ফসল বা গাছ ইত্যাদি লাগাবে বা কোনো কাজে ব্যবহার করবে, জমি অনর্থক ফেলে রাখবে না। আবাদি জমিকে অনাবাদি অবস্থায় ফেলে রাখাটা ইসলাম সমর্থন করে না। কেননা, এতে আল্লাহ-প্রদত্ত নিয়ামতের অবহেলা ও সম্পদ বিনষ্ট হয়। আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন [৩]

### জমি কাজে লাগানোর বিভিন্ন পদ্ধতি

#### [প্রথম পদ্ধতি] নিজের জমি নিজেই চাষবাস করা

নিজের জমিতে নিজেই কোনো ফসল ফলানো বা কোনো গাছ লাগানো, ফসল আসার আগ পর্যন্ত তাতে পানি দেওয়া এবং যত্ন নেওয়া। নিজের জমিতে নিজে

[১] সূরা আহযাব, আয়াত : ৬

[২] সহিল বুখারি : ৬৭৪৫; সহিহ মুসলিম : ১৬১৯

[৩] সহিল বুখারি : ৬৪৭৩; সহিহ মুসলিম : ৫৯৩, ১৭১৫

চাষবাস করা একটি প্রশংসযোগ্য কাজ। যতদিন সেই ফসল বা গাছের মাধ্যমে কোনো মানুষ, পাখি অথবা জন্ম উপকৃত হবে, ততদিন তিনি এজন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অতিদান পাবেন। আনসারি সাহাবিদের অধিকাংশই নিজেদের জমি নিজেরা চাষ করতেন, এ সম্পর্কে আলোচনা পূর্বেই অতিবাহিত হয়েছে।

### [দ্বিতীয় পর্যটি] বিনিময় ছাড়া জমি অন্যকে চাষ করতে দেওয়া

মালিকের পক্ষে চাষাবাদ সন্তুষ্ট না হলে তিনি অন্য কাউকে সেখানে কাজের সুযোগ দিতে পারেন। সে তার নিজস্ব যন্ত্রপাতি, সহযোগী, বীজ ও প্রাণী দিয়ে সেখানে ফসল ফলাবে। জমির মালিক উৎপন্ন ফসল থেকে কিছুই নেবেন না, এটিও ইসলামের একটি কাঙ্ক্ষিত বিষয়। আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلِيَرْزَعَهَا، أَوْ لِيَمْتَحِنْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَانَتْ أَرْضًا مَيْسِكَةً

যার নিকট জমি রয়েছে, সে যেন তা নিজে চাষ করে কিংবা তার (মুসলিম) ভাইকে বিনা পারিশ্রমিকে (চাষ করতে) দেয়। আর যদি সে এমনটা করতে আপত্তি করে, তবে সে যেন তার জমি (নিজের কাছেই) রেখে দেয়।<sup>[১]</sup>

জাবির রায়িয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَصِيبُ مَنْ الْقُصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلِيَرْزَعَهَا أَوْ فَلِيَخْرِثَهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلِيَبَدِعَهَا

জাবির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে বর্গা চাষ করতাম। ফসল তুলে ফেলার পরে, ঝারে যাওয়া অল্প কিছু ফসল পেতাম আমরা। নবিজি তখন বললেন, যার মালিকানায় কোনো জমি রয়েছে, সে যেন তা নিজে চাষ করে অথবা তার ভাইকে চাষ করতে দেয়, অন্যথায় সে যেন তা ছেড়ে দেয়।<sup>[২]</sup>

[১] সহিহ মুসলিম : ১৫৪৪; সুনান ইবনি মাজাহ : ২৪৫২

[২] সহিহল বুখারি : ২৩৪০; সহিহ মুসলিম : ১৫৩৬

এসব হাদিসের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী কোনো কোনো ফকির হাদিসের বাহ্যিক নির্দেশনাকেই প্রহণ করেছেন। তাদের মতে জমি চাষাবাদের কেবল দুটি পদ্ধতি হতে পারে। যথা—এক. মালিক নিজে চাষ করবে। দুই. অন্য কাউকে বিনা পারিশ্রমিকে চাষাবাদের সুযোগ দেবে। জমির কর্তৃত থাকবে মালিকের হাতে, আর ফসলের মালিকানা থাকবে চাষীর হাতে।

ইমাম ইবনু হায়ম রাহিমাতুল্লাহ নিজ সনদে ইমাম আওয়ায়ি রাহিমাতুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ‘আতা রাহিমাতুল্লাহ, মাকহুল রাহিমাতুল্লাহ, মুজাহিদ রাহিমাতুল্লাহ, হাসান বসরি রহিমাতুল্লাহ বলতেন, দিনার-দিরহামের বিনিময়ে খালি জমি ভাড়া দেওয়া যাবে না। হয়তো ব্যক্তি নিজে চাষ করবে নয়তো তার ভাইকে দেবে। এছাড়া জমি চাষাবাদের আর কোনো সুযোগ নেই।’<sup>[১]</sup>

কিন্তু ইবনু আব্বাস রায়িয়াল্লাহু আনহু মনে করেন, এ সকল হাদিসের নির্দেশনা আবশ্যিকীয় নয়; বরং উৎসাহমূলক ও মুসতাহব পর্যায়ের<sup>[২]</sup> ইমাম বুখারি রাহিমাতুল্লাহ আমর ইবনু দিনার রাহিমাতুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—

فُلْتُ لِطَاؤِسٍ: لَوْ تَرْكَتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَرْغُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ ، قَالَ: أَيْ عَمْرُو إِنِّي أَغْطِيهِمْ وَأَعْيَنْهُمْ ، وَإِنَّ أَغْلَمَهُمْ ، أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهِ عَنْهُ وَلَكِنْ ، قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَخَاهُ خَيْرَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَفْلُومًا

আমি তাউস রাহিমাতুল্লাহকে বললাম, আপনি যদি বর্গাচাষ ছেড়ে দিতেন (তাহলে কতই না ভাল হতো)! কেননা, লোকেরা বলে যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে নিষেধ করেছেন। তাউস রাহিমাতুল্লাহ বললেন, হে আমর, আমি তো তাদেরকে (বর্গাচাষ করতে দিয়ে একপ্রকার) দান করি এবং সাহায্য করি। আর (তুমি জেনে রাখো,) তাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী অর্থাৎ ইবনু আব্বাস রায়িয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্গাচাষ থেকে বারণ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ তার

[১] আল-মুহাম্মাদ, ইবনু হায়ম, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৬

[২] ফাতহুল বারি, ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৫

ভাইকে বিনা পারিশ্রমিকে জমি (চাষ করতে) দেওয়াটা তার জন্য তার ভাইয়ের কাছ হতে নির্দিষ্ট বিনিময় গ্রহণ করার চেয়ে উত্তম।[১]

### [তৃতীয় পদ্ধতি] উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে বর্গাচাষ করতে দেওয়া

কাউকে এই শর্তে জমি প্রদান করা, সে তার নিজস্ব যন্ত্রপাতি, বীজ ও প্রাণী দ্বারা চাষবাদ করে উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়ে নেবে, বাকিটা জমির মালিকের জন্য থাকবে; নির্দিষ্ট অংশটি হতে পারে অর্ধাংশ, এক-তৃতীয়াংশ, তার থেকে কম বা বেশি; তাদের খুশিমতো তারা যা নির্ধারণ করবে তা-ই। জমির মালিক চাষীকে বীজ, যন্ত্রপাতি এবং প্রাণী দিয়ে সহযোগিতাও করতে পারে। চাষবাসের এই পদ্ধতিটিকে আরবিতে মুয়ারাতাহ (مزاولة), মুসাকাহ (مساقاة) বা মুখাবারাহ (مخابرة) বলে, আর বাংলায় এটাকে বলা হয় বর্গাচাষ।[২]

[১] সহিল বুখারি : ২৩৩০; সহিহ মুসলিম : ১৫৫০

[২] বর্গাচাষের বৈধতা নিয়ে ফকিহগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। হানাফি মাযহাবের বিশুদ্ধ মতানুসারে এবং হাফ্লি মাযহাব মতে, উৎপাদিত ফল-ফসলের অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ এরকম অংশের বিনিময়ে বর্গাচাষের প্রচলিত পদ্ধতি বৈধ। অর্থাৎ খালি মাঠে কৃষক ফসল উৎপাদন করে চুক্তি অনুসারে সে জমির মালিককে উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট একটি অংশ দেওয়ার প্রচলিত পদ্ধতিটি শরিয়ত-অনুমোদিত। সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে তারা এটার বৈধতা প্রমাণ করেন। এটা ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু মুআয় ইবনু জাবাল রায়িয়াল্লাহু আনহু, সাইদ ইবনু মুসাইয়িব রাহিমাহুল্লাহু, তাউস রাহিমাহুল্লাহু, আবুর রহমান ইবনু আসওয়াদ রাহিমাহুল্লাহু, মুসা ইবনু তালহা রাহিমাহুল্লাহু, ইবনু শিহাব যুহরি রাহিমাহুল্লাহু, আবুর রহমান ইবনু আবি লাইলা রাহিমাহুল্লাহু, আবুর রহমান ইবনু ইয়ায়িদ রাহিমাহুল্লাহু, সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহু, আওয়ায়ি রাহিমাহুল্লাহু, ইসহাক ইবনু রাহুয়াহ রাহিমাহুল্লাহু, ইবনুল মুন্যির রাহিমাহুল্লাহু প্রমুখের মত। এছাড়াও অনেক সাহবি ও তাবিয়ি থেকে বর্গাচাষ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন বর্ণিত আছে যে, আলি রায়িয়াল্লাহু আনহু, সাদ ইবনু আবি ওয়াকাস রায়িয়াল্লাহু আনহু, ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহু, আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের লোক, আলি রায়িয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের লোক, উমার ইবনু আবুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহু, কাসিম রাহিমাহুল্লাহু, উরওয়া রাহিমাহুল্লাহু, ইবনু সিরিন রাহিমাহুল্লাহু প্রমুখ বর্গাচাষ করেছেন। [আল-মাবসুত, সারাখসি, খণ্ড : ২৩, পৃষ্ঠা : ১৭-১৯; আল-মুগনি, ইবনু কুদামা, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩০৯; কাশশাফুল কিলা, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৩৪; আল-মাওসুতাতুল ফিকহিয়া, খণ্ড : ৩৭, পৃষ্ঠা : ৫০-৫১]

এর বিপরীতে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহু ও যুক্তির রাহিমাহুল্লাহুর মতে, বর্গাচাষ কোনোভাবেই বৈধ নয়। খালি মাঠের ক্ষেত্রেও নয়, আবার গাছসমৃদ্ধ বাগানের ক্ষেত্রেও নয়। সর্বাবস্থায় তারা এ ধরনের চুক্তিকে অবৈধ ঘনে করেন। অবশ্য বীজ ও চাষবাদের যাবতীয় যন্ত্রপাতি যদি জমির মালিক দেয়, আর উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট একটি অংশের বিনিময়ে কৃষক কেবল শ্রম দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি এটাকে বৈধ বলেছেন। হানাফি মাযহাবের প্রধান ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহু এমন মত পোষণ করলেও এ মাযহাবের অন্য দুই শীর্ষ ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহু ও ইমাম মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, চুক্তি অনুযায়ী উৎপাদিত ফল-ফসলের অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ এরকম নির্দিষ্ট অংশের

সহিল বুখারি ও সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে  
বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمِيرٍ أَوْ زَرِعٍ

| নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারবাসীর সাথে জমির উৎপাদিত  
ফল বা ফসলের অর্ধাংশের শর্তে (বর্গাচাষের) চুক্তি করেছিলেন [১]

এই হাদিসটি ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু, ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু ও  
জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রায়িয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন।

বর্গাচাষ বৈধতার প্রবক্তৃগণ এই হাদিসের মাধ্যমে প্রধানত প্রমাণ দিয়ে থাকেন।  
তারা বলেন, এটি একটি বিশুদ্ধ এবং প্রসিদ্ধ বিষয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম তার মৃত্যু পর্যন্ত, খলিফাগণ তাদের শেষ সময় পর্যন্ত, পরবর্তী সময়ে তাদের  
পরিজন, এমনকি মদিনার কোনো ঘরই এ কাজ থেকে মুক্ত ছিল না। নবিজি সাল্লাল্লাহু

বিনিময়ে বর্গাচাষের প্রচলিত পদ্ধতি বৈধ। হানাফি মাযহাবের ফাতওয়া ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ ও  
ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহর মতের ওপর। [রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৭৫-২৭৬; বাদায়িউস  
সানায়ি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৭৫]

মালিকি মাযহাব মতে বর্গাচাষ বৈধ, তবে তার রূপরেখা প্রচলিত পদ্ধতির সাথে মেলে না। ইমাম মালিক  
রাহিমাহুল্লাহর মত হলো, খালি জমি বর্গা দেওয়া যাবে না। বর্গা দিতে চাইলে জমি ও গাছ একসাথে বর্গা  
দিতে হবে। অর্থাৎ ফল-ফসলের গাছগাছালি সহকারেই কেবল বাগান বর্গা দেওয়া যাবে; খালি জমি নয়।  
পাশাপাশি গাছবিশিষ্ট জমির পরিমাণ খালি জমির চেয়ে বেশি হতে হবে। আর চুক্তির ক্ষেত্রে বাগানের  
মালিকের লভ্যাংশের পরিমাণ উৎপাদিত ফল-ফসলের এক-তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কম হতে হবে, বেশি  
হওয়ার সুযোগ নেই। এটাকে মূলত বর্গাচাষ বলা হয় না, এটা অনেকটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বাগান  
পরিচর্যার মতো। তবে পারিশ্রমিকটা উৎপাদিত ফল-ফসল থেকেও হতে পারবে, আবার তার সমমূল্যের  
অন্য কিছুও হতে পারবে, শর্ত হলো তা উৎপাদিত ফল-ফসলের এক-তৃতীয়াংশের বেশি হতে পারবে  
না। [বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩০; আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৬২]

শাফিয়ি মাযহাব মতেও বর্গাচাষ বৈধ, তবে তার রূপরেখা প্রচলিত পদ্ধতির সাথে মেলে না। ইমাম শাফিয়ি  
রাহিমাহুল্লাহর মত হলো, খালি জমি তো বর্গা হিসেবে দেওয়া যাবেই না; এমনকি যেকোনো ফল-ফসলের  
গাছসমূহ বাগানও বর্গা দেওয়া যাবে না। বরং কেবল খেজুর ও আঙুরের বাগানের ক্ষেত্রেই বর্গা দেওয়ার  
অনুমতি আছে; চাই গাছবিশিষ্ট জমির পরিমাণ খালি জমির চেয়ে বেশি হোক বা কম। তবে অন্য আরেকটি  
মতানুসারে গাছবিশিষ্ট জমির পরিমাণ খালি জমির চেয়ে কম হলে সেক্ষেত্রে বাগান বর্গা দেওয়া বৈধ হবে  
না। আর জমি যদি একেবারে খালি হয় তাহলে সেটাকে বর্গাচাষের জন্য দেওয়া কিছুতেই বৈধ নয়। [মুগলিল  
মুহতাজ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪২১-৪২২; আল-মুহাজাৰ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৪১-২৪২]।

[১] সহিল বুখারি : ২৩২৮; সহিহ মুসলিম : ১৫৫১

আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পরে তার স্তীগণও এই চাষাবাদ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই এমন একটি বিষয় কখনোই রহিত হওয়ার নয়। কেননা, রহিত হওয়ার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্ধশার সঙ্গে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে যে বিষয়ের সঙ্গে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমৃত্যু সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তারপরে তার খলিফাগণ, বলা যেতে পারে সকল সাহাবি এ ব্যাপারে একমত ছিলেন এবং এ অনুযায়ী কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে কেউই এ বিষয়ে বিরোধ করেননি, তাহলে এমন একটি বিষয় কী করে রহিত হতে পারে? যদি এ বিষয়টি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্ধশাতেই রহিত হয়ে থাকে; তাহলে প্রশ্ন হলো, রহিত হওয়ার পরেও কী করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের চাষাবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন? এটাই বা কী করে সন্তুষ—রহিত হওয়ার বিষয়টি খলিফাদের কাছে পৌঁছেনি; অথচ খাইবার এবং খাইবার-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সবার জানা ছিল। আর রহিতকরণ-সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনাকারীই বা কোথায় ছিলেন? তিনি বিষয়টি তাদের সামনে কেন আলোচনায় আনেননি বা তাদেরকে জানাননি?

### নিষিদ্ধ বর্গাচুক্তি

নবিযুগে প্রচলিত এক ধরনের বর্গাচুক্তিতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। কারণ, তাতে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার মতো অনিশ্চয়তা ও অস্পষ্টতা থাকত, তাছাড়া এতে ইসলামের কাঙ্ক্ষিত ন্যায্যতা ও ভারসাম্যও রক্ষা হয় না। নবিযুগে প্রচলিত সে বর্গাচুক্তিতে জমির মালিক শর্ত দিত, জমির নির্দিষ্ট উর্বর অংশের ফসল বা নির্দিষ্ট ওজন পরিমাণ ফসল তার জন্য বরাদ্দ রেখে বাকি অংশ কৃষকের একার বা তাদের মধ্যে আধাআধি হারে বণ্টিত হবে।

উৎপন্ন শস্য কম বেশি যা-ই হোক, তাতে দুজনের অংশ থাকাই হলো সাম্য ও কাঙ্ক্ষিত। কারো জন্য পূর্বনির্ধারিত নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ অবধারিত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা, হতে পারে শস্য উৎপন্নই হলো পূর্বনির্ধারিত সে নির্দিষ্ট পরিমাণ। তাহলে এক্ষেত্রে মালিক একাই ফসল পাবে, আর শ্রমদাতা কৃষক বণ্টিত হবে। অন্যদিকে হতে পারে, মালিকের জন্য নির্দিষ্ট ভূমিতে ফসলই হলো না, তাহলে সেক্ষেত্রে মালিক হবে বণ্টিত, আর শ্রমদাতা কৃষক হবে লাভবান।

দুজনের মধ্যে উৎপন্ন শস্য, তারা যেভাবে চান, সেভাবে বণ্টিত হলে এবং ফসল বেশি হলে উভয়ে লাভবান হবে, ফসল কম হলে দুজনেই অল্প অল্প করে পাবে,

আর যদি কোনো ফসল উৎপন্ন না হয়, তাহলে বোঝা উভয়ের কাঁধেই চেপে বসবে। এই সমতা তাদের উভয়ের মানসিক স্থিতি ও সাংস্কারণ জন্য অত্যন্ত জরুরি।

ইমাম বুখারি রাহিমাতুল্লাহ রাফি ইবনু খাদিয় রাফিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—

كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرِعًا ، كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمَّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ ،  
قَالَ : فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلِمُ الْأَرْضُ ، وَمِمَّا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلِمُ ذَلِكَ ، فَتُهِبِّنَا

মদিনাবাসীর মধ্যে আমরা (আনসাররা) সবচেয়ে বেশি কৃষিজমির মালিক ছিলাম। আমরা জমির মালিকের জন্য জমির নির্দিষ্ট একটি অংশের ফসলের বিনিময়ে জমি (চাষ করতে) বর্গা দিতাম। তিনি বলেন, কখনো জমির এ নির্দিষ্ট অংশের ওপর দুর্যোগ আসত, আর অন্য অংশ নিরাপদ থাকত। আবার কখনো জমির অন্য অংশের ওপর দুর্যোগ আসত আর নির্দিষ্ট এ অংশ নিরাপদ থাকত। এরপর আমাদেরকে (এরূপ লেনদেন করতে) নিষেধ করে দেওয়া হলো।<sup>[১]</sup>

ইমাম মুসলিম রাহিমাতুল্লাহ রাফি ইবনু খাদিয় রাফিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—

إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَآذِيَّاتِ ، وَأَفْبَالِ  
الْجَدَائِيلِ ، وَأَشْيَاءِ مِنَ الزَّرْعِ ، فَيَهْلِكُ هَذَا ، وَيَسْلِمُ هَذَا ، وَيَهْلِكُ هَذَا ، فَلَمْ  
يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا ، فَلِذِلِكَ زُحْرَ عَنْهُ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে লোকেরা পানির ডেনের পার্শ্ববর্তী অংশের ফসল, খালের অগ্রভাগের ভেজা অংশের ফসল ও উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট (ওজন, যেমন এক মন বা দুই মন ইত্যাদি) পরিমাণ নেওয়ার শর্তে জমি বর্গা দিত। এতে কখনো এক অংশ বিনষ্ট হতো এবং অপর অংশ ভালো থাকত। আবার কখনো এ অংশ ভালো থাকত এবং অপর অংশ বিনষ্ট হতো। সেসময় লোকজনের মাঝে কেবল এ ধরনের বর্গাপদ্ধতিই চালু ছিল। এজন্যই এ ধরনের লেনদেনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়।<sup>[২]</sup>

[১] সহিল বুখারি : ২৩২৭; মুসতাখরাজু আবি আওয়ানা : ৫১৬৮

[২] সহিল মুসলিম : ১৫৪৭; সুনানু আবি দাউদ : ৩৩৯২

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ যুহাইর ইবনু রাফি রায়িয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—

دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاجِلِكُمْ؟ فَقُلْتُ: نُواجِرُهَا  
عَلَى الرُّبُعِ ، وَعَلَى الْأَوْسَقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعْبِيرِ ، قَالَ: لَا تَفْعَلُوا

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডেকে জিজেস করলেন, তোমরা ক্ষেত-খামার কীভাবে চাষাবাদ করো? আমি বললাম, আমরা এক-চতুর্থাংশের শর্তে অথবা খেজুর ও যবের নির্দিষ্ট কয়েক গুসাক প্রদানের শর্তে জমি বর্গা দিয়ে থাকি। তিনি বললেন, তোমরা এটা কোরো না।<sup>[১]</sup>

এ হাদিসের ব্যাখ্যা হলো, প্রথমে জমির মালিক নিজের জন্য একটি পরিমাণ নির্ধারিত করে রাখত, সেটা তারা গাছ থেকে কেটে নিতো। এরপর জমির মালিক অবশিষ্ট ফসল কৃষকের সাথে চুক্তি অনুসারে বণ্টন করত। উদাহরণসূরূপ (পূর্বের চুক্তি অনুসারে) একজন পেত অবশিষ্ট ফসলের এক-চতুর্থাংশ, আর অন্যজন পেত তিন-চতুর্থাংশ।

এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামাজিক লেনদেনে পরিপূর্ণ ভারসাম্য ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে এবং মুসলিমদের সমাজ থেকে ঝগড়া-বিবাদের যাবতীয় উপকরণ দূর করতে কতটা আগ্রহী ও সচেষ্ট ছিলেন!

উরওয়া ইবনু যুবাইর রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهُ ، أَغْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ ، إِنَّمَا أَئِي  
رَجُلَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ افْتَلَا ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا  
الْمَزَارَعَ ، فَسَمِعَ رَافِعٌ بْنُ خَدِيجٍ قَوْلَهُ: فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارَعَ.

যাইদ ইবনু সাবিত রায়িয়াল্লাহু আনহু (একদিন) বললেন, আল্লাহ রাফি ইবনু খাদিয় রায়িয়াল্লাহু আনহুকে ক্ষমা করুন। আল্লাহর শপথ! (জমি বর্গাচাষ নিষিদ্ধ হওয়া-সংক্রান্ত) সেই হাদিসটি সম্পর্কে আমি তার চেয়ে বেশি অবগত। ঘটনা

[১] সহিলুল বুখারি: ২৩৩৯; সহিহ মুসলিম: ১৫৪৮

হলো, একবার দুই ব্যক্তি বাগড়া-বিবাদ করে (মীমাংসার জন্য) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে উপস্থিত হলো। তখন তিনি বললেন, এই যদি হয় তোমাদের অবস্থা, তাহলে তোমরা জমি বর্গা দিয়ো না। রাফি ইবনু খাদিয় রায়িয়াল্লাহু আনহু তার কথার শুধু এই শেষের অংশটুকুই শুনলেন, ‘তাহলে তোমরা জমি বর্গা দিয়ো না।’ (ফলে তিনি আংশিক কথা শোনার ওপর ভিত্তি করে জমি বর্গা নিষেধ বলে বর্ণনা করেছেন) [১]

জমির মালিক ও চাষী উভয়ের উচিত পরস্পরের প্রতি উদার, দয়াদৃ ও ক্ষমাশীল হওয়া। ভূমি মালিক যেমন বেশি ফসল দাবি করবে না, তেমনি চাষির কর্তব্য উৎপন্ন ফসলে ভূমি মালিককে না ঠকানো। এজন্য ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارِعَةَ، وَلَكِنْ أَمْرَ أَنْ يَرْفَقَ بِغَصْبِهِمْ  
بِبَغْضٍ

বর্গাচাষ প্রথাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারাম করেননি। বরং তিনি একে অন্যের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন [২]

এজন্য তাবিয়ি তাউস রাহিমাহুল্লাহকে বর্গাচাষ ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হলে তিনি বলতেন, আমি তো তাদের দান করি ও সাহায্য করি। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ আমর ইবনু দিনার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—

فُلِتْ لِطَاؤِسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَرْغُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى  
عَنْهُ، قَالَ: أَنِّي عَمِرْتُ إِنِّي أَغْطِيَهُمْ وَأَعْيَنْهُمْ، وَإِنَّ أَغْلَمَهُمْ، أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهِ عَنْهُ وَلَكِنْ، قَالَ: أَنْ يَمْتَحِنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ  
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَغْلُومًا

আমি তাউস রাহিমাহুল্লাহকে বললাম, আপনি যদি বর্গাচাষ ছেড়ে দিতেন (তাহলে কতই না ভালো হতো)! কেননা, লোকেরা বলে যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১] সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৪৬১; মুসনাদু আহমাদ : ২১৫৮৮; হাদিসটি হাসান।

[২] জামিউত তিরমিয়ি : ১৩৮৫; সহিলু ইবনি হিলবান : ৫১৯৫; হাদিসটি সহিল।

ইমাম ইবনু হায়ম রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য খেয়াল করলে এই মাসআলাটির চরিত্র যেকোনো চিন্তাশীল পাঠকই ধরতে পারবেন। তিনি বলেন, ‘নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় এসে দেখলেন, মদিনাবাসী তাদের জমি ইজারা দিচ্ছে, যেমনটা আমরা রাফি ইবনু খাদিয় রায়িয়াল্লাহু আনহু-সহ অন্যদের বর্ণনা থেকে জানতে পেরেছি। সন্দেহ নেই যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরিত হওয়ার আগ থেকেই আরব সমাজে জমি ইজারার বিষয়টি প্রচলিত ছিল, এ নিয়ে কোনো বৃদ্ধিমান ব্যক্তিই সংশয় করবে না। তাছাড়া জাবির রায়িয়াল্লাহু আনহু আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু, আবু সাইদ রায়িয়াল্লাহু আনহু রাফি রায়িয়াল্লাহু আনহু জুহাইর আল-বাদরি রায়িয়াল্লাহু আনহু আরেকজন বদরি সাহাবি ও ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, ‘আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমি ইজারা দিতে সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করেছেন।’ এতে অর্থের বিনিময়ে জমি ইজারার বৈধতা পরিপূর্ণভাবে নাকচ হয়ে যায়। এখন কেউ নিশ্চিত কোনো রহিত বিধানের ব্যাপারে বৈধতার দাবি করলে সে একজন মিথ্যুক, সত্যকে অস্মীকারকারী ও অজ্ঞাত বিষয়ে প্রলাপকারী বলে বিবেচিত হবে। এ ধরনের প্রলাপ কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের আলোকে হারাম করা হয়েছে। তবে সে যদি প্রমাণ আনতে পারে, তাহলে ভিন্ন কথা। আর তার পক্ষে প্রমাণ আনা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। অবশ্য উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশ যেমন : এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশের মধ্যে ইজারা তথা বর্গাচারের প্রমাণ তো আমাদের সামনেই রয়েছে। কারণ, বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমি ইজারা দিতে নিষেধের কয়েক বছর পরেও তিনি খাইবারের ইহুদিদের সঙ্গে বর্গাচুক্তি করেছেন এবং আমৃত্যু এর উপরই তিনি ছিলেন।’[১]

এই মতের পক্ষেও এক দল সালাফ রয়েছেন। ইয়ামানের ফকিহ, বিখ্যাত তাবিয়ি তাউস রাহিমাহুল্লাহ সুর্মুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে জমি ইজারা দেওয়াকে নাজারিয়

---

ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, যে মাসআলায় চার মাঘহাব-সহ উম্মাহর অধিকাংশ আলিম বৈধতার পক্ষে, সেখানে বিপরীত পক্ষে কিছু দলিল দেখে সংশয়ে নিপতিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। নিঃসন্দেহে শক্তিশালী দলিল-প্রমাণের আলোকে এবং উম্মাহর অধিকাংশ আলিমদের মতানুসারে মুদ্রার বিনিময়ে জমি লিজ দেওয়া বৈধ। অধিকাংশ আলিমের বিপরীতে গ্রন্থকারের আলোচনা থেকে এ মাসআলার ব্যাপারে সংশয়ে পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বেশি সংশয় লাগলে যেকোনো বিজ্ঞ আলিমের শরণাপন হলেই সব সংশয়-সন্দেহ দূর হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

[১] আল-মুহাম্মাদ, ইবনু হায়ম, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৬০-৬১

মনে করতেন, তবে বর্গাচাষে কোনো সমস্যা মনে করতেন না। যখন তার বিরুদ্ধে জমি ইজারার নিষেধাজ্ঞা-বিষয়ক হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হলো, তখন তিনি বললেন—

**قَدِمْ عَلَيْنَا مُعَاذْ بْنُ جَبَلٍ فَأَغْطَى الْأَرْضَ عَلَى النُّثْ وَالرُّبْعِ ، فَتَخْنَقْ نَفْلَهَا إِلَى الْيَوْمِ**

মুহায় ইবনু জাবাল রায়িয়াল্লাহু আনহু (আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে ইয়ামানের দিকে প্রেরিত হয়ে) আমাদের কাছে এলেন। তখন তিনি এক-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশ ফসলের বিনিময়ে জমি বর্গাচাষের জন্য দিয়েছিলেন। আর এখন পর্যন্ত আমরা এভাবেই জেনে আসছি।<sup>[১]</sup>

তার বক্তব্য থেকে বোধ যাচ্ছে, তিনি সোনা-রূপার বিনিময়ে ইজারাকে হারাম মনে করছেন, বাদবাকি বর্গাচাষে কোনো সমস্যা দেখছেন না।

এ ধরনের বক্তব্য মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন রাহিমাল্লাহ, কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবি বকর রাহিমাল্লাহ থেকেও পাওয়া যায়। তারা উভয়ে কোনো খরচ করা ছাড়া শূণ্য জমি দিয়ে উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ বা এক দশমাংশের বিনিময়ে বর্গাচাষের জন্য কাউকে জমি প্রদানে কোনো সমস্যা মনে করতেন না।<sup>[২]</sup> অথচ তারা উভয়েই জমি ইজারা প্রদান নিষেধের হাদিস বর্ণনাকারী।

অবশ্য তাবিয়িদের একটি দলের কাছে জমি ইজারা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ, সেটা অর্থের বিনিময়ে হোক বা উৎপন্ন শস্যের বিনিময়ে হোক। সন্দেহ নেই যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খুলাফায়ে রাশিদিন ও মুয়াজ রায়িয়াল্লাহু আনহুর আমল তাদের বিপক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে থাকবে। এটাই প্রথম যুগে সাধারণ মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত আইন। আর নগদ অর্থের বিনিময়ে ভূমি ইজারার নিষিদ্ধতা যৌক্তিক ও পরম্পরাগত দলিল দ্বারা প্রমাণিত।<sup>[৩]</sup>

[১] আল-মুহাল্লা, ইবনু হায়ম, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৯

[২] আল-মুহাল্লা, ইবনু হায়ম, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৫০

[৩] এটা উস্মাহর অল্প কিছু আলিমের মত। প্রথকার ড. ইউসুফ কারযাবি রাহিমাল্লাহ এখানে জমহুরের বিপরীতে অল্প কিছু আলিমের মতকেই শক্তিশালী মনে করে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অর্থ-মূদ্রার বিনিময়ে জমি লিজ দেওয়া বৈধ হওয়ার মাসআলায় জমহুরের মতটাই অধিক শক্তিশালী। সাহাবা,

## জমি ইজারা দেয়া কি বৈধ?

ইসলামি মূলনীতি ও কুরআন-হাদিসের বক্তব্যের ধারা খেয়াল করলে বোঝা যায়— শুন্য জমি নগদ অর্থের বিনিময়ে ইজারা দেওয়া বৈধ হওয়ার কথা নয় [১] নিম্নে কয়েকটি যৌক্তিক কারণ তুলে ধরা হলো—

[এক] জমির মালিকের জন্য উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ যেমন : এক মণ, দুই মণ, এক স্তুপ বা দুই স্তুপ ধার্য থাকবে, এমন বিনিময়ে ভূমি ইজারা দিতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। বর্গাচুক্তি কেবল শতকরা হিসেবেই বৈধ হবে, যাতে জমিতে ফসল এলে তারা দুজনই যায়, আর দুর্ঘাগে ফসল নষ্ট হলে তারা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

একজনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের নিশ্চয়তা, আর অন্যজনের শ্রম বিফলে যাওয়ার আশঙ্কা, এ তো অনেকটা সুদের মতোই ব্যাপার। নগদ অর্থে জমি ইজারা দেওয়া আর নির্দিষ্ট ফসলের নিশ্চয়তায় ভূমি ইজারা দেওয়া, যা সবার নিকটই নাজায়িয়, এ দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? একদিকে ইজারাদারের বিনিময় তথা অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত, অন্যদিকে ইজারাগ্রহণকারী শ্রম দেবে, যাম করাবে; অথচ তার জানা নেই যে, ফসল হবে নাকি হবে না, সে লাভবান হবে, নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হবে [২]

তাবিয়িন ও চার মাযহাব-সহ উম্মাহর অধিকাংশ ফকিহগণ এ মতই পোষণ করেন; যেমনটি আমরা ইতিঃপূর্বে উল্লেখ করেছি।

[১] প্রথমত, অর্থের বিনিময়ে জমি লিজ দেওয়ার বৈধতার দলিল হাদিসে পাওয়া যায়। উম্মাহর অধিকাংশ ফকিহের মতও বৈধতার পক্ষে। দ্বিতীয়ত, এ ব্যাপারে আকলি তথা যুক্তিনির্ভর দলিলও রয়েছে, যার বিবরণ ফিকহের কিতাবসমূহে বিদ্যমান। প্রথকার ড. ইউসুফ কারযাবি রাহিমাহুল্লাহ এটার অবৈধতার পক্ষে যে চারটি যুক্তি পেশ করেছেন, এর বিপক্ষেও ফকিহগণের শক্তিশালী মত রয়েছে।

[২] ইজারাচুক্তি এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে ইজারাদার নির্দিষ্ট পারিশ্রমকের বিনিময়ে তার মালিকানাধীন বস্তু থেকে অন্যকে উপকৃত হতে দেবে। চাই ইজারা গ্রহণকারী সে বস্তু থেকে উপকৃত হতে পারুক বা না পারুক। যেমন : কেউ অন্য এক ব্যক্তিকে তার দোকান ভাড়া দিলো, যেন সে সেখানে ব্যবসা করতে পারে। কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল, সে ব্যবসায় লাভবান হতে পারছে না; বরং দিনদিন তার কেবল লসই হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এখানে দোকানের মালিকের লাভ নিশ্চিত; অথচ দোকান ভাড়াটায় লাভ অনিশ্চিত। কেননা, তার জানা নেই যে, এ দোকানে ব্যবসা করে সে লাভবান হবে নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবু সকলের নিকটেই দোকান ভাড়া দেওয়াটা বৈধ। সুতরাং একপক্ষের লাভ নিশ্চিত, আর অপরপক্ষের লাভ অনিশ্চিত থাকলেই সেটাকে সুদের সদৃশ বলে নাজায়িয় বলাটা সঠিক নয়।

[দুই] কোনো কিছু ভাড়া দিতে হলে বস্তুটিকে কাজের উপযোগী বানাতে হয়, যবহারের সময় ভাড়াগ্রহীতা বস্তুর কিছু ক্ষতিও করে, এসবের বিনিময়ে ভাড়াদাতা মালিক কিছু অর্থ পায়।

ভূমি ইজ্জারাদার কি জমি প্রস্তুত করে দেয় বা তার জন্য কোনো পরিশ্রম করে? জমি তো শস্য উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত করেন আল্লাহ তাআলা, ভূমি মালিক নয়; উপরতু ভূমি তো ঘর-বাড়ি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মতো নয় যে, ভেঙ্গে যাবে, ক্ষয় হয়ে যাবে।<sup>[১]</sup>

এবার জমির উৎপাদিত ফসল থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল নেওয়া কিংবা জমির নির্দিষ্ট কোনো অংশের ফসল নেওয়ার শর্ত করলে সেক্ষেত্রে বর্গাচাষ বৈধ না হওয়ার কারণ কী? এক্ষেত্রে একজনের লাভ সুনির্ণিত থাকে আর অন্যজনের লাভ অনিশ্চিত থাকে, অবৈধ হওয়ার এটাই একমাত্র ও প্রধান কারণ নয়। বরং এটা অবৈধ হওয়ার মূল ও প্রধান কারণ হলো, এ ধরনের লেনদেনে বাগড়া-বিবাদের আশঙ্কা থাকে; যেমনটি একাধিক হাদিস থেকে জানা যায় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাগড়া-বিবাদের কারণে দুই সাহাবিকে বর্গাচাষ করতে নিষেধ করেছিলেন। এমন চুক্তির লেনদেনে কখনো একপক্ষ একাই লাভবান হয়, কখনো অপরপক্ষ একাই লাভবান হয়, কখনো উভয়েই লাভবান হয়, আবার কখনো উভয়ের ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমন হলে সাধারণত সেখানে বাগড়া-বিবাদের আশঙ্কা থাকে। এজন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের লেনদেন থেকে নিষেধ করেছেন।

মনে হতে পারে, বর্গাচাষের লেনদেন তো শারয়ি মূলনীতির আলোকে নাজারিয় হওয়ার কথা ছিল। কেননা, এখানে লেনদেনের বিনিময়মূল্য অঙ্গাত। জমির মালিক ও কৃষক কারোরই জানা নেই যে, আদৌ ফসল হবে নাকি হবে না, আর হলেও তার পরিমাণ কতটুকু। দ্বিতীয়ত, এখানে বিনিময়মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে এমন জিনিস, যা কৃষক আর্থিক বিনিয়োগ ও শারীরিক পরিশ্রম করার পর তবেই অস্তিত্বে আসে। অথচ শারয়ি মূলনীতি হলো, শ্রমদাতার শ্রম থেকে তৈরি জিনিস দ্বারা পরিশ্রমিক নির্ধারণ করা জারিয় নেই। হাদিসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এরকম একাধিক শারয়ি মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া সত্ত্বেও বর্গাচাষকে বৈধ করা হয়েছে মানুষের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ করে। সুতরাং এ মাসআলাটি বলা যায় কিয়াস-বহির্ভূত সরাসরি নস দ্বারা প্রমাণিত। তাই এ মাসআলার কোনো অংশ দিয়ে অন্য মাসআলার বৈধতা-অবৈধতার যৌন্তিকতা নির্ণয় করা পুরোই ভুল। কেননা, শরিয়তের মূলনীতি হলো, কোনো মাসআলার যৌন্তিকতা-অযৌন্তিকতা কেবল সেসব মাসআলা দ্বারাই নির্ণয় করা যায়, যেগুলো কিয়াসভিত্তিক নস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং কিয়াস-বহির্ভূত নস দ্বারা কোনো মাসআলা প্রমাণিত হলে সেটার ওপর ভিত্তি করে অন্য কোনো মাসআলাকে যৌন্তিক-অযৌন্তিক নির্ণয় করার কোনো অবকাশ নেই।

[১] এ দাবি সঠিক নয় যে, ভাড়া দেওয়ার জন্য ভাড়ায় দেওয়া বস্তুতে আলাদাভাবে মেহনত-পরিশ্রম করে প্রস্তুত করা এবং তাতে ভাড়াগ্রহীতার ক্ষয়ক্ষতি করাটা জরুরি। কেননা, এমন অনেক ভাড়াচুক্তি দেখানো যাবে, যেখানে এ দুটি বিষয় না পাওয়া সত্ত্বেও সেটা বৈধ। যেমন : কেউ একটি সূর্ণের চেইন কিনে তা যবহারের জন্য নির্দিষ্ট টাকায় ভাড়া দিল। এখানে চেইনটি ভাড়া দেওয়ার জন্য আলাদাভাবে মেহনত-পরিশ্রম করে প্রস্তুত করার প্রয়োজন নেই। অনুরূপ এখানে ভাড়া দেওয়ার কারণে চেইনের উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষয়ক্ষতিও হয় না। দ্বিতীয়ত, আমরা যদি একথা মেনে নিই যে, ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে এ দুটি বিষয়ের প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা বলব, জমি ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রেও এ দুটি পাওয়া যায়। কেননা, যেকোনো জমি

[তিনি] সাধারণত ঘর ইত্যাদি ভাড়া নেওয়ার পরই সেটি বসবাস উপযোগী থাকে, বসবাসের জন্য ভাড়াটিয়ার সেখানে আলাদা কোনো শ্রম দিতে হয় না; কোনো সামগ্রী ভাড়া নিলে সেটাও তৎক্ষণাত্ ব্যবহারের উপযোগীই থাকে। কিন্তু ভূমি তো এরূপ ব্যবহারযোগ্য থাকে না। ইজারাগ্রহীতা ইজারা নেওয়ামাত্রই ঘর ও আসবাবপত্রের মতো তা ব্যবহার করতে পারে না। তাকে সেখানে শ্রম দিতে হয়, ঘাম ঝরাতে হয় সম্ভাব্য ফসলের আশায়, যেটি কখনো কাঞ্চিত মাত্রায় উৎপন্ন হতে পারে আবার কখনো উৎপন্ন না-ও হতে পারে। তাই ঘর-বাড়ি ভাড়ার সঙ্গে ভূমি ইজারার তুলনা যথার্থ নয়।<sup>[১]</sup>

[চার] হাদিসে এসেছে, পরিপক্ব এবং দুর্যোগ ও বিপদমুক্ত হওয়ার আগে ক্ষেত বা বাগানে থাকাকালীন ফল বিক্রয় করতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। এর কারণ হিসেবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তুমি ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ তাআলা ফল ধরানো বন্ধ করে

যেকোনো কাজের জন্য ভাড়া দেওয়া যায় না। যদি কেউ কোনো জমি ফসলি জমি হিসেবে ভাড়া দিতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই জমিটিকে ফসলের উপযুক্ত জমি বানিয়ে দিতে হবে। যেমন : কাঠো একটি নর্দমা আছে, সে কিন্তু চাইলেই সেটাকে ফসলি জমি হিসেবে ভাড়া দিতে পারবে না। বরং সেখানে ভালো মাটি ফেলে সেটাকে যথাযথ প্রস্তুত করে তবেই তা ভাড়া দিতে হবে। অনুরূপ ভাড়াগ্রহীতা জমিতে একটু হলেও ক্ষয়-ক্ষতি করে। কেননা, সে সেখানে ফসল ফলিয়ে কেটে নেওয়ার পর তাতে বিভিন্ন আগাছ ও ময়লা পড়ে থাকে, যা পরে জমির মালিককেই পরিষ্কার করতে হয়। অনেক সময় বিভিন্ন ফসলের কারণে জমির উর্বরতাও কিছুটা কমে যায়। অনুরূপ জমির চারপাশের আইল-সহ বিভিন্ন অংশ অনেক সময় কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে দৃষ্টিকে একটু প্রসারিত করে ভাবলে দেখা যায়, জমি ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রেও এ দুটি বিষয় পাওয়া যায়।

[১] এখানে লক্ষ্যণীয়, ভাড়াগ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভাড়া নিয়েছে, সে উদ্দেশ্য তৎক্ষণিকভাবে পূরণ করা সম্ভব কি না। উদ্দাহরণস্বরূপ, কেউ একটি দোকান ভাড়া নিল। এখন আমরা জানি যে, সাধারণত দোকান ভাড়া নেওয়া হয় ব্যবসার উদ্দেশ্যে। সুতরাং দোকানে যদি মালামাল উঠিয়ে ব্যবসা করার মতো সবকিছু ঠিক থাকে তাহলে ভাড়া দেওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। বাকি ভাড়াটিয়া তার ব্যবসা থেকে লাভবান হতে হলে তাকে অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম না করে শুধু দোকান ভাড়া নিয়ে বসে থাকলে তো কোনো লাভ আসবে না, উল্লে আরো লস হবে। জমির ব্যাপারটিও অনেকটা এরকমই। জমি ভাড়া নেওয়া হয় পরিশ্রম করে ফসল ফলানোর জন্য, ভাড়া নেওয়ামাত্রই তৈরি ফসল পাওয়ার জন্য নয়। ভাড়ার ক্ষেত্রে প্রধানত দেখতে হবে ভাড়া নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য কী এবং সেটার জন্য ভাড়াকৃত জিনিস উপযুক্ত কি না। সুতরাং জমি ভাড়ার ক্ষেত্রে জমি যদি ফসল ফলানোর উপযুক্ত থাকে তাহলেই সেটা ভাড়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। অতএব জমিতে পরিশ্রম করে ফসল ফলানোর কারণে যদি এটা ভাড়ার উপযুক্ত না হয়ে থাকে তাহলে তো দোকানেও সময় ও শ্রম দিয়ে ব্যবসা করার কারণে তা ভাড়ার উপযুক্ত হওয়ার কথা নয়। অথচ এটা বাস্তবতার পুরোই বিপরীত। বোঝা গেলো, দোকানের মতো জমি ও অর্থের বিনিময়ে লিঙ্গ দেওয়াটা যৌক্তিক। এতে অযৌক্তিকতার কিছু নেই।

দেন, তাহলে তোমাদের কেউ (অর্থাৎ বিক্রেতা) কীসের বদলে তার (ক্রেতা) ভাইয়ের সম্পদ (অর্থাৎ ফলের মূল্য) গ্রহণ করবে? [১]

ফল হয়েছে, কিন্তু পরিপক্ষ হয়নি, তাই আশঙ্কা রয়েছে কাড়ে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেক্ষেত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বক্তব্য দিয়েছেন। তাহলে শুন্য জমি, যেখানে কোদালের অঁচড় পড়েনি এবং শস্য রোপিত হয়নি, তার অবস্থা কী হবে? ‘তুমি ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ তাআলা ফল ধরা বন্ধ করে দেন, তাহলে তোমাদের কেউ (অর্থাৎ বিক্রেতা) কীসের বদলে তার (ক্রেতা) ভাইয়ের সম্পদ (অর্থাৎ ফলের মূল্য) গ্রহণ করবে?’ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য তো এক্ষেত্রে আরো প্রবলভাবে প্রযোজ্য হয়।

আমি সুচক্ষে অনেক তুলার ক্ষেত দেখেছি, ফলে-ফুলে ভরতি; কিন্তু হঠাতে পোকার আক্রমণে একেবারে সব দফারফা হয়ে গিয়েছে, তুলার কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট থাকেনি। ভূমি মালিক কেবল বিনিয়য় চাইবে, আর চাষি শুধু অভাবে পড়ে তার অনুগত থাকবে, তাদের মধ্যে সমতা কোথায়! ইসলামে কাঞ্চিত সাম্য আসলে কোথায়? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমোদিত বর্গাচাষ ছাড়া অন্য কোথাও ভারসাম্য ও ন্যায্যতার অস্তিত্ব নেই, যেখানে লাভ-ক্ষতি উভয়ের কাঁধে সমানভাবে বর্তায়।[২]

[১] সহিল বুখারি : ২১৯৮; সহিহ মুসলিম : ১৫৫৫

[২] ইসলামি বিধানমতে ইজারার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের লাভ-ক্ষতি সমানভাবে থাকা আবশ্যিক নয়। শরিয়তে এমন অসংখ্য নজির আছে, যেখানে ইজারাদাতা পরিপূর্ণ ভাড়ামূল্য বুঝে পেলেও ভাড়াগ্রহীতা লসের শিকার হয়। আর এটা খুবই স্মাভাবিক ব্যাপার। যাকি বর্গাচাষ ও গাছের ফল-ফলাদি বিক্রির ক্ষেত্রে এমন কোনো শর্ত করা বৈধ নয়, যা একপাঞ্চিক লাভ নিশ্চিত করে। প্রথমত, এটা অনেক সময় ঝাগড়া-বিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য শরিয়ত শুরু থেকেই এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তৃতীয়ত, বর্গাচাষের বিষয়টি কিয়াস-বহির্ভূত একটি লেনদেন, যা কেবল নসের আলোকেই বৈধ হয়েছে। অতএব, এটার ওপর ভিত্তি করে অন্য কোনো মাসআলাকে বৈধ-অবৈধ নির্ণয় করার অবকাশ নেই। তৃতীয়ত, এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফল পরিপক্ষ হওয়ার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, পরিপক্ষ হওয়ার আগে বিক্রি করে টাকা নেওয়ার পর যদি দুর্ঘটনের কারণে ফল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পণ্য ছাড়া তার মূল্য খাওয়া আবশ্যিক হচ্ছে, যা অযৌক্তিক ব্যাপার। এজন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে ইজারার ক্ষেত্রে ইজারার জিনিস ঠিক থাকলে সেক্ষেত্রে সেটাৰ ভাড়া নেওয়াটা কোনোভাবেই অন্যায্য বা অযৌক্তিক নয়। ইজারাগ্রহীতা ব্যক্তিগতভাবে লসের শিকার হয়েছে, সেটা ভিন্ন বিষয়, কিন্তু এটার কারণে তো ইজারাচুক্তিতে কোনো প্রভাব পড়বে না।

শাহখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ যদিও অর্থের বিনিময়ে ভূমি ইজারার প্রবন্ধা, কিন্তু তার মতেও বর্গাচাষই হলো শরিয়া ও তার মূলনীতির সঙ্গে অধিক সংগত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেন, ‘অর্থের বিনিময়ে চাষাবাদের তুলনায় বর্গাচাষই অধিক হালাল এবং ন্যায্যতা ও শারয়ি মূলনীতির অধিকতর নিকটবর্তী। কেননা, একেত্রে কৃষক-মালিক উভয়েই লাভ-ক্ষতির দায়ভার বহন করে। বিপরীতে অর্থের বিনিময়ে ভূমি ইজারার মধ্যে মালিকের পারিশ্রমিক নিশ্চিত, কিন্তু ইজারাগ্রহীতার ফসল অনিশ্চিত; তা উৎপন্ন হতেও পারে, আবার না; ও হতে পারে। আলিমগণ অর্থের বিনিময়ে ভূমি ইজারা ও উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে বর্গাচাষ উভয়টির বৈধতা নিয়ে মতভেদ করেছেন। এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হলো, উভয়টিই ‘বৈধ।’<sup>[১]</sup>

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ তার যুগের কৃষকদের প্রতি শাসক ও সেনাবাহিনীর নিপীড়ন নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, ‘হাদিসে বর্ণিত ও খলিফাগণের অনুসৃত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথ্য যদি সেনাবাহিনী ও শাসকগণ মেনে চলত, তাহলে তাদের প্রতি চতুর্দিক থেকে রিযিকের বর্ষণ নেমে আসত। আসমান-যমিন থেকে আল্লাহ তাদের জন্য বারাকাহ অবতরণ করতেন এবং জুলুম ও নিপীড়নের মাধ্যমে অর্জিত ফসল থেকে তারা আরো কয়েক গুণ ফসল পেত। কিন্তু মূর্খতা ও জুলুমের কারণে তারা কেবল নিপীড়ন ও গুনাহে লিপ্ত হয়। ফলে তারা বারাকাহ ও রিযিকের প্রশস্ততা থেকে বণ্ণিত হয়। তাদের জন্য কেন্দ্রীভূত হচ্ছে আখিরাতের শাস্তি আর দুনিয়ার বারাকাহ থেকে বণ্ণনা।

প্রশ্ন আসতে পারে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দেশিত, সাহাবিগণ ও আল্লাহর আনুকূল্যপ্রাপ্ত লোকজনের অনুসৃত বিষয়টি কী? তাহলে আমরা বলব, ভারসাম্যপূর্ণ বর্গাচাষ, যেখানে ভূমি মালিক ও কৃষকের মধ্যে সমতা থাকে; কারো জন্য বিশেষ কিছু নির্ধারিত থাকে না। কারো জন্য বিশেষভাবে কিছু নির্ধারিত রাখার প্রচলনই শেষ করে দিয়েছে শহর, নষ্ট করেছে মানুষ, বন্ধ করেছে বৃক্ষ এবং দূর করেছে বারাকাহ। সেনাবাহিনী ও অধিকাংশ শাসকগণ এভাবেই হারাম গ্রহণ করে। জানা কথা যে, হারাম খাদ্যে গঠিত শরীরের জন্য জাহানামই অধিক উপযুক্ত।

মুসলিমগণ নবিযুগে ও খলিফাদের সময়ে কেবল ভারসাম্য ও ন্যায্যতাপূর্ণ এই বর্গাচাষিতে লিপ্ত হতেন। আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আনহু, উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু

[১] আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম, ইবনু তাইমিয়া, পৃষ্ঠা : ২৮

উসমান রায়িয়াল্লাহু আনহু, আলি রায়িয়াল্লাহু আনহু-সহ অন্যান্য মুহাজির পরিবারে এই রেওয়াজ চালু ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহু, উবাই ইবনু কাব রায়িয়াল্লাহু আনহু, যাইদ ইবনু সাবিত রায়িয়াল্লাহু আনহু-সহ বড় বড় সাহাবিদের বক্তব্য এর পক্ষে। আহমাদ ইবনু হাস্বল রাহিমাহুল্লাহ, ইসহাক ইবনু রাহুয়াহ রাহিমাহুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল বুখারি রাহিমাহুল্লাহ, দাউদ ইবনু আলি রাহিমাহুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনি খুযাইমা রাহিমাহুল্লাহ, আবু বকর ইবনুল মুনফির রাহিমাহুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবনু নসর আল-মারওয়ায়ি রাহিমাহুল্লাহ-সহ বহু ফকিহ ও মুহাদিসদের মতামত এমনই। তাছাড়া প্রসিদ্ধ ইমামগণ, যেমন : লাইস ইবনু সাদ রাহিমাহুল্লাহ, ইবনু আবি লাইলা রাহিমাহুল্লাহ, আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ ও মুহাম্মাদ ইবনু হাসান রাহিমাহুল্লাহ-সহ অনেকের মাযহাবগত অবস্থানও এর পক্ষে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমত্য খাইবারের ইহুদিদের সঙ্গে অর্ধেক উৎপন্ন শস্যের বিনিময়ে বর্গাচাবের চুক্তি করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক খাইবার থেকে তাদেরকে উচ্চেদের আগ পর্যন্ত এই চুক্তি চলমান ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের শর্ত দিয়েছিলেন— চাষাবাদের কাজ তারা করবে, বীজও তারা দেবে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু করবেন না। এজন্য বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো, বীজ শ্রমিক একাও দিতে পারে; যেমনটা হাদিসে এসেছে, আবার শ্রমিক-মালিক উভয়েও দিতে পারে। সহিল বুখারিতে এসেছে, উমার ইবনুল খাত্বাব রায়িয়াল্লাহু আনহু মানুষের সঙ্গে বর্গাচুক্তি করতেন এই শর্তে যে, উমার যদি নিজের পক্ষ থেকে বীজ দেয়, তাহলে তার জন্য অর্ধেক, আর যদি তারা (কৃষকগণ) বীজ নিয়ে আসে তাহলে তাদের জন্য এত এত অংশ (অর্থাৎ অর্ধেক থেকেও বেশি)।<sup>[১]</sup>

বর্গাচাষ-সংশ্লিষ্ট কোনো বর্ণনায় কৃষকের অংশ অর্ধাংশের কম থাকার কথা আসেনি; বরং কিছু কিছু বর্ণনায় কৃষককে অর্ধেকের চেয়ে বেশি দেওয়ার কথা পাওয়া যায়। এজন্য আমার কাছে অধিক মনঃপূত মতামত হলো, কৃষকের অংশ অর্ধাংশ থেকে কম না হওয়া, যেমনটা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার খলিফাগণ খাইবারের ইহুদিদের সঙ্গে করেছেন। এটা সমীচীন নয় যে, জড়বস্তু তথা জমির ভাগ মানুষের ভাগের চেয়ে বেশি হবে।

[১] আত-তুবুক হুকমিয়াহ, ইবনুল কাইয়িম, পৃষ্ঠা : ২০৯-২১০

## পশুপালনে শরিকানা বৈধ কি?

আমাদের দেশে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যৌথভাবে পশুপালনের লেনদেন প্রচলিত আছে। লেনদেনের চিহ্নটা হলো এমন—একজন পশুর মূল্য দেয়, পুরোটা বা আংশিক, অন্যজন পশু লালনপালন করে থাকে; অতঃপর বাচ্চা ও লভ্যাংশ তাদের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বণ্টিত হয়।

চুক্তিভিত্তিক এ ধরনের যৌথ উদ্যোগে পশু পালনের বৈধতা-অবৈধতার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রকাশের আগে এই চুক্তির প্রচলিত চিত্রগুলো সামনে আসা দরকার। আমরা এখানে এমন লেনদেনের দুটি পদ্ধতি উল্লেখ করছি।

[প্রথম পদ্ধতি] বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে দুই পক্ষের পশুপালনে যৌথভাবে উদ্যোগ নেওয়া। যেমন : মোটাতাজা করে বিক্রির জন্য বাছুর কিংবা দুধ বিক্রয়ের জন্য গাড়ী ও মহিষ পালন।

এখানে চুক্তির পদ্ধতিটি হলো, প্রথম পক্ষ সম্পদ খরচ করবে, আর দ্বিতীয় পক্ষ শ্রম দেবে। পশুর খাদ্য ও বাসস্থানের খরচ দুজনের পকেট থেকেই যাবে। বিক্রয়ের পর পশু ক্রয়ের টাকা প্রথম পক্ষ ফেরত পাবে, আর অবশিষ্ট লভ্যাংশ চুক্তি অনুসারে তাদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে।

খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যয় কোনো একপক্ষের কাঁধে চাপানো সাম্য ও ন্যায্যতার পরিচায়ক হবে না। যেহেতু ব্যয় করার দ্বারা সে কোনো অতিরিক্ত লাভ পাচ্ছে না, আর এদিকে লভ্যাংশ সমানভাবে বণ্টিত হবে, তাই খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যয় উভয়ে সমভাবেই বহন করবে [১]

[১] হানাফি মাযহাব মতে, পশু প্রতিপালনের বিনিয়য় হিসেবে পশুর কোনো বাচ্চা বা তা বিক্রির লভ্যাংশে শরিক করা বৈধ নয়। এটা অগ্রহণযোগ্য ইজারাচুক্তি। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে একটি গরু কিনে দেয় এ শর্তে যে, সে গরুটি প্রতিপালন করবে এবং গরু থেকে যা লাভ আসবে তা তাদের দুজনের মাঝে সমানভাবে বণ্টিত হবে তাহলে এটা ফাসিদ বা অকেজে ইজারাচুক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে গরুর মালিক গরু থেকে প্রাপ্ত বাচ্চা, দুধ ও পুরো লভ্যাংশ একাই পাবে, আর গরু প্রতিপালনকারী তার ব্যবহৃত খরচ ও শর্মের ন্যায্য পারিশৰ্মিক পাবে। অবশ্য এক্ষেত্রে টাকা না দেওয়া সত্ত্বেও অন্যজনকে পশুর লভ্যাংশে শরিক করার একটা বিকল্প উপায় আছে। সেটা হলো, সে প্রথমে একটি গরু নিজের অর্থে ক্রয় করবে। অতঃপর অন্যজনের কাছে তার অর্ধেকাংশ বিক্রি করে দেবে এবং তার থেকে এটার মূল্য প্রহণ করবে কিংবা চাহিলে তা ক্ষমা করে দেবে। তাহলে এখন দুজনেই গরুতে সমান অংশীদার হয়ে গেল। এরপর সে তাকে গরুটি প্রতিপালন করার জন্য দেবে এ শর্তে যে, এখান থেকে যা লাভ আসবে, তা উভয়ের মাঝে

[দ্বিতীয় পর্যটি] একপক্ষে পশু কেনার মূল্য দেবে, আর অন্যপক্ষে পশুর খাদ্য যোগাবে এবং তার দেখাশোনা করবে। এর বিনিময়ে সে পশুর দুধ পাবে কিংবা পশু দিয়ে পানি টানার কাজ, চাষবাস ইত্যাদি করবে।

সমাজের কল্যাণের দিকে চেয়ে এই পদ্ধতি শরিয়ায় অনুমোদিত ও বৈধ [১] শর্ত হলো, প্রাণীটি ব্যবহার উপযোগী হতে হবে। সঙ্গবনা আছে, দ্বিতীয় পক্ষের খরচ ও উৎপাদিত দুধ বা কাজের পরিমাণে কমবেশি থাকতে পারে। এটা যদিও এক ধরনের অস্পষ্টতা, কিন্তু সমাজে যেহেতু এ নিয়ে তেমন কোনো ঝগড়া-বিবাদ হয় না, তাই এতটুকু ছাড় দেওয়া হয়েছে। শরিয়ায় এ ধরনের সামান্য ছাড়ের নজির আরো অনেক আছে। যেমন : বিশুদ্ধ একটি হাদিসে বন্ধক-সংশ্লিষ্ট মাসআলায় এসেছে, বহনযোগ্য বা দোহনযোগ্য প্রাণী বন্ধক হিসেবে থাকলে তার ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الظَّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفْقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى  
الَّذِي يُرْكَبُ وَيُشْرَبُ النَّفْقَةُ

বাহনের পশু বন্ধক থাকলে তার খরচের পরিমাণ অনুসারে তাতে আরোহণ করা যাবে। তদুপ দুধেল প্রাণী বন্ধক থাকলে তার খরচের পরিমাণ অনুসারে দুধ পান করা যাবে। আরোহণকারী এবং দুধ-পানকারীকেই বন্ধকি পশুর খরচ বহন করতে হবে [২]

সমানভাবে বটিত হবে। এভাবে চুক্তি করলে সেক্ষেত্রে গ্রু-প্রতিপালনকারী একজন অংশীদার হিসেবে চুক্তি অনুসারে লভ্যাংশে শরিক হবে। [রদুল মুহতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩২৭; আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩৫; ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া, খণ্ড : ১৬, পৃষ্ঠা : ৬০১]

[১] এখানে যে দুটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে, তার কোনোটি হানাফি মাযহাব সমর্থন করে না। হানাফি মাযহাবে, পশুর ক্ষেত্রে অন্যের সাথে চুক্তি করার বৈধ পদ্ধতি দুটি। এক. নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কাউকে পশু প্রতিপালন করতে দেওয়া। এক্ষেত্রে একজন থাকে মালিক, সে একাই পশুর সব লাভ-ক্ষতির দায়ভার বহন করে এবং অন্যজন তার শ্রমিক হিসেবে কাজ করে উপযুক্ত পারিশ্রমিক গ্রহণ করে। দুই. যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে পশু প্রতিপালন করা। এক্ষেত্রে প্রত্যেকে তার মালিকানার অংশ অনুপাতে লভ্যাংশ পাবে, আর যে পশু প্রতিপালন করবে, সে অতিরিক্ত হিসেবে তার কাজের যথাযথ পারিশ্রমিক পাবে।

[২] সহিলুল বুখারি : ২৫১২; সুনানু আবি দাউদ : ৩৫২৬

এ যাদিস থেকে বাহ্যত বোঝা যায়, বন্ধকি জিনিস থেকে বন্ধকগ্রহীতা তার খরচ অনুপাতে উপকৃত হতে পারবে। অর্ধাং বন্ধকি জিনিস রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যতটুকু খরচ হবে, ততটুকু উপকার গ্রহণ করতে পারবে।

এই হাদিসে প্রাণীর খাবার-খরচ ইত্যাদিকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহনে আরোহণ এবং দুধের বিনিময় ধার্য করেছেন। সমাজে প্রচলন থাকায় এবং মানুষের পরস্পরের প্রতি আশ্চর্য থাকায় বন্ধকের ক্ষেত্রে এই ধরনের তারতম্য বৈধ। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে, আরোহণের ভাড়া বা দুধের মূল্যের তুলনায় পশুর ব্যয় কমবেশি হতেই পারে। তাই আমাদের কাঞ্চিত মাসআলায় এ ধরনের সামান্য ছাড়ে অনুমতি প্রদানে কোনো সমস্যা হবে না। কারণ, এগুলো মানুষের প্রয়োজনীয় বিষয়।

এই সিদ্ধান্তটি হাদিস থেকে উদঘাটিত আমাদের নিজস্ব মতামত। আশা রাখি— মতামতটি বিশুদ্ধই হবে।

কিন্তু পশু যদি বহন বা দোহন অনুপযোগী ছেট বাচ্চুর হয় তাহলে একজনের থেকে পশুর মূল্য এবং আরেকজন থেকে তার খরচ ও প্রতিপালন—এই শর্তে তা বৈধ হবে না। কেননা, এখানে খরচদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে; অথচ সে প্রাণী থেকে কোনো উপকারই পাচ্ছে না, অন্যপক্ষ এই বিবেচনায় অতিরিক্ত লাভবান হবে। এটা ইসলামে কাঞ্চিত ভারসাম্য ও ন্যায়তার মধ্যে পড়ে না। ব্যবহার উপযোগী হওয়ার আগ পর্যন্ত খরচাদি দুজনে ভাগাভাগি করে নিলে তখন আবার চুক্তি বৈধ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

### খেলাধুলা ও বিনোদন

ইসলাম কোনো পৌরাণিক ও কল্পলোকের ধর্ম নয়, ইসলাম একটি বাস্তব ও জীবন্ধনিষ্ঠ ধর্ম। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ কোনো ডানাওয়ালা ফেরেশতা নয়, তারা এমন মানুষ, যারা খায়-দায়, বাজারে যায়। এজন্য ইসলাম মানুষকে সদা জিকির-ফিকির করতে, কুরআন তিলাওয়াত করতে আর মসজিদে গিয়ে পড়ে

এটা ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম ইসহাক ইবনু রাহুয়াহ রাহিমাহুল্লাহ-সহ একদল ফকিরের মত। তারা বলেন, বন্ধকগ্রহীতা তার বন্ধকি পশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে পরিমাণ খরচ হয়, সে খরচ অনুপাতে পশুতে আরোহণ করতে পারবে এবং তার দুধ দোহন করে খেতে পারবে। কিন্তু অন্য হাদিসের দলিলের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ-সহ অধিকাংশ ফকিরগণ বলেন, বন্ধকি জিনিস থেকে বন্ধকগ্রহীতা কোনোভাবেই উপকৃত হতে পারবে না। বন্ধকি জিনিস রক্ষণাবেক্ষণের খরচাদি ও দায়দায়িত্ব বন্ধকদাতার, তাই তার লাভ ও উপকারিতাও বন্ধকদাতা পাবে। [ফাতহুল বারি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৪৪; আওনুল মাবুদ, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩২০]

থাকতে বলেনি। সৃষ্টিজাত চাহিদা এবং মানসিক বিষয়াদির সুইকৃতিও দিয়েছে ইসলাম। আল্লাহ তাআলাই তো তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন—তারা মুখ্য হবে, আনন্দিত হবে, হাসবে, খেলবে; ঠিক যেভাবে তারা খায়-দায়, পান করে।

### কিছু সময় দুনিয়া ও আধিরাতের চিন্তা

আত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে অনেক সাহাবি এত ওপরে চলে গিয়েছিলেন—তাদের ধারণা জন্মেছিল যে, আধিরাতের জন্য সর্বদা কঠোর প্রচেষ্টা ও আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকাটাই ইসলামের দাবি। দুনিয়ার সুদ-আল্লাদ ও সুখকর নিয়ামত থেকে দূরে থাকতে হবে। খেলাধুলা যাবে না, হাসি-তামাশা করা যাবে না, দুনিয়া থেকে বিমুখ হতে হবে এবং মনোযোগ সর্বদা আধিরাতের প্রতি নিবন্ধ থাকতে হবে।

বিখ্যাত সাহাবি হানযালা উসাইদি রায়িয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা। তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত ওহি লেখক। চলুন, ঘটনাটি আমরা তার মুখ থেকেই শুনে আসি। তিনি বলেন—

لَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: كَيْفَ أَثْنَتْ؟ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ: قُلْتُ: نَافِقَ حَنْظَلَةُ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّىٰ كَانَأْ رَأَيْ عَيْنِ، إِذَا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأُوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ، قَسِيسِنَا كَثِيرًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، فَانْتَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، حَتَّىٰ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: نَافِقَ حَنْظَلَةُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَمَا ذَلِكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ، يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّىٰ كَانَأْ رَأَيْ عَيْنِ، إِذَا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأُوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ، قَسِيسِنَا كَثِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدْعُونَ عَلَى مَا نَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْرِ، لَصَاقَ حَنْظَلُكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرْشَكُمْ وَفِي طَرِيقَكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً» ثَلَاثَ مَرَاتٍ

একবার আবু বকর সিদ্দিক রায়িয়াল্লাহু আনহু আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং আমাকে প্রশ্ন করলেন, হে হানযালা, তুমি কেমন আছ? তিনি বলেন, জবাবে আমি বললাম, হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি কী বলছ? হানযালা রায়িয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, আমরা যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাম্বাহু আলাইহি ওয়া সালামের কাছে থাকি, তখন

তিনি আমাদেরকে জাগ্রাত-জাহানামের কথা এমনভাবে স্মরণ করিয়ে দেন, যেন আমরা তা সৃচক্ষে দেখছি। অতঃপর আমরা যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে বের হয়ে স্ত্রী-পরিবার, সন্তানসন্ততি ও ধন-সম্পদের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যাই, তখন আমরা এর অনেক বিষয় ভুলে যাই। আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম! আমরাও তো একই অবস্থা দেখতে পারছি। অতঃপর আমি এবং আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রবেশ করলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ব্যাপার কী? আমি বললাম, আমরা যখন আপনার কাছে থাকি, তখন আপনি আমাদেরকে জাগ্রাত-জাহানামের কথা এমনভাবে স্মরণ করিয়ে দেন, যেন আমরা তা সৃচক্ষে দেখছি। এরপর আমরা যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে স্ত্রী-পরিবার, সন্তানসন্ততি ও ধন-সম্পদের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যাই তখন আমরা এর অনেক বিষয় ভুলে যাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে সন্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমার কাছে থাকার সময়ে ও আল্লাহর স্মরণকালে তোমাদের যে অবস্থা হয়, সে অবস্থায় যদি তোমরা সার্বক্ষণিক থাকতে, তাহলে অবশ্যই ফেরেশতাগণ তোমাদের সঙ্গে তোমাদের শয্যায় ও তোমাদের রাস্তায় মুসাফাহা করত। কিন্তু হে হানযালা, এটা সময়ে সময়ে (অর্থাৎ কিছু সময় এই অবস্থা থাকবে এবং কিছু সময় ওই অবস্থা থাকবে) —এ কথাটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার পুনরাবৃত্তি করেছেন [১]

### নবিজি একজন মানুষ

পরিপূর্ণ মানবজীবনের জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী হলো সবচেয়ে সুন্দর ও সেরা উদাহরণ। নির্জনে দীর্ঘ সময় একান্তে তিনি সালাত আদায় করতেন। আল্লাহর সামনে সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার পা ঘোবারক ফুলে যেত। সত্য প্রকাশে তিনি কাউকে ভয় পেতেন না। কিন্তু সমাজ ও মানুষের সঙ্গে থাকাকালে তিনি একজন সর্বোত্তম মানুষের মতোই চলাফেরা করতেন। তিনি উন্নত জিনিস ভালোবাসতেন, মুচকি হাসতেন। এমনকি কখনো

[১] সহিহ মুসলিম : ২৭৫০; জামিউত তিরমিয়ি : ২৫১৪

নির্মল ক্রীড়া-কোতুকও করতেন। তবে এটা করতে গিয়ে সত্য ছাড়া তার মুখ দিয়ে কখনো মিথ্যা বা অবাস্তব কোনো কথা বের হয়নি।

উৎসব ও আনন্দের মৌসুম তিনিও ভালোবাসতেন। বিপদ-যাতনা এবং এর উপসর্গসমূহ, যেমন : ঝণভার, কষ্ট-ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা-পোরেশানি ইত্যাদিকে তিনিও অপছন্দ করতেন। এগুলোর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন। তিনি অসংখ্যবার এ দুআটি করতেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمَّ وَالْحَزَنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسْلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ . وَضَلَعِ  
الدِّينِ ، وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ

আল-হুম্মা ইন্নী আ‘উয়ু বিকা মিনাল হাস্মি ওয়াল হায়ানি, ওয়াল ‘আজফি ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি ওয়াল-জুবনি ওয়া দ্বলা‘যিদ্বাইনি ওয়া গালাবাতির রিজা-ল।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঝণভার ও লোকজনের প্রাধান্য থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১]

একবারের ঘটনা, যা ইমাম তিরমিয়ি রাহিমাহুল্লাহ তার শামায়েলে তিরমিয়িতে বর্ণনা করেছেন। হাসান বাসরি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَئْتَ عَجُوزً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ  
يُذْخِلَنِي الْجَنَّةَ ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ قَلَّابٍ ، إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ» قَالَ: فَوَلَّتْ تَبَكِي  
فَقَالَ: «أَخِرُّوهَا أَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ» إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {إِنَّا أَنْشَأْنَا هُنَّ إِنْ شَاءَ  
فَجَعَلْنَا هُنَّ أَبْكَارًا غُرْبًا أَثْرَابًا}

একবার এক বৃন্দা মহিলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন তিনি আমাকে আন্নাতে প্রবেশ করান। তখন তিনি বললেন, ওহে অমুকের মা, নিশ্চয় আন্নাতে কোনো বৃন্দা মহিলা প্রবেশ করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, এটা শুনে সে বৃন্দা

[১] সহিল বুখারি : ২৮৯৩; জামিউত তিরমিয়ি : ৩৪৮৪

মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। অতঃপর নবিজি সাল্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তাকে জানিয়ে দাও যে, সে বৃদ্ধাবস্থায় জানাতে প্রবেশ করবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে (অর্থাৎ জানাতি হুর ও রমনীদেরকে) সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে। অতঃপর তাদেরকে করেছি কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্ক।<sup>[১][২]</sup>

### অন্তরও ক্লান্ত হয়

সাহাবিরাও হাসতেন, নির্মল কুড়া-কৌতুক করতেন এবং বৈধ খেলাধুলা ও হালকা বিনোদনেও অংশ নিতেন। মনের খোরাক, মানসিক স্থিরতার জন্য তারা নির্দোষ আনন্দ লাভের চেষ্টা করতেন। জীবন, সে তো এক দীর্ঘ ক্লান্তিকর জার্নি, তাই এসব নির্দোষ বিনোদন জীবনের কষ্ট কিছুটা লাঘব করে।

আলি ইবনু আবি তালিব রায়িয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘শরীরের মতো অন্তরও ক্লান্ত

[১] সুরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৩৫-৩৭

[২] আশ-শামায়িলুল মুহাম্মাদিয়া, তিরমিয়ি : ২৪১; তাফসিলুল বাগাবি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৯-১০, হাদিস : ২১০৫; হাদিসটির সনদ যইফ এবং এটা মুরসাল হাদিস। অবশ্য এসংক্রান্ত অন্যান্য প্রমাণযোগ্য হাদিসসমূহের সমর্থন থাকায় সামগ্রিকভাবে এ হাদিসটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করা যায়। সমর্থক হাদিসগুলোর একটি হলো, ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ নিজ সনদে আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন—‘একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহার নিকট প্রবেশ করলেন। তখন সেখানে একজন বৃদ্ধ বসে ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজেস করলেন, এ বৃদ্ধা মহিলাটি কে? আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমার একজন খালা। রাসুলুল্লাহ সাল্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সাবধান! বৃদ্ধা নারীরা কিন্তু জানাতে প্রবেশ করবে না। এটা শুনে বৃদ্ধা মহিলার মনে অনেক দুশ্চিন্তা এসে ভর করল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন (জানাতি) নারীদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করবেন, তাদেরকে অন্য সৃষ্টিতে বৃপ্তান্তরিত করে দেবেন। (অর্থাৎ জানাতে গেলে বৃদ্ধারা সবাই যুবতী হয়ে যাবে, কেউ বৃদ্ধা অবস্থায় জানাতে প্রবেশ করবে না।)’ [আল-বা’সু ওয়াল-নুশুর, বাইহাকি : ৩৪৩; এ হাদিসটি হাসান ও প্রমাণযোগ্য।] আরেকটি হাদিস হলো, ইমাম তিরমিয়ি রাহিমাহুল্লাহ নিজ সনদে মুআয় ইবনু জাবাল রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—‘জানাতিরা জানাতে প্রবেশের সময় তাদের শরীরে লোম থাকবে না, দাঁড়ি-গোফও থাকবে না এবং চোখে সুরমা লাগানো থাকবে। তারা হবে ৩০ অথবা ৩৩ বছরের যুবক।’ [জামিউত তিরমিয়ি : ২৫৪৫; এ হাদিসটি হাসান; বরং সামগ্রিকভাবে বলা যায়, এটা সহিহ লি-গাইরিহি।] এসব হাদিস থেকে বোঝা যায়, জানাতিরা জানাতে সবাই যুবক-যুবতী হয়ে প্রবেশ করবে, সেখানে কোনো বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থাকবে না। এ দুটি সমর্থক হাদিসের ভিত্তিতে শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ শামায়িলে তিরমিয়ির হাদিসটিকে হাসান বলে সাব্যস্ত করেছেন। [সিলসিলাতু আহাদিসিস সহিহা, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১২২১-১২২৪, হাদিস : ২৯৮৭]

হয়। অতএব তোমরা (অন্তরের খোরাক হিসেবে) মজাদার জ্ঞানগর্ত কথা তালাশ করো।’<sup>[১]</sup>

তিনি আরো বলেন, ‘তোমরা তোমাদের মননকে কিছু সময় বিশ্রাম দিয়ো। কেননা অন্তরের ওপর (অতিরিক্ত) চাপ দেওয়া হলে তা অন্ধ হয়ে যায়।’<sup>[২]</sup>

আবুদ-দারদা রায়িয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমি (শরিয়ত-অনুমোদিত নির্মল) ক্রীড়া-বিনোদনের মাধ্যমে আমার অন্তরকে প্রশান্তি দিই। হকের ওপর অবিচল থাকতে এটা আমার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করো।’<sup>[৩]</sup>

মানসিক বোঝা হালকা করার জন্য পরিমিত হাসি-তামাশা, আশপাশের মানুষ ও নিজের আনন্দের জন্য নির্দোষ কৌতুক চর্চায় কোনো সমস্যা নেই। অবশ্য একে অভ্যাস বানানো যাবে না। যেমন : উঠতে বসতে ঠাট্টা-মশকারায় লেগে যাওয়া, স্থানকাল-পাত্র ভুলে হাসি-তামাশায় লিপ্ত হওয়া। এভাবে সর্বদা এতে মজে থাকা ঠিক নয়। এজন্য আরবিতে একটি প্রবচন আছে—‘বস্ত্রে একটু কৌতুক ও রম্য-রস মেশাতে পারো, তবে তার পরিমাণ যেন হয় খাবারে লবণ দেওয়ার মতো পরিমিত মাত্রায়।’<sup>[৪]</sup>

তাই হাসি-ঠাট্টার সময় খেয়াল রাখার বিষয় হলো, ঠাট্টাছলে কোনো মুসলিমের যেন সম্মান ও মর্যাদার হানি না ঘটে। আল্লাহ তাত্ত্বালা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ...  
◎

হে ঈমানদারগণ, (তোমাদের) একদল যেন অপরদলকে উপহাস না করে।  
হতে পারে, তারা (অর্থাৎ উপহাসের পাত্র লোকেরা) উপহাসকারীদের  
চেয়ে উত্তম।<sup>[৫]</sup>

[১] আদাবুল মুজালাসা, ইবনু আবিল বার, পৃষ্ঠা : ১০৭, আদব : ২৪১

[২] ইহইয়াউ উলুমিদিন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩০

[৩] ইহইয়াউ উলুমিদিন, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৭৪

[৪] নিহায়াতুল আরা'ব ফি ফুলুনিল আদব, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৭১

[৫] সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১১

অনুরূপভাবে সতর্ক থাকতে হবে, মানুষ যেন হাসাতে গিয়ে আবার মিথ্যার আশ্রয় না নেয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন—

وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ ، وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ

| ধৰ্মস ওই ব্যক্তির জন্য, যে লোকদেরকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে! তার জন্য ধৰ্মস, তার জন্য ধৰ্মস![১]

### হালাল খেলাধুলা

আনন্দ-বিনোদন ও মানসিক প্রসম্ভৱার জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা ও ক্রীড়া-কৌতুকের বৈধতা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন। একই সময় এই খেলাধুলাগুলো সাহাবিদের মানসিক শক্তি জোগাত এবং ইবাদত ও অন্যান্য কর্তব্য পালনে তাদেরকে আরো উদ্যমী করে তুলত। পাশাপাশি তাদের জিহাদের প্রস্তুতি ও শারীরিক কসরতের ক্ষেত্রেও এসব ক্রীড়া-বিনোদনের অবদান অপরিসীম। হালাল খেলাধুলার কয়েকটি হলো—

### দৌড় প্রতিযোগিতা

সাহাবিগণ প্রায় সময় দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ কাজের স্বীকৃতি দিয়েছেন। একাধিক সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সালামা ইবনু আকওয়া রায়িয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ক্ষীপ্র গতির দৌড়বিদ।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে মনস্তুষ্টি ও আনন্দের জন্য তার স্ত্রী আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلِيِّ ،  
فَلَمَّا حَمَلْتُ الْلَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقْنِي قَالَ: هَذِهِ بِتْلَكَ السَّبَقَةِ

| তিনি এক সফরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় নামলে আমার দৌড়ে তার আগে

[১] সুনান আবি দাউদ : ৪৯৯০; মুসনাদু আহমাদ : ২০০৫৫; হাদিসটি হসান।

চলে গেলাম। অতঃপর আমি যখন একটু মোটাসোটা হয়ে গেলাম তখন তার সাথে আবারও দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম। এবার তিনি আমার ওপর অগ্রগামী হলেন। তখন তিনি বললেন, এ বিজয় সেই বিজয়ের বদলা।[১]

## কুস্তি লড়াই

আব্দুল্লাহ ইবনু হারিস রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন—

صَارَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا رَكَانَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ شَدِيدًا، قَالَ: شَاءَ اللَّهُ صَرَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو رَكَانَةَ: عَاوِدْنِي، فَصَارَعَهُ، قَصَرَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا، قَالَ: عَاوِدْنِي فِي أُخْرَى، فَعَاوَدَهُ، قَصَرَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيْضًا، قَالَ أَبُو رَكَانَةَ: هَذَا أَقْوَلُ لِأَهْلِي: شَاءَ اللَّهُ أَكَلَهَا الْذِئْبُ، وَشَاءَ تَكْسَرَتْ، فَهَذَا أَقْوَلُ لِلَّهَ الْمُلِيقِ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كُنَّا لِنَجْمَعَ عَلَيْكَ أَنْ نَصْرَعَكَ وَنَفْرَمَكَ حُذْعَنَكَ

‘নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহিলিয়াতের যুগে আবু রুকানার সাথে কুস্তি প্রতিযোগিতা করেছিলেন। সে ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী এক কুস্তিগীর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ছাগলের পরিবর্তে ছাগল (অর্থাৎ জিতলে ছাগল পাবে, আর হারলে ছাগল দিতে হবে)। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুস্তিতে তাকে ধরাশায়ী করলেন। তখন আবু রুকানা বলল, আমার সাথে আবার কুস্তিতে লড়ো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে

[১] মুনাফু আবি দাউদ : ২৫৭৮; সহিল ইবনি হিবান : ৪৬৯১; হাদিসটি সহিহ।

মুসলাদু আহমাদের বর্ণনায় ঘটনাটির বিবরণ বিস্তারিতভাবে এসেছে। আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে এক সফরে বের হলাম। সেসময় আমি (হালকা গড়নের) বালিকা ছিলাম, তখনে সুস্থামদেহের অধিকারী হইনি এবং মোটাসোটাও হইনি। তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা সামনে এগিয়ে যাও। তারা এগিয়ে গেলে তিনি আমাকে বললেন, এসো, তোমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করি। অতঃপর আমি তার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমে তার ওপর বিজয়ী হলাম। তিনি আমাকে কিছু বললেন না, চূপ করে থাকলেন। অতঃপর আমি যখন সুস্থামদেহের অধিকারী হলাম, একটু মোটাসোটা হয়ে গেলাম এবং পূর্বের সে ঘটনাও ভুলে গেলাম তখন আমি অন্য আরেকটি সফরে তার সঙ্গে বের হলাম। তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা সামনে এগিয়ে যাও। তারা এগিয়ে গেলে তিনি আমাকে বললেন, এসো, তোমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করি। অতঃপর আমি তার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় নামলে এবার তিনি আমার ওপর বিজয়ী হলেন। তখন তিনি হাসতে লাগলেন এবং বললেন, এটা আগেরবারের বদলা।’ [মুসলাদু আহমাদ : ২৬২৭৭]

কুস্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুনরায় তাকে ধরাশায়ী করলেন। তখন আবু রুকানা বলল, আমার সাথে আবারও কুস্তিতে লড়ো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও কুস্তি প্রতিযোগিতায় লড়ে তাকে ভূপাতিত করলেন। তখন আবু রুকানা বলল, আমার পরিবারকে গিয়ে আমি বলব, একটি ছাগল নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে, একটি দলছুট হয়ে হারিয়ে গিয়েছে, কিন্তু তৃতীয়টার বেলায় কী বলব? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে প্রতিযোগীতায় হারিয়েও দিব, আবার তোমার থেকে জরিমানাও নেবো, সেটা হতে দেবো না। তুমি তোমার ছাগল নিয়ে যাও।’<sup>[১]</sup>

এই হাদিসগুলোর ওপর ভিত্তি করে ফকিরগণ বলেন, দৌড় প্রতিযোগিতা বৈধ, হোক সেটা পরম্পরে পুরুষদের মাঝে অথবা পুরুষ ও তার মাহরাম নারীদের মাঝে বা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে। এসব হাদিসের ভিত্তিতে তারা এটাও বলেছেন যে, দৌড় প্রতিযোগিতা ও কুস্তি প্রতিযোগিতা কখনো সম্মান, মর্যাদা ও জ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু নয়। অনুরূপভাবে এটা অধিক বয়সের সাথেও অসংগতিপূর্ণ নয়। কারণ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করার সময় তার বয়স পঞ্চাশের অধিক ছিল।

### তিরন্দাজি

বৈধ খেলাধুলার মধ্যে আরেকটি হলো তিরন্দাজি। সাহাবিগণ বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে তিরন্দাজিতে লিপ্ত হওয়া দেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে বলতেন, তোমরা তির নিক্ষেপ করো, আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি।’<sup>[২]</sup>

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিরন্দাজিকে শুধু একটি শখ বা খেলা হিসেবেই দেখেননি; বরং এটাকে শক্তি অর্জনের একটি উপায় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি

[১] মুসামাফু আব্দির রাজ্জাক : ২০৯০৯; হাদিসটির সনদ মুরসাল। হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ সনদে ইয়ামিদ ইবনু আবি যিয়াদ আছে, সে দুর্বল বর্ণনাকারী। আর এখানে বর্ণনায় ‘আবু রুকানা’ এসেছে, কিন্তু এটা ভুল। সঠিক নাম হবে ‘রুকানা’। [আত-তালাখিসুল হাবির, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৯৮, হাদিস : ২০২৪] তবে শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন। [গায়াতুল মারাম, পৃষ্ঠা : ২১৬, হাদিস : ৩৭৮]

[২] সহিল বুখারি : ২৮৯৯; সহিল ইবনি হিবান : ৪৬৯৩

কৌশল বলে গণ্য করেছেন, যার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ...  
⑥

আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করো।<sup>[১]</sup>

কুরআনে উল্লেখিত এই শক্তির ব্যাখ্যায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ

জেনে রাখো, নিশ্চয়ই শক্তি হচ্ছে তির নিক্ষেপ করা। জেনে রাখো, নিশ্চয়ই শক্তি হচ্ছে তির নিক্ষেপ করা; জেনে রাখো, নিশ্চয়ই শক্তি হচ্ছে তির নিক্ষেপ করা।<sup>[২]</sup>

সাদ ইবনু আবি ওয়াকাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَعِبِّكُمْ

তোমরা তিরন্দাজিকে (ভালোভাবে) আঁকড়ে ধরো। কেননা, এটা তোমাদের ক্রীড়াগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।<sup>[৩]</sup>

এ জন্য আরবের অনেক লোক জীবিত প্রাণীকে বেঁধে রেখে তাকে টার্গেট বানিয়ে তিরন্দাজির অনুশীলন করত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে প্রাণী দিয়ে তিরন্দাজির অনুশীলন করতে নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার একদল লোককে এমন করতে দেখে বললেন—

[১] সূরা আনফাল, আয়াত : ৬০

[২] সহিহ মুসলিম : ১৯১৭; সুনানু আবি দাউদ : ২৫১৪

[৩] আল-মুজ্জামুল আওসাত, তাবারানি : ২০৪৯; মুসনাদুল বায়য়ার : ১১৪৬; হাদিসটি হাসান।

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ، شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ عَرَضًا

| নবিজি সেই ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো প্রাণীকে লক্ষ্যবস্তু বানায়। [১]

অভিশাপ দেওয়ার কারণ হলো, এতে অথবা একটি প্রাণ বিনষ্ট হয় এবং যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে মারা যায়। তাছাড়াও এতে অপচয় তো আছেই। বস্তুত কোনো জীবিত প্রাণী কখনো মানুষের খেলার পাত্র হতে পারে না।

ইবনু আবুস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

| রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চতুর্ক্ষণ জন্মে লড়াই লাগাতে নিষেধ করেছেন। [২]

আরব ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলন ছিল—তারা দুটি দুশ্মা বা ঘাড় এনে তাদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিত। এই প্রাণীগুলো মারা যাওয়া কিংবা মৃতপ্রায় হওয়ার আগ পর্যন্ত লড়তে থাকত, আর চারপাশে দাঁড়িয়ে লোকজন উৎসাহ দিতো এবং আনন্দ প্রকাশ করত।

আলিমগণ বলেন, লড়াইটা প্রাণীদের জন্য কষ্টকর ও ক্লান্তিজনক এবং এখানে স্বেচ্ছ বিনোদন ছাড়া অন্য কোনো উপকারণ নেই, তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলো করতে নিষেধ করেছেন।

### বর্ণা নিষ্কেপণ

তিরন্দাজির মতো আরেকটি বৈধ খেলা হলো বর্ণা নিষ্কেপ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাবশার লোকদেরকে মসজিদে নববিতে বর্ণার খেলার অনুমতি দিয়েছিলেন। শুধু এতটুকুই নয়; বরং তিনি আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহাকে

[১] সহিল বুখারি : ৫৫১৫; সহিহ মুসলিম : ১৯৫৮

[২] সুনান আবি দাউদ : ২৫৬২; জামিউত তিরমিয়ি : ১৭০৮; হাদিসটির সনদ সামান্য দুর্বল।

সেই খেলা দেখার সুযোগও করে দিয়েছিলেন। আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ، يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرْقِ وَالْجِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلَتِ النِّيَّةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِمَّا قَالَ: تَشْهِينَ تَنْظُرِيْنَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِيْيَ غَلَى خَدِيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: دُونَكُمْ يَا بَنِي أَزْفَدَةَ

আর ঈদের দিন (হাবশার অধিবাসী) নিশ্চেরা বর্ষা ও ঢাল দিয়ে (মসজিদে নববির আঙিনায়) খেলা করত। আমি নিজে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আবেদন করেছিলাম অথবা তিনি নিজেই বলেছিলেন, তুমি কি (তাদের খেলা) দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আমাকে তার পেছনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন যে, আমার গাল তার গালের সাথে লেগে ছিল। তিনি তাদের বলছিলেন, হে আরফিদার বংশধরগণ, তোমরা খেলা চালিয়ে যাও [১]

‘বনু আরফিদা’ বা আরফিদার বংশধরগণ হলো হাবশার নিশ্চেদের উপনাম, যে নামে আববের লোকেরা তাদের সন্ধোধন করত।

আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

يَئِنَّا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النِّيَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِرَابِهِمْ، دَخَلَ عُمُرُ فَاهْوَى إِلَى الْحَصَى فَحَصَبَهُمْ بِهَا، قَالَ: دَغْهُمْ يَا عُمَرْ

একবার একদল হাবশি লোক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বর্ষা দিয়ে খেলা করছিলেন। এমন সময় উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু সেখানে এলেন এবং হাতে কাঁকর তুলে নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উমার, তাদেরকে (বর্ষা দিয়ে খেলাধুলার জন্য) ছেড়ে দাও [২]

খুব সম্ভবত গন্তীর সুভাবের অধিকারী হওয়ার কারণে উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুর কাছে এই খেলাধুলা ভালো লাগেনি। এজন্য তিনি তাদেরকে খেলায় বাধা দিতে

[১] সহিল বুখারি : ৯৫০; সহিহ মুসলিম : ৮৯২

[২] সহিল বুখারি : ২৯০১; সহিহ মুসলিম : ৮৯৩

চাইলেন। কিন্তু (এটা বৈধ বিনোদনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বাধা দিতে বারণ করে দিলেন।

মসজিদে এ ধরনের খেলাধুলার অনুমোদন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিপুল উদারতার বহিঃপ্রকাশ। তিনি এটার অনুমতি এজন্যই দিয়েছিলেন, যেন মসজিদে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ধরনের কাজেরই সমন্বয় ঘটে। মসজিদ যেন মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ের আলোচনার কেন্দ্র হয়, তেমনিভাবে তাদের ক্রীড়া-বিনোদনও যেন মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। তাছাড়া বর্ষা নিক্ষেপের খেলাটা তো কোনো নিষ্ক ক্রীড়া নয়; বরং এটি একই সঙ্গে ক্রীড়া, ব্যায়াম ও অনুশীলন।

মুহাম্মাব রাহিমাহুল্লাহ এই হাদিসের ভিত্তিতে বলেন, ‘মসজিদ বানানো হয়েছে মুসলিমদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য। তাই যে কাজ ইসলাম ও মুসলিমদের উপকারে আসে, তা মসজিদে সম্পাদন করা বৈধ। বর্ষা দ্বারা খেলা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য অনুশীলনের অন্তর্ভুক্ত। এটা শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হওয়া এবং যুদ্ধের সক্ষমতা অর্জনের একটি মাধ্যম। সুতরাং এ ধরনের খেলা মসজিদে ও অন্য যেকোনো স্থানে বৈধ।’[১]

বর্তমান সময়ের মুসলিমগণ এখান থেকে শিক্ষা নিতে পারে। আমাদের মসজিদগুলো তো নির্জীব ও নিষ্প্রাণ পড়ে আছে। এতে এখন না কোনো শক্তির চর্চা-অনুশীলন করা হয়, আর না তাতে কোনো রুহের খোরাক নিয়ে আলোচনা করা হয়। বর্তমানে আমাদের বেশিরভাগ মসজিদগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে অলস ও কর্মহীনদের আশ্রয়স্থল হিসেবে।

পাশাপাশি এই হাদিসটি স্তীদের সঙ্গে স্বামীদের আচরণবিধি ও তাদের বিনোদন-বিষয়ক একটি নববি নির্দেশনা। নারীরা পর্দা রক্ষা করে এ ধরনের বৈধ খেলাধুলা ও নির্দোষ বিনোদন দেখতে পারে। আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

رَأَيْتُ الَّتِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَرِنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْجَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي  
الْمَسْجِدِ، حَتَّىْ أَكُونَ أَنَا الَّتِيْ أَسْأَمُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيقَةِ السِّينِ، الْحَرِيصَةِ  
عَلَى الْلَّهِ

[১] শারহু সহিহিল বুখারি, ইবনু বাত্তাল, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ১০৪

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি আমাকে তার চাদর দ্বারা ঢেকে দিচ্ছেন, যখন আমি হাবশি (কৃষ্ণজগ) যুবকদের দেখছিলাম, যারা মসজিদের আঙ্গনায় (তির-বর্ষা ইত্যাদি দিয়ে) খেলা করছিল। (খেলা দেখতে দেখতে) একপর্যায়ে আমি নিজেই বিত্তন্ত হয়ে পড়লাম। তাহলে তোমরা খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী অঞ্জবয়সি বালিকার ধৈর্যের মাত্রা পরিমাপ করে দেখো (নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতটা ধৈর্যশীল আর স্ত্রীর বিনোদনের ব্যাপারে যত্নশীল ছিলেন)![১]

আরেক হাদিসে আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبُنَّ مَعِي ،  
فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ ، فَيُسْتَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبُنَّ مَعِي

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে থাকাকালীন আমি পুতুল[২]  
নিয়ে খেলা করতাম। আমার কিছু বান্ধবী ছিল, তারাও আমার সাথে খেলা করত।

[১] সহিল বুখারি : ৫২৩৬; সহিল মুসলিম : ৮৯২

[২] ত্রিমাত্রিক প্রতিকৃতি হারাম হওয়া নিয়ে কারো কোনো মতানৈক্য নেই। চার মাযহাবের সকল আলিমের নিকটেই ত্রিমাত্রিক বা দেহবিশিষ্ট প্রতিকৃতি হারাম। তবে বাচ্চাদের খেলনার জন্য যেসব পুতুল ও বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতি বানানো হয় তা জায়িয় আছে কি না, সে ব্যাপারে আলিমদের মাঝে মতভেদ আছে। এ ব্যাপারে মালিকি, শাফিয়ি ও হাস্বলি মাযহাবের মত হলো, বাচ্চাদের জন্য বানানো পুতুল ও বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতি বানানো, ক্রয়-বিক্রয় করা ও ব্যবহার করা সবই জায়িয়। তবে হাস্বলি মাযহাবে এটা জায়িয় হওয়ার জন্য শর্ত হলো, সেটার মাথা থাকতে পারবে না কিংবা এমন অঙ্গবিহীন হতে হবে, যে অঙ্গ ছাড়া কোনো প্রাণী সাধারণত বাঁচতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য আলিমগণ এমন কোনো শর্ত আরোপ করেননি। [আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ১১২]

এর বিপরীতে ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম ইবনুল বাত্তাল রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম দাউদি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম হালিমি রাহিমাহুল্লাহ-সহ অন্যান্য মাযহাবের বেশ কিছু আলিম প্রাণীজাতীয় পুতুল ইত্যাদিকে নাজায়িয় বলেছেন এবং পুতুল জায়িয় হওয়ার হাদিসকে মানসুখ (বহিত) বলে অভিহিত করেছেন। [ফাতহুল বারি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৫২৭]

আর হানাফি মাযহাবের ফকিহগণের মত হলো, প্রাণীর ত্রিমাত্রিক বা দেহবিশিষ্ট সকল প্রতিকৃতিই হারাম। তাদের নিকট প্রাণীর কোনো ধরনের ছবি-প্রতিকৃতিই জায়িয় নয়; চাই তা বাচ্চাদের খেলনার জন্য বানানো হোক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে। এ ব্যাপারে হানাফি ফকিহগণ আলাদাভাবে কোনো পার্থক্য বা ব্যতিক্রম উল্লেখ করেননি। [রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৪৭]

তবে কেবল ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ থেকে এ ব্যাপারে স্পষ্ট একটি ভাষ্য পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ‘পুতুলের ক্রয়-বিক্রয় ও তা দ্বারা বাচ্চাদের খেলা জায়িয় আছে’ আল্লামা শামি রাহিমাহুল্লাহ তার এ মতটিকে

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করলে তারা তার ভয়ে দৌড়ে পালাত। তখন তিনি তাদেরকে ডেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন, ফলে তারা আবার আমার সঙ্গে খেলত [১]

## অশ্বারোহণ ও ঘোড়দৌড়

অশ্বারোহণ ও ঘোড়দৌড় একটি চমৎকার ব্যায়াম। এতে মানসিক চাঞ্চল্য ও ক্ষীপ্রতা সৃষ্টি হয়; বৃদ্ধি পায় বীরত্ব, তেজস্বিতা ও আত্মনির্ভরতা। তাছাড়াও ঘোড়া ও তার চালচলন নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা তো অর্জিত হয়েই। এ ধরনের শারীরিক কসরতের প্রতি ইসলামে অনুসারিত তো করেনি; বরং তীব্রভাবে উদ্বৃদ্ধি করেছে এবং এর প্রতি অনেক গুরুত্বারূপ করেছে। যেহেতু জিহাদ, সমরশক্তি, দেশ ও জাতির নিরাপত্তার সঙ্গে ঘোড়দৌড়ের রয়েছে গভীর সম্পর্ক।

সমর্থন করে বলেন, ‘এ মতটি ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হওয়ার কারণে এটা বোঝার কোনো অবকাশ নেই যে, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ এ থেকে ভিন্নমত পোষণ করতেন। কেননা, হতে পারে এ মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহরও একই মত’ [রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২২৬]

অর্থাৎ আল্লামা ইবনু আবিদিন শামি রাহিমাহুল্লাহর মতে, এটা ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহর মত হওয়ার পাশাপাশি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর মতও হতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, হানাফি ফকিহগণ থেকে ব্যাপকভাবে প্রাণীর সব ধরনের ছবি-প্রতিকৃতি হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষ্য পাওয়া গেলেও বাচ্চাদের পুতুলের ব্যাপারে বৈধতা বা অবৈধতার কোনো মতই আমরা যথসাধ্য চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি। বরং বিপরীতে ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহর মত থেকে বোঝা যায়, এ মাসআলাটি প্রাণীর ছবি-প্রতিকৃতি হারাম হওয়ার মাসআলা থেকে ব্যতিক্রম; যেমনটি মালিকি, শাফিয়ি ও হাস্বলি মাযহাবের ফকিহগণ বলেছেন। কেননা, এ ব্যাপারে আলাদাভাবে একাধিক সুস্পষ্ট হাদিস পাওয়া যায়, যেখানে পুতুলের বৈধতার বিষয়টি রাহিত হওয়ার দাবি কিংবা সেখানে ভিন্ন ব্যাখ্যার কোনোই অবকাশ নেই। এ হিসেবে হানাফি মাযহাবে যদি পুতুলের বৈধতার বিষয়টি সাধারণ ছবি-প্রতিকৃতি হারাম হওয়ার বিধান থেকে ব্যতিক্রম বলা হয় তাহলে আশর্যের কিছু নেই; বিশেষত যখন এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহর স্পষ্ট ভাষ্য রয়েছে এবং বিপরীতে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে কোনো মত পাওয়া যায়নি। বরং আল্লামা শামি রাহিমাহুল্লাহর ভাষ্য ও তার কথার ধরণ থেকে বোঝা যায়, তিনিও বাচ্চাদের জন্য পুতুলের বৈধতার মতটিকে সঠিক মনে করেন। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

তবে আমাদের উপর্যুক্ত বিধানের হানাফি ফকিহগণ তাদের বিভিন্ন প্রলেখ পুতুলের ক্রয়-বিক্রয় এবং তার ব্যবহারকে নাজরিয়ি বলেছেন। তারা এক্ষেত্রে ছবি-প্রতিকৃতি নিষিদ্ধ হওয়া-সংক্রান্ত হাদিসগুলো দিয়ে দলিল দিয়েছেন। আর পুতুলের দ্বারা খেলা বৈধ হওয়ার হাদিসগুলোকে রাহিত বা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও বাস্তবতার নিরিখে হাদিসগুলোকে রাহিত হওয়ার দাবি করা বা সেগুলোর ভিন্ন ব্যাখ্যা করার সুযোগ কম, তবু যেহেতু এতে আলিঙ্গনের ভিন্নমত রয়েছে, তাই সর্তকতাসুরূপ পুতুল বা এ ধরনের প্রাণী জাতীয় খেলনার ব্যবহার থেকে বিরত থাকাই উত্তম ও সবদিক থেকে নিরাপদ।

[১] সহিতুল বুখারি : ৬১৩০; সহিহ মুসলিম : ২৪৪০

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالْحِنْيَلُ وَالْبَعْلُ وَالْحَمِيرُ لَتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ...  
❸

আর তোমাদের আরোহণের জন্য এবং শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন  
যোড়া, খচ্চর ও গাধা।[১]

উরওয়া আল-বারিকি রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الْحَيْنَلُ مَغْفُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ الْأَجْرُ، وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

| কিয়ামত পর্যন্ত যোড়ার কপালের উপরিভাগের কেশদামে আছে কল্যাণ, সাওয়াব  
ও গনিমত।[২]

উকবা ইবনু আমির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِذْمُوا وَأَرْكِبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبَّ إِلَيْيِّ مِنْ أَنْ تَرْكِبُوا

| তোমরা তিরন্দাজি করো এবং অশ্বারোহণ করো। তবে তোমাদের অশ্বারোহণ  
শেখার তুলনায় তিরন্দাজি শিক্ষা করা আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়।[৩]

জাবির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম  
বলেছেন—

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فَهُوَ سَهْوٌ وَلَهْوٌ، إِلَّا أَرْبَعًا: مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ  
وَتَأْدِيبَهُ قَرْسَةُ، وَتَعْلِمَةُ السِّبَاحَةِ، وَمَلَاعِبَتَهُ أَهْلَهُ

[১] সুরা নাহল, আয়াত : ৮

[২] সহিত্তুল বুখারি : ৩১১৯; সহিহ মুসলিম : ১৮৭৩

[৩] মুসনাদু আহমাদ : ১৭৩০০; জামিউত তিরমিয়ি : ১৬৩৭; হাদিসটি হাসান।

যাতে আল্লাহর স্মরণ নেই, এমন প্রত্যেকটি জিনিস ভুল এবং অনর্থক কাজ। তবে চারটি জিনিস ব্যতিক্রম। সেগুলো হলো—দুই লক্ষ্যস্থলের মাঝে কুচাকাওয়াজ করা, নিজের ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, সাঁতার শেখা ও নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ক্রীড়া-বিনোদন করা।[১]

উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

عَلِمُوا أَوْلَادُكُمُ السَّبَاحَةُ وَالرِّمَايَةُ، وَمُرْوُهُمْ فَلَيَبْثُوا عَلَى الْخَيْلِ وَثُبَّا

তোমাদের সন্তানদের সাঁতার ও তিরন্দাজি শেখাও। আর তাদেরকে নির্দেশ দাও,  
তারা যেন ঘোড়ার পিঠে দক্ষতার সাথে লাফিয়ে আরোহণ করে।'[২]

[১] আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৯৭৪১; আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ি : ৮৮৯১; হাদিসটি সহিহ।

[২] এসংক্রান্ত একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু ইয়াকুব ইসহাক আল-কাররাব রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইয়াকুব, তিনি বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন হুসাইন ইবনু ইদরিস, তিনি বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন সুওয়াইদ ইবনু নাসর, তিনি বলেন, হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, তিনি উসামা ইবনু যাইদ থেকে, তিনি বলেন, আমাকে বর্ণনা করেছেন মাকহুল দিমাশকি, তিনি বলেন, উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু শামবাসীদের নিকট পত্রে লিখে পাঠান—‘عَلِمُوا أَوْلَادُكُمُ السَّبَاحَةُ وَالرِّمَايَةُ—তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতার, তিরন্দাজি ও অশ্বারোহণ শেখাও।’ [ফাযারিলুর রামায়ি, ইসহাক আল-কাররাব : ১৫; কানযুল উস্মাল, মুভাকি আল-হিন্দি : ১১৩৮৬]

দি঱াসাতুল আসানিদের মাধ্যমে পর্যালোচনা আমরা দেখেছি যে, এ সনদের বর্ণনাকারীগণ সবাই সিকা বা নির্ভরযোগ্য, কেবল উসামা ইবনু যাইদ আল-লাইসি নামক বর্ণনাকারী অন্যদের তুলনায় একটু নিম্নস্তরের। তার ব্যাপারে ইমামদের মিশ্র বক্তব্য পাওয়া যায়; যদিও বেশিরভাগ ভালোই বলেছেন। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সে সহনীয় পর্যায়ের বর্ণনাকারী (অর্থাৎ তার হাদিস বেশি শক্তিশালী না হলেও গ্রহণ করার মতে)। [আল-কামিল, ইবনু আদি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭৭, রাবি : ২১২] ইমাম ইবনু শাহিন রাহিমাহুল্লাহ তাকে ইমাম ইবনু মাইন রাহিমাহুল্লাহর সূত্রে সিকা বা নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়ে তার তারিখু আসমায়িস সিকাত গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। [তারিখু আসমায়িস সিকাত, ইবনু শাহিন, পৃষ্ঠা : ৩৮, রাবি : ৮০] অনুরূপ ইমাম ইবনু হিবান রাহিমাহুল্লাহও তাকে সিকা বা নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়ে তার আস-সিকাত গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তবে সে মাঝেমধ্যে ভুল করে। [আস-সিকাত, ইবনু হিবান, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৭৪, রাবি : ৬৭৮৬]

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেলে, উসামা ইবনু যাইদ উচ্চস্তরের সিকা বা নির্ভরযোগ্য রাবি না হলেও সে কমপক্ষে হাসান স্তরের রাবি বলে গণ্য হবে, যার হাদিস হাসান বলে গণ্য হয়; যেমনটি হাফিয় যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে রায় দিয়েছেন। আর উক্ত সনদে কোনো ধরনের ইনকিতা বা সূত্রবিচ্ছিন্নতাও নেই। অতএব বলা যায়, এ হাদিসটির সনদ হাসান।

ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম বলেছেন—

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ

|      রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন  
|      করতেন এবং (অগ্রগামী বিজয়ীর জন্য) পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখতেন।[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, ঘোড়দৌড়  
প্রতিযোগিতার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা ও অশ্঵ারোহণের প্রতি উৎসাহ জোগানো। কারণ,  
আমরা যেমনটা বলেছি, এটা একই সঙ্গে ক্রীড়া, ব্যায়াম ও যুদ্ধের অনুশীলন।

আবু লাবিদ রাহিমাহুল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কিছু লোক বসরার  
ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় আনাস রায়িয়াল্লাহু আনহুর সাথে  
সাক্ষাৎ করলাম। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম—

يَا أَبَا حَمْزَةَ ، أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَاہِنُ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَاللَّهُ ، لَقَدْ رَاهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَلَى فَرَسٍ لَهُ ، يَقَالُ لَهُ : سَبَحَةٌ ، فَسَبَقَ النَّاسَ ، فَإِنَّشَى لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ

|      হে আবু হাম্যা, আপনারা কি নবিজির সময়ে ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা করতেন?  
নবিজি কি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম,  
নবিজি প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। ‘সাবহা’ নামের একটি ঘোড়ায় চড়ে বসেন  
তিনি। ঘোড়াটি অন্য সবাইকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যায়। এরপর সে  
বিজয়ী হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশিতে সেদিন আগ্রহারা  
হয়েছিলেন। ঘোড়াটি তাকে অনেক বেশি মুখ্য করেছিল।[২]

প্রতিযোগিতার পুরস্কার হতে হবে প্রতিযোগী ছাড়া তৃতীয় পক্ষ কিংবা প্রতিযোগী  
দুজনের মধ্যে নির্দিষ্ট একজনের পক্ষ থেকে। দুজনই টাকা দেবে—যে জিতবে, সে

[১] মুসনাদু আহমাদ : ৫৩৪৮, ৫৬৫৬; হাদিসটি সহিহ।

[২] মুসনাদু আহমাদ : ১৩৬৮৯; সুনানুদ দারিমি : ২৪৭৪; হাদিসটি হাসান।

উভয়ের টাকা নিয়ে নেবে, এটা নিষিদ্ধ জুয়া [১] নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের জুয়ার জন্য প্রস্তুতকৃত ঘোড়াকে শয়তানের ঘোড়া বলে অবহিত করেছেন। ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الْخَيْلُ تَلَانَةٌ ، فَقَرْسٌ لِّلرَّحْمَنِ ، وَقَرْسٌ لِّلشَّيْطَانِ ، فَأَمَّا قَرْسُ الرَّحْمَنِ: فَالَّذِي يُرْبَطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَعَلَفُهُ وَرَوَاهُ وَبَوْلُهُ ، وَذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَأَمَّا قَرْسُ الشَّيْطَانِ: فَالَّذِي يَقَامُ أَوْ يُرَاهُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا قَرْسُ الْإِنْسَانِ: فَالْقَرْسُ يَرْتَبِطُهَا الْإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا ، فَهِيَ تَسْتَرُ مِنْ قَفْرٍ

ঘোড়া তিনি ধরনের। রহমানের জন্য পালিত ঘোড়া, মানুষের জন্য পালিত ঘোড়া এবং শয়তানের জন্য পালিত ঘোড়া। সুতরাং রহমানের ঘোড়া হলো ওই ঘোড়া, যা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য বেঁধে রাখা হয়। এর খাবার, মলমুক্ত এবং তিনি (পশুর খাবার ও প্রতিপালন-সংক্রান্ত) আরো কিছু উল্লেখ করেছেন, যা আল্লাহ চেয়েছেন। (অর্থাৎ এগুলো সবই তার জন্য সাওয়াবের কারণ হবে)। আর শয়তানের ঘোড়া হলো ওই ঘোড়া, যা দ্বারা কেবল জুয়া খেলা হয় কিংবা (জুয়ার হারাম পুরস্কার জেতার জন্য) ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা করা হয়। আর মানুষের ঘোড়া হলো ওই ঘোড়া, যেটা মানুষ অশ্বশাবকের আশায় বেঁধে রাখে। এটা তার জন্য দারিদ্র্য থেকে রক্ষার ঢালস্বরূপ [২]

## শিকার

ইসলামি শরিয়ায় অনুমোদিত বিনোদন-ক্রীড়ার মধ্যে একটি হলো শিকার। শিকার আসলেই একটি আনন্দদায়ক ও পরিশ্রমের কাজ, পাশাপাশি এটি উপার্জনের মাধ্যমও বটে। তির, বর্শা কিংবা কুকুর ও বাজপাখি সবকিছুর মাধ্যমেই শিকারের সুযোগ আছে। শিকারের শর্তাবলি, নিয়ম-নীতি-সম্পর্কিত আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

[১] নিষিদ্ধ জুয়ার দুটি ধরন হতে পারে। এক. প্রতিযোগী দুজনেই চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেবে এবং এভাবে শর্ত করবে, যে জিতবে সে উভয়ের টাকা পাবে। দুই. প্রতিযোগী দুজনের কেউই প্রথমে অর্থ দেবে না; বরং চুক্তি এভাবে হবে, যে পরাজিত হবে সে চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেবে। জুয়ার এ দুটি ধরনই ইসলামে হারাম ও নিষিদ্ধ।

[২] মুসলাদু আহমাদ : ৩৭৫৬; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৯৭৭৭; হাদিসটি সহিহ।

শিকারিকে লক্ষ রাখতে হবে, নিষিদ্ধ দুই সময়ে যেন শিকার না করা হয়। শিকারের জন্য নিষিদ্ধ সময় দুটি হলো—

[এক] হজ ও উমরার ইহরাম বাঁধা অবস্থায়। কারণ, তখন সকল প্রাণী থাকে নিরাপদ। এই সময়ে কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া হারাম, কোনোরূপ রক্তপাতের সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ...  
⑯

হে ঈমানদারগণ, ইহরামে থাকাকালে তোমরা শিকার-জন্মু হত্যা কোরো না।<sup>[১]</sup>

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

...وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْثُمْ حُرُمًا...  
⑯

আর তোমরা যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাকবে, ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে।<sup>[২]</sup>

[দুই] মকার হারামে থাকা অবস্থায়। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম শরিফ সকল প্রাণীর জন্যই একটি নিরাপদ স্থান। এখানে পশু-পাখি ঘূরবে-ফিরবে, আকাশে উড়ে বেড়াবে, কিন্তু সেগুলো শিকার যাবে না; এমনকি তাড়ানোও যাবে না। এখানে ঘাস ও লতাপাতা জমিতে উৎপন্ন হবে, কিন্তু সেগুলো কাটা যাবে না। ইবনু আবুস রায়িয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

حَرَمَ اللَّهُ مَكَّةَ قَلْمَنْ تَحْلِلُ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ ، وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِيْ ، أَحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، لَا يُخْتَلِي خَلَاهَا وَلَا يُغْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يَنْقُرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تُنْقَطِطُ لَقْطَهَا إِلَّا لِمُعْرِفٍ فَقَالَ  
الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِلَّا إِذْخَرْ لِصَاعِدَتِنَا وَقُبُورِنَا ؟ فَقَالَ : إِلَّا إِذْخَرْ

[১] সুরা মায়দা, আয়াত : ৯৫

[২] সুরা মায়দা, আয়াত : ৯৬

আল্লাহ তাআলা মক্কাকে হারাম (সম্মানিত বা নিষিদ্ধ এলাকা) ঘোষণা করেছেন। সুতরাং আমার পূর্বেও তা কারো জন্য হালাল (বৈধ যেকোনো কিছু করার জন্য উন্মুক্ত এলাকা) ছিল না এবং আমার পরেও কারো জন্য তা হালাল হবে না। আমার জন্য একটি দিনের (অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের দিবসের) কিছু সময় (কয়েকজন ক্ষমার অযোগ্য ভয়ংকর অপরাধীকে হারামের সীমানায় হত্যার জন্য) হালাল করা হয়েছিল। কাজেই হারাম শরিফের ঘাস উপরে ফেলা যাবে না, তার গাছ কাটা যাবে না এবং শিকারকে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সেখানে পড়ে থাকা (হারানো) বস্তু উঠিয়ে নেওয়া যাবে না, তবে হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা প্রদানকারীর জন্য (অনুমতি থাকবে)। তখন আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, তবে ইয়খির ঘাস, আমাদের সুর্ণকারদের জন্য এবং আমাদের কবরগুলোর জন্য প্রয়োজন। তখন তিনি বললেন, ঠিক আছে, ইয়খির ঘাস (নিষেধাজ্ঞার এ বিধান থেকে) ব্যতিক্রম।<sup>[১]</sup>

### পাশা খেলা

যে খেলার মধ্যে জুয়া থাকে, সে খেলা হারাম। জুয়া বলা হয় এমন চুক্তিকে, যেখানে খেলোয়াড়কে অবশ্য-অবশ্যই লাভ অথবা ক্ষতির শিকার হতে হবে। (অর্থাৎ জুয়াতে কখনো এমন হয় না যে, খেলোয়াড়ের লাভও হবে না, আবার ক্ষতিও হবে না; যেমনটা অনেক সময় ব্যবসার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্যবসায় লাভও হয় না, আবার ক্ষতিও হয় না; বরং সমান-সমান থাকে।) কুরআনে জুয়াকে মিস্র (মাইসির) বলা হয়েছে, যার আলোচনা মদ, মৃত্তি ও ভাগ্য-নির্ধারক তিরের সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।<sup>[২]</sup>

[১] সহিল বুখারি : ১৮৩৩, সহিল মুসলিম : ১৩৫৩

[২] এ চারটি বর্জনীয় বিষয়ের আলোচনা সুরা মায়দার ৯০ নম্বর আয়াতে এসেছে। আর একই সুরার ৯১ নম্বর আয়াতে বিশেষভাবে মদ ও জুয়ার মদ্দ প্রভাব এবং এর পার্থিব ও দীনি ক্ষতির ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصْنَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَقُلْ أَنْشُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٧﴾

হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া, মৃত্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শরসমূহ তো কেবলই ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা সেগুলো বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর ঘরণে ও সালাতে বাধা দিতে।

আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرَكَ ، فَلْيَتَصَدَّقْ

| আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে, এসো আমি তোমার সঙ্গে জুয়া খেলব, সে যেন (পাপের কাফফারাস্বৰূপ কিছু অর্থ-সম্পদ) সাদাকা করে দেয় [১]

অর্থাৎ, এ হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে, জুয়ার প্রতি আহান করাটাই আলাদা একটি গুনাহের কাজ। আর এ গুনাহের কাফফারা হিসেবে তাকে কিছু সাদাকা করে দিতে বলা হয়েছে।

সুতরাং পাশা খেলার সাথে যদি জুয়া থাকে তাহলে এটা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। আর পাশার সাথে যদি জুয়া না থাকে তাহলে অধিকাংশ আলিমগণের মতে এটাও হারাম। আর কিছু আলিমের মতে জুয়া না থাকলে সেটা মাকরুহ (হারামের নিকটবর্তী) হবে, হারাম নয়।

হারামের প্রবক্তাগণ প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন বুরাইদা রায়িয়াল্লাহু আনহুর হাদিস। তার থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْذِشِيرِ ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَخْمٍ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ

| যে ব্যক্তি পাশা খেলল, সে যেন তার হাত শূকরের গোশত-রক্তে রঞ্জিত করল [২]

এছাড়াও আবু মুসা আশআরি রায়িয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْذِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

| যে ব্যক্তি পাশা খেলল, সে আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্যতা করল [৩]

অতএব তোমরা কি বিরত হবে না? [সূরা মায়দা, আয়াত : ৯০-৯১]

[১] সহিল বুখারি : ৪৮৬০; সহিহ মুসলিম : ১৬৪৭

[২] সহিহ মুসলিম : ২২৬০; সুনানু আবি দাউদ : ৪৯৩৯

[৩] সুনানু আবি দাউদ : ৪৯৩৮; মুসনাদু আহমাদ : ১৯৫২১; হাদিসটি হাসান।

পাশা খেলার মধ্যে জুয়া থাকুক কিংবা না থাকুক, এই হাদিস দুটির ব্যাপকতা দ্বারা সব ধরনের পাশা খেলাই নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। আর এটাই অধিকাংশ আলিমদের মত। অবশ্য পাশা খেলায় জুয়া না থাকলে কিছু আলিম সেক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। আল্লামা শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনুল মুগাফফাল রাহিমাহুল্লাহ ও সাইদ ইবনু মুসাইয়িব রাহিমাহুল্লাহ জুয়া না থাকলে পাশা খেলাকে বৈধ বলেছেন।’<sup>[১]</sup>

এতে বোঝা যায়, তারা সম্ভবত এই হাদিস দুটিতে বর্ণিত নিন্দা ও নিষিদ্ধতাকে জুয়ামিশ্রিত পাশা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। (অর্থাৎ তাদের মতে, এ হাদিস দুটিতে সব ধরনের পাশা খেলার কথা বোঝানো হয়নি; বরং এখানে জুয়ামিশ্রিত পাশা খেলা বোঝানো হয়েছে।)

### মদের সঙ্গী জুয়া

অনেক ধরনের খেলাধূলা ও ক্রীড়া-কৌতুকই ইসলামে বৈধ। তবে জুয়ামিশ্রিত ক্রীড়া-বিনোদনমাত্রাই ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। জুয়ামিশ্রিত খেলা চেনার উপায় হলো, যে খেলা লাভ কিংবা ক্ষতি থেকে মুক্ত নয়, তা-ই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ জুয়ার মধ্যে লাভ বা ক্ষতি থাকবেই, এতে লাভ-ক্ষতিহীন মাঝামাঝি থাকার কোনো সুযোগ নেই।) পূর্বেই আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস উল্লেখ করেছি, আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامْكَ ، فَلْيَتَصَدَّقْ

আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে, এসো আমি তোমার সঙ্গে জুয়া খেলব, সে যেন (পাপের কাফফারা-স্বরূপ কিছু অর্থ-সম্পদ) সাদাকা করে দেয়।<sup>[২]</sup>

একজন মুসলিমের জন্য কখনোই বৈধ ও শোভনীয় নয়, জুয়া তার অবসরের বিনোদন হবে; যেমনিভাবে কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়, জুয়া তার পেশা ও উপর্যন্তের মাধ্যম হবে।

[১] নাইলুল আওতার, শাওকানি, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১০৭

[২] সহিলুল বুখারি : ৪৮৬০; সহিহ মুসলিম : ১৬৪৭

জুয়া কঠোরভাবে নিষেধের পেছনে ইসলামের কিছু গভীর ভাবনা ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য রয়েছে। নিম্নে জুয়া নিষেধের কিছু কারণ তুলে ধরা হলো—

[এক] ইসলাম চায়, মানুষ সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পদ্ধতির মধ্যে সীমিত থাকুক, যেকোনো ফলাফল লাভের জন্য সঠিক পন্থা অবলম্বন করুক, ঘরে প্রবেশের সময় দরজা দিয়েই প্রবেশ করুক এবং সঠিক উপকরণ থেকে যথাযথ সেবা নিক। জুয়া মানুষকে ভাগ্য, কাকতালীয় বিষয় ও মিথ্যা আকাঙ্ক্ষার প্রতি নির্ভরশীল বানিয়ে দেয়। ইসলাম চায়, তারা এগুলোর ওপর নয়; বরং সঠিক কর্ম ও শ্রমের ওপর নির্ভরশীল হোক, পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা উপার্জনের জন্য যেসব হালাল পন্থা প্রস্তুত করে রেখেছেন, সেগুলোর প্রতি তারা সম্মান জানাতে শিখুক।

[দুই] ইসলামে একজনের সম্পদ আরেকজনের জন্য রাস্ত বা প্রাণের মতোই হারাম। এজন্য শরিয়ত-অনুমোদিত লেনদেন বা মালিকের সন্তুষ্টিক্রমে দান ও সাদাকা ছাড়া কারো সম্পদে হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। তাই জুয়ার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ গ্রহণের অর্থ হলো অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভক্ষণ করা।

[তিনি] জুয়াড়িদের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ লেগেই থাকে; যদিও তারা বাহিরে বন্ধু-বন্ধু ভাব ধরে থাকে। পরাজিত ব্যক্তি হয়তো চুপ থাকে এটা ভেবে যে, জুয়ার মধ্যে হারাজিত থাকবেই। একজন ঠকবে আরেকজন জিতবে, এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে ঠিকই পরাজয়ের ক্ষেত্রে ও হতাশার ক্ষেত্রে জুলতে থাকে। সে কেন জয়ী হতে পারল না, এ চিন্তায় অপরপক্ষের প্রতি তার মধ্যে ক্ষোভ ও ঘৃণা জমাটবন্ধ হতে থাকে।

[চার] ব্যর্থতা পরাজিত ব্যক্তিকে আবারও জুয়ার দিকে টেনে নিয়ে যায়। সে ভাবে, হয়তো দ্বিতীয়বার সে প্রথমবারের ক্ষতি উসুল করে ফেলতে পারবে। অন্যদিকে সফলতার আনন্দে বিজয়ী আবারও জুয়া খেলতে চলে আসে। মাঝে মাঝে জুয়ার অভ্যাস তাকে নিয়মিত জুয়াড়ি বানিয়ে দেয়। লোভে পড়ে সে কখনোই আর জুয়ার ফাঁদ থেকে মুক্তি পায় না। আবার কখনো পাশার দান উল্টে গিয়ে সেও সবকিছু খুইয়ে বসতে পারে। জয়ের আনন্দ পাল্টে যেতে পারে পরাজয়ের বিষাদে। এ তো ভাগ্যচক্র, জুয়াড়িরা এর হাত থেকে কখনো বাঁচতে পারে না। তাই জুয়াড়িরা সাধারণত জুয়ার বৃন্ত ছেড়ে সহজে বেরোতে পারে না। জুয়ায় নেশাগ্রস্ত হওয়ার রহস্য এটাই।

[পাঁচ] জুয়া খেলার মানসিকতা সমাজ ও ব্যক্তির জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। এই বোঁক ও মানসিকতা তার মূল্যবান সময় ও শ্রম কেড়ে নেয়, আর জুয়াড়িদেরকে বানিয়ে দেয় অলস, নিষ্ক্রিয়। জীবন থেকে এরা নেয়; কিন্তু কিছুই দেয় না; খরচ করে, কিন্তু উৎপাদন করে না। জুয়াড়ি সদা জুয়ার মধ্যেই লেগে থাকে। তার নিজের প্রতি কর্তব্য, রবের প্রতি কর্তব্য, পরিবারের প্রতি কর্তব্য, জাতির প্রতি কর্তব্য—সবই সে ভুলে থাকে। জুয়ার মায়ায় যে একবার জড়িয়েছে, অসম্ভব নয় সে জুয়ার জন্য তার দীন, মান-ইজ্জত ও মালিকানাধীন জমি সবই বিক্রি করে দেবে। জুয়ার টেবিলের বন্ধুত্ব তার থেকে সবই কেড়ে নিতে পারে। এই সর্বনাশা বন্ধুত্ব তার মর্মে মর্মে গেঁথে দেয় জুয়ার প্রতি ভালোবাসা; ফলে তার নিজের গৌরব, আকিদা-বিশ্বাস, সুজাতি সবকিছুই জুয়ার কল্পিত উপার্জনের সামনে হালকা হয়ে যায়।

কুরআনে মদ ও জুয়ার কথা একই সঙ্গে উল্লেখের মাধ্যমে যথাযথ ও বিশুদ্ধ বার্তাই দিয়েছে যে, দেশ, সমাজ, ব্যক্তি ও চরিত্রের ওপর এই দুটির ক্ষতিকর প্রভাব কাছাকাছি। জুয়াড়ি ও মদ্যপের মধ্যে কতই না মিল! খুব কম জুয়াড়িই আছে, যে মদ্যপান করে না, আর খুব কম মদ্যপই আছে, যে জুয়া খেলে না।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা যথার্থই বলেছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, মদ ও জুয়া শয়তানের কাজ। তিনি এগুলোকে মৃত্তিপূজা ও তিরের মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষার মতো মারাত্মক গুনাহের সঙ্গে তালিকাভূক্ত করে বলেছেন যে, এগুলো অপবিত্র কাজ ও অবশ্যই পরিত্যাজ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَبِبُوهُ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَذَابَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي  
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصْدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهُنَّ مُنْتَهُونَ ﴿٢﴾

হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া, মৃত্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য-নির্ণয়ক শরসমূহ তো কেবলই ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা সেগুলো বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে। অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে? [১]

## লটারি এক ধরনের জুয়া

লটারি এক ধরনের জুয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সামাজিক বা মানবিক কল্যাণের নামে এ বিষয়ে শিথিলতা ও ছাড় গ্রহণযোগ্য নয়। সমাজ-কল্যাণের জন্য লটারির মাধ্যমে মানুষের দান গ্রহণ অনেকটা নাচ-গান ও মূর্তি-প্রতিকৃতি এঁকে দান গ্রহণের মতোই। আমরা এদের উদ্দেশে এতটুকু বলতে পারি, পবিত্র মহান সত্তা কখনো হারাম সম্পদের দান করুল করবেন না। যেমন হাদিসে এসেছে—

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبُلُ إِلَّا طَيِّبًا

| নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পবিত্র, তিনি পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া (দান-সাদাকা) কোনো কিছুই গ্রহণ করেন না।<sup>[১]</sup>

দানের টাকা সংগ্রহের জন্য এসব অবৈধ ও হারাম উপায় গ্রহণকারীরা বলতে চায়, সমাজ থেকে কল্যাণ, দয়া ও অনুগ্রহের মানসিকতা বিলুপ্ত হয়ে দিয়েছে। জুয়া ও নিষিদ্ধ বিনোদন ছাড়া অর্থ সংগ্রহের আর কোনো উপায় নেই! কিন্তু তাদের এমন কথা সম্পূর্ণ ভুল। ইসলাম কখনোই এটা বিশ্বাস করে না, মুসলিম সমাজ থেকে কল্যাণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই ইসলাম সার্বক্ষণিক কলুষতামুক্ত পন্থার পক্ষে। ইসলাম বলে, তোমরা মানুষকে দানের জন্য প্রেরণা দাও, তাদের মধ্যে মানবিকতা জাগিয়ে দাও, আল্লাহ ও পরকালের বিশ্বাস জাগ্রত করে দাও, তাহলেই মানুষ দান করতে শুরু করবে।

## সামাজিক সম্পর্ক

ইসলাম মুসলিমদের সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারটি মৌলিক দুটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠা করেছে। স্তম্ভ দুটি হলো—

- » পারস্পরিক ভাতৃত্বের মজবুত বন্ধন টিকিয়ে রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।
- » ইসলাম নির্দেশিত প্রত্যেকের অধিকার ও ব্যক্তিগত সীমানায় (যেমন : জান, সম্মান ও সম্পদে) হস্তক্ষেপ না করা।

[১] সহিহ মুসলিম : ১০১৫

এই মৌলিক ভিত্তি দুটির সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও বিরোধপূর্ণ সকল আচরণ, কথা-বার্তা ও কর্মকাঙ্গই ইসলামে নিষিদ্ধ। অবশ্য সামাজিক ও ব্যক্তিগত ক্ষতিভেদে নিষেধাজ্ঞার মধ্যে স্তরগত তারতম্য হবে। পারস্পরিক আত্ম ও ব্যক্তিগত মর্যাদার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কিছু নমুনা সামনের আয়তে পাওয়া যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَأَنفَقُوا اللَّهَ لِعْلَكُمْ تُرَحَّمُونَ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا يُنْسَأُ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ  
خَيْرًا مِّنْهُنَّ سُلْطَانٌ لَّمْ يَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابُّوا بِالْأَلْقَابِ مِلِيشَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ  
وَمَنْ لَمْ يَتَبَشَّرْ قَوْلُكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الطَّنِّ إِنَّ  
بَعْضَ الطَّنِّ إِثْمٌ سُلْطَانٌ لَّا تَجْسِسُوا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِيَّاهُ أَحْذَكُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَحْمَ  
أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَأَنْفَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

মুমিনগণ সবাই তো পরস্পর ভাই-ভাই; কাজেই তোমরা তোমাদের দু-ভাইয়ের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। হে মুমিনগণ, (তোমাদের পুরুষদের) একদল যেন (পুরুষদের) অন্য দলকে উপহাস না করে। হতে পারে তারা উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম। আর নারীরাও যেন অন্য নারীদেরকে উপহাস না করে। হতে পারে, তারা উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা নিজেদেরকে (অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে) দোষারোপ কোরো না। এবং তোমরা একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম করতই না নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যালিম। হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কোনো কোনো অনুমান পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করতে যেয়ো না এবং তোমাদের কেউ যেন অপরাজনের গিবত (পরানিদা) না করে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই করে থাকো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু।[১]

[১] সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১০-১২

আল্লাহ তাআলা প্রথম আয়াতে ঘোষণা দিয়েছেন, মুমিনগণ পরস্পরে ভাই-ভাই। একে তো তারা মানুষ হিসেবে পরস্পরের ভাই, তার সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে দীনের ভাই। ভাইদের দাবি হলো—তারা নিজেরা মিলেমিশে চলবে, অপরিচিতের মতো থাকবে না; পরস্পরে সম্পর্ক বজায় রাখবে, বিচ্ছিন্ন হবে না; একে অন্যের প্রতি আন্তরিক থাকবে, বিদ্রোহী হবে না; পরস্পরকে ভালোবাসবে, ঘৃণা করবে না; সবাই ঐক্যবন্ধ হয়ে থাকবে, বিচ্ছিন্ন হবে না। হাদিসে আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِيَّاكُمْ وَالظُّنُنُ ، فَإِنَّ الظُّنُنَ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحْسَسُوا ، وَلَا تَحَاسِدُوا ،  
وَلَا تَدَابِرُوا ، وَلَا تَباغضُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

তোমরা ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। কেননা, (সুস্পষ্ট কারণ ও প্রমাণ ছাড়া কারো ব্যাপারে খারাপ) ধারণা হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা দোষ তালাশ কোরো না, গোয়েন্দাগিরি কোরো না, পরস্পর হিংসা পোষণ কোরো না, একে অন্যের পেছনে লেগে থেকো না, একে অন্যের প্রতি শত্রুতা-বিদ্রোহ রেখো না; বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বাল্দা ভাই-ভাই হয়ে যাও [১]

### মুসলিম ভাইয়ের সাথে বিচ্ছেদ বৈধ নয়

এজন্য (দীনি কারণ ছাড়া) মুসলিমের সঙ্গে রূঢ় আচরণ, সম্পর্ক বর্জন এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া সবই নিষিদ্ধ। ঝগড়া লাগার পরে সর্বোচ্চ ৩ দিন কথা না বলার অনুমতি আছে। ক্রোধ প্রশংসিত হলে মীমাংসার জন্য তাদের উভয়ের চেষ্টা চালাতে হবে। অহংকার, রাগ, ক্ষোভ ও ঝগড়া-বিবাদ সব ভুলে আবার ভাইদের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। কারণ, কুরআনে উল্লেখিত মুমিনদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, মুমিনদের প্রতি তারা বিনয়-নশ্র।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسُوفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذْلَلُهُ  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةُ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا يُمِّ...  
[১]

[১] সহিল বুখারি : ৬০৬৪; সহিল মুসলিম : ২৫৬৩

হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে কেউ দীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ  
এমন এক সম্প্রদায় আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং যারা  
তাঁকে ভালোবাসবে; তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি  
কঠোর হবে; তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের  
নিন্দার ভয় করবে না [১]

আবু আইয়ুব রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়া সালাম বলেছেন—

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُغْرِضُ هَذَا ، وَيُعْرِضُ هَذَا  
وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدِأُ بِالسَّلَامِ

কোনো মুসলিমের জন্য ৩ দিনের বেশি তার ভাইয়ের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা বজায়  
রাখা জায়িয় নয়। এটাও জায়িয় নয় যে, দেখা হলে তারা একজন আরেকজনের  
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের মধ্য সে ব্যক্তিই উত্তম, যে আগে সালাম দেবে [২]

সুনানু আবি দাউদের বর্ণনায় আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে,  
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন—

لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ ، فَلِيَلْقَهُ فَلِيُسْلِمْ عَلَيْهِ ،  
فَإِنْ رَدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَ فِي الْأَجْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْدَ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ . زَادَ أَخْمَدُ  
وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ

কোনো মুমিনের জন্য বৈধ নয়, সে কোনো মুমিনের সঙ্গে ৩ দিনের বেশি  
সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখবে। অতঃপর ৩ দিন অতিবাহিত হলে সে যেন তার সাথে  
দেখা করে সালাম দেয়। যদি অপরজন তার সালামের উত্তর দেয় তাহলে উভয়েই  
(সালামের) সাওয়াবে অংশীদার হবে। আর যদি সে সালামের উত্তর না দেয়  
তাহলে সে (সালাম প্রত্যাখ্যানকারী একাই) গুনাহ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।

[১] সুরা মায়দা, আয়াত : ৫৪

[২] সহিতুল বুখারি : ৬২৩৭; সহিহ মুসলিম : ২৫৬০

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ অতিরিক্ত এটাও বর্ণনা করেছেন যে, সালামদাতা সম্পর্কচ্ছেদের গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।<sup>[১]</sup>

রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার গুনাহ আরো মারাত্মক। ইসলাম রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তা রক্ষা করাকে আবশ্যিক করেছে এবং এটাকে অন্যগুলোর তুলনায় অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

① ...وَأَنْقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

আর তোমরা ভয় করো আল্লাহকে, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে (বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও অধিকার) চেয়ে থাকো এবং ভয় করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়তার বন্ধনের ব্যাপারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক।<sup>[২]</sup>

আল্লাহ তাআলার নিকট এই সম্পর্ক ও তার মূল্যায়নের চিত্রায়ণ অত্যন্ত সুন্দরভাবে ঘটেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্যে। আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الرَّحْمُ مُعْلَقٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ

রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়তার বন্ধন আল্লাহ তাআলার আরশের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। সে বলতে থাকে, যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ তাআলা তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবেন। আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহ তাআলা তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন।<sup>[৩]</sup>

অন্য একটি হাদিসে জুবাইর ইবনু মুতাহিম রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

[১] সুনান আবি দাউদ : ৪৯১২; আল-আদাবুল মুফরাদ : ৪১৪; হাদিসটি হাসান।

[২] সুরা নিসা, আয়াত : ১

[৩] সহিহ মুসলিম : ২৫৫৫; মুসনাদু আবি ইয়ালা : ৪৪৪৬

| (রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়তার বন্ধন) ছিন্নকারী ব্যক্তি জানাতে প্রবেশ করবে না।[১]

কিছু আলিমের মতে, এখানে রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর কথা বোঝানো হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেছেন, এখানে পথেঘাটের ছিনতাইকারী তথা ডাকাতের কথা বলা হয়েছে। যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী আর পথেঘাটে মানুষের সম্পদ ছিনতাইকারী ডাকাত একই স্তরের অপরাধী।

আত্মীয়রা সম্পর্ক রাখলে আমিও রাখব আর তারা ভালো ব্যবহার করলে আমিও ভালো ব্যবহার করব; এটি শরিয়া-নির্দেশিত পন্থা নয়। শরিয়া-নির্দেশিত পন্থা হলো, যারা দুর্ব্যবহার করে দূরে ঠেলে দেয়; তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং তাদের অধিকার আদায় করতে হবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلَكِنَ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمُهُ وَصَلَّاهَا

প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ওই ব্যক্তি নয়, যে (অন্যপক্ষ থেকে সম্পর্ক বজায় রাখার) প্রতিদান হিসেবে সম্পর্ক রক্ষা করে। বরং প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী হলো ওই ব্যক্তি, যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হলেও সে তা বজায় রাখে।[২]

আত্মত্ব বর্জন ও সম্পর্কহীনতার এই বিধান ততক্ষণ প্রযোজ্য, যতক্ষণ না সেটা আল্লাহ তাআলার জন্য হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার জন্য এবং সত্ত্বের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আত্মত্ব বর্জনে এবং সম্পর্কহীনতায় কোনো সমস্যা নেই। কেননা, আল্লাহ তাআলার জন্য কারো সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও ঘৃণা করা ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতলের একটি। বারা ইবনু আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ أَوْتَقَ عَزِّيَ الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللَّهِ ، وَتُبْغِضَ فِي اللَّهِ

[১] সহিল বুখারি : ৫৯৮৪; সহিহ মুসলিম : ২৫৫৬

[২] সহিল বুখারি : ৫৯৯১; সুনানু আবি দাউদ : ১৬৯৭

| নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার জন্যই ভালোবাসা এবং আল্লাহ তাআলার জন্যই ঘৃণা  
করা সমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল।[১]

তাবুক যুদ্ধের সময় যুদ্ধে না গিয়ে মদিনায় অবস্থানকারী তিনজন সাহাবিকে  
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবগণ সর্বাত্মকভাবে বয়কট  
করেছিলেন। তাদের সঙ্গে ওঠাবসা, কথাবার্তা ও সালাম-কালাম সবই নিষিদ্ধ ছিল।  
পৃথিবীর সমস্ত প্রশস্ততা তাদের কাছে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তাদের জীবন হয়ে  
উঠেছিল অতিষ্ঠ। ৫০ দিন পরে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে তাদের তাওবা  
করুল-বিষয়ক আয়াত অবর্তীর্ণ করেন।[২]

আনাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

آلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا

| রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার তার স্ত্রীদের ব্যাপারে ১  
মাসের জন্য ঈলা (কাছে না যাওয়ার শপথ) করেছিলেন।[৩]

ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু একবার দীনি বিষয়ে রাগান্বিত হয়ে তার এক ছেলের  
সাথে আম্বত্যু কথা বলেননি। ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি  
বলেন—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْنَعُنَّ رَجُلٌ أَهْلَهُ أَنْ يَأْتُوا الْمَسَاجِدَ» ، فَقَالَ  
ابْنُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَمْنَعُهُنَّ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَحَدِثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا ، قَالَ: فَمَا كَلَمَةُ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّىٰ مَاتَ

| নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যেন নিজের  
স্ত্রীকে (সালাত আদায় করার জন্য) মসজিদে আসতে বাধা না দেয়। এটা শুনে  
ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুর এক পুত্র বলল, আমরা অবশ্যই তাদেরকে

[১] মুসনাদু আহমাদ : ১৮৫২৪; মুসনাদুর বুইয়ানি : ৩৯৯; হাদিসটি হাসান।

[২] সহিলুল বুখারি : ৪৪১৮; সহিহ মুসলিম : ২৭৬৯

[৩] সহিলুল বুখারি : ৫২০১; সহিহ মুসলিম : ১৪৭৫

বাধা দেবো। তখন ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি তোমার কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করছি হাদিস, আর তুমি বলছ এটা? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু তার এই ছেলের সাথে আমৃত্যু কথা বলেননি [১]

পার্থিব কোনো বস্তু বা স্বার্থের জন্য একজন মুমিনের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ শোভনীয় বা যথার্থ নয়। কেননা, পার্থিব বিষয়াদি আল্লাহ তাআলা ও মুমিনের কাছে খুবই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিষয়। তাছাড়াও মুমিনের প্রতি বিদ্বেষ আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও রহমত থেকে বঞ্চনার কারণ!

আবু ঝুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيُقَالُ : أَنْظِرُوهُمْ هَذِينِ حَتَّىٰ يَصْنَطِلُوكُمْ أَنْظِرُوهُمْ هَذِينِ حَتَّىٰ يَصْنَطِلُوكُمْ أَنْظِرُوهُمْ هَذِينِ حَتَّىٰ يَصْنَطِلُوكُمْ

জামাতের দরজাগুলো সোমবার এবং বৃহস্পতিবার খুলে দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা মুশারিক ছাড়া প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করে দেন, তবে একজন ব্যক্তি ব্যতিরেকে, যার সঙ্গে তার ভাইয়ের শত্রুতা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা তাদের সমরোতা পর্যন্ত অবকাশ দাও, তোমরা তাদের সমরোতা পর্যন্ত অবকাশ দাও, তোমরা তাদের সমরোতা পর্যন্ত অবকাশ দাও [২]

যদি কারো অধিকার নষ্ট করা হয়, অতঃপর অধিকার নষ্টকারী এসে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তাহলে তার কর্তব্য হলো, তার ক্ষমাপ্রার্থনা মেনে নিয়ে বাগড়া-বিবাদ থামিয়ে দেওয়া। ক্ষমাপ্রার্থনাকারীর ওজর প্রত্যাখ্যান করে তাকে ফেরত পাঠানো সম্পূর্ণরূপে হারাম। হাদিসে এসেছে, জাওদান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১] মুসনাদু আহমাদ : ৪৯৩৩; হিলইয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২২৮; হাদিসটি সহিহ।

[২] সহিহ মুসলিম : ২৫৬৫; মুসনাদুল ঝুমাইদি : ১০০৫

مَنْ أَغْنَدَرَ إِلَى أُخْيِيهِ بِمَغْدِرَةٍ فَلِمْ يَقْبِلُهَا ، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ حَطِينَةٍ صَاحِبٌ مَكْسُبٌ

যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের নিকট ওজর পেশ করে ক্ষমাপ্রার্থনা করল, কিন্তু সে ভাই তার ক্ষমাপ্রার্থনা গ্রহণ করল না, তাহলে তার (অন্যায়ভাবে) শুল্ক-ট্যাক্স আদায়কারীর মতো গুনাহ হবে।<sup>[১]</sup>

### বিবদমান ব্যক্তিদের মধ্যে মীমাংসা

পারস্পরিক ভাইভ্রের দাবি অনুসারে বিতর্ককারীদের কর্তব্য হলো, তাদের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ বন্ধে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এটা ব্যক্তি পর্যায়ের কর্তব্য। অন্যদিকে মুসলিম সমাজেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে। নিজেদের মুমিন ভাইয়েরা ক্রোধবশত বিতর্কে বা মারামারিতে লিপ্ত, আর অন্যরা সেই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে, ঝগড়া বৃদ্ধি পেতে দেবে, তাদের মধ্যকার ফাটল আরো প্রশস্ত হতে দেবে, সেটা কখনো হতে পারে না।

এজন্য সমাজের বিজ্ঞ ও সামর্থ্যবানদের দায়িত্ব হলো, তাদের মধ্যে মীমাংসার জন্য এগিয়ে আসা। প্রত্তিই অনুগামী না হয়ে যথাযথভাবে তাদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সমাজের কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦﴾

মুমিনগণ সবাই তো পরস্পর ভাই-ভাই; কাজেই তোমরা তোমাদের দু-ভাইয়ের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।<sup>[২]</sup>

এ ধরনের মীমাংসার ফজিলত, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব; পাশাপাশি ঝগড়া ও বিদ্বেষের ক্ষতি ও মন্দ দিক সম্পর্কে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসেও আলোচনা করেছেন। আবু দারদা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১] সুনান ইবনি মাজাহ : ৩৭১৮; শুআবুল ইমান : ৭৯৮১; হাদিসটির সনদ যইফ।

[২] সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১০

أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ ، قَالُوا: بَلٌ ، قَالَ: صَلَاحٌ ذَاتٌ  
البَيْنِ ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ.....وَيُرَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ  
قَالَ: هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أُفُولُ تَحْلِيقَ الشَّعْرِ ، وَلَكِنْ تَحْلِيقُ الدِّينِ

আমি কি তোমাদেরকে সিয়াম, সালাত ও সাদাকার চেয়েও অধিক ফজিলতপূর্ণ  
কর্ম সম্পর্কে অবহিত করব না? সাহাবিগণ বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি বললেন,  
পরস্পরের মধ্যে আপস-মীমাংসা করা। কেননা, পরস্পরে ঝগড়া বাধানোর কাজ  
হলো উৎপাটনকারী (অর্থাৎ দীন নিশ্চিহ্নকারী)। .....ইমাম তিরমিয়ি রাহিমাহুল্লাহ  
বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, তিনি  
বলেন, এটা (অর্থাৎ পরস্পরে ঝগড়া বাধানোর কাজ) নির্মূলকারী। আমি বলছি  
না যে, তা চুল-পশম উপড়ে ফেলে; বরং তা দীনকে উপড়ে ফেলে (অর্থাৎ  
বিনাশ করে দেয়)।[১]

পূর্বোল্লেখিত সুরা হুজুরাতের আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের পারস্পরিক  
ভাতৃত্ব ও সম্মান রক্ষার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন।  
আমরা নিম্নে বিষয়গুলো সবিস্তরে উল্লেখ করছি—

### ঠাট্টা-বিদ্রূপ গুনাহের কাজ

উল্লিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম বিষয় হলো ঠাট্টা-উপহাস। কোনো মুমিনকে  
নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করা কিংবা কাউকে ঠাট্টা-মশকরার বিষয় হিসেবে গ্রহণ সবই  
আবেদ্ধ। ঠাট্টা-বিদ্রূপের মধ্যে এক ধরনের প্রচলন অঙ্গকার ও গর্ব লুকিয়ে থাকে।  
তাছাড়া শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত মাপকাঠি সম্পর্কে অঙ্গতার ফলে ব্যক্তি অনেক সময়  
অন্যকে তাচ্ছিল্য করে থাকে। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قَوْمٌ مَّنْ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ  
عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ... ⑪

হে মুমিনগণ, (তোমাদের পুরুষদের) একদল যেন (পুরুষদের) অন্য  
দলকে উপহাস না করো। হতে পারে তারা উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম।

[১] জারিইত তিরমিয়ি: ২৫০৯; মুসলামু আহমাদ: ২৭৫০৮; হাদিসটি সহিহ।

আর নারীরাও যেন অন্য নারীদেরকে উপহাস না করে। হতে পারে তারা  
উপহাসকারিণীদের চেয়ে উত্তম।[১]

ঐশ্বী শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হলো—ইমান, ইখলাস ও আল্লাহ তাআলার সাথে সুসম্পর্ক।  
চেহারা, দৈহিক সৌন্দর্য, খ্যাতি ও সম্পদের এখানে কোনো মূল্য নেই। হাদিসে আবু  
হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

| নিচ্যই আল্লাহ তাআলা তোমাদের চেহারা-সূরত ও ধনসম্পদ দেখেন না; বরং  
তিনি দেখেন, তোমাদের অন্তর ও কর্ম।[২]

মুমিন পুরুষ হোক বা নারী, তার শারীরিক ভুটি বা দারিদ্র্যের জন্য কি তাকে তাচ্ছল্য  
করা যাবে? হাদিসে এসংক্রান্ত একজন সাহাবির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু  
মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে—

أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنَ الْأَرَاكِ، وَكَانَ دَقِيقَ السَّائِقَيْنِ، فَجَعَلَتِ الرِّيحُ تَكْفُؤُهُ،  
فَضَحِكَ الْقَوْمُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِمَّ تَضَحَّكُونَ؟ قَالُوا: يَا رَبِّيَ  
اللَّهُ، مِنْ دِقَّةِ سَاقِيهِ، فَقَالَ: وَالَّذِي تَقْسِي بَيْدِيهِ، لَهُمَا أَنْقُلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَحَدٍ

| তিনি (অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু) একবার আরাক গাছ  
থেকে মিসওয়াক সংগ্রহ করছিলেন। তিনি ছিলেন সরু পায়ের গোছাবিশিষ্ট। হঠাৎ  
দমকা বাতাসে তার পায়ের গোছা উন্মোচিত হয়ে গেল। লোকজন তা দেখে হেসে  
ফেলল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কী  
দেখে হাসছ? সাহাবিরা বললেন, হে আল্লাহর নবি, তার পায়ের গোছার শীর্ণতা  
দেখে। তখন তিনি বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! মিয়ানের পাল্লায়  
তার পায়ের গোছা দুটি উহুদ পাহাড়ের চেয়েও অধিক ওজনদার।[৩]

[১] সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১১

[২] সহিহ মুসলিম : ২৫৬৪; সুনান ইবনি মাজাহ : ৪১৪৩

[৩] মুসলামু আহমাদ : ৩৯৯১; সহিহ ইবনি হিবান : ৭০৬৯; হাদিসটি হাসান।

মুশরিকরা মুমিনদের নিয়ে, বিশেষ করে বিলাল রায়িয়াল্লাহু আনহু, আম্মাৱ রায়িয়াল্লাহু আনহুৰ মতো অসহায় সাহাবিদের নিয়ে প্রচুর ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। কুরআন বলছে, কিয়ামতের দিন পাশার দান উল্টে যাবে। সেদিন ঠাট্টাকারীরা পরিণত হবে ঠাট্টা ও উপহাসের বস্তুতে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الظَّالِمِينَ<sup>١٦</sup> وَإِذَا مَرُوا يَضْحَكُونَ<sup>١٧</sup> وَإِذَا  
أَنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكِيهِنَ<sup>١٨</sup> وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هُوَ لَغُلَامٌ<sup>١٩</sup> لَصَالُونَ<sup>٢٠</sup> وَمَا أُرْسِلُوا  
عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ<sup>٢١</sup> فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ<sup>٢٢</sup> عَلَى الْأَرَائِكِ<sup>٢٣</sup> يَنْظُرُونَ<sup>٢٤</sup>  
هُلْ ثُوبَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ<sup>٢٥</sup>

নিচ্যই যারা অপরাধ করেছে, তারা মুমিনদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত এবং যখন তারা তাদের (অর্থাৎ মুমিনদের) কাছ দিয়ে যেত তখন তারা চোখ টিপে বিদ্রুপ করত। আর যখন তারা নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসত তখন তারা (মুমিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে আসার কারণে) উৎফুল্ল হয়ে ফিরত। আর তারা যখন তাদেরকে (অর্থাৎ মুমিনদেরকে) দেখত তখন বলত, নিচ্য এরা পথভ্রষ্ট। অথচ তাদেরকে তো এদের (অর্থাৎ মুমিনদের) ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি (মুমিনদের কৃতকর্মের হিসাব মুমিনরাই দেবে)। অতএব আজ (কিয়ামতের দিন জামাত পেয়ে) মুমিনগণ কাফিরদেরকে নিয়ে উপহাস করবে। সুসজ্জিত আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে। কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হলো তো? [১]

ঠাট্টা-তামাশা-বিষয়ক নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি নারীদের জন্য সুত্ত্বভাবে আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে; যদিও তাদের বিষয়টি পুরুষের নিষেধাজ্ঞা থেকেই বোৰো যায়। তাদের জন্য আলাদাভাবে উল্লেখের কারণ হলো, ঠাট্টা ও তাচ্ছিল্যের বিষয়টি নারীদের একটি সূভাবিক রীতি ও নিত্যকার অভ্যাস।

### দোষারোপ করা ও খোঁচা দেওয়া

এই তালিকার দ্বিতীয় বিষয় হলো লাম্য (لمز). এটার শাব্দিক অর্থ হলো—খোঁচা দেওয়া ও আঘাত করা। এখানে আয়াতে শব্দটি দোষারোপ করার অর্থে এসেছে।

[১] সুরা মুতাফফিফিন, আয়াত : ২৯-৩৬

কাউকে দোষারোপ করার অর্থ, তাকে বর্ণা বা তরবারি দিয়ে খোঁচা দেওয়ার সমতুল্য। এটা পুরোপুরিই বাস্তব একটি বিষয়। বরং কখনো কখনো তো মৌখিক আক্রমণ বর্ণা-তরবারির খোঁচা থেকেও গভীর ও মারাত্মক। এক আরব কবি বলেন—

جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا إِلْتَئَامٌ ، وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ الْسِّنَانَ

বর্ণার আঘাতের ক্ষত একদিন শুকিয়ে যাবে। কিন্তু কথার আঘাতের যে ক্ষত, তা কখনোই মুছে যায় না।

পূর্বে উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা সরাসরি নিষেধাজ্ঞাবাচক শব্দ ব্যবহার করে বলেছেন—

وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ

‘আর তোমরা নিজেদেরকে (অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে) দোষারোপ কোরো না।’<sup>[১]</sup> বাক্যের শৈলীটি খেয়াল করুন—‘তোমরা নিজেদেরকে দোষারোপ কোরো না।’ আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সবাইকে এক দেহের মতো করে উল্লেখ করছেন, যেন তারা একে অন্যের সহযোগী ও পরিপূরক। একজন মুমিন ভাইকে দোষারোপ করা মানে নিজেকেই দোষারোপ করা। কেননা, তার ভাই তো এক দেহের মতো তারই অংশ।

### কাউকে মন্দ নামে ডাকা

লাময (لَمْ) বা নিষিদ্ধ খোঁচার একটি প্রকার হলো, মন্দ উপাধিতে ডাকা। ঠাট্টা-বিদ্রুপ বা খোঁচা দেওয়ার জন্য কাউকে নিন্দনীয় ও মন্দ নামে ডাকা হারাম। কষ্টদায়ক ও অপছন্দনীয় নামে কোনো ভাইকে ডাকা মানে, তার মনে আঘাত দেওয়া এবং ভাতৃত্বের ওপর কুঠারাঘাত করা। তাছাড়া এসব আচরণ তো উন্নত শিষ্টাচার ও উন্নত মেজাজ-রূচির সঙ্গে পুরোই সাংঘর্ষিক।

### কারো প্রতি কুধারণা করা

মুসলিম সমাজ থাকবে সংশয়-সন্দেহ এবং বাজে অনুমান ও কুধারণা থেকে পবিত্র।

[১] সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১১

মুমিনরা কখনো একে অন্যের ব্যাপারে কোনো কুধারণা পোষণ করবে না। তারা পরস্পর সম্পর্কে সৃচ্ছ ধ্যান-ধারণা নিয়ে সমাজে বিচরণ করবে, এটাই ইসলামের দাবি। এজন্য আয়তের চতুর্থ নিষিদ্ধ বিষয় হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে কুধারণা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبِوْا كَثِيرًا مِّنَ الظُّنُّونِ إِنَّ بَعْضَ الظُّنُّونِ إِثْمٌ...  
⑯

হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কোনো  
কোনো অনুমান পাপ [১]

কিছু অনুমানকে যে পাপ বলা হয়েছে, সেটা হলো বাজে অনুমান বা কুধারণা। তাই যথোপযুক্ত কারণ ও সুষ্টি প্রমাণ ছাড়া কোনো মুসলিম সম্পর্কে মন্দ ধারণা করা বৈধ নয়। মানুষ সন্তাগতভাবে দোষমুক্ত, তাই স্বাভাবিকভাবে একজন নির্দোষ মানুষকে সামান্য সন্দেহের বশে অভিযুক্ত করার কোনো সুযোগ নেই। হাদিসে আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম বলেছেন—

إِيَّاكُمْ وَالظُّنُّونُ ، فَإِنَّ الظُّنُّونَ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

তোমরা ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। কেননা, (সুস্পষ্ট কারণ ও প্রমাণ ছাড়া  
কারো ব্যাপারে খারাপ) ধারণা হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা [২]

মানবিক দুর্বলতাবশত অনেকের মনে নানা সময় নানা লোকের সম্পর্কে কুধারণা জন্ম নিতে পারে। বিশেষ করে যাদের সঙ্গে শত্রুতা ও সম্পর্ক খারাপ থাকে, তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন উন্নিট অনুমান মানুষের মনে দানা বাঁধে। কিন্তু মুমিনের কর্তব্য হলো, এসব সন্দেহ অন্তরে দানা বাঁধতে না দেওয়া এবং তার পেছনে না ছোটা। একটি হাদিসে হারিসা ইবনু নুমান রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,  
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১] সুরা হুদুরাত, আয়াত : ১২

[২] সহিল বুখারি : ৬০৬৪; সহিহ মুসলিম : ২৫৬৩

ثَلَاثٌ لَّازِمَاتْ لِأَمْتَنِي: الْطِّيَرَةُ، وَالْحَسَدُ، وَسُوءُ الظَّنِّ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يُذْهِبُهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّنْ هُوَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا حَسَدْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَإِذَا ظَنَّتْ فَلَا تُحَقِّقْ، وَإِذَا ثَطَّيْزَتْ فَامْضِ

তিনটি জিনিস আমার উন্মত্তের সহজাত বৈশিষ্ট্য। যথা : অশুভ লক্ষণ গ্রহণ, হিংসা ও মন্দ ধারণা। তখন এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসুল, কারো মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য থাকলে সেগুলো দূর করার উপায় কী? তিনি উত্তরে বললেন, যখন হিংসা করবে তখন (দেরি না করে দ্রুত) আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে। যখন (কারো ব্যাপারে মন্দ) ধারণা করবে তখন সেটাকে (দূর করে দেবে, নিজের অন্তরে তা) প্রতিষ্ঠিত করবে না। আর যখন কোনো কিছুকে অশুভ মনে করবে তখন (কাজ বন্ধ না করে) চালিয়ে যাবে।<sup>[১]</sup>

### অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানো

মানুষের প্রতি অবিশ্বাস ও অনাস্থার ফলে মনের মধ্যে কুধারণার রোগ সৃষ্টি হয়। আর এর প্রতিফলন ঘটে দোষ অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ইসলাম চায়, মুসলিম সমাজ ভেতর-বাহির উভয় দিক থেকে পরিচ্ছন্ন ও নিষ্কলুষ থাকুক। এজন্য কুধারণা থেকে বারণের সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের দোষ অনুসন্ধান করতেও নিষেধ করেছেন। সহিহাইনের হাদিসে আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِيَّاكُمْ وَالظَّنُّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحْسَسُوا، وَلَا تَجْسِسُوا

তোমরা ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। কেননা, (সুস্পষ্ট কারণ ও প্রমাণ ছাড়া কারো ব্যাপারে খারাপ) ধারণা হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা দোষ তালাশ কোরো না, গোয়েন্দাগিরি কোরো না।<sup>[২]</sup>

প্রতিটি মানুষের একান্ত জগৎ আছে, সেই একান্ত জগতে দখল দেওয়ার অধিকার কারো নেই। কারো পিছে লেগে এবং দোষ খুঁজতে গিয়ে তার একান্ত গোপনীয়তার

[১] আল-মুজামুল কাবির, তাবারনি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২২৮, হাদিস : ৩২২৭; আল-আহাদ ওয়াল-মাসানি, ইবনু আবি আসিম : ১৯৬২; হাদিসাটির সনদ যইফ।

[২] সহিহুল বুখারি : ৬০৬৪; সহিহ মুসলিম : ২৫৬৩

জায়গায় হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়। এমনকি একান্তে কেউ কোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হলেও, যতক্ষণ সে তা লুকিয়ে করবে, বাইরে প্রকাশ করবে না, ততক্ষণ সেখানে গোয়েন্দানির করার অনুমতি শরিয়ায় নেই।

উকবা ইবনু আমির রায়িয়াল্লাহু আনহুর লিপিকার দুখাইন রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

قُلْتُ لِعَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: إِنَّ لَنَا جِيرًا نَّيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، وَأَنَا دَاعُ الشُّرُطَ لِيَأْخُذُوهُمْ، فَقَالَ  
عَقْبَةُ: وَيَحْكَ ، لَا تَفْعَلْ ، وَلَكِنْ عِظَّهُمْ وَهَدْدَهُمْ ، قَالَ: إِنِّي نَهَيْتُهُمْ ، فَلَمْ يَنْتَهُوا ، وَإِنِّي  
دَاعُ الشُّرُطَ لِيَأْخُذُوهُمْ ، فَقَالَ عَقْبَةُ: وَيَحْكَ ، لَا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: مَنْ سَتَرَ عُورَةً مُؤْمِنٍ ، فَكَانَهَا أَسْتَخِنْتَيْ مَوْءُودَةً فِي قَبْرِهَا

قُلْتُ لِعَقْبَةَ: إِنَّ لَنَا جِيرًا نَّيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، وَأَنَا دَاعُ لَهُمُ الشُّرُطَ فَيَأْخُذُوهُمْ. فَقَالَ: لَا  
تَفْعَلْ ، وَلَكِنْ عِظَّهُمْ وَهَدْدَهُمْ. قَالَ: فَفَعَلَ فَلَمْ يَنْتَهُوا ، قَالَ: فَجَاءَهُ دُخْنِين. فَقَالَ:  
إِنِّي نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا ، وَأَنَا دَاعٌ لَهُمُ الشُّرُطَ ، فَقَالَ عَقْبَةُ: وَيَحْكَ لَا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي  
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَتَرَ عُورَةً مُؤْمِنٍ ، فَكَانَهَا أَسْتَخِنْتَيْ  
مَوْءُودَةً مِنْ قَبْرِهَا

আমি একবার উকবা রায়িয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, আমাদের কিছু প্রতিবেশী আছে, যারা মদ্যপান করে। আমি পুলিশ ডাকতে চাচ্ছি, যেন তারা এসব মদ্যপদের ধরে নিয়ে যায়। তখন তিনি বললেন, এমনটা কোরো না। তবে তাদের উপদেশ দাও এবং সতর্ক করো। তিনি (কিছুদিন পর এসে) বললেন, আমি তাদেরকে বারণ করেছি, কিন্তু তারা বিরত হয়নি। এখন আমি তাদের জন্য পুলিশ ডাকতে চাচ্ছি। উকবা রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমার জন্য আফসোস! এমনটা কোরো না। কেননা, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দোষ গোপন করল, সে যেন কবরে জীবন্ত দাফনকৃত একটি কন্যাসন্তানকে জীবিত করল [১]

[১] মুসলাদু আহমাদ : ১৭৩৯৫; সহিলু ইবনি হিবান : ৫১৭; হাদিসটি সহিহ।

হাদিসটির সনদে একটু ইয়তিরাব (বিশ্বল্লা) আছে। দুখাইন ও আবুল হাইসাম দুজন ব্যক্তি নাকি একজন, এটা নিয়ে দ্বিমত আছে। ইমাম ইবনু হিবান রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম ফাসাবি রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম দুলাবি রাহিমাহুল্লাহ-সহ প্রযুক্ত আবুল হাইসামকে দুখাইনের উপনাম বলেছেন। সে হিসেবে নাম দুটি একই ব্যক্তিকে

হাদিসে এসেছে, দোষ অঙ্গের মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য, যারা মুখে ঈমান আনার কথা বলেছে, কিন্তু অন্তরে ঈমান গ্রহণ করেনি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার সামনেই এদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। আবু বারযাহ আল-আসলামি রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

يَا مَعْشَرَ مَنْ أَمْنَى بِلِسْتَانِهِ، وَلَمْ يَذْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَبَعُو  
عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ أَتَبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَبَعُ اللَّهُ عَوْرَاتَهُ، وَمَنْ يَتَبَعُ اللَّهُ عَوْرَاتَهُ يَقْضِحُهُ فِي بَيْتِهِ

হে ওইসব লোক, যারা কেবল মুখেই ঈমান এনেছে কিন্তু ঈমান অন্তরে প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলিমদের গিবত (পরনিন্দা) কোরো না এবং তাদের দোষত্বটি

বোঝায়। ইমাম বুখারি রাহিমাল্লাহ তার আল-আদাবুল মুফরাদে, ইমাম আবু দাউদ তায়ালিসি রাহিমাল্লাহ তার মুসনাদে, ইমাম আবু দাউদ সিজিসতানি রাহিমাল্লাহ তার সুনানে, ইমাম নাসায়ি রাহিমাল্লাহ তার আস-সুনানুল কুবরাতে, ইমাম বাইহাকি রাহিমাল্লাহ তার সুনানে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবরাহিম ইবনু নাশিতের সূত্রে, তিনি কাব ইবনু আলকামা থেকে, তিনি আবুল হাইসাম থেকে, তিনি উকবা ইবনু আমির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে। ইমাম হাকিম রাহিমাল্লাহও এভাবে বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি আবুল হাইসামের নাম বলেছেন ‘কাসির’। হাদিসটিকে ইমাম হাকিম রাহিমাল্লাহ সহিহ বলেছেন এবং হাফিয় যাহাবি রাহিমাল্লাহও তাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু হাফিয় যাহাবি রাহিমাল্লাহ তার আল-মুগনি ও মিয়ানুল ইতিদালে আবুল হাইসামের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন, তাকে চেনা যায় না। এ বর্ণনাগুলোর বিপরীতে ইমাম আহমাদ রাহিমাল্লাহ তার মুসনাদে এবং ইমাম আবু দাউদ রাহিমাল্লাহ তার সুনানে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবরাহিম ইবনু নাশিতের সূত্রে, তিনি কাব ইবনু আলকামা থেকে, তিনি আবুল হাইসাম থেকে, তিনি দুখাইন থেকে, তিনি উকবা ইবনু আমির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে। হাফিয় মিয়ায়ি রাহিমাল্লাহ তার তাহফিলুল কামালে এ দুই ধরনের বর্ণনাই উল্লেখ করেছেন। কিছু বর্ণনায় এসেছে, আবুল হাইসাম বর্ণনা করেছেন দুখাইন থেকে, তিনি উকবা ইবনু আমির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে। আর কিছু বর্ণনায় এসেছে, আবুল হাইসাম বর্ণনা করেছেন সরাসরি উকবা ইবনু আমির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। এ সনদের সবাই সিকা বা নির্ভরযোগ্য, শুধু একজন মাজহুল (অঙ্গাত) রাবি রয়েছে। এ হাদিসটির পক্ষে দুটি শাহিদ (ভিন্ন সাহাবি থেকে বর্ণিত সমার্থক) হাদিস রয়েছে। একটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তাবারানি রাহিমাল্লাহ তার আল-মুজামুল আওসাতে মাসলামা ইবনু মুখাল্লাদ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে। এ হাদিসটির সনদের সবাই সিকা বা নির্ভরযোগ্য, শুধু ইসা ইবনু সিনান নামক একজন রাবি আছে, যার ব্যাপারে হাফিয় ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাল্লাহ বলেছেন, সে লাইয়িন (লিন) বা সামান্য শিখিল। আরেকটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিয়া আল-মাকদিসি রাহিমাল্লাহ তার আল-আহাদিসুল মুখতারাহ প্রশ্নে শিহাৰ রাহিমাল্লাহ সূত্রে মিসরে অবস্থানকারী এক সাহাবি থেকে। ইমাম তাবারানি রাহিমাল্লাহও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

শাহিদ শুয়াইব আরনাউত রাহিমাল্লাহ এ হাদিসটির ওপর উপরিউক্ত দীর্ঘ আলোচনা করে শেষে বলেন, এ সমর্থক দুটি হাদিস দ্বারা ইবনু হিবানের বর্ণিত এ হাদিসটি শক্তিশালী হয়ে সহিহ হয়ে যায়। [তাখরিজু সহিহি ইবনি হিবান, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭৫]

তালাশ কোরো না। কারণ, যে ব্যক্তি তাদের দোষগুটি খুঁজে বেড়ায় আল্লাহ তাআলাও তাদের দোষগুটি তালাশ করেন। আর সুযং আল্লাহ তাআলা যার দোষগুটি তালাশ করেন, তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপদস্থ করে ছাড়েন।<sup>[১]</sup>

মানুষের গোপনীয়তা রক্ষার্থে কারো বাড়িতে অনুমতি ছাড়া উঁকিবুঁকি দেওয়া হারাম। কারো ঘরে উঁকি দিলে ঘরের বাসিন্দারা তাকে কঠিন শাস্তি দিতে পারবে, এতে তাদের কোনো অপরাধ হবে না। আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ اطْلَعَ فِي بَيْتٍ قَوْمٍ بَغْيَرِ إِذْنِهِمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ

যে ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে উঁকি দেয়, তার চোখ উপড়ে ফেলা তাদের (ঘরওয়ালাদের) জন্য জায়িয়।<sup>[২]</sup>

উঁকিবুঁকি দেওয়া যেমন নিষেধ, তেমনই অজ্ঞাতসারে ও সন্তুষ্টি ছাড়া কারো কথা শোনাও হারাম। ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، أَوْ يَفْرُوْنَ مِنْهُ ، صُبَّ فِي أَذْنِهِ الْأَنْكَبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি লোকদের কথার দিকে কান পেতে রইল; অথচ তারা তাকে (তাদের কথা শোনানোটা) পছন্দ করে না কিংবা তার থেকে তারা দূরে সরে যেতে চায়, কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে।<sup>[৩]</sup>

কারো বাড়িতে গেলে প্রথমেই ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাওয়া বাধ্যতামূলক। অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে প্রবেশই করা যাবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সঙ্গে করে বলেন—

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৮০; মুসনাদু আহমাদ : ১৯৭৭৬; হাদিসটি সহিহ।

[২] সহিলুল বুখারি : ৬৮৮৮; সহিহ মুসলিম : ২১৫৮

[৩] সহিলুল বুখারি : ৭০৪২; সুনানু আবি দাউদ : ৫০২৪

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا يُومًا عَيْرَ بُيوْتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْسِنُوا وَتُشَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٧﴾ إِنَّ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ سُوَانٍ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوهُ أَرْجَنِي لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٨﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজদের গৃহ ছাড়া অন্য কারো গৃহে প্রবেশ কোরো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নেবে এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দেবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ প্রহণ করো। অতঃপর যদি তোমরা সেখানে কাউকে না পাও তাহলে তোমাদেরকে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানে প্রবেশ কোরো না। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ‘ফিরে যাও’ তাহলে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত।<sup>[১]</sup>

হাদিসে আবু যর রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ كَشَفَ سِرًّا فَأَدْخَلَ بَصَرَةً فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَرَأَىٰ عَوْرَةَ أَهْلِهِ فَقَدْ أَتَىٰ حَدًّا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ

যে ব্যক্তি অনুমতি পাওয়ার আগেই পর্দা তুলে কারো ঘরের ভেতরে তাকাল, অতঃপর ঘরের অধিবাসীদের গোপন কোনো বিষয় দেখে ফেলল, তাহলে সে এমন শাস্তিযোগ্য কাজ করল, যা করা তার জন্য বৈধ নয়।<sup>[২]</sup>

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে অনুসন্ধান চালানোর অবৈধতা ও দোষ খৌজা-সংশ্লিষ্ট নিষেধাজ্ঞা শাসক-প্রজা সবার জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। মুআবিয়া রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

إِنَّكَ إِنِّي أَتَبْغِثُ عَوْرَاتَ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كَذَّتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ

[১] সুরা নুর, আয়াত : ২৭-২৮

[২] জামিউত তিরমিয়ি : ২৭০৭; মুসলাদু আহমাদ : ২১৫৭২; হাদিসটি হাসান।

তুমি যদি মানুষের গোপন দোষগুটি তালাশ করে বেড়াও তাহলে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বা ক্ষতির দ্বারপ্রাপ্তে পৌঁছে দেবে।[১]

আবু উমামা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّبَيْةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ

শাসক যখন জনগণের ব্যাপারে সন্দেহ-অবিশ্বাসের অনুসন্ধান শুরু করবে তখন সে তাদেরকে ধূংস করে ফেলবে।[২]

গিবত একটি জঘন্য অপরাধ

কুরআনে নিযিন্দ ষষ্ঠি বিষয় হচ্ছে গিবত বা পরনিন্দা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا...  
⑯

এবং তোমাদের কেউ যেন অপরজনের গিবত (পরনিন্দা) না করে।[৩]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরনিন্দার বিষয়টি সাহাবিদেরকে প্রশ্ন-উত্তরের আলোকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন (সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন—

أَنَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكُ أَخَاكَ بِمَا يَكْرُهُ، قِيلَ أَفْرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَيْتَ

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৮৮; সহিহ ইবনি হিবান : ৫৭৬০; হাদিসটি সহিহ।

[২] সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৮৯; মুসনাদু আহমাদ : ২৩৮১৫; হাদিসটি হাসান।

[৩]সুরা ইন্দুরাত, আয়াত : ১২

তোমরা কি জানো, গিবত কী জিনিস? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, (গিবত হলো) তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বাস্তবেই থাকে তাহলে আপনি (এ ব্যাপারে) কী বলেন? তিনি বললেন, তুমি তার সম্পর্কে যা বলছ তা যদি তার মধ্যে বাস্তবেই থাকে, তাহলেই তো তুমি তার গিবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তো তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে।<sup>[১]</sup>

দৈহিক আকৃতি, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বংশ ও ব্যক্তিগত সবকিছুর সমালোচনাই মানুষের অপছন্দনীয় বিষয়ের আওতাভুক্ত। আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

قُلْتُ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَسْبُكَ مِنْ صَفَيَّةَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ عَيْنِيْرُ مُسْدَدٍ: تَعْنِي  
قَصِيرَةً ، فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُرِجِحَتْ بِهَا الْبَحْرِ لَمَرْجَحَتْهُ» قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ  
إِنْسَانًا ، فَقَالَ: «مَا أَحِبُّ أَنِي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا

আমি একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, সাফিয়ার ব্যাপারে আপনার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে এরূপ এরূপ। অর্থাৎ তিনি খাটো। এটা শুনে তিনি বললেন, তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যা সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া হলেও তা সমুদ্রের পানি দূষিত করে ফেলবে। আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এক ব্যক্তির অঙ্গাভঙ্গি নকল করলাম। তখন তিনি বললেন, আমাকে এত এত সম্পদ দেওয়া হলেও আমি কোনো মানুষের অঙ্গাভঙ্গি নকল করা পছন্দ করি না।<sup>[২]</sup>

পরচর্চা বা পরনিন্দার মানে অন্যের ধর্মস কামনা। কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্মান, ইজ্জত ও সন্তায় এর মাধ্যমে আঘাত হানা হয়। এটি একই সঙ্গে নিচু ও দুর্বল মানসিকতার প্রমাণ বহন করে। এটি একটি নেতিবাচক অভ্যাস ও ধর্মসাত্ত্বক উপকরণ। পরনিন্দায় পেছন থেকে লোকদের নিন্দা করা হয় এবং এসব নিন্দাবাদ করা থেকে খুব কম লোকই বেঁচে থাকতে পারে।

[১] সহিত মুসলিম : ২৫৮৯; সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৭৪

[২] আমিউত তিরমিয়ি : ২৫০২; মুসনাদু আহমাদ : ২৫৫৬০

এজন্য কুরআনে গিবত বা পরনিন্দা উপস্থাপিত হয়েছে অত্যন্ত কৃৎসিত চিত্রে, এই বর্ণনা শোনার পরে সবার মনেই পরনিন্দার প্রতি ঘৃণা চলে আসার কথা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿لَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرْهُتُمُوهُ...﴾

তোমাদের কেউ যেন অপরজনের গিবত (পরনিন্দা) না করে। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই করে থাকো।<sup>[১]</sup>

মানুষের মাংস খেতেই তো যেমন লাগে, সেখানে মানুষ নিজের আপন ভাইয়ের মাংস কী করে খাবে, তাও আবার মৃত!

যখনই সুযোগ এসেছে, তখনই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই চিত্রটি মানুষের মাথায় আরো গভীর ও স্পষ্টভাবে গেঁথে দিয়েছেন। ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আন্নাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَوَقَعَ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَخَلَّلَ» ، قَالَ: مِمَّا أَنْتَ خَلَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ مَا أَكْلَتُ لَحْمًا ، قَالَ: «بَلَى؛ مِنْ لَحْمِ أَخِيكَ أَكْلَتُ

আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসে ছিলাম। একটু পর একজন লোক মজলিস থেকে উঠে চলে গেল। উঠে যাওয়ার পর তাকে নিয়ে নিন্দা শুরু করল আরেকজন। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিন্দুককে বললেন, দাঁত খিলাল করো। সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, কী খিলাল করব? আমি তো মাংস খাইনি! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অবশ্যই খেয়েছ। (গিবত বা পরনিন্দা করে) তুমি তো তোমার ভাইয়ের মাংস খেয়েছ।<sup>[২]</sup>

[১] সুরা হুদুরাত, আয়াত : ১২

[২] মুসনাদু ইননি আবি শাইবা : ৩১১; আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১০২, হাদিস : ১০০৯২; হাদিসটি সহিহ।

জাবির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَتَنَا رِيحُ حِيقَةٍ مُنْتَبِتَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ هَذِهِ رِيحُ الظِّيَّانِ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ

আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। হঠাৎ করেই পচা লাশের দুর্ঘট্য বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কি জানো এটা কীসের দুর্ঘট্য? এটা হলো ওইসব (মুনাফিক) লোকদের দুর্ঘট্য, যারা মুমিনদের পরনিষ্ঠা করে।<sup>[১]</sup>

**কোন কোন ক্ষেত্রে শিবত করা জায়িয়/বৈধ?**

এতক্ষণ আলোচিত কুরআন ও হাদিসের বক্তব্য থেকে আমরা ইসলামে ব্যক্তি ও তার গোপনীয়তা রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারলাম। অবশ্য আলিমগণ কিছু কিছু স্থানে মানুষের দোষগুটি বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন। তবে এসব অনুমোদিত ক্ষেত্রেও দোষগুটি বর্ণনায় সীমালঙ্ঘন করার কোনো সুযোগ নেই। শিবতের জন্য শরিয়ত-অনুমোদিত ক্ষেত্রগুলো হলো—

[এক] মাজলুম ও অত্যাচারের শিকার ব্যক্তি : নিপীড়িত ব্যক্তি তার ওপর চলা নির্যাতন ও তার অধিকার বঙ্গনার বিষয়ে কথা বলতে পারবে। তার জন্য জুলুমের বিবরণ দেওয়ার অনুমতি আছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهَرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقُوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيْمًا (১)

মন্দ কথার প্রকাশ আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে কেউ নিপীড়িত হলে ভিন্ন কথা। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।<sup>[২]</sup>

[দুই] বিবাহ, লেনদেন ও বিভিন্ন প্রয়োজনে তথ্য অনুসন্ধানকারী : কেউ যদি কারো সঙ্গে যৌথ-ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য বা কারো কাছে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য বা কাউকে কোনো দায়িত্বে বসানোর জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে কারো নিকটে

[১] মুসনাদু আহমাদ : ১৪৭৮৪; আল-আদবুল মুফরাদ : ৭৩২; হাদিসটি হাসান।

[২] সুরা নিসা, আয়াত : ১৪৮

জানতে চায়, তাহলে এক্ষেত্রে একজন মুমিনের করণীয় কী? একদিকে নসিহতের মধ্যে সত্য বলা প্রয়োজন, অন্যদিকে আরেকজনের পিঠও বাঁচানো দরকার; এক্ষেত্রে একজন মুমিনের কর্মপন্থা কী? উভর হলো—এখানে এ দুটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম কর্তব্যটিই প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ যথাযথভাবে তার দোষত্রুটি বর্ণনা করে দিতে হবে। কারণ, মানুষকে ধোঁকা ও বিপদে পতিত হওয়া থেকে বাঁচানোর প্রয়োজনে দোষত্রুটি বর্ণনা করে দেওয়াটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং একজন মুমিনের কল্যাণ কামনায় তার জন্য এটা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে হাদিস থেকে দলিল পাওয়া যায়।

ফাতিমা বিনতু কাইস রায়িয়াল্লাহু আনহা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে ইদত পালন শেষ করার পরের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন—

قَلِّمَا حَلَّتْ ذَكَرْتُ لَهُ أَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سَفِيَّانَ ، وَأَبَا جَهْنِ خَطَّبَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَمَا أَبُو جَهْنِ ، فَلَا يَصْنَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَا مُعَاوِيَةَ قَصْغُلُوكْ لَا مَالَ لَهُ ، إِنْ كَحِيَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «إِنْ كَحِيَ أَسَامَةً» ، فَنَكَحْتُهُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا ، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ

অতঃপর যখন আমি ইদত পালন শেষ করলাম তখন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানলাম যে, মুআবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান রায়িয়াল্লাহু আনহু ও আবু জাহম রায়িয়াল্লাহু আনহু আমাকে বিবাহের পায়গাম পাঠিয়েছেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু জাহম এমন লোক, যে তার কাঁধ থেকে লাঠি নামিয়ে রাখে না (অর্থাৎ অধীনস্ত লোকদের প্রহার করে)। আর মুআবিয়া তো নিঃসৃ আর গরিব একজন মানুষ। তুমি উসামা ইবনু যাইদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও। কিন্তু আমি তাকে পছন্দ করলাম না। পরে তিনি আবার বললেন, তুমি উসামাকে বিয়ে করো। অতঃপর আমি তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। আল্লাহ তাআলা এতে কল্যাণ দান করলেন এবং এটার কারণে আমি ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হলাম।<sup>[১]</sup>

[তিনি] গর্হিত কাজ ও মন্দ বিষয় প্রতিহতকারী : সুতরাং কোনো পাপাচারীর ব্যাপারে ফতোয়া জানার জন্য কিংবা কারো কোনো গর্হিত কাজে বাধাদানে সহায়তা

[১] সহিহ মুসলিম : ১৪৮০; সুনান আবি দাউদ : ২২৮৪

চাওয়ার জন্য তার গিবত করা বৈধ। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে ব্যক্তির দোষত্রুটি বর্ণনা করা যাবে।

[চার] পরিচিতির প্রয়োজনে নিন্দাজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহারকারী : সুতরাং কেউ যদি এমন নাম, উপাধি বা উপনামে প্রসিদ্ধ হয়, যা তার অপছন্দনীয় হলেও সেটি ছাড়া তার আর কোনো প্রসিদ্ধ ভালো নাম নেই, তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে সেই নিন্দাজ্ঞাপক নামে উল্লেখ করতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন : আরাজ (ল্যাংড়া), আমাশ (অর্থ), ইবনু ফুলানাহ (অমুক মহিলার ছেলে) ইত্যাদি।[১]

[পাঁচ] সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দ যাচাইকারী : সুতরাং মামলা-মোকাদ্দমায় সাক্ষীদের সত্যতা যাচাই করার জন্য তাদের নেতৃত্ব অবস্থার তথ্য তালাশ করা, অনুরূপ হাদিস ও ইতিহাস বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা যাচাইয়ের জন্য তাদের ব্যক্তিজীবনের অবস্থা ও তাদের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করায় কোনো সমস্যা নেই। এক্ষেত্রে তাদের বাস্তবিকই কোনো দোষত্রুটি থাকলে যথাযথভাবে তা বর্ণনা করা যাবে।

তবে গিবত করার এসব ব্যক্তিক্রমী অবস্থাগুলোর বৈধতার জন্য ভালোভাবে দৃটি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে—

ক. প্রয়োজন। সুতরাং যেখানে গিবত বা পরনিন্দা করার প্রয়োজন নেই, আরেকজনের দোষ বর্ণনা করার আবশ্যকীয়তা নেই, সেখানে কারো জন্য এই নিষিদ্ধ সীমায় অবেশের কোনো সুযোগ নেই। অতএব কোথাও যদি ইশারা-ইঙ্গিতের দ্বারাই প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়, তাহলে সেখানে স্পষ্টভাবে বলা যাবে না। যেখানে অনিদিক্টভাবে বললেই কাজ হয়ে যায়, সেখানে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখের

[১] ‘আরাজ’ হলো বিখ্যাত তাবিয়ি আন্দুর রহমান ইবনু হুরমুয় রাহিমাহুল্লাহর উপনাম। তিনি ছিলেন আবু হুরারুরা রহিমাহুল্লাহু আনন্দুর বিখ্যাত শাগরিদ। ইতিহাসে তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধ। সহিহ বুখারি ও সহিহ বুসলিম-সহ অনেক হাদিসগুলোতে তাকে শুধু ‘আরাজ’ নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। ‘আমাশ’ হলো ইরাকের বিখ্যাত হাদিস-বিশারদ সুলাইমান ইবনু মিহরান রাহিমাহুল্লাহর উপাধি। ‘ইবনু ফুলানাহ’ অর্থ অমুক মহিলার তথ্য মায়ের বেটা। ইসলামে সবাই সাধারণত পুরুষ তথ্য বাবার পরিচয়ে পরিচিত হয়। কিন্তু কখনো কখনো তাচিল্লা করে বাপের বেটা না বলে মায়ের বেটা বলা হয়ে থাকে। সাধারিক অবস্থায় এটা বলে কাউকে দ্বিগুণ ও অপদ্রষ্ট করা যাবে না। তবে যদি এটা কারো নাম হয়ে যায় এবং এছাড়া তার অন্য কোনো নাম না থাকে তাহলে প্রয়োজনের খাতিরে তাকে এ নামে সঙ্গোধন করা যাবে। ইতিহাসে আমরা এমন নামে প্রসিদ্ধ কোনো ব্যক্তি দ্বারে পাইনি।

অনুমতি নেই। যেমন : ফতোয়া-জিজ্ঞেসকারী যদি নাম উল্লেখ না করে এভাবে প্রশ্ন করতে পারে, ‘যে ব্যক্তি এমন কাজ করে, তার ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী?’ তাহলে এক্ষেত্রে ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক এভাবে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা বৈধ হবে না, ‘আপনি অমুকের পুত্র অমুকের ব্যাপারে কী বলেন?’ সুতরাং এসব দোষ যদি ব্যক্তির মধ্যে বাস্তবেই থাকে, তাহলেই কেবল ফতোয়া জানার প্রয়োজনে সেটা বৈধ হবে, অন্যথায় তো তা ব্যক্তির নামে অপবাদ হয়ে যাবে।

৪. নিয়ত। এসবকিছুর পেছনে নিয়ত সবচেয়ে বড় বিষয়। কোন কাজ কোন উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হচ্ছে, তা অন্য লোকদের চেয়ে সম্পাদনকারীই ভালো জানে। নিয়তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, কে জুলুম থেকে মুক্তির জন্য ব্যক্তির দোষত্বটি বলছে, আর কে স্বেক্ষ আনন্দ লাভের জন্য বলছে; কে ফতোয়ার জন্য জিজ্ঞেস করছে, আর কে বিদ্রুপের জন্য জানতে চাচ্ছে; কে কল্যাণের নিয়তে দোষীর নাম বলছে, আর কে শুধু নিন্দা প্রচারের জন্য কারো দোষত্বটি বলে বেড়াচ্ছে। এসব ব্যাপারে একজন মুমিনকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কেননা, বলা হয়ে থাকে—নিজের কর্মের হিসাবের ক্ষেত্রে একজন মুমিন জালিম শাসক কিংবা কৃপণ অংশীদারের চেয়েও অধিক কঠোর হয়ে থাকে।

পরনিন্দা শ্রবণকারী ব্যক্তি নিন্দুকের মতোই গুনাহের ভাগীদার হবে। তাই কারো নিন্দা করা হলে শ্রোতার কর্তব্য হলো, নিন্দাকৃত ব্যক্তির পক্ষে কথা বলা এবং নিন্দুকের কথার প্রতিবাদ জানানো। হাদিসে আসমা বিনতে ইয়াফিদ রায়িয়াল্লাহু আনহ্য থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْغَيْبَةِ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعَذِّبَهُ مِنَ النَّارِ

যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষার্থে পরনিন্দায় বাধা দেয়, আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়, তাকে জাহানাম থেকে মুক্তি দেওয়া।<sup>[১]</sup>

আবু দারদা রায়িয়াল্লাহু আনহ্য থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১] মুসলাম আহমদ : ২৭৬০৯; মুসলাম আবি দাউদ তায়ালিসি : ১৭৩৭; হাদিসটির সনদ যইফ।



مَنْ رَدَ عَنِ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার ভাইয়ের সম্মানের ওপর আসা আকৃমণ প্রতিহত করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার চেহারা থেকে (জাহানামের) আগুন দূরে রাখবেন।[১]

কিন্তু নিম্নুককে বাধা দেওয়ার মতো ক্ষমতা ও সাহস না থাকলে এবং তার মুসলিম ভাইয়ের পক্ষে কথা বলার সৎসাহস না হলে, তার সর্বনিম্ন দায়িত্ব হলো—নিন্দার মজলিস ছেড়ে যাওয়া এবং অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা শুরুর আগ পর্যন্ত তাদের উপেক্ষা করা। অন্যথায় সেও তাদের মতো গুনাহগার হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা, কোনো মজলিসে অন্যায় আলোচনা দেখলে হয় তাতে বাধা দিতে হবে, নয় সেখান থেকে উঠে আসতে হবে। বাধা না দিয়ে সেখানে থাকলে সেও অন্যদের মতো গুনাহগার হবে। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَدْ نَزَّلْ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنِ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكَفِّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا  
مَعْهُمْ حَتَّىٰ يَخْوُضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ...  
১৬

আর তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি (এ আদেশ) নায়িল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনতে পাবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না; যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হবে। অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে।[২]

### চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না

পরনিন্দার মতো আরেকটি বিষয় হলো চুগলি বা কুৎসা রটনা। এটি ইসলামে হারাম। চুগলি হচ্ছে একজন একটি কথা বলেছে, সেই কথাটি অন্যজনের কাছে সেভাবেই বা আরেকটু রংচং লাগিয়ে এমনভাবে ছড়ানো, যাতে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় কিংবা আগে থেকেই সম্পর্কে ক্লেদ থাকলে সেটা আরো বেড়ে যায়।

[১] জামিউত তিরমিয়ি : ১৯৩১; মুসনাদু আহমাদ : ২৭৫৪৩; হাদিসটি হাসান।

[২] সুরা নিসা, আয়াত : ১৪০

কুরআনে এই ধরনের নিষ্পন্নীয় ও জ্যন্ত অভ্যাসের প্রতি নিষ্পা জানানো হয়েছে  
মাকি জীবনের প্রথম দিকেই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلْفٍ مَّهِينٍ ⑪ هَمَّا زِ مَشَاءِ بِنَيِّمٍ

আর আপনি আনুগত্য করবেন না প্রত্যেক এমন ব্যক্তির, যে অধিক  
শপথকারী, লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিষ্পাকারী ও চোগলখোর [১]

হুয়াইফা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَنَاثٌ

| চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। [২]

আব্দুর রহমান ইবনু গানম রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

خَيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا، ذُكِرَ اللَّهُ، وَشَرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ،  
الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَجْمَعَةِ، الْبَاغُونَ الْبُرَاءُ الْعَنْتَ

আল্লাহ সবচেয়ে উত্তম বান্দা হলো তারা, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ  
হয়। আর আল্লাহর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বান্দা হলো চোগলখোর, প্রিয়জনদের মাঝে  
ফাটল সৃষ্টিকারী ও নির্দোষ ব্যক্তিদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী। [৩]

দুই দলের মধ্যে মীমাংসার সময় প্রয়োজনে একদল অপরদল সম্পর্কে যে মন্দ কথা  
বলেছে, সেগুলো লুকিয়ে রাখার সুযোগ আছে। এমনকি প্রয়োজনে নিজের পক্ষ  
থেকে কিছু ভালো কথা যুক্ত করার অনুমতিও রয়েছে। [৪]

[১] সুরা কলাম, আয়াত : ১০-১১

[২] সহিল বুখারি : ৬০৫৬; সহিহ মুসলিম : ১০৫

[৩] মুসনাদু আহমাদ : ১৭৯১৮; মারিফতুস সাহাবা, আবু নুআইম : ৪৭০০; হাদিসটি হাসান।

[৪] ফাতহুল বারি, ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৯৯-৩০০

হাদিসে উম্মু কুলসুম বিনতে উকবা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন—

لَيْسَ الْكَذَابُ الَّذِي يُصْلِحُ تَيْنَ النَّاسِ ، فَيَئْمِي حَيْرًا ، أَوْ يَقُولُ حَيْرًا

| সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মাঝে মীমাংসা করতে গিয়ে ভালো কথা পৌছায় অথবা ভালো কথা বলে।<sup>[১]</sup>

যারা কারো ব্যাপারে কোনো মন্দ কথা বা কোনো দোষত্বটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে কারো নৈকট্য অর্জন কিংবা কারো ক্ষতির উদ্দেশ্যে তার প্রচার-প্রসার শুরু করে দেয়, ইসলামের এরা অত্যন্ত ঘৃণ্য প্রাণী।

তারা যতটুকু শোনে, সাধারণত ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তারা সেখানে নানারকম ‘মশলা’ যুক্ত করে কিংবা ইচ্ছেমতো বানিয়ে বানিয়ে বলে।

কবি বলেন—

ভালো কথা শুনলে তারা গোপন করে রাখে।

মন্দ কিছু শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে।

মনের মতো কোনো কিছু শুনতে নাহি পেলে

নিজে থেকে রং মিশিয়ে বানিয়ে যে ফেলে।

একবার এক লোক উমার ইবনু আব্দুল আয়িয়ের কাছে কারো ব্যাপারে নিন্দা করল। তখন উমার বললেন, তুমি চাইলে আমরা এ বিষয়টি যাচাই করে দেখতে পারি। তুমি যদি মিথ্যা বলে থাকো, তাহলে তুমি এ আয়াতটির অন্তর্ভুক্ত—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَادِمِينَ ⑥

[১] সহিল বুখারি : ২৬৯২; সহিহ মুসলিম : ২৬০৫

হে মুমিনগণ, যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে  
আসে, তাহলে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে [১]

আর যদি তুমি সত্যবাদী হও, তাহলে তুমি এ আয়াতটির অন্তর্ভুক্ত—

هَمَّازٌ مَّشَاعِبَنِيمِمْ ⑪

পশ্চাতে নিন্দাকারী ও চোগলখোর [২]

তবে তুমি যদি চাও, তাহলে আমরা তোমাকে ক্ষমাও করে দিতে পারি। তখন সে  
বলে উঠল, আমিরূল মুমিনিন, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি আর কখনো এমনটা  
করব না। [৩]

### মান-সম্মান হিফাযত করা

মানুষের মান-সম্মান ও ইজ্জত-আবু রক্ষায় ইসলামি দীক্ষার গুরুত্ব আমরা দেখেছি।  
মানুষের মর্যাদা এখানে অলঙ্ঘনীয় পবিত্রতার মতো। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার একবার  
কাবার দিকে তাকিয়ে বললেন—

مَا أَعْظَمُكُمْ وَأَغْظَمُ حُرْمَتِكُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ أَغْظَمُ حُرْمَةً مِنْكُمْ

তুমি কত মহান, কত সম্মানিত, কিন্তু একজন মুমিন তোমার চেয়েও বেশি  
সম্মানিত! [৪]

একজন মুমিনের সম্মানের প্রতিফলন ঘটে তার মর্যাদা ও জানমালের নিরাপত্তার  
মধ্য দিয়ে।

[১] সুরা হুজুরাত, আয়াত : ৬

[২] না কলম, আয়াত ১১

[৩] যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর, খণ্ড : ৩৯; পৃষ্ঠা : ২

[৪] জামিউত তিরমিয়ি : ২০৩২

আবু বাকরা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজের ভাষণে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার সামনেই বলেছেন—

فَإِنْ دِمَاءُكُمْ . وَأَمْوَالُكُمْ . وَأَغْرِاضُكُمْ . تَبَيَّنَكُمْ حَرَامٌ . كَحْرَمَةٌ يَوْمَكُمْ هَذَا . فِي شَهْرِكُمْ  
هَذَا . فِي بَلْدِكُمْ هَذَا

| নিচ্যই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও ইজ্জত-আবু তোমাদের পরস্পরের জন্য তেমনই মর্যাদাপূর্ণ, যেমন তোমাদের এ দিন, তোমাদের এ শহর এবং তোমাদের এ মাস মর্যাদাপূর্ণ।[১]

কারো পেছনে তার মধ্যে থাকা দোষ নিয়ে আলোচনাও ইসলাম যেখানে মানহানিকর ও গুনাহের কাজ বলে সাব্যস্ত করেছে, সেখানে কারো ওপর মিথ্যা দোষারোপের গুনাহ কী পরিমাণ হবে? নিঃসন্দেহে এটা তো কবিরা গুনাহ ও জঘন্য অপরাধ। হাদিসে আবু দারদা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ ذَكَرَ امْرًا بِمَا لَيْسَ فِيهِ لِيَعْبِيَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ حَبْسَةً اللَّهُ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِنَقَادِ  
مَا قَالَ فِيهِ

| যে ব্যক্তি চরিত্রে কালিমা লেপনের উদ্দেশ্যে কোনো লোকের এমন দোষের কথা বলে সমালোচনা করে, যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাকে জাহানামের আগুনে ততদিন পর্যন্ত আটকে রাখবেন; যতদিন না সে তার দেওয়া অপবাদের সত্যতা প্রমাণ করবে।[২]

সাইদ ইবনু যাইদ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنْ مِنْ أَزْئَى الرِّبَا إِلَاسْتِطَالَةِ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقِّ

[১] সহিলুল বুখারি : ৬৭; সহিহ মুসলিম : ১৬৭৯

[২] আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৮৯৩৬; সরিহুস সুন্নাহ, তাবারি : ৩৮; হাদিসটির সনদকে ইমাম মুনিয়ির রাহিমাহুল্লাহ জাইয়িদ (ভালো ও উত্তম) বলেছেন। কিন্তু শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ এটার সনদকে যদিক (দুর্বল) বলে অভিহিত করেছেন।

অন্যায়ভাবে কোনো মুসলিমের মান-সম্মানে আঘাত করা সবচেয়ে মারাত্মক ও  
জগ্ন্য সুদসমূহের অন্যতম (অর্থাৎ ভয়ংকর রকমের মহাপাপ) [১]

তারপর তিনি পাঠ করেন—

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ اخْتَمَلُوا بِهُنَّا نَّا وَإِنَّمَا مُبِينًا ⑤٨

আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় তাদের কোনো  
অন্যায়-অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট  
পাপের বোৰা বহন করে।[২]

মানুষের মর্যাদাহানির সবচেয়ে কঠিন ও জগ্ন্য স্তর হলো সচরিত্রা মুমিন নারীদের  
ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ। এতে এসব নারী, তাদের পরিবার এবং তাদের  
স্বার ভবিষ্যৎ তীব্র ঝুঁকির মুখে পড়ে। তাছাড়া মুসলিম সমাজে পাপ ছড়িয়ে পড়ার  
আশঙ্কা তো আছেই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে ঈমান বিধবংসী  
কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কুরআনে এদের জন্য ভয়ানক  
শাস্তির হুমকি এসেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لِعِنْوَانِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُنْ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ ⑮ بِيَوْمٍ تَشَهَّدُ عَلَيْهِمْ أَسْتِئْنَهُمْ وَأَنْدِيْهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑯ يَوْمَئِذٍ  
يُوَقِّيْهُمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ⑰

যারা সচরিত্রা সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা  
দুনিয়া ও আধিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। যেদিন  
তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্মের  
ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। সেদিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের ন্যায় প্রতিফল

[১] দুনানু আবি দাউদ : ৪৮৭৬; মুসলানু আহমাদ : ১৬৫১; হাদিসতি সহিহ।

[২] সুরা আহমাদ, আয়াত : ৫৮

(অর্থাৎ সমুচিত শাস্তি) পুরোপুরি দিয়ে দেবেন এবং তারা জানতে পারবে,  
আল্লাহই সত্য ও সুস্পষ্ট [১]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ يُجْبِيْنَ أَنْ تَشْيَعَ الْفَاحِشَةُ فِي الْدِّيْنِ أَمْنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

নিশ্চয়ই যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচার-প্রসার কামনা করে, তাদের  
জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন  
তোমরা জানো না [২]

### মানবহত্যা মারাত্মক গুনাহ

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিটি মানবপ্রাণই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি প্রাণের মর্যাদা ও  
মাহাত্ম্য রক্ষার জন্য ইসলাম প্রতিশ্রুতিবন্ধ। তাই কাউকে থাণে মেরে ফেলা কুফরির  
পরে আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক জর্ঘন্য অপরাধ হিসেবে গণ্য।

কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে—

...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَ مَنْ قَاتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا... ﴿٣﴾

মানবহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধূসাত্মক কাজ করা ছাড়া (অন্য কোনো কারণে)  
যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করল [৩]

পুরো মানবজাতি একটি পরিবারের মতো। যথাযথ কারণ ছাড়া এই পরিবারের  
একজন সদস্যকে হত্যা করা মানে পুরো পরিবারের ওপরই আঘাত ও সীমালঙ্ঘন  
করা। মানবহত্যা এমনিতেই একটি জর্ঘন্য অপরাধ, আবার হত্যাকৃত ব্যক্তি যদি হয়

[১] সূরা নূর, আয়াত : ২৩-২৫

[২] সূরা নূর, আয়াত : ১৯

[৩] সূরা মায়দা, আয়াত : ৩২

মুসলিম, তাহলে জব্বন্যতা ও অপরাধের মাত্রা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ  
তাআলা বলেন— ।

وَمَن يَقْتُل مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَصِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَذَابًا  
عَظِيمًا ﴿١﴾

আর যে বাস্তি স্বেচ্ছায় কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হলো  
জাহানাম; তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন,  
তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মহাশাস্তি [১]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রায়িয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَرْوَأْلُ الدُّنْيَا أَهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

আল্লাহর নিকট একজন মুসলিম খুন হওয়ার চাইতে পুরো পৃথিবী ধর্ষস হয়ে  
যাওয়াটাও অধিকতর হালকা বিষয় [২]

অন্য হাদিসে ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَنْ يَرَأَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ ، مَا لَمْ يُصْبِتْ دَمًا حَرَامًا

মুমিন তার দীনের প্রশস্ততার মধ্যে থাকে, যতক্ষণ না সে নিষিদ্ধ রক্ত আক্রমণ  
করে (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে) [৩]

মুআবিয়া রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি নবিজি  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ৯৩

[২] জামিউত তিরমিয়ি : ১৩৯৫; সুনানুল নাসাই : ৩৯৮৭; হাদিসাটি সহিহ।

[৩] সহিহুল বুখারি : ৬৮৬২; মুসনাদু আহমাদ : ৫৬৮১

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ ، إِلَّا الرُّجُلُ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا ، أَوِ الرُّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا

| কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কিংবা স্নেচ্ছায় কোনো মুমিনের হস্তারক ছাড়া  
সব গুনাহই হয়তো আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেবেন [১]

এসব আয়াত ও হাদিসের ভাষা-শৈলীর কঠোরতা বিবেচনায় নিয়ে ইবনু আবুস  
রায়িয়াল্লাহ আনহু মতামত দিয়েছেন যে, ‘হস্তারকের তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়।’ তার  
মতে, অধিকার বিনষ্টের ক্ষেত্রে তাওবা করুলের শর্ত হলো—মালিকের অধিকার  
ফেরত দেওয়া বা তাকে সন্তুষ্ট করা। প্রাণনাশের ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির অধিকার  
আদায় বা তাকে সন্তুষ্ট করার কোনো সুযোগ যেহেতু নেই, তাই তাওবা করুলের  
সুযোগও নেই। অবশ্য অন্যদের বস্তুব্য হলো, আন্তরিক তাওবা অবশ্যই আল্লাহর  
নিকট গ্রহণযোগ্য। আন্তরিক নিষ্ঠাপূর্ণ তাওবায় যেখানে শিরকের অপরাধও ক্ষমা  
হয়ে যায়, সেখানে হত্যা তো আরেও আগেই ক্ষমাযোগ্য হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزِّئُونَ  
وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ⑯ يُضَاعِفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ⑰ إِلَّا  
مَنْ تَابَ وَأَمْنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ فَلَوْ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَّحِيمًا ⑱

আর (দয়াময় আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তো তারাই) যারা আল্লাহর সাথে অন্য  
উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সংগত কারণ  
ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যারা এগুলো  
করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি হবে  
দ্বিগুণ এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল, লাঞ্ছিত অবস্থায়। তবে যারা  
তাওবা করে ঈমান আনে, সৎকর্ম করে; আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা  
পরিবর্তিত করে দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু [২]

[১] সুনানুন নাসাই : ৩৯৮৪; মুসনাদু আহমাদ : ১৬৯০৭; হাদিসটি সহিহ।

[২] সূরা ফুরকান, আয়াত : ৬৮-৭০

## হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি দুঃজনেই জাহানামি

মুমিনের সঙ্গে লড়াইকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুফরির একটি দরজা এবং জাহিলি যুগের কর্ম বলে অভিহিত করেছেন। জাহিলি যুগের লোকেরা সামান্য উট বা ঘোড়ার জন্য যুধ ও রক্তপাতে জড়িয়ে পড়ত। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

| মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকি, আর তার সঙ্গে লড়াই করা কুফরি।<sup>[১]</sup>

জারির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন—

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ، يَضْرِبُ بَغْضُكُمْ رِقَابَ بَغْضٍ

| তোমরা আমার পরে কাফিরে রূপান্তরিত হয়ে যেয়ো না যে, তোমাদের একদল অন্যদলের গর্দান উড়িয়ে দেবে।<sup>[২]</sup>

আবু বাকরা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِذَا تَقَوَّى الْمُسْلِمَانِ بِسَيِّئَتِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَفْتُولُ فِي النَّارِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا  
الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَفْتُولِ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

| দুজন মুসলিম যখন তরবারি নিয়ে পরম্পরের সম্মুখে দাঁড়ায়, তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয়ে জাহানামি হয়ে যায়। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, হত্যাকারীর বিষয়টি তো ঠিক আছে, কিন্তু নিহত ব্যক্তির অপরাধ কী? তিনি বললেন, সেও নিশ্চয়ই তার সঙ্গীকে হত্যার জন্য উদ্ঘৰীব ছিল।<sup>[৩]</sup>

[১] সহিল বুখারি : ৪৮, সহিহ মুসলিম : ৬৪

[২] সহিল বুখারি : ১২১, সহিহ মুসলিম : ৬৫

[৩] সহিল বুখারি : ৩১; সহিহ মুসলিম : ২৮৮৮

এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হত্যা বা যুদ্ধের উসকানি যোগায় এমন সকল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, হোক না সেটা অস্ত্রের মাধ্যমে একটা ইশারা কেবল। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي ، لَعْلَ الشَّيْطَانَ يَنْزُغُ فِي يَدِهِ ، فَيَقُولُ  
فِي خُفْرَةِ مِنَ النَّارِ

তোমাদের কেউ যেন তার অন্য কোনো ভাইয়ের দিকে অস্ত্র তাক করে ইশারা না করে। কারণ, তার জানা নেই যে, শয়তান হয়তো তার হাতের দিকে ঝুঁকে পড়বে, ফলে (শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তার মুসলিম ভাইকে হত্যার কারণে) সে জাহানামের গর্তে পতিত হবে।[১]

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ ، حَتَّىٰ يَدْعُهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأَمِهِ

যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি লোহার কোনো অস্ত্র তাক করে ইশারা করে, সে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে অভিসম্পাত করতে থাকেন; যদিও সে তার আপন ভাই হয়।[২]

একাধিক সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرُوَعَ مُسْلِمًا

। একজন মুসলিমের জন্য আরেকজন মুসলিমকে ভয় দেখানো বৈধ নয়।[৩]

[১] সহিল বুখারি : ৭০৭২; সহিহ মুসলিম : ২৬১৭

[২] সহিহ মুসলিম : ২৬১৬; সহিল ইবনি হিবান : ৫৯৪৪

[৩] সুনান আবি দাউদ : ৫০০৪; মুসনাদু আহমাদ : ২৩০৬৪; হাদিসটি সহিহ।

পাপের বোঝা শুধু হত্যাকারীর ওপরই বর্তায় না; বরং প্রত্যেকে যারা এর সঙ্গে কথায়, কাজে বা অন্য কোনোভাবে জড়িত, তাদের সবার ওপরই বর্তায়। এমনকি যারা হত্যাখলে উপস্থিত ছিল, তাদের ওপরও এর কিছু গোমাহ বর্তাবে এজন্য যে, তারা কেন তাতে বাধা দেয়নি।

ইবনু আবুস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا يَقْنَأْ أَحَدُكُمْ مَوْقِعًا يُقْتَلُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْمًا ، فَإِنَّ اللُّغْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ

তোমাদের কেউ যেন এমন স্থানে দাঁড়িয়ে না থাকে, যেখানে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা হয়। কারণ, সেখানে উপস্থিত সকল ব্যক্তির ওপর অভিসম্পাত আপত্তি হয়, যখন তারা নিপীড়নমূলক হত্যায় বাধা দেয়নি।<sup>[১]</sup>

### নির্বিচারে হত্যা কথনো বৈধ নয়

হত্যা নিষিদ্ধ হওয়ার বিধানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কুরআন-হাদিসের অধিকাংশ বন্তব্যের আলোচ্য বিষয় হলো, মুসলিমদের হত্যার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ও তার গুনাহ নিয়ে। কারণ, কুরআন-হাদিসের বিধানগুলো সাধারণত মুসলিম সমাজ বিনির্মাণ এবং তাদের দিক-নির্দেশনার জন্য। কিন্তু এর অর্থ কথনোই এই নয় যে, ব্যাপকভাবে অমুসলিমদের রক্তপাত বৈধ।

একটি মানবপ্রাণকে কথনোই অনর্থক বিনষ্ট করা যাবে না। বস্তুত আল্লাহ তাআলার কাছে মানবজাতির প্রতিটি প্রাণই নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ও সংরক্ষণযোগ্য। তবে কেউ যদি মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তার রক্ত হালাল হয়ে যায়।<sup>[২]</sup>

[১] আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২৬০, হাদিস : ১১৬৭৫; শুআবুল ঈমান : ৭১৭৩; হাদিসটি হাসান।

[২] মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত কাফিরকে হারবি কাফির বলা হয়। হারবি কাফির বলতে কেবল সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত থাকা ব্যক্তিই বোঝায় না; বরং যুদ্ধে লিপ্ত থাকার বিষয়টি দুইভাবে প্রমাণ হয়। এক. বাস্তবিক অর্থেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকা। দুই. বাস্তবিক অর্থে বর্তমানে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না থাকলেও সম্ভাবনার জায়গায় থাকা। অর্থাৎ মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে কাফিরদের কোনো

পক্ষান্তরে, সে যদি মুসলিমদের আশ্রয়ে থাকে বা মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়, তাহলে মুসলিমদের মতো তার রন্তর সংরক্ষিত ও সম্মানিত, সেখানে কোনো ধরনের অন্যায় হস্তক্ষেপ ও সীমালঙ্ঘন অনুমোদিত নয়।<sup>[১]</sup>

সন্ধিচুক্তি না থাকাটাই যুদ্ধের সম্ভাবনা তৈরির জন্য যথেষ্ট। সুতরাং উভয় অবস্থায় তাদেরকে হারবি কাফির বলা হবে। অনেকে কেবল প্রথম অবস্থার কাফিরদেরকে হারবি মনে করে, কিন্তু এটা সঠিক নয়।

হারবি কাফির চিনতে হলে আমাদের ইসলামি রাষ্ট্র ও কুফরি রাষ্ট্রের পরিচয় এবং কাফিরদের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানা থাকতে হবে। সুতরাং আমরা বলব যে, ইসলামি রাষ্ট্র বলা হয়, যেখানে সংবিধান ও আইন-আদালতে পুরোপুরি আল্লাহর আইন ও ইসলামি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত আছে; চাই সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম হোক। আর কুফরি রাষ্ট্র বলা হয়, যেখানে সংবিধান ও আইন-আদালতে কুফরি সংবিধান ও অনেসলামিক আইন-কানুন প্রতিষ্ঠিত আছে; চাই সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম হোক। সংক্ষিপ্তভাবে এটাই হলো, ইসলামি রাষ্ট্র ও কুফরি রাষ্ট্রের ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণা।

এখন দ্বিতীয় বিষয়ে কথা হলো—পুরো দুনিয়ার কাফিররা দুভাবে বিভক্ত। এক. ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী কাফির। দুই. কুফরি রাষ্ট্রে বসবাসকারী কাফির। ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী কাফিররা মুসলিমদের খলিফাকে জিজিয়া (মাথাপিছু বাংসরিক কর) দিয়ে থাকে। এর বিনিময়ে তারা ইসলামি রাষ্ট্রে আনমালের নিরাপত্তার সহিত নিজ ধর্মের ওপর অবিচল থেকে বসবাস করার সুবিধা পেয়ে থাকে। ইসলামি পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় যিস্মি (আশ্রয়প্রাপ্ত কাফির নাগরিক)। আর কুফরি রাষ্ট্রে বসবাসকারী কাফিররা আবার দু-প্রকারের। এক. মুআহিদ (চুক্তিবদ্ধ) কাফির। দুই. হারবি (যোদ্ধা বা সম্ভাব্য যোদ্ধা) কাফির। মুআহিদ (চুক্তিবদ্ধ) কাফির হলো এমন কুফরি রাষ্ট্রের নাগরিক, যাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত মুসলিমদের খলিফার যুদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে সন্ধিচুক্তি রয়েছে। আর হারবি (যোদ্ধা বা সম্ভাব্য যোদ্ধা) কাফির হলো এমন কুফরি রাষ্ট্রের নাগরিক, যাদের সাথে মুসলিমদের খলিফার যুদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্ধিচুক্তি নেই।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বোধা গেল, পুরো পৃথিবীতে দু-ধরনের কাফির রয়েছে। এক. নিরাপদ কাফির, যাদের রন্তরে ব্যাপারে মুসলিমদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা আছে। এরা হলো যিস্মি ও মুআহিদ কাফির। যিস্মি কাফির তো জিজিয়া দিয়ে ইসলামি রাষ্ট্রেই বসবাস করে, যার কারণে সে মুসলিমদের কাছে পুরোপুরিই নিরাপদ। আর মুআহিদ কুফরি রাষ্ট্রে বসবাস করলেও নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে সন্ধিচুক্তি থাকায় তারাও মুসলিমদের আক্রমণের হাত থেকে নিরাপদ। দুই. অনিরাপদ কাফির। এরা হলো হারবি কাফির। অর্থাৎ এরা না জিজিয়া দিয়ে ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করে মুসলিমদের নিরাপত্তা গ্রহণ করেছে, আর না কুফরি রাষ্ট্রে থেকে সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা গ্রহণ করেছে। অতএব তাদের ব্যাপারে যেহেতু ইসলামের কোনো দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নেই, তাই তারা মুসলিমদের থেকে নিরাপদ নয়। এথেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কোনো কাফির যিস্মি ও মুআহিদ না হলেই সে হারবি; যদিও সে বর্তমানে প্রকৃত অর্থে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না থাকুক। সুতরাং ‘হারবি’ শব্দটি কেবল বর্তমান যোদ্ধাকেই বোঝায় না; বরং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য যোদ্ধাকেও বুঝিয়ে থাকে।

[১] কাফির যদি মুসলিমদের আশ্রয়ে থাকে অর্থাৎ বাংসরিক জিজিয়া দিয়ে নিজের জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা গ্রহণ করে ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করে, তাকে বলা হয় ‘যিস্মি’ বা আশ্রয়প্রাপ্ত। আর কাফির যদি মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকে অর্থাৎ সে কুফরি রাষ্ট্রে বসবাস করে মুসলিমদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ থাকে তাহলে তাকে বলা হয় ‘মুআহিদ’ বা চুক্তিবদ্ধ।

এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রায়িয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِخْ رَأْيَهُ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَذْبَعِينَ عَامًا

| যে ব্যক্তি কোনো মুআহিদ (চৃষ্টিবন্ধ) কাফিরকে হত্যা করবে, সে জান্মাতের ষ্ঠানও পাবে না; অথচ তার ষ্ঠান ৪০ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।[১]

অন্য বর্ণনায় এক সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الدِّيَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا

| যে ব্যক্তি কোনো যিশ্মিকে হত্যা করবে, সে জান্মাতের ষ্ঠানও পাবে না; অথচ তার সুগন্ধ ৭০ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।[২]

**কোন কোন ক্ষেত্রে মানবহত্যা বৈধ?**

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... ৩৩

আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা তাকে হত্যা কোরো না।[৩]

কুরআনের এ আয়াতটিতে যথার্থ কারণ ছাড়া কোনো মুসলিমের হত্যাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর শরিয়তে কোনো মুসলিমকে হত্যার জন্য যথার্থ কারণ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে মোট তিনটি বিষয়কে। যথা—

[১] সহিল বুখারি : ৩১৬৬; সুনানুল নাসাই : ৪৭৫০

[২] সুনানুল নাসাই : ৪৭৪৯; মুসনাদ আহমাদ : ১৮০৭২; হাদিসাটি সহিহ।

[৩]সুরা আনআম, আয়াত : ১৫১

[এক] অন্যায় হত্যা। সুতরাং যদি কারো বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে মন্দের বদলায় মন্দ প্রতিদান দেওয়ার জন্য তাকে হত্যার বদলায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। তাছাড়া যে মন্দের সূচনা করে, সে-ই হলো বড় জালিম; তাই মন্দ (অর্থাৎ ভয়ংকর কঠিন) শাস্তি দ্বারা তার জুলুমের মন্দকে দূর করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولَئِكَ بِأَعْلَمْ تَفْعُونَ ﴿٧١﴾

হে জ্ঞানীসমাজ, তোমাদের জন্য কিসাসে (অর্থাৎ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের বিধানে) রয়েছে জীবন, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো।<sup>[১]</sup>

[দুই] প্রকাশ্যে ব্যভিচার। এক্ষেত্রে ব্যভিচারীকে (প্রস্তরাঘাতে) মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য শর্ত হলো, চারজন ব্যক্তি ব্যভিচারের সময় সুচক্ষে তাকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখে সে ব্যাপারে বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দেবে। পাশাপাশি ব্যভিচারকারী লোকটি বিবাহিত হতে হবে। (অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়; বরং ১০০টি বেত্রাঘাত।) অনুরূপ বিবাহিত ব্যভিচারকারী যদি বিচারকের সামনে চারবার নিজের ব্যভিচারের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি দেয় তাহলে সেটাও ৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় তার ওপর মৃত্যুদণ্ড আরোপিত হবে।

[তিনি] ইসলাম পরিত্যাগ করা। মুসলিম সমাজকে চ্যালেঞ্জ করে প্রকাশ্য ইসলাম-ত্যাগ মূলত ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য। ইসলাম কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না, কিন্তু ইসলাম নিয়ে হাসি-তামাশা, যেমন ‘যখন ইচ্ছে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করা আবার বের হয়ে যাওয়া’ ইসলামে কখনোই অনুমোদিত নয়। তাই এটা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। ইসলাম পরিত্যাগের মতো এই জঘন্য কাজ মূলত ইহুদিরা করত। আল্লাহ তাআলা ইহুদি সম্প্রদায়ের এ মারাত্মক ভয়ংকর অভ্যাসের বিবরণ দিয়ে বলেন—

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا  
آخِرَةً لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৭৯

আর কিতাবিদের একদল বলল, মুমিনদের ওপর যা নাফিল করা হয়েছে, তার প্রতি তোমরা দিনের প্রথমভাগে বিশ্বাস (স্মান) স্থাপন করো, আর শেষভাগে তা অস্মীকার (কুফরি) করো; যাতে তারা (ইসলাম থেকে) ফিরে আসে [১]

এই তিন ক্ষেত্রেই কেবল মুসলিমদের হত্যা করা যাবে। এ ছাড়া মুসলিমদের হত্যার কোনো বৈধতা নেই। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، إِلَّا يَأْخُذُهُ ثَلَاثٌ :  
الْفَقْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالْتَّبِعُ الزَّانِي ، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ

যে মুসলিম সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তিনটি কারণের কোনো একটি কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। (কারণগুলো হলো,) প্রাণের বদলে প্রাণ, বিবাহিত ব্যক্তিচারী এবং মুসলিমদের দল-বিচ্ছিন্ন ধর্মত্যাগী [২]

এই তিন ক্ষেত্রে কাউকে হত্যা তো বৈধ, কিন্তু শাস্তি বাস্তবায়নের অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র দায়িত্বশীল প্রশাসনের জন্য সংরক্ষিত। যেকেউ চাইলেই হত্যার দণ্ড দিতে পারবে না। কারণ, সমাজের প্রত্যেকেই যদি বিচারক ও আইন প্রয়োগকারী হতো তাহলে সমাজের শৃঙ্খলা ও শান্তি বিনষ্ট হতো এবং মানুষের জীবন হয়ে পড়ত অনি঱াপদ। তবে ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে ইসলামে অনুমতি রয়েছে, নিহতের আত্মীয়-সৃজন চাইলে দায়িত্বশীল প্রশাসনের উপস্থিতিতে তারা নিজেদের হাতে হস্তারককে হত্যা করতে পারবে। তাদের মানসিক ক্ষেত্রে উপশম ও প্রতিশোধের ঘৃণা দূরা করার জন্য এবং কুরআনের বিধান পালন করার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْنِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٢﴾

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৭২

[২] সহিলুল বুখারি : ৬৮৭৮; সহিহ মুসলিম : ১৬৭৬

যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয় আমি অবশ্যই তার অভিভাবককে (কিসাস দাবী করার কিংবা ক্ষমা করে দেওয়ার) ক্ষমতা দিয়েছি। সুতরাং হত্যার ব্যাপারে সে যেন সীমালঙ্ঘন না করে। সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই [১]

### আত্মহত্যা মহাপাপ

মানবহত্যা-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় গুনাহ ও অপরাধ আত্মহত্যার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি যেকোনো কিছুর মাধ্যমে আত্মহত্যা করল, সে অন্যায়ভাবে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ একটি প্রাণ হরণ করল।

জীবন মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বস্তু নয়। মানুষের প্রাণ, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শিরা-উপশিরা কিছুই তার নিজের স্বষ্টি নয়; বরং সবই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দেওয়া আমানত। তাই জীবনের বিষয়ে কোনো অবহেলা গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে সীমালঙ্ঘন করে জীবনকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার অপরাধটা কত মারাত্মক হতে পারে, চিন্তা করে দেখুন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ⑪

আর তোমরা নিজেদের হত্যা কোরো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা  
তোমাদের প্রতি দয়ালু [২]

ইসলাম চায়, মুসলিম হবে দৈহিকভাবে বলিষ্ঠ ও মানসিকতায় দৃঢ়। যত বিপদ, হতাশা ও ব্যর্থতাই তার জীবনে নেমে আসুক না কেন, সে জীবন থেকে পলায়ন কিংবা নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার কথা কখনোই ভাববে না। মুমিনের সৃষ্টিই হলো প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের জন্য, হেরে যাওয়ার জন্য নয়। তার ঈমান, তার চরিত্র-মাধুর্য তাকে কখনোই জীবন থেকে হারিয়ে যেতে দিতে পারে না। যার সঙ্গে আছে ঈমানের মতো অব্যর্থ অস্ত্র, চরিত্রের মতো বিশাল ধনভাস্তর, তার আবার ভয় কীসের!

[১] সুরা ইসরায়, আয়াত : ৩৩

[২] সুরা নিসা, আয়াত : ২৯

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্তক করে দিয়ে বলেছেন যে, যারা আত্মহত্যায় লিপ্ত হবে, তারা জানাতে আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে বণ্ণিত হবে এবং জাহানামে আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে শিকার হবে।

জুন্দুব রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

كَانَ فِيهِنَّ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ ، فَجَزَعَ ، فَأَخَذَ سِكِينًا فَحَرَّثَ بِهَا يَدَهُ ، فَمَا رَقَّ الدُّمُ  
حَتَّىٰ مَاتَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

তোমাদের পূর্বেকার যুগে এক ব্যক্তি আঘাত পেয়েছিল। এতে সে কাতর হয়ে পড়েছিল। অতঃপর সে একটি ছুরি হাতে নিল এবং তা দিয়ে সে তার হাতটি কেটে ফেলল। ফলে রস্ত আর বন্ধ হলো না; এমনকি শেষ পর্যন্ত সে মারা গেল। মহান আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা নিজের (প্রাণের) ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। কাজেই আমি তার ওপর জানাত হারাম করে দিলাম।[১]

একজন আহত মানুষ আঘাতের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নেওয়ার অপরাধে আল্লাহ তাআলা তাকে জানাত থেকে বণ্ণিত করেছেন। তাহলে চিন্তা করে দেখুন, যারা ব্যবসায় লোকসান হলে কিংবা পরীক্ষা বা প্রেমে ব্যর্থ হলে আত্মহননের আশ্রয় নেয়, তাদের কী অবস্থা হবে!

আত্মহত্যা বিষয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কঠোর হুশিয়ারির কথা দুর্বলচিত্তের মানুষ যেন কান খুলে শুনে নেয়। হাদিসে আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا ،  
وَمَنْ تَحَسَّى سُمًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخْلَدًا فِيهَا  
أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ، فَحَدِيدَةٌ فِي يَدِهِ يَجْهَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا  
مُخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا

[১] সহিত্তুল বুখারি : ৩৪৬৩; সহিত্তু ইবনি হিবান : ৫৯৮৮

যে লোক পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আঘ্যহত্যা করে, সে জাহানামে যাবে। সেখানে সে ওইভাবে (পাহাড় থেকে) লাফিয়ে পড়তে থাকবে; চিরকাল সে ওখানেই থাকবে। আর যে লোক বিষপান করে আঘ্যহত্যা করবে, তার বিষ তার হাতে থাকবে, জাহানামের আগুনের মধ্যে সে চিরকাল অবস্থান করে তা পান করতে থাকবে। যে লোক লোহার কোনো অস্ত্রের আঘাতে আঘ্যহত্যা করবে, সেই লোহা তার হাতে থাকবে, জাহানামের আগুনের ভেতর সে চিরকাল অবস্থান করে তা দিয়ে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে।[১]

### মুমিন কি সম্পদশালী হতে পারবে?

মুমিনদের জন্য সম্পদ সঞ্চয়ে কোনো বাধা-নিষেধ নেই। তবে শর্ত হলো, অর্থ উপার্জন ও লাভ যেন বৈধভাবে হয়। কিছু কিছু ধর্মে সম্পদ সঞ্চয়ের অনেক নিষ্ঠা-মন্দ বর্ণিত হয়েছে। যেমন : মথির ইনজিলে এসেছে, ‘ধনাত্যতা কখনো উর্ধলোকে প্রবেশ করতে পারবে না; যতক্ষণ না সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করবে।’[২]

এর বিপরীতে ইসলামে সম্পদ ও ধনাত্যতার প্রশংসা করা হয়েছে। আমর ইবনু আস রায়িল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

يَا عَمْرُو ، نَعِمًا بِالْمَالِ الصَّالِحِ ، لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

| হে আমর, সৎ ব্যক্তির জন্য পবিত্র সম্পদ কতই না উত্তম জিনিস! [৩]

ইসলাম যেভাবে সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা সুরক্ষা করে, তেমনই সেগুলোকে আইনি প্রক্রিয়া এবং নৈতিক নির্দেশনার মাধ্যমে সংরক্ষণও করে। কারো সম্পদ চুরি, ছিনতাই বা দখল কোনোটাই ইসলামে অনুমোদিত নয়।

এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্যে জান, মাল ও ইজ্জত-আরুর পবিত্রতার বিষয়টি একসাথে স্থান পেয়েছে। আবু বাকরা রায়িল্লাহু আনহু থেকে

[১] সহিল বুখারি : ৫৭৭৮; সহিল মুসলিম : ১০৯

[২] ইনজিল মাথি, ১৯ : ২৪

[৩] মুস্তাদরাকুল হাকিম : ২১৩০; মুসলাদু আহমাদ : ১৭৭৬৩; হাদিসটি সহিহ।

বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, বিদায় হজের ভাষণে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার সামনেই বলেছেন—

فَإِنْ دِمَاءُكُمْ . وَأَمْوَالُكُمْ . وَأَغْرِاضُكُمْ . تَيْتَكُمْ حَرَامٌ . كَحْرَمَةٌ يَوْمَكُمْ هَذَا . فِي شَهْرِكُمْ هَذَا . فِي بَلْدَكُمْ هَذَا

| নিচ্যই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের ইঞ্জত-আবু তোমাদের পরস্পরের জন্য তেমনই মর্যাদাপূর্ণ, যেমন তোমাদের এ দিন, তোমাদের এ শহর এবং তোমাদের এ মাস মর্যাদাপূর্ণ।[১]

তার বক্তব্য থেকে আমরা আরো জানতে পেরেছি যে, চুরি বিষয়টি ঈমানের দাবির সঙ্গে পুরোই সাংঘর্ষিক। আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ جِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

| চোর কখনো মুমিন থাকা অবস্থায় চুরি করতে পারে না।[২]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيهِمَا جَزَاءٌ بِمَا كَسَبُوا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [৩]

আর পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের উভয়ের হাত তোমরা কেটে দাও; তাদের কৃতকর্মের ফল ও আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্রষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে।

আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৩]

আবু হুমাইদ সায়িদি রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১] সহিল বুখারি : ৬৭; সহিহ মুসলিম : ১৬৭৯

[২] সহিল বুখারি : ৫৫৭৮; সহিহ মুসলিম : ৫৭

[৩]সুরা মায়দা, আয়াত : ৩৮

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِيٍّ أَنْ يَأْخُذَ عَصَنِيَّاً خِيَهِ بِغَيْرِ طِيبٍ تَفْسِيرٍ مِنْهُ

| কোনো ব্যক্তির জন্য তার (মুসলিম) ভাইয়ের মনস্তুষ্টি ছাড়া তার লাঠি নেওয়াও বৈধ নয়।<sup>[১]</sup>

এ কথা বলার উদ্দেশ্য, অনুমতি ছাড়া কারো সম্পদে হস্তক্ষেপের নিষিদ্ধতা ও কঠোরতা বোঝানো।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِإِنْتَنُّكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

হে মুমিনগণ, তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কোরো না।  
তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা।<sup>[২]</sup>

**ঘূষদাতা ও ঘূষঘৃতীতার ওপর নবিজির লানত**

মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাতের একটি মাধ্যম হলো ঘূষঘৃতণ। প্রভাবশালী বা সরকারি কর্মকর্তাকে কিছু অর্থ দেওয়া—যাতে সে তার পক্ষে বা বাদীর বিপক্ষে রাখ দেয়; তার কোনো কাজ করে দেয় বা তার বিপক্ষের কাজ যেন আটকে রাখে ইত্যাদি। এটাকেই বলা হয় ঘূষ।

ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো মুসলিমের জন্য কর্তব্যরত ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীকে ঘূষ দিয়ে কোনো কাজ করানো হারাম, অনুরূপভাবে এসব কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য ঘূষ গ্রহণও হারাম। তাছাড়া ঘূষদাতা ও ঘৃতীতার মাঝে মধ্যসূত্রের কাজও হারাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِإِنْتَنُّكُمْ بِالْبَاطِلِ وَثَدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمَاءِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

[১] সহিল ইবনি ইবনান : ৫৯৭৮; মুসলাদু আহমাদ : ২৩৬০৫; হাদিসটি সহিল।

[২] সুরা নিসা, আয়াত : ২৯

আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো না এবং মানুষের অর্থ-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনেশুনে অসৎ পন্থায় আত্মসাং করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের কাছে তা (অর্থাং ঘূষ হিসেবে কিছু অর্থ) পেশ কোরো না।<sup>[১]</sup>

আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

**لَعْنَ اللَّهُ الرَّاشِي ، وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ**

| বিচারিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ঘূষ-প্রদানকারী ও ঘূষ-গ্রহণকারী উভয়কে আল্লাহ তাআলা অভিসম্পাত করেছেন।<sup>[২]</sup>

আবুল্লাহ ইবনু আমর রায়িয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

**لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي**

| রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘূষ-প্রদানকারী ও ঘূষ-গ্রহণকারী উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন।<sup>[৩]</sup>

ঘূষ-প্রদানকারী ও ঘূষ-গ্রহণকারীর মাঝে মধ্যস্থতভোগীও এই অভিসম্পাত থেকে মুক্তি পাবে না। কেননা, সে হলো এই দুজনের মধ্যকার যোগসূত্র এবং এই কবিরা গুনাহ সম্পাদনের মাধ্যম। এটাও কিছু কিছু বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘূষ নেওয়া হারাম হওয়ার কারণ হলো—ঘূষ-গ্রহণকারী যদি অন্যায় সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য ঘূষ নেয় তাহলে তো এর গুনাহ ও অপরাধ মারাত্মক পর্যায়ের। ঘূষ নেওয়ার পাশাপাশি জুলুমে সহযোগিতা হিসেবে তার গুনাহের জ্যন্যতা আরো

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৮

[২] সহিল ইবনি হিকমান : ৫০৭৬; মুসনাদু আহমাদ : ৯০২৩; হাদিসটি সহিহ।

[৩] সুলানু আবি দাউদ : ৩৫৮০; জামিউত তিরমিয়ি : ১৩৩৭; হাদিসটি সহিহ।

বৃদ্ধি পাবে। আর ঘূষ-গ্রহণকারী যদি ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে ঘূষ নেয়, তাহলে এটা তো তার জন্য এমনিতেই অপরিহার্য ও অবশ্যপালনীয় একটি কর্তব্য। অতএব এটার জন্য অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার কোনোই সুযোগ নেই। সুতরাং অন্যায় সুবিধার জন্য হোক বা ন্যায়সংগত সুবিধার জন্য হোক, উভয় অবস্থাতেই ঘূষ গ্রহণ হারাম।

সুলাইমান ইবনু ইয়াসার রাহিমাল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى حَيْبَرَ. فَيَخْرُصُ  
تَيْئَنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ حَيْبَرَ. قَالَ ، فَجَمِعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ نِسَائِهِمْ. فَقَالُوا: هَذَا أَكَ.  
وَحَقِيقٌ  
عَنَّا. وَتَجَاوِزُ فِي الْقُسْنِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: يَا مَغْشَرَ يَهُودَ ، وَاللَّهُ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَنْجَضْ  
خَلْقِ اللَّهِ إِلَيَّ وَمَا ذَاكَ بِحَامِلٍ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْنَكُمْ. قَائِمًا مَا عَرَضْتُمْ مِنَ الرُّشُوَّةِ فَإِنَّهَا  
سُخْتٌ. وَإِنَّا لَا تَأْكُلُهَا. فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ

রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রায়িয়াল্লাহু আনহুকে খাইবারে প্রেরণ করতেন। তিনি গিয়ে খাইবারের ইহুদিদের সম্মুখে (জিজিয়া-কর হিসেবে তাদের বাগানের ফলের পরিমাণ) অনুমান করে নির্ধারণ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, একবার ইহুদিরা নিজেদের ঘরের নারীদের কিছু অলংকার সংগ্রহ করে এনে (আব্দুল্লাহ রায়িয়াল্লাহু আনহুকে দিয়ে) বলল, এটা আপনার জন্য। এটার বিনিময়ে আপনি আমাদের জন্য সহজ করুন এবং বণ্টনে কিছুটা ছাড় প্রদান করুন। আব্দুল্লাহ রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে ইহুদি সম্প্রদায়, আল্লাহর শপথ! নিঃসন্দেহে তোমরা হলে আমার নিকট সমস্ত সৃষ্টিজীবের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এতৎসত্ত্বেও এটা আমাকে তোমাদের ওপর জুলুম করতে প্ররোচিত করে না। কিন্তু তোমরা আমাকে যে উৎকোচ পেশ করছ, নিঃসন্দেহে তা হারাম, আমরা এটা খাই না। তখন ইহুদিরা বলল, এটার কারণেই আসমান-জমিন স্থির রয়েছে।<sup>[১]</sup>

ঘূষ ইসলামে সর্বত্বাবে নিষিদ্ধ। এর সঙ্গে জড়িত সবার কঠোর নিন্দা বর্ণিত হয়েছে হাদিসে। ঘূষ সমাজে ছড়িয়ে যাওয়ার অর্থ-অন্যায় ফয়সালা এবং অবিচারের

[১] মুআত্তা মালিক : ৫৮৪, ২৫৯৫, তাহকিক : মুস্তফা আযামি; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ৭৪৩৮; হাদিসটি মুরসাল সহিহ।

আসন পাকাপোষ্ট হওয়া। যার বিচার আগে পাওয়ার কথা, তারটা পরে; আর যার বিচার পরে পাওয়ার কথা, তারটা আগে দেওয়া-সহ এমন নানা ফ্যাসাদ ও জুলুম ছড়িয়ে যাবে সমাজে। পাশাপাশি দিনদিন মানুষের মধ্যে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের চেয়ে অর্থ পাওয়ার মানসিকতাই বেশি প্রচার-প্রসার লাভ করবে।

### বিচারকদের জন্য জনগণের উপহার

ঘূষ সর্বাবস্থায় ঘূষ, যে নামেই তা দেওয়া হোক না কেন। হাদিয়ার নামে ঘূষ দিলে সেটা হারাম থেকে হালাল হয়ে যাবে না। হাদিসে এসেছে, বুরাইদা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَىٰ عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا ، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلْوُلٌ

কাউকে আমরা কোনো পদে নিযুক্ত করে তার জন্য নির্ধারিত সম্মানীর ব্যবস্থা করলাম। এর পরে সে অতিরিক্ত যা কিছু নেবে তা চুরি বা আত্মসাং হিসেবে গণ্য হবে।<sup>[১]</sup>

বর্ণিত আছে যে, ‘খলিফা থাকাকালীন উমার ইবনু আবুল আয়িয রাহিমাল্লাহ একটি হাদিয়া পেলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না করে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। বলা হলো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো হাদিয়া গ্রহণ করতেন, আপনি কেন গ্রহণ করলেন না? তিনি বললেন, সেটা তার জন্য হাদিয়া ছিল, আর এটা আমাদের জন্য ঘূষ।’<sup>[২]</sup>

আবু হুমাইদ সায়িদি রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَىٰ صَدَقَاتِ بَنِي شَيْمٍ ، يُدْعَى ابْنَ اللَّثِيَّةِ ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَتْهُ ، قَالَ : هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي تَيْتِ أَبِيكَ وَأَمِيكَ ، حَتَّىٰ تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا» ثُمَّ خَطَبَنَا ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ”أَمَا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَىٰ

[১] সুনানু আবি দাউদ: ২৯৪৩; মুস্তাদরাকুল হাকিম: ১৪৭২; হাদিসটি সহিহ।

[২] ইহইয়াউ উলুমিদিন, খণ্ড: ২; পৃষ্ঠা: ১৫৬

العَمَلِ مِمَّا وَلَانِي اللَّهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُ لَيْ، أَفَلَا جَلَسْتُ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأَمِهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللَّهُ لَا يَأْخُذُ أَحَدًا مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لِقَاءً اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا يَغْرِقُنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقَيَ اللَّهُ يَخْمُلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقْرَةً لَهَا حُوَارٌ، أَوْ شَاءَ تَيْغَرُ "لَمْ رَفَعْ يَدَهُ حَتَّى رُتِيَ بِيَاضٍ إِبْطِهِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ইবনুল লুতবিয়া নামক এক লোককে বনি সুলাইম গোত্রের যাকাত-আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ করলেন। যখন সে ফিরে এলো তখন তিনি তার নিকট হতে হিসাব-নিকাশ নিলেন। সে বলল, এগুলো আপনাদের (জন্য আদায়কৃত) সম্পদ, আর এগুলো হলো (আমাকে দেওয়া) হাদিয়া। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যদি সত্যিবাদী হয়ে থাকো, তাহলে তুমি তোমার মা-বাবার ঘরে বসে থাকলে না কেন? যাতে সেখানেই তোমার কাছে তোমার হাদিয়া পৌঁছে যেত। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণগুণ বর্ণনা করার পর তিনি বললেন, অতঃপর কথা হলো—আমি তোমাদের কাউকে এমন কোনো কাজে নিয়োগ করি, যার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহ আমাকে মনোনীত করেছেন। কিন্তু সে কাজ করে এসে বলে, এ হলো তোমাদের সম্পদ আর এ হলো আমাকে দেওয়া হাদিয়া। তাহলে সে কেন তার মা-বাবার ঘরেই বসে থাকল না, যাতে সেখানেই তার কাছে তার হাদিয়া পৌঁছে যেত? আল্লাহর শপথ! যদি তোমাদের কেউ অন্যায় পর্যায় কোনো কিছু গ্রহণ করে, তবে সে কিয়ামতের দিন তা বহনরত অবস্থায় আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। আমি তাকে ভালোভাবেই চিনব, সেদিন সে আল্লাহর সামনে উঁচু গলায় ডাকতে থাকা উট, গরু বা বকরি নিয়ে হাজির হবে। তারপর তিনি নিজের হাতদুটি এতটা ওপরে ঝঠালেন যে, তার বাহুমূলের শুভ্রতা দেখা যাচ্ছিল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ, আমি কি পৌঁছে দিতে পেরেছি? [১]

ইমাম গায়ালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘এসব কঠোরতা ও হুঁশিয়ারির পর বিচারক ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের চিন্তা করা উচিত, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে যারা তাকে হাদিয়া দিত, তার জন্য তাদের হাদিয়া নেওয়া বৈধ। আর যেগুলোর ব্যাপারে বোৰা যায়—এসব হাদিয়া তার পদের জন্য এসেছে, সেগুলো নেওয়া তার জন্য হারাম।

বিচারক ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের জন্য তাদের বন্ধু-বান্ধবদের হাদিয়া প্রহণ করা নিয়েও সমস্যা আছে। এখানে ভালোভাবে লক্ষ করে দেখতে হবে, যদি সে এমন বিশেষ পদে না থাকত, তাহলেও কি তারা তাকে হাদিয়া দিত? বস্তুত এটা একটা সংশয়পূর্ণ জায়গা। তাই এ থেকেও বিরত থাকা উচিত।’[১]

### জুলুম থেকে বাঁচার জন্য ঘুষ দেওয়া কি বৈধ?

কারো কোনো অধিকার নষ্ট হচ্ছে, ঘুষ ছাড়া সেই অধিকার উদ্ধারের কোনো উপায় নেই কিংবা তার ওপর কোনো অন্যায় হচ্ছে, সেই অন্যায় থেকে বাঁচতে হলে ঘুষ ছাড়া আর কোনো দরজা খোলা নেই। এক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো ধৈর্য ধরা। আল্লাহ তাআলা হয়তো তার জুলুম থেকে মুক্তি বা অধিকার আদায়ের জন্য উত্তম কোনো উপায় করে দেবেন।

তবে একান্ত প্রয়োজন হওয়ায় সে যদি ঘুষ দিতে বাধ্য হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে গুনাহের দায়ভার আরোপিত হবে ঘুষগ্রহীতার ওপর, এখানে ঘুষদাতার কোনো গুনাহ হবে না। ঘুষ দেওয়ার ক্ষেত্রে গুনাহ না হওয়ার জন্য শর্ত হলো, অন্যান্য বৈধ উপায়গুলো আগে যাচাই করে দেখতে হবে এবং তার এই ঘুষের পেছনে নিজের ওপর থেকে কোনো জুলুম হটানো কিংবা নিজের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্য থাকতে হবে, পাশাপাশি এর ফলে অন্যের কোনোরূপ ক্ষতি না হয়, সেদিকেও নজর দিতে হবে।

কিছু আলিম প্রমাণ হিসেবে এর পক্ষে আবু সাইদ খুদরি রায়িয়াজ্জাহু আনহুর বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করে থাকেন। তিনি বর্ণনা করেন—

قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ سَوِيْغْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا يُخْسِنَانِ النَّنَاءَ، يَذْكُرَانِ أَنْكَ أَغْطِنَيْتَهُمَا  
دِينَارَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكِنَّ وَاللَّهِ فُلَانًا مَا هُوَ كَذَلِكَ لَقَدْ  
أَغْطَنَيْتَهُ مِنْ عَشَرَةِ إِلَى مَائَةِ، فَمَا يَقُولُ ذَلِكَ، أَمَا وَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُخْرُجَ مَسَالَةً مِنْ  
عِنْدِي يَتَابُطُهَا ”يَغْنِي تَكُونُ تَحْتَ إِنْطِهِ، يَعْنِي تَارًا“، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ  
تُغْطِيَهَا إِلَيْاهُمْ؟ قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ يَأْبُونَ إِلَّا ذَلِكَ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبَخْلُ

[১] ইহিয়াউ উলুমিদিন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫৬

উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু একদিন (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি অমুক ও অমুককে বলতে শুনেছি, তারা দুজনে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আদায় করছে। তারা বলছে যে, আপনি তাদেকে দুটি দিনার (সুর্ণমুদ্রা) দান করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কিন্তু আল্লাহর শপথ! (তিনি তৃতীয় আরেকজনের নাম নিয়ে বললেন,) অমুক তো এমন নয়। আমি তাকে ১০ থেকে ১০০ দিনার (সুর্ণমুদ্রা) দান করেছি! কিন্তু সে কখনো এমন (কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদজ্ঞাপক কোনো কথা) বলেনি। মনে রেখো, আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ আমার কাছ থেকে তার দাবি-চাওয়া প্রার্থনা করে তা বগলদাবা করে নিয়ে যায়। বস্তুত সে বগলে করে আগুন নিয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, তাহলে আপনি তাদেরকে তা দান করেন কেন? তিনি বললেন, তাহলে আমি কী করব? তারা (আমার কাছে তাদের) দাবি-চাওয়ার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করতেই থাকে, চাওয়া পূরণ করা ছাড়া যেতে চায় না। আর এদিকে আল্লাহ তাআলা আমার জন্য কৃপণতার কোনো সুযোগ রাখেননি [১]

পীড়াপীড়ির চাপে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি কোনো প্রার্থীকে তার প্রার্থিত অর্থ দিতে পারেন; অথচ তিনি নিশ্চিত জানেন যে, এটা তার জন্য আগুনতুল্য, তাহলে নিরুপায় অবস্থায় একান্ত বাধ্য হয়ে জুলুম প্রতিহত করতে কিংবা প্রাপ্য অধিকার আদায়ের জন্য কি টাকা দেওয়া যাবে না? এটা তো অবশ্যই আরো অধিক বৈধ হওয়ার কথা।

### ব্যক্তিগত সম্পদের অপচয় নিষিদ্ধ

অনুমতি ছাড়া অন্যের সম্পদ ব্যবহার, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে অন্যায় হস্তক্ষেপ যেমন বৈধ নয়, তেমনই নিজস্ব সম্পদ ব্যবহারেও কিছু ইসলামি বিধিনিষেধ রয়েছে। নিজের সম্পদ হলেও তা অপচয় ও ডানে-বামে যথেচ্ছা খরচের ব্যাপারে এসব বিধান বাধা দেয়।

ব্যক্তির সম্পদে সমাজেরও হক আছে। মালিকের পর সমাজেরও ব্যক্তির সম্পদে

[১] মুসনাদু আহমাদ : ১১০৪, ১১১২৩; শারহু মুশকিলিল আসার : ৫৯৩৬; হাদিসটি সহিহ।

অধিকার রয়েছে। এজন্য নির্বোধ বালক, যে কিনা অনর্থক সম্পদ উড়িয়ে বেড়ায়, তার ব্যয়ে সীমাবদ্ধতা আরোপের অধিকার সমাজের আছে। কেননা, এই সম্পদের মালিক সমাজও। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন—

وَلَا تُؤْثِرُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ  
فَوْلَا مَعْرُوفًا

আর তোমরা অল্ল-বুদ্ধিসম্পদের হাতে নিজেদের অর্থ-সম্পদ অর্পণ কোরো না, যেটাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য বানিয়েছেন জীবিকার মাধ্যম এবং তোমরা তা থেকে তাদেরকে খাবার ও পোশাকের ব্যবস্থা করো, আর তাদের সাথে সুন্দর কথা বলো।<sup>[১]</sup>

এখনে আল্লাহ তাআলা মুসলিম জাতিকে বলছেন, তোমরা অল্ল-বুদ্ধিসম্পদ নির্বোধদের হাতে তোমাদের অর্থ-সম্পদ তুলে দিয়ো না। অথচ এটা স্পষ্ট যে, সম্পদের মালিক এই নির্বোধ বাচ্চারাই। এ থেকে বোৰা যায়, মূলত প্রত্যেকের সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পদ হওয়ার পাশাপাশি পুরো সমাজেরও সম্পদ।

ইসলাম সাম্য ও ন্যায্যতার ধর্ম। মুসলিম জাতি একটি মধ্যপন্থি জাতি। মুসলিম মাত্রই সকল কাজে মধ্যপন্থার অনুসারী। এই জায়গা থেকেই মুমিনদের অপচয় ও অপব্যয় নিষিদ্ধ হয়েছে; যেভাবে হারাম করা হয়েছে কার্পণ্য ও কঞ্চুসি।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا مِنْ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا مِنْ كُلِّ شَرْبَىٰ وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّمَا لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ<sup>[২]</sup>

হে আদম-সন্তানগণ, তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করো। তোমরা খাও এবং পান করো, কিন্তু অপচয় কোরো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।<sup>[৩]</sup>

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ৫

[২] সূরা আরাফ, আয়াত : ৩১

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

وَاتِّ ذَا الْقُرْنَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّيْلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِّرِا ⑤ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا  
إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ مَوْكَانَ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِ كُفُورًا ⑥

আর আপনি আত্মীয়সৃজনকে তার প্রাপ্য প্রদান করুন এবং অভাবগ্রস্ত ও  
মুসাফিরকেও। তবে কিছুতেই অপব্যয় করবেন না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা  
শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।[১]

মদ, নেশাদ্রব্য, সূর্ণ-রূপার আসবাবপত্রের মতো অবৈধ ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা  
হলে তাকে অপব্যয় বলা হয়; পরিমাণে তা কম হোক বা বেশি। নিজের জন্য  
বা আশপাশের মানুষের জন্য সম্পদ নষ্ট করলেও সেটা অপব্যয় বলে গণ্য হবে।  
অপচয় হলো—অপ্রয়োজনীয় কাজে সম্পদ ব্যয় করা এবং এভাবে ব্যয় করতে  
করতে এক সময় নিঃসৃ হয়ে যাওয়া।

ইমাম রায়ি রাহিমাহুল্লাহ (আর তারা আপনাকে  
জিজ্ঞেস করে, তারা [নফল দান হিসেবে] কী ব্যয় করবে? বলুন, যা প্রয়োজনের  
অতিরিক্ত) [২]—এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন—

وَاتِّ ذَا الْقُرْنَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّيْلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِّرِا ⑤ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا  
إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ مَوْكَانَ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِ كُفُورًا ⑥

আর আপনি আত্মীয়সৃজনকে তার প্রাপ্য প্রদান করুন এবং অভাবগ্রস্ত ও  
মুসাফিরকেও, কিন্তু কিছুতেই অপব্যয় করবেন না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা  
শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।[৩]

[১] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৬-২৭

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ২১৯

[৩] সুরা ইসরা, আয়াত : ২৬-২৭

আল্লাহ তাআলা আরেক আয়াতে বলেছেন—

وَلَا تَجْعَلْ يَدِكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْفَدَ مَلْوَمًا مَخْسُورًا [১]

আর আপনি আপনার হাতকে আপনার গলার সাথে বেঁধে রাখবেন না (অর্থাৎ কৃপণ হবে না) এবং হাত একেবারে প্রসারিতও করে দেবেন না (অর্থাৎ অপচয় করবেন না)। অন্যথায় আপনি তিরস্কৃত ও নিঃসৃ হয়ে বসে পড়বেন।[১]

আল্লাহ তাআলা সুরা ফুরকানে বলেছেন—

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْثُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا [২]

আর তারা (অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহর বান্দারা) যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না; বরং তারা এতদুভয়ের মাঝামাঝি থাকে।[২]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের কাউকে যখন আল্লাহ কল্যাণ (অর্থাৎ সম্পদ) দান করেন তখন সে নিজের এবং তার পরিবারস্থ লোকজন দ্বারা ব্যয় শুরু করবে।’[৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, ‘সর্বোত্তম সাদাকা হলো যা (দান করার পরেও) প্রাচুর্য বাকি রাখে।’[৪]

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আনসারি রায়িয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, ‘একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অবস্থানকালে এক ব্যক্তি একটি ডিম পরিমাণ সৃষ্টির টুকরা নিয়ে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি এ সৃষ্টি খনি থেকে পেয়েছি, আপনি এটি দান হিসেবে প্রহণ করুন। এছাড়া আমার আর কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখ ফিরিয়ে নিলে লোকটি তার ডান পাশে এসে আগের মতোই বলল। এরপর সে তার বাম পাশে

[১] সুরা ইসরায়, আয়াত : ২৯

[২] সুরা ফুরকান, আয়াত : ৬৭

[৩] সহিহ মুসলিম : ১৮২২

[৪] সহিহুল বুখারি : ৫৩৫৫

এসেও তা-ই বলল। আর তিনিও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অবশেষে সে তার পেছনে এসে অনুরূপ বললে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা নিয়ে এমন জোরে তার দিকে ছুড়ে মারলেন যে, তার শরীরে লাগলে তাকে অবশ্যই জখম বা আহত করে ছাড়ত। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের কেউ তার সমস্ত অর্থ-সম্পদ আমার কাছে নিয়ে এসে বলে, এটা সাদাকা। পরে সে (সম্ভলহীন হয়ে) লোকের কাছে ভিক্ষা করে বেড়ায়। বস্তুত সর্বোত্তম সাদাকা সেটাই, যা অভাবমুক্ত থেকে দান করা হয়।’<sup>[১]</sup>

উমার ইবনুল খাতাব রায়িয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, ‘নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনি নায়িরের খেজুর বিক্রি করতেন এবং পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য জোগাড় করে রাখতেন।’<sup>[২]</sup>

জ্ঞানী ও বিজ্ঞনেরা বলেছেন, সর্বোত্তম হলো ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা বজায় রাখা। অতিরিক্ত ব্যয় যেমন অপব্যয়, তেমনই প্রয়োজনেও ব্যয় না করা কৃপণতা হিসেবে গণ্য। তাই সর্বোত্তম হলো এ দুইয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন। ‘উদ্বৃত্ত তথা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ (নফল দান হিসেবে) ব্যয় করো।’<sup>[৩]</sup>

কুরআনের এই বন্ধবের উদ্দেশ্যও এটাই। এই তত্ত্বই হলো ইসলামি শরিয়ার মূল কথা। ইহুদি শরিয়ার মূলকথা কৃচ্ছ-সাধনা। খ্রিস্টানদের শরিয়ার মূলকথা পরিপূর্ণ শিথিলতা। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ শরিয়ার অবস্থান এ দুয়ের মাঝামাঝি। এজন্যই সকল দ্বীন-ধর্মের মাঝে ইসলামই হলো সবচেয়ে পরিপূর্ণ।’<sup>[৪]</sup>

### অমুসলিমের সঙ্গে মুসলিমের সম্পর্ক

বৈধতা ও অবৈধতার দ্রষ্টিকোণ থেকে অমুসলিমের সঙ্গে একজন মুসলিমের আচরণ কেমন হবে, সে বিষয়ে ইসলামি শিক্ষাদীক্ষা জানার জন্য কুরআনের দুটি

[১] সুনানু আবি দাউদ : ১৬৭৩

[২] সহিলুল বুখারি : ৫৩৫৭

[৩] সুরা বাকারা, আয়াত : ২১৯

[৪] তাফসিলুর রায়, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪০২-৪০৩

আয়াতই যথেষ্ট। এই দুটি আয়াতেই এই বিষয়ে পূর্ণ সারগার্ড দিক-নির্দেশনা রয়েছে।<sup>[১]</sup>  
আয়াত দুটি হলো—

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبْرُوْهُمْ  
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ⑤ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي  
الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ ⑥

দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে সুদেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচরণে এবং ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিচয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন। আল্লাহ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে সুদেশ থেকে বহিকার করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বহিকার করাতে সাহায্য করেছে।

আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই তো যালিম।<sup>[২]</sup>

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, যেসকল অমুসলিম ধর্মের জন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি, মাত্তুমি থেকে মুসলিমদের উৎখাতের সঙ্গেও জড়িত ছিল না, যাদের সঙ্গে মুসলিমদের কোনো যুদ্ধ বা শত্রুতা নেই, তাদের প্রতি ইনসাফ ও

[১] এ আয়াত দুটিতে মুসলিমদের জন্য কাফিরদের সাথে পার্থিব লেনদেন ও আচার-ব্যবহারের ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আয়াত দুটির সারকথা হলো—তিনটি শর্তে কাফিরদের সাথে স্বাভাবিক লেনদেন, চলাফেরা ও প্রয়োজনীয় সম্পর্ক রাখার অনুমতি আছে। এক. দীন ইসলামের কারণে মুসলিমদের সাথে কোনো প্রকারের বিদ্রো ও শত্রুতা না রাখা এবং এর ভিত্তিতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা। দুই. মুসলিমদের সাথে এমন নিপীড়িনমূলক আচরণ না করা, যার কারণে মুসলিমরা সেখান থেকে হিজরত করতে বাধ্য হয়। তিনি. মুসলিমদের বিরুদ্ধে যেকোনো কাজের জন্য অন্যান্য কাফিরকে কোনো প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা না করা—না পরামর্শ দিয়ে, না জনবল দিয়ে, না অর্থসম্পদ দিয়ে, আর না অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে।

এই তিনি শর্ত যদি কোনো কাফির পূরণ করে তাহলে তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা এবং ন্যায়সংগত আচরণ করা নিবন্ধ নয়। যেমন : সহিহ বুখারির বর্ণনায় আসমা বিনতু আবি বকর রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবিজির যুগে আমার মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট এলেন। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করে বললাম, তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট, এমতাবস্থায় আমি কি তার সঙ্গে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে সদাচরণ করো। [সহিহল বুখারি : ২৬২০; সহিহ মুসলিম : ১০০৩]

[২] সুরা মুমতাহিনা, আয়াত : ৮-৯

সুবিচার করতে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেন না; বরং তাদের প্রতি সদাচার ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণের প্রতি তিনি উৎসাহ দেন।

এখানে কুরআনে কাফিরদের সঙ্গে সদাচরণের জন্য শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ‘বির’। ‘বির’ শব্দটি কল্যাণ ও সদাচারের জন্য ব্যবহৃত একটি বিপুল অর্থবোধক শব্দ। এই শব্দটি ন্যায় ও ইনসাফের চেয়েও অধিক অর্থবহ একটি শব্দ। আরবিতে পিতামাতার প্রতি সদাচার বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

আমরা বলেছি, ‘আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সদাচার ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণের প্রতি উৎসাহ দেন।’ কারণ, আল্লাহ তাআলা আয়াতের শেষে বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়-পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।’ মুমিনমাত্রই আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় কর্ম সম্পাদনে সচেষ্ট। ‘আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না’—কুরআনের এই বাক্যশেলী উৎসাহ ও প্রেরণা পরিপন্থ নয়; বরং এখানে অমুসলিমদের সহযোগিতা বিষয়ক নেতৃত্বাচক চিন্তা—যেটা মানুষের মধ্যে ছিল কিংবা এখনো আছে—ধর্মে ভিন্নতা থাকলে সে সদাচার, ন্যায্যতা ও সম্প্রীতি পাওয়ার অধিকার রাখে না, তা দ্রু করার জন্য এই বাচনভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এখানে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কোনো অমুসলিমের সঙ্গেই দয়া ও সম্প্রীতি বজায় রাখা যাবে না—বিষয়টি এমন নয়; বরং যারা মুসলিমদের সঙ্গে লড়াইয়ে রত বা শত্রুভাবাপন্ন, কেবল তাদের সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্ক রাখা যাবে না।

এই ধরনের বাচনভঙ্গি কুরআনের সুরা বাকারায় সাফা-মারওয়ায় তাওয়াফের ক্ষেত্রেও বিধৃত হয়েছে। জাহিলি যুগের কিছু বিষয়ের কারণে সাফা-মারওয়ায় তাওয়াফের ব্যাপারে কারো কারো মনে দ্বিধা কাজ করছিল, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ مَقْمَنْ حَجَّ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوَفَ

بِهِمَا...  
◎

নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। কাজেই যে কেউ (কাবা) ঘরের হজ বা উমরা সম্পন্ন করে, তার জন্য এ (পাহাড়) দুটির প্রদক্ষিণে কোনো গুনাহ নেই।<sup>[১]</sup>

এখানে ‘গুনাহ নেই’ বলা হয়েছে তাদের ভুল ধারণা মোচনের জন্য, বিধান বোঝানোর জন্য নয়। কারণ, সাফা-মারওয়ার প্রদক্ষিণ ওয়াজিব এবং এটি ইসলামে একটি ধর্মীয় নির্দশন।

### ইহুদি-খ্রিস্টানদের বিশেষ কিছু আলোচনা

ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের অনুসারী যদি সে পৌত্রিকও হয়, তবু তাদের প্রতি সদাচার ও নিষ্ঠাপূর্ণ আচরণে ইসলাম বাধা দেয় না। তবে ঐশ্বী গ্রন্থধারী ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অবস্থান ইসলামের দৃষ্টিতে একটু ভিন্ন; চাই তারা ইসলামি রাস্তে বসবাস করুক কিংবা এর বাইরে থাকুক।

কুরআনে এদেরকে ‘আহলুল কিতাব’ (কিতাবধারী) নামে সঙ্গোধন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইঞ্জিত পাওয়া যায়—তারাও মূলত ঐশ্বী ধর্মের অনুসারী। তাদের সঙ্গে মুসলিমদের আঢ়ীয়তা ও সম্পর্ক রয়েছে। তাদের ধর্ম আর ইসলাম ধর্মের মূলকথা একই, যা দিয়ে আল্লাহ তাআলা সকল নবি-রাসূলকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

شَرَعْ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى  
وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَنْفَرُّو فِيهِ...  
.....

তিনি তোমাদের জন্য দীনের সে পথই বিধিবদ্ধ করেছেন, যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নুহকে, আর যা আমি ওহি (প্রত্যাদেশ) করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহিম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে—তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনেক্য সৃষ্টি কোরো না।<sup>[১]</sup>

আল্লাহ তাআলার নায়িলকৃত সকল গ্রন্থ এবং তাঁর প্রেরিত সকল নবি-রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মুসলিমদের ঈমানের অংশ। এটা ছাড়া তাদের ঈমান পূর্ণই হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ

[১] সুরা শুরা, আয়াত : ১৩

وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١﴾

তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাফিল করা হয়েছে এবং যা ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের প্রতি নাফিল করা হয়েছে এবং যা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবিকে তাদের রবের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর প্রতিও (আমরা ঈমান এনেছি)। আমরা তাদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না এবং আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী [১]

আহলে কিতাব তথা আসমানি গ্রন্থধারী ইহুদি-খ্রিস্টানরা কুরআন পড়লেই সেখানে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের নাম, তাদের নবি-রাসূলদের প্রশংসা ও বিবরণ দেখে বহু অনুপ্রেরণা পাবে।

মুমিনগণ ইহুদি-খ্রিস্টানদের সঙ্গে শক্ত ভাষায় তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবে, যাতে তাদের মনে ইসলামের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে মুমিনদের নির্দেশ দিয়ে বলেন—

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَخْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ سُؤْفَولُوا آمَنُوا بِالَّذِي  
أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٢﴾

আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক কোরো না, তবে ওদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করে তাদের সাথে (উত্তম পন্থায় তর্ক) নয়। আর তোমরা বলো, আমাদের প্রতি যা নাফিল করা হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি যা নাফিল করা হয়েছে, তাতে আমরা ঈমান এনেছি। আর আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই এবং আমরা তাঁরই প্রতি  
আত্মসমর্পণকারী [২]

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিস্টানদের খাদ্য ও জবাইকৃত প্রাণী খাওয়া যেমন আমাদের জন্য বৈধ, তেমনই তাদের (নারীদের) সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক রাখাও জায়িয়। আর এটা জানা কথা, বিয়ের মাধ্যমে

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৩৬

[২] সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৪৬

পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও দয়া-মায়ার সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন—

الْيَوْمَ أَحِلَّ لِكُمُ الطَّيْبَاتُ مِنْ طَعَامٍ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ...  
◎

আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পরিত্র জিনিস হালাল করা হলো। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের (জবাইকৃত পশু ও তাদের তৈরিকৃত অন্যান্য হালাল) খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের (জবাইকৃত পশু ও তোমাদের তৈরিকৃত অন্যান্য হালাল) খাদ্যদ্রব্যও তাদের জন্য হালাল। আর (তোমাদের জন্য বিয়ের মাধ্যমে বৈধ করা হলো) মুমিনা সচরিত্বা নারীদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচরিত্বা নারীদেরকে [১]

এটা তো গেল ব্যাপকভাবে আহলে কিতাবদের কথা, যেখানে ইহুদি-খ্রিস্টান উভয় দলই অস্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে কুরআনুল কারিমে খ্রিস্টানদের মুসলিমদের অধিক নিকটবর্তী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَتَعْدِنَ أَشَدُ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا أَشْرَكُوا بِإِسْمِ اللَّهِ مَوْدَةً  
لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَاتَلُوا إِنَّا نَصَارَى هَذِهِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ  
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيَ الرَّسُولِ تَرَى أَغْيَثُهُمْ تَقْيِضُ مِنَ الدَّفْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ  
يَقُولُونَ رَبُّنَا أَمْنَا فَاكْبُنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ  
◎  
[১]

মানবজাতির মধ্যে ইহুদি ও মুশরিকদেরকেই আপনি মুমিনদের প্রতি অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবেন। আর আপনি মুমিনদের সাথে হৃদ্যতা-বন্ধুত্বে সবচে নিকটবর্তী পাবেন তাদেরকে, যারা বলে, ‘আমরা খ্রিস্টান।’ এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে অনেক পশ্চিম ও সংসারবিরাগী রয়েছে এবং এজন্যও যে, তারা অহংকার করে না। আর রাসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারা যখন তা শ্রবণ করে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য আপনি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবেন। তারা বলে, হে আমাদের

[১] সুরা মায়দা, আয়াত : ৫

প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আপনি আমাদের (সত্যের) সাক্ষীদের দলভুক্ত করুন।<sup>[১]</sup>

### আহলে কিতাব যখন চুক্তিবন্ধ

পূর্বোক্ত এসব নির্দেশনা সকল আহলুল কিতাবের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে (জিজিয়া কর দিয়ে) ইসলামি রাষ্ট্রে অবস্থানকারী আহলে কিতাবদের জন্য রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। এদেরকে ইসলামি পরিভাষায় ‘যিন্মি’ বা ‘আহলুয় যিন্মাহ’ বলা হয়। ‘যিন্মাহ’ অর্থ নিরাপত্তা-চুক্তি। শব্দটি ইঞ্জিত করে যে, তাদের সঙ্গে আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুসলিম সমাজের চুক্তি হয়ে গিয়েছে—তারা (বাংসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ জিজিয়া কর দিয়ে) ইসলামি রাষ্ট্রের ছায়ায় নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হয়ে বসবাস করবে।

আধুনিক পরিভাষায় বলা যায়, এরা হলো ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই মুসলিমদের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, তাদের অধিকার মুসলিমদের মতো এবং তাদের শাস্তিও মুসলিমদের মতোই। তবে আকিদা ও ধর্মের কথা ভিন্ন। এক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাস তারা লালন করবে, সেটা মুসলিমদের চিন্তার বিষয় নয়।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামি রাষ্ট্রের চুক্তিবন্ধ নাগরিকদের অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। তিনি চুক্তি-লঙ্ঘনকারীদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি ও শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। হাদিসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রায়িয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرْجِعْ رَأْيَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবন্ধ কাফিরকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের স্বাণও পাবে না।  
অর্থচ তার স্বাণ ৪০ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।<sup>[২]</sup>

[১] সুরা মায়দা, আয়াত : ৮২-৮৩

[২] সহিল বুখারি : ৩১৬৬; সুনানুন নাসাই : ৪৭৫০

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন—

مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا ، أَوْ اتَّقَصَهُ ، أَوْ كَلَفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ ، أَوْ أَحَدَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبٍ نَفْسٍ ،  
فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তির ওপর যুলম করবে বা তার প্রাপ্য কম দেবে কিংবা তাকে তার সামর্থ্যের বাইরে কিছু করতে বাধ্য করবে অথবা তার সন্তুষ্টিমূলক সম্মতি ছাড়া তার কাছ থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হব।[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফাগণ অমুসলিম নাগরিকদের এসব অধিকার ও প্রাপ্যের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। বিভিন্ন মাযহাবের ফকিহগণও তাদের অধিকার ও প্রাপ্য নিশ্চিতকরণের প্রতি জোর দিয়েছেন।

মালিকি মাযহাবের বিখ্যাত ফকিহ ইমাম কারাফি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘নিরাপত্তা চুক্তির ফলে তাদের কিছু অধিকার নিশ্চিতকরণ আমাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, তারা আমাদের রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়ে আল্লাহ, তাঁর রাসূল, ইসলাম ও মুসলিমদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। অতএব, কেউ যদি তাদের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে, তাদের উদ্দেশ্য মন্দ কথা বলে, তাদের বিরুদ্ধে কৃৎসা রটায় অথবা অন্য কোনো উপায়ে তাদের কষ্ট দেয় বা তাদের কষ্ট দিতে সাহায্য করে, সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ইসলামের চুক্তি ভঙ্গ করল। ইমাম ইবনু হায়ম জাহিরি রাহিমাহুল্লাহ অনুরূপ কথাই বলেছেন। তিনি বলেন, যিন্মি (নিরাপত্তা-চুক্তিতে আবদ্ধ) কোনো কাফির যদি আমাদের ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করে, আর ইসলামের শত্রুরা তার ওপর আক্রমণ করতে আসে, তাহলে তাকে রক্ষায় যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া আমাদের সবার ওপর অপরিহার্য হয়ে যায়। এর জন্য দরকার হলে শহিদ হয়ে যেতে হবে, তবু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদত্ত নিরাপত্তা-চুক্তি নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। লড়াই না করে কাউকে আক্রমণকারী কাফিরদের হাতে ছেড়ে দেওয়াটা নিরাপত্তা-চুক্তি রক্ষার ব্যর্থতা ও চরম অবহেলার পরিচয় বহন করে।’[২]

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৩০৫২; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৮৭৩১; হাদিসটি সহিহ।

[২] আল-ফুরুক, কারাফি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৪

## অমুসলিমদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা কি বৈধ?

অনেকের মনেই একটি প্রশ্ন আসতে পারে, অমুসলিমদের প্রতি ভালোবাসা, সদাচার কী করে সম্ভব। অথচ কুরআনে তো কাফিরদের প্রতি ভালোবাসা রাখতে এবং তাদেরকে বন্ধু ও সহচর হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন :

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ بَعْضٍ ۝ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ  
فَإِنَّمَا مِنْهُمْ قَاتِلُنَا اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑥

হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম  
সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না [১]

এ প্রশ্নের উত্তর হলো—এই আয়াতের কথাগুলো সর্বক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য নয়। কেননা, এখানে সকল ইহুদি, খ্রিস্টানই এ বিধানের আওতাভুক্ত নয়। সবাই যদি এই বিধানের অঙ্গভূক্ত হতো, তাহলে কুরআনের বহু আয়াত ও হাদিসের বক্তব্য সংঘর্ষিক হয়ে পড়বে। কেননা, কুরআনেই তো আহলে কিতাব নারীদেরকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ও মায়া-মমতার সম্পর্ক তৈরি হবে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এ হৃদ্যতার সম্পর্ক আল্লাহই সৃষ্টি করে দেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... ⑥

আর তিনি তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া-মায়া সৃষ্টি করেছেন [২]

[১] সুরা মায়দা, আয়াত : ৫১

[২] সুরা বুম, আয়াত : ২১

খ্রিস্টানদের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿...وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوْدًةً لِّلّذِينَ آمَنُوا إِنَّا نَصَارَىٰ...﴾

আর আপনি মুমিনদের সাথে হৃদ্যতা-বন্ধুত্বে সবচেয়ে নিকটবর্তী পাবেন  
তাদেরকে, যারা বলে যে, ‘আমরা খ্রিস্টান।’<sup>[১]</sup>

সুতরাং বোৰা গেল, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব নিষেধাজ্ঞার আয়াতটি কেবল ওই সকল  
কাফিরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা ইসলামের সাথে শত্রুতা রাখে এবং মুসলিমদের  
সাথে যুদ্ধ ও বিরোধিতায় লিপ্ত থাকে। এ ধরনের কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন  
এবং তাদেরকে কোনোরূপ সাহায্য-সহযোগিতা করা বৈধ নয়। এদেরকে অন্তরঙ্গ  
বন্ধু ও সহচর হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে মুসলিমদের গোপন বিষয়াদি জানার  
পথ করে দেওয়া যাবে না। এ বিষয়টি অন্য আরেকটি আয়াতে স্পষ্ট হয়েছে। আল্লাহ  
তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَعَذُّزُوا بِطَائِنَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُوئُكُمْ خَبَالًا وَدُوَّا مَا عِنْتُمْ قَدْ بَدَتِ  
الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَفْقِلُونَ  
هَا أَنْتُمْ أُولَئِنَّجُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَثُوَمُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا  
خَلُوا عَصُّوْا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْقَنِيطِ قُلْ مُؤْمِنُوا بِعِنْيَطِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  
[১]

‘হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের (মুসলিম সম্প্রদায়) ছাড়া অন্য (কাফির  
সম্প্রদায়ের) কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। তারা তোমাদের  
অনিষ্ট সাধনে কোনো ত্রুটি করে না। তারা তোমাদের দুর্ভোগ কামনা করে।  
তাদের মুখ থেকে তো শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। আর তাদের অন্তরে  
যা সুষ্ঠু আছে, তা তো আরো ভয়াবহ। আমি তোমাদের জন্য নির্দেশনসমূহ  
বিশদভাবে বিবৃত করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন করতে পারো। ভেবে  
দেখো, তোমরা (বন্ধু ভেবে) তাদেরকে ভালোবাসো, কিন্তু তারা  
তোমাদেরকে ভালোবাসে না। আর তোমরা (অসমান থেকে নায়িলকৃত)  
সমস্ত কিতাবের প্রতি ঈমান রাখো, (কিন্তু তারা তোমাদের কিতাবের প্রতি  
ঈমান আনে না) এবং যখন তারা তোমাদের সাক্ষাতে আসে, তখন তারা

[১] সুরা মায়দা, আয়াত : ৮২

বলে, আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু যখন তারা একা হয়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রমে তারা দাঁত দিয়ে নিজেদের আঙ্গুল কানড়ে ধরে। আপনি বলুন, তোমরা নিজেদের আক্রমে মরে যাও। নিশ্চয় অন্তরে যা রয়েছে,  
আল্লাহ সে ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত।<sup>[১]</sup>

ইসলাম-বিদ্বেষী সম্প্রদায়, যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা যাবে না, আয়াতটিতে তাদের বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এদের অন্তরে মুসলিমদের উন্ন্য রয়েছে শত্রুতা, ঘৃণা-বিদ্বেষ। নানা সময় তাদের মনের সুপ্ত বিষ তাদের মুখের কথাতেও প্রকাশ পেয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ...  
⑤

যে সকল লোক আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না—হোক না তারা (অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীরা)  
তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা এদের জাতি-গোষ্ঠী<sup>[২]</sup>

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী মনোভাব কেবল কুফরই নয়; বরং এটা ইসলামের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষের ভিত্তিমূল এবং মুসলিমদের সাথে শত্রুতার কেন্দ্রীয় শক্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوّكُمْ أُولَئِنَاءِ تُلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا  
جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّا كُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ...  
①

হে মুমিনগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও। অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্ত্ব এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা রাসুলকে

[১] সুরা আলি-ইন্দুরান, আয়াত : ১১৮-১১৯

[২] সুরা মুজাদালা, আয়াত : ২২

এবং তোমাদেরকে বহিকৃত করেছে এই কারণে সে, তোমরা তোমাদের  
প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস করো।<sup>[১]</sup>

এই আয়াতটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধবাদী এবং তাদের সঙ্গে শত্রুতা  
পোষণকারী মক্কার মুশারিকদের সম্পর্কে অবর্তীর্ণ হয়েছে, যারা মুসলিমদের বন্দেশ  
তাগে বাধ্য করেছে শুধু এই কারণে যে, মুসলিমরা বলেছিল—আল্লাহ আবাদের  
রব। এদের মতো শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কখনোই বৈধ নয়। তবু কুরআন এদের  
হৃদয়ের সুচ্ছতার ব্যাপারে মুমিনদেরকে একেবারে নিরাশ করেনি এবং তাদের  
ঈমানের বিষয়ে পরিপূর্ণ হতাশার কথাও বলেনি। কুরআনে বরং মুমিনদের মধ্যে  
আশা জাগিয়ে রেখেছে—হয়তো তাদের পরিবর্তন ঘটবে, তাদের হৃদয় নির্মল হয়ে  
উঠবে। একই সুরায় আল্লাহ তাআলা বলেন—

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ لَيْتَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١﴾

যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে, আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদের  
ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আর আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং  
আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।<sup>[২]</sup>

কুরআনের এই সর্তর্কতা কাফিরদের প্রতি অতিরিক্ত বৈরিতা ও শত্রুতা থেকে বেঁচে  
থাকার জন্য যথেষ্ট। আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أَخِيبُ حَبِيبَكَ هُونَاً مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بِغَيْضَكَ يَوْمًا مَا ، وَأَبْغِضُ بَغِيْضَكَ هُونَاً مَا عَسَى  
أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا

বন্ধুকে ভালোবাসো একটু আস্তে-ধীরে। হয়তো সে কোনো একদিন তোমার  
শত্রু হয়ে যাবে। আর শত্রুকে ঘৃণা করো একটু রয়ে-সয়ে। হয়তো সে কোনো  
একদিন তোমার বন্ধু হয়ে যাবে।<sup>[৩]</sup>

[১] সুরা মুমতাহিনা, আয়াত : ১

[২] সুরা মুমতাহিনা, আয়াত : ৭

[৩] আমিটেড ডিমিসি : ১৯৯৭; আল-মুজামুল আওসাত, তাৰামানি : ৩৩৯৫; হাদিসটি সহিহ।

ইসলামের শত্রুরা যদি প্রভাবশালী হয়, তাহলে তো তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন আরো আগেই হারাম। কেননা, মুনাফিক ও দুর্বল-চিন্তের লোকজন শক্তিশালী ও প্রভাবশালী কাফিরদের বন্ধুত্ব গ্রহণের জন্য লালায়িত থাকে, যাতে ভবিষ্যতে বিপদাপদে তাদের সাহায্য পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা এসব মুনাফিকের মুখেশ উম্মোচন করে বলেন—

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقْتُلُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصِبِّحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿١﴾

সুতরাং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, আপনি তাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি ওদের (অর্থাৎ ইহুদি, নাসারা ও মুশরিকদের) সাথে মিলিত হতে দেখবেন এই বলে যে, আমাদের আশঙ্কা হয় কোনো বিপদ আমাদের ওপর এসে পড়ে কিনা। এরপর হতে পারে আল্লাহ (মুমিনদের) বিজয় বা তাঁর কাছ থেকে এমন কিছু দেবেন, যাতে তারা (অর্থাৎ অন্তরে ব্যাধিগ্রস্ত মুনাফিকরা) তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল সে জন্য লজ্জিত হবে [১]

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের ব্যাপারে আরো বলেন—

بَشِّرِ الْمُتَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧٩﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ هُوَ أَيْتَنْجُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٨٠﴾

আপনি মুনাফিকদের সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) কাছে সম্মান চায়? অথচ যাবতীয় সম্মান তো কেবল আল্লাহরই [২]

### অমুসলিম থেকে সহায়তা গ্রহণ

নিরেট দ্বীনি বিষয় ছাড়া অন্যান্য শাস্ত্রীয় বিষয়, চিকিৎসা, কল-কারখানা, চাষবাস

[১] সুরা মাযিদা, আয়াত : ৫২

[২] সুরা নিসা, আয়াত : ১৩৮-১৩৯

ইত্যাদি কাজকর্মে শাসক-জনগণ সবাই অমুসলিমদের থেকে সাহায্য নিতে পারবে, এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে এসব বিষয়ে মুসলিমদের স্বাবলম্বী ও সুনির্ভর হওয়া জরুরি ও অধিকতর উত্তম।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী থেকে আমরা জানতে পারি, হিজরতের সময় তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আরিকিতকে সঙ্গে নিয়েছিলেন পথপ্রদর্শক হিসেবে। তখন আব্দুল্লাহ ছিলেন মুশরিক। আলিমগণ বলেন, কাফির হলে ব্যক্তিকে বিশ্বাসই করা যাবে না, বিষয়টি এমন নয়। কেননা, পথপ্রদর্শনের চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কোনো কাজ নেই। বিশেষ করে, হিজরতের সফরে। এক্ষেত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি একজন অমুসলিমের প্রতি আস্থা রাখতে পারেন, তাহলে আমাদের আস্থা রাখতে সমস্যা কোথায়?

মুসলিম নেতার জন্য যুদ্ধের সময় অমুসলিমদের মাধ্যমে, বিশেষ করে আহলে কিতাবদের মাধ্যমে সহযোগিতা গ্রহণে কোনো বাধা নেই। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অমুসলিমগণ গনিমতের অংশ পাবে মুসলিম যোদ্ধাদের মতোই।

ইমাম যুহরি রাহিমাল্লাহ মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন—

*أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَانَ بِنَاسٍ مِّنَ الْيَهُودِ فِي حَرْبٍ فَأَسْهَمُوا لَهُمْ*

| নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের জন্য কিছু ইহুদি লোকের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের জন্য গনিমতের অংশও বরাদ্দ করেছিলেন।<sup>[১]</sup>

সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া রায়িয়াল্লাহু আনহু মুশরিক থাকাকালীন একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন—

*أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَذْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ*

| হুনাইনের যুদ্ধের দিন (সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার লোহবর্মসমূহ ধার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।<sup>[২]</sup>

[১] মাগ্রাসিলু আবি দাউদ : ২৮১; সুনানু সাইদ ইবনু মানসুর : ২৭৯০; হাদিসাটি দুর্বল মুরসাল।

[২] সুনানু আবি দাউদ : ৩৫৬২; মুসনাদু আহমাদ : ১৫৩০২; হাদিসাটি হাসান।

অমুসলিমের কাছ থেকে সাহায্য নিতে হলে তার অবশ্যই মুসলিমদের বিষয়ে সুধারণা থাকতে হবে। সে যদি মুসলিমদের জন্য নিরাপদ না হয়, তাহলে তার মাধ্যমে সাহায্য নেওয়া যাবে না। কেননা, যেখানে কোনো মুসলিমও যদি যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য অনিরাপদ হয়, যেমন : নৈরাশ্য-সৃষ্টিকারী ও গুজব-রটনাকারী, তাহলে তার থেকে আমরা সাহায্য নিই না, সেখানে অনিরাপদ অমুসলিম তো আরো আগেই বাদ যাবে।<sup>[১]</sup>

অমুসলিমের হাদিয়া গ্রহণ ও তাকে হাদিয়া দেওয়া বৈধ। আলি রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন—

أَهْدَى كِسْرَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقِيلَ مِنْهُ ، وَأَهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقِيلَ مِنْهُ ، وَأَهْدَتْ لَهُ الْمُلُوكُ فَقِيلَ مِنْهَا

কিসরা (পারস্যের বাদশা) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপটোকন পাঠিয়েছে, তিনি তার হাদিয়া গ্রহণ করেছেন। কাইসার (রোমের বাদশা) তাকে উপটোকন পাঠিয়েছে, তিনি তার উপটোকন গ্রহণ করেছেন। অন্যান্য রাজা-বাদশাহ উপটোকন পাঠিয়েছে, তিনি তাদের উপটোকনও গ্রহণ করেছেন।<sup>[২]</sup>

মুহাদিসগণ বলেন, কাফিরদের পক্ষ থেকে আসা হাদিয়া গ্রহণের ঘটনা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে অহরহ ঘটেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও হাবশার বাদশাকে উপটোকন পাঠিয়েছেন। উম্মু সালামা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ مِنَ النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِنْ حَرِيرٍ

আমি নাজাশির জন্য একজোড়া পোশাক ও কয়েক উকিয়া রেশম হাদিয়া পেয়েছি।<sup>[৩]</sup>

[১] আল-মুগনি, ইবনু কুদামা, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৫৭

[২] মুসনাদু আহমাদ : ৭৪৭; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৮৭৯২; হাদিসটির সনদ যইফ।

[৩] মুসনাদু আহমাদ : ২৭২৭৬; মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার : ১১৬৪১; হাদিসটির সনদ যইফ।

ইসলামে একজন মানুষ, সে মানুষ হিসেবেই সম্মানের যোগ্য। একজন আহলে কিতাব তো আরো সম্মানিত। আর সে যদি হয় ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক, তাহলে তো সে আরো বেশি সম্মান ও কদর পাওয়ার যোগ্য।<sup>[১]</sup>

সাহল ইবনু হুনাইফ রায়িয়াল্লাহু আনহু ও কায়স ইবনু সাদ রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তারা বর্ণনা করেন—

إِنَّ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرِثَتْ بِهِ جَنَازَةُ فَقَامَ ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ ، فَقَالَ:  
أَلَيْسَتْ نَفْسًا

একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলে তাকে বলা হলো, এটা তো এক ইহুদির মরদেহ! তিনি বললেন, সে কি একটি প্রাণ নয়?<sup>[২]</sup>

বস্তুত ইসলামে প্রতিটি প্রাণেরই তার স্তর ও ধরন অনুসারে সম্মান আছে।<sup>[৩]</sup>

[১] ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হিসেবে কেউ তখনই প্রকৃত সম্মানযোগ্য হবে, যখন সে মুসলিম হবে। আর অমুসলিম হলে দেখতে হবে, সে যিন্মি ও মুআহিদ কাফির নাকি হারবি কাফির। যদি সে যিন্মি কাফির হয় অর্থাৎ ইসলামি রাষ্ট্রে জিজিয়া-কর দিয়ে মুসলিমদের নিরাপত্তা নিয়ে বসবাস করে, তাহলে সে পার্থিব জীবনে মানুষ হিসেব সম্মানযোগ্য। একইভাবে সে যদি মুআহিদ কাফির হয় অর্থাৎ কুফরি রাষ্ট্রে বসবাস করলেও সে ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে সন্ধিচুক্তিতে আবধূ, তাহলে সেও পার্থিব জীবনে মানুষ হিসেব কিছুটা সম্মানযোগ্য। তবে তার সম্মান-মর্যাদা যিন্মির চেয়ে নিম্নমতের। আর যদি সে হারবি কাফির হয় অর্থাৎ সে ইসলামি রাষ্ট্রেও বসবাসকারী নয়, আবার সন্ধিচুক্তিতে আবধূ কোনো কুফরি রাষ্ট্রেও নাগরিক নয়, তাহলে সে ইসলামের দৃষ্টিতে সম্মানযোগ্য নয়। তাকে অসম্মান করাটা যদিও জরুরি বা অপরিহার্য কোনো বিষয় নয়, তবে সে মুসলিমদের থেকে যিন্মি ও মুআহিদ কাফিরদের মতো সুযোগ-সুবিধাও পাবে না। অবশ্য কেউ যদি আল্লাহ, রাসূল কিংবা ইসলাম নিয়ে কষ্টিত করে কিংবা কোনো বিধান নিয়ে অবঙ্গ দেখায় অথবা ইসলামের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শত্রুতা রাখে, তাহলে সে কোনোভাবেই আর সম্মানের উপর্যুক্ত থাকবে না; বরং তার অপরাধের স্তরভেদে সে মুসলিমদের নিকট শাস্তিযোগ্য বা কখনো হত্যাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং কাফিরকে মানুষ হিসেবে সম্মান জানাতে হবে বলে যে কথাটি অনেকের মুখে শোনা যায় কিংবা অনেকের লেখায় পাওয়া যায়, তা পুরোপুরি সঠিক নয়। বস্তুত সব কাফিরের বিধান এক নয় এবং সব কাফিরই সম্মান ও নিরাপত্তার অধিকারীও নয়। তাদের কিছু আছে, যাদেরকে ইসলামের পক্ষ থেকে পার্থিব নিরাপত্তা ও সম্মান দেওয়া হয়েছে। আর অন্য যারা আছে, তাদের এমন কোনো সম্মান ও নিরাপত্তা নেই। তাই এ বিধানের ব্যাপারে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। কোথাও যেন বাড়াবাড়িও না হয়, আবার ছাড়াছাড়িও না হয়; বরং সর্বত্র মধ্যপন্থাই হলো ইসলামের শিক্ষা।

[২] সহিল বুখারি : ১৩১২; সহিহ মুসলিম : ৯৬১

[৩] হানাফি মাযহাব ও হাস্বলি মাযহাবের মত হলো, জানায়ার লাশ দেখে দাঁড়াবে না। তবে এমনিতেই

## ইসলামের দয়া সর্বজনীন

একজন অমুসলিমের সঙ্গে অসদাচরণ কিংবা তাকে কষ্ট দেওয়া কী করে বৈধ হবে, ইসলাম যেখানে প্রতিটি জীবের প্রতিই দয়ার কথা বলে! ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অবজ্ঞা প্রাণীর প্রতিও কঠোর আচরণে বাধা দেয়।

আধুনিক সময়ে এসে পশু অধিকারের বিভিন্ন আইন-কানুন তৈরি হচ্ছে, কিন্তু ইসলাম আরো চৌক্ষিক বছর আগেই অবলা পশুপাখি ও বিভিন্ন জীবজন্তুর প্রতি দয়াকে ঈমানের অঙ্গ ঘোষণা দিয়েছে। বিভিন্ন হাদিস থেকে বোঝা যায়, প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া এবং সেগুলোর প্রতি নিষ্ঠুরতা জাহানামে যাওয়ার কারণ।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগের যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন—

بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي . فَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ . فَئَزَّلَ بِثِرًا . فَسَرَبَ مِنْهَا . ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ  
بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التَّرَى مِنَ الْعَطْشِ . قَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي . فَهَلَّا  
خُفْهُ . ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ . ثُمَّ رَقَيْ . فَسَقَى الْكَلْبَ . فَسَكَرَ اللَّهُ لَهُ . فَغَفَرَ لَهُ " . قَالُوا: يَا  
رَسُولَ اللَّهِ . وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: «فِي كُلِّ كَيْدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ»

একজন লোক রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লাগল। সে কৃপে নেমে পানি পান করল। এরপর সে বের হয়ে দেখে, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে মাটি চেঁটে খাচ্ছে। সে তখন (মনে মনে) বলল, কুকুরটারও আমার মতো অবস্থা হয়েছে। এরপর সে কৃপের মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা ভরে পানি নিয়ে মুখ দিয়ে সোটি আঁকড়ে ধরে ওপরে উঠে এলো। এরপর কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তাআলা তার এ কাজের প্রতিদান দিয়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, চতুর্ক্ষণ্ড

লাশ দেখার উদ্দেশ্যে হলে তিনি কথা, সেক্ষেত্রে দাঁড়াতে কেনো সমস্যা নেই। হাস্তি মাযহাবে লাশের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোকে মাকরুহ বলা হয়েছে। আর শাফিয়ি মাযহাবের মত হলো, এটা আবশ্যিকীয় নয় এবং মুসতাহাবও নয়। যদিও তাদের একদল এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন। মালিকি মাযহাবেরও মত হলো, এটা আবশ্যিকীয় নয় এবং মুস্তাহাবও নয়। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম ইবনু দাবিদ রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম ইবনু মাজিশুন রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ থেকে কাবি ইয়ায় রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, জ্ঞানাধার লাশ দেখে দাঁড়ানোর বিষয়টি ইচ্ছাকীর্তন বিষয়। কেউ চাইলে দাঁড়াতেও পারে, আবার চাইলে না-ও দাঁড়াতে পারে। [আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া, খণ্ড : ১৬, পৃষ্ঠা : ১৫-১৬]

জীবজন্মের উপকার করলেও কি তাতে আমাদের সাওয়াব হবে? তিনি বললেন,  
প্রত্যেক জীবন্ত কলিজার প্রাণীর ক্ষেত্রেই সাওয়াব রয়েছে।<sup>[১]</sup>

প্রাণীর প্রতি দয়ার প্রতিদান হিসেবে যেমন রয়েছে ক্ষমা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি, তেমনই  
প্রাণীর প্রতি নির্দয় আচরণের ফলে রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি। ইবনু উমার  
রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলি  
ইসরাইলের একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন—

دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَّبَطْنَهَا فَلَمْ تُطِعْمَهَا وَلَمْ تَدْعَهَا تَأْكُلْ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ

বিড়ালের কারণে এক নারী জাহানামে প্রবেশ করেছে। বিড়ালটিকে সে আটকে  
রেখেছিল। কোনো খাবার খেতে দেয়নি তাকে। ছেড়েও দেয়নি তাকে, যাতে  
সে জমিন থেকে পোকামাকড় খেতে পারে।<sup>[২]</sup>

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাণীর প্রতি দয়া ও যত্নের পরাকার্ষা  
দেখিয়েছেন। তিনি অবলা জীবজন্ম ও প্রাণীর কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। কোনো  
প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া হলে তিনি খুবই ব্যথিত হতেন। ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু  
আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ قَالَ: فَوَاللَّهِ! لَا  
أَسِمُّهُ إِلَّا فِي أَفْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখে-সেকা-দেওয়া একটি গাধা  
দেখতে পেলেন। নবিজির কাছে এটা খুবই খারাপ লাগল। তিনি বললেন, আল্লাহর  
কসম, আমি হলে তার চেহারার খুব ক্ষুদ্রাংশে সেকা দিতাম।<sup>[৩]</sup>

আরেক হাদিসে জাবির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ قَقَالَ: لَعْنَ اللَّهِ الَّذِي وَسَمَهُ

[১] সহিল বুখারি : ২৩৬৩; সহিহ মুসলিম : ২২৪৪

[২] সহিল বুখারি : ৩৪৮২; সহিহ মুসলিম : ২৬১৯

[৩] সহিহ মুসলিম : ২১১৮; সহিল ইবনি হিবান : ৫৬২৪

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশ দিয়ে একটি গাধা অতিক্রম করছিল, যার মুখে দাগ দেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি একে দাগ লাগিয়েছে, আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করুন।[১]

পূর্বেই আমরা ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা উল্লেখ করেছি যে, সাইদ ইবনু জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ ، أَوْ بِنَفْرٍ ، نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَقَرَّقُوا عَنْهَا ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا

আমি ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুর কাছে ছিলাম। এরপর তারা (অর্থাৎ ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু ও তার সঙ্গীরা) এমন একদল তরুণের বা দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যারা একটি মুরগি বেঁধে রেখে তাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তির নিক্ষেপ করছিল। তারা যখন ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে পেল, তখন তারা সেখান থেকে (স্টকে পড়ে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু বললেন, এমন কাজ কে করেছে? এমন কাজ যে করে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অভিশাপ দিয়েছেন।[২]

ইবনু আবাস রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চতুর্ক্ষণ জন্মের মধ্যে যুদ্ধ বাধাতে নিষেধ করেছেন।[৩]

ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِخْصَاءِ الْحَيْنَلِ وَالْبَهَائِمِ

[১] সহিহ মুসলিম : ২১১৭; সহিল্লু ইবনি হিবান : ৫৬২৮

[২] সহিল্লু বুখারি : ৫৫১৫; সহিহ মুসলিম : ১৯৫৮

[৩] সুনানু আবি দাউদ : ২৫৬২; জামিউত তিরমিয়ি : ১৭০৮; হাদিসের সনদটি মারফু হিসেবে দুর্বল। তবে ইমাম বুখারি ও ইমাম বাইহাকি ইবনু উমার রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে মাওকুফ সূত্রে হাদিসটি সহিহ বলেছেন।

| রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোড়া ও চতুর্ক্ষণ জন্মুকে খাসি করতে  
নিষেধ করেছেন [১]

জাহিলি যুগে কাফিররা চতুর্ক্ষণ জন্মুর কান কেটে দিত। আল্লাহ তাআলা কঠোর ভাষায় তাদের এমন কাজের নিন্দা করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, এগুলো হলো শয়তানের নির্দেশিত কাজ। আল্লাহ তাআলা শয়তানের বক্তব্য বর্ণনা করে বলেন—

وَقَالَ لَا تَخْذِنُ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ⑪ ۚ وَلَا ضِلَّلَنَّهُمْ وَلَا مُنْتَهَيَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّنُكُنْ ۚ  
آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ... ⑫

আর শয়তান বলল, অবশ্যই আমি আপনার বাল্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (আমার অনুসারী হিসেবে) প্রহণ করব। আর আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, আমি অবশ্যই তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করব। আর অবশ্যই আমি তাদেরকে (প্ররোচনার মাধ্যমে) নির্দেশ দেবো। ফলে তারা পশুর কান ছিঁড়ি করবে। আর আমি অবশ্যই তাদেরকে (প্ররোচনার মাধ্যমে) নির্দেশ দেবো। ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে [২]

জবাই-বিষয়ক আলোচনার সময় আমরা দেখেছি, যথাসন্ত্ব প্রাণীকে কম কষ্ট দিয়ে জবাইয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম করতা আগ্রহী! পশুর কষ্ট যেন কম হয় সেজন্য জবাইয়ের অস্ত্র শান্তি করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং সেটি প্রাণী থেকে লুকিয়ে রাখতে বলা হয়েছে। তাছাড়াও এক প্রাণীর সামনে আরেক প্রাণী জবাই দিতেও নিষেধ করা হয়েছে। জীবজন্মুর প্রতি এই ধরনের মমতা ও যত্নাদি কি দুনিয়া দেখেছে কখনো?



[১] মুসলাদু আহমাদ : ৪৭৬৯

[২] সুরা নিসা, আয়াত : ১১৮-১১৯



## পরিশিষ্ট

মানুষের বাহ্যিক ও দৈহিক কাজকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হালাল-হারামই ছিল এই বইয়ের আলোচ্য বিষয়। অভ্যন্তরীণ বিষয়াদির মধ্যেও বৈধ-অবৈধ বিষয় রয়েছে। যেমন : হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, অহমিকা, লৌকিকতা, কপটতা, কার্পণ্য, লালসা ইত্যাদি। এগুলোও নিষিদ্ধ ও হারাম। তবে এসব বিষয় এই বইয়ের মূল আলোচ্য বিষয় নয়।

অভ্যন্তরীণ রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে ইসলামের অনন্ত লড়াই জারি আছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব রোগের অনিষ্ট ও ক্ষতি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করেছেন। হাদিসে বেশ কিছু আত্মিক ব্যাধিকে পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির ধর্মসের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পাঠকমাত্রই জানার কথা, কুরআন ও হাদিসে বারবার বলা হয়েছে, অন্তরের সুস্থতা ও নির্মলতাই দুনিয়া ও আখিরাতে মানবজাতির ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়ন ও সাফল্যের মূল ভিত্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُفَرِّمُ مَا يُقَوِّيْ مَحْتَى يُعَيِّرُوا مَا يَأْنِسُهُمْ ...

নিচ্যই আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না। যতক্ষণ না  
তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরাই পরিবর্তন করে [১]

---

[১] সূরা রাদ, আয়াত : ১১

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَوْمَ لَا يَنْقُعُ مَالٌ وَلَا بُنُونَ ﴿٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقُلْبٍ سَلِيمٍ

যেদিন ধন-সম্পদ ও সম্ভানসন্ততি কোনো কাজে আসবে না। তবে যে ব্যক্তি  
বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট আসবে (সে-ই কেবল উপকৃত হবে) [১]

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিখ্যাত হাদিসটি  
বর্ণিত হয়েছে। নুমান ইবনু বা�শির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,  
আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

الحالُ بَيْنَ ، وَالحَرَامُ بَيْنَ ، وَبَيْنِهِمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى  
الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبَرَ لِدِينِهِ وَعَرَضِيهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ: كَرَاءٌ يَرْعَى حَوْلَ الْجِهَنَّمِ ،  
يُوشِكُ أَنْ يُؤَاقِعَهُ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَّ ، أَلَا إِنَّ حَمَّ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ  
فِي الْجَسَدِ مُضَعَّةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا  
وَهِيَ الْقَلْبُ

হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দুয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক  
বিষয়, যা অনেকেই জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে  
বেঁচে থাকবে, সে তার দীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক  
বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সেই রাখালের মতো, যে তার  
পশুগুলো বাদশাহর সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলোর  
সেখানে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জেনে রাখো, প্রত্যেক বাদশাহরই একটি  
সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রাখো, আল্লাহর জমিনে তাঁর সংরক্ষিত  
এলাকা হলো তাঁর হারাম বা নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রাখো, শরীরের মধ্যে  
একটি গোশতের টুকরো আছে। তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন  
ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন দূষিত হয়ে যায়, তখন গোটা শরীরই দূষিত হয়ে  
যায়। জেনে রাখো, সে গোশতের টুকরোটি হলো অন্তর [২]

[১] সূরা শুআরা, আয়াত : ৮৮-৮৯

[২] সহিল বুখারি : ৫২; সহিহ মুসলিম : ১৫৯৯

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালক ও তত্ত্ববধায়ক হলো অন্তর। অন্তর ভালো থাকলে ভালো থাকবে দেহ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আর অন্তর বিচ্যুত হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই হয়ে পড়বে বিচ্যুত।

আল্লাহ তাআলা অন্তর ও সংকল্পের নিষ্ঠিতে সবকিছু মাপেন। বাহ্যিক আকৃতি, মৌখিক কথাবার্তা এগুলো আল্লাহ তাআলার কাছে কিছুই না। আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

| নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা-সুরত ও ধনসম্পদ দেখেন না; বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও কর্ম।<sup>[১]</sup>

উমার ইবনুল খাত্বাব রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِاللِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرٍ مَا نَوَى

| সকল কর্ম নিয়তের সাথেই সম্পৃক্ত। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য (ভালো-মন্দ) তা-ই বরাদ্দ থাকবে, যার সে নিয়ত করেছে।<sup>[২]</sup>

গৃট ও অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোর অবস্থান এটা। কিন্তু আমাদের বইয়ে এ বিষয়ে তেমন আলোচনা উল্লেখ করা হয়নি। এই বিষয়টি নেতৃত্ব বিধানাবলির অন্তর্ভুক্ত। নেতৃত্ব ও তাসাউফ-বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে লেখালেখি করেছেন এবং কলম ধরেছেন। এগুলোকে ‘অন্তরের রোগ’ বলে অভিহিত করে থাকেন তারা। এসব ব্যাধির শেকড়, শাখা-প্রশাখা এবং কুরআন সুন্নাহের আলোকে এর চিকিৎসা নিয়েও তারা লিখেছেন। ইহইয়াউ উলুমিদিনের এক-চতুর্থাংশে ইমাম গায়ালি রাহিমাহুল্লাহ ‘মুহলিকাত’ (ধৰ্মসাম্বক ব্যাধি) শিরোনামে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই

[১] সহিহ মুসলিম : ২৫৬৪; সুনান ইবনি মাজাহ : ৪১৪৩

[২] সহিহুল বুখারি : ১; সহিহ মুসলিম : ১৯০৭

রোগগুলো ‘মুহলিকাত’ শিরোনামে উল্লেখের কারণ, এসব ব্যাধি দুনিয়াতে যেমন ক্ষতি ও ধূংসের কারণ, তেমনই আখিরাতেও জাহানামে যাওয়ার কারণ।

আরেকটি বিষয় হলো, নিষিদ্ধ কাজ করার দুটি ধরন হতে পারে। এক. শরিয়া-নিষিদ্ধ কাজে জড়ানো। দুই. ফরজ বিধান ছেড়ে দেওয়া। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে হারাম বিধান উল্লেখের সময় আমাদের লক্ষ্য ছিল কেবল প্রথম প্রকারে। দ্বিতীয় প্রকারটি এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য নয়। তবে এসৎক্রান্ত আলোচনা কখনো কখনো হয়তো প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে এসেছে। এই বিষয়ে আলোচনায় জড়ালে আমরা মূল বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকতে পারতাম না।

অবশ্য এটাও জানিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য—সকল ফরজ ও ওয়াজিব, যেগুলো শরিয়ত মুসলিমদের ওপর অবধারিত করেছে, সেগুলো ছেড়ে দেওয়া বা তাতে অবহেলা করা নিঃসন্দেহে হারাম। জ্ঞানার্জন প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ। মূর্খতার অন্ধকারে হাবুড়ুর খাওয়া একজন মুসলিমের জন্য জায়িয নয়। ফরজ ইবাদত তথা সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ—ইসলামের এসব মৌলিক বিধান বিনা কারণে ছেড়ে দেওয়া বৈধ নয়। এগুলো ছেড়ে দিলে কবিরা গুনাহ হবে। কেউ যদি এসব বিধানের ব্যাপারে অবমাননা বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে, তাহলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে।

উম্মাহের অস্তিত্ব রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র সংরক্ষণ, প্রস্তুত ও মজুত রাখা উম্মাহের সম্মিলিত দায়িত্ব এবং বিশেষ করে কর্তৃত্ববানদের দায়িত্ব। এই দায়িত্বে অবহেলা করা গুরুতর অপরাধ ও কবিরা গুনাহ। এভাবেই ব্যক্তিগত ও সামাজিক অপরিহার্য বিষয়গুলো সম্পাদিত হবে।

উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও বাকি অধ্যায়ের হালাল-হারাম-সংক্রান্ত যাবতীয় খুঁটিনাটি এই রচনায় উল্লেখ করা হয়েছে, সেই দাবি আমরা করছি না। একজন মুসলিমের ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে ও সামাজিক জীবনে দৈনন্দিন সর্বাধিক প্রয়োজনীয় সিদ্ধ-অসিদ্ধ বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারলেই আমাদের চেষ্টা সার্থক। বিশেষত, যেসব বিধান বা বিধানের পেছনের কারণ সম্পর্কে লোকজন জানে না কিংবা অবহেলা করে, সেগুলো এই রচনায় স্থান পেয়েছে।

হালাল-হারামের ক্ষেত্রে ইসলামের দর্শন ও দূরদর্শিতা আমরা স্পষ্ট আকারে তুলে ধরেছি। আল্লাহ তাআলা মানুষকে অসংযত বানানোর জন্য কোনো কিছু যেমন

হালাল করেননি, তেমনই তাদের জীবন কঠিন বানানোর জন্য কোনো কিছু হারামও করেননি। মানুষের জীবন, দ্বীন ও দুনিয়া, তাদের সত্তা ও চিন্তা, তাদের চরিত্র, ইজ্জত-আবু, সম্পদ ও সন্তান, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে তাদের জন্য কল্যাণকর বিষয়াদির ফয়সালাই আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন।

মানব-রচিত বিধানের সমস্যা হলো, এগুলো সবসময় অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত হয়। কারণ, আইন বা বিধানদাতা ব্যক্তি, সরকার কিংবা পার্লামেন্টে যা-ই হোক না কেন, তারা শুধু বাহ্যিক ও বস্তুগত উপকার ও কল্যাণই বিবেচনায় রাখবে। দ্বীন ও নৈতিকতা সম্পর্কে তারা থাকবে সদা অসচেতন। তাছাড়া তারা নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করে কেবল নিজ দেশ বা জাতির কথা বিবেচনায় নিয়ে, পুরো বিশ্ব ও সমগ্র মানবজাতি তাদের চিন্তায় অনুপস্থিত থাকে। বর্তমান প্রেক্ষাপট ও অধুনা বিশ্বের দিকে তাকিয়ে তারা বিধান তৈরি করে। অদূর ভবিষ্যৎ বা আগত দিনে কী ঘটবে, সে সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই।

সর্বোপরি তারা হলো মানুষ। তাদের রয়েছে মানবিক দুর্বলতা, অক্ষমতা ও বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ অন্যায়কারী ও অজ্ঞ। আল্লাহ তাআলা মানুষের এ সুভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন—

﴿كَانَ ظُلْمًا جَهْوَلًا...﴾

নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত যালিম, বড়ই অজ্ঞ [১]

সুতরাং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, মানব-রচিত আইনের মূল বিষয়ই হলো সংকীর্ণ, অগভীর পক্ষপাতদুষ্ট এবং সমাজের বস্তুগত সুর্থরক্ষা। তাছাড়া কখনো সেগুলো ব্যাপকভাবে জনমত দ্বারা প্রভাবিত, আর এর ক্ষতি ও বিপজ্জনক পরিণতি তো সুস্পষ্ট।

উদাহরণ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কথাই বলা যায়। সেখানে মদ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু জনমতের তোপের মুখে মাদকদ্রব্যের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। অথচ ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক-জীবনে মাদকদ্রব্যের ক্ষতি সৃষ্টি ও অনসীকার্য।

[১] সুরা আহ্�মাব, আয়াত : ৭২

অপরদিকে ইসলামি আইনবিধি এসব অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত। এটা বিশ্বজগতের স্রষ্টা, সবজাত্তা মহান আল্লাহর দেওয়া আইন। তিনি তো জানেন, তাঁর সৃষ্টির জন্য কোনটা উপকারী আর কোনটা ক্ষতিকর।

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ... ﴿١﴾

আর আল্লাহ তাআলা জানেন, কে হিতকারী আর কে অনিষ্টকারী [১]

স্রষ্টাই তো কেবল তাঁর সৃষ্টির নাড়ি-নক্ষত্র সম্পর্কে জানবেন, তিনি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এতকিছু জানা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَيِّرُ ﴿٢﴾

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানবেন না? তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক  
অবগত! [২]

শরিয়া তো প্রজ্ঞাবান মহামহিমের আইন। তিনি অনর্থক কোনো কিছু হারাম করেন না। ক্ষতিকর কিছুকে বৈধ বলেন না। তার প্রতিটি জিনিস পরিমিত আকারে সৃষ্টি, তাঁর দেওয়া যাবতীয় বিধানই ভারসাম্যের নিষ্ঠিতে ওজনকৃত।

এটা তো দয়াময় প্রতিপালকের দেওয়া বিধান। তিনি বান্দাদের জন্য সহজতা চান, তাদের প্রতি কঠোরতা চাপানো তার কাছে পছন্দনীয় নয়। তিনি কী করে কঠোরতা করবেন! তিনি তো আপন মায়ের চেয়েও তাঁর বান্দাদের প্রতি অধিক দয়ালু।

এটা হলো সর্বশক্তিমান মালিকের প্রদত্ত আইন-কানুন। বান্দাদের ওপর তিনি নির্ভরশীল নন। কোনো দল, জাতি বা প্রজন্মের পক্ষপাতিত্বের প্রয়োজনও তাঁর নেই। জগৎসমূহের মালিক হওয়ার পরেও কেন তিনি একটি জিনিস একজনের জন্য হালাল করবেন, আর অন্যদের জন্য হারাম করে দেবেন? এমনটা তিনি করেন না, সবার জন্য তিনি সমান আইন দিয়েছেন।

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২০

[২] সুরা মুলক, আয়াত : ১৪

হালাল-হারাম ইত্যাদি আল্লাহ তাআলার দেওয়া বিধানের ক্ষেত্রে এটাই একজন মুসলিমের বিশ্বাস। এজন্য সে এই বিধান বিনা দ্বিধায়, খুশি মনে এবং পূর্ণ বিশ্বাস ও বাস্তবায়নের সংকল্পের সঙ্গে মেনে নেয়। তার বিশ্বাস, দুনিয়ার সাফল্য ও আখিরাতের কৃতকার্যতা সবই আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মধ্যেই নিহিত।

এজন্য বান্দার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হলো, তাকে আল্লাহ তাআলার দেওয়া সীমারেখা মেনে চলতে হবে; যাতে সে উভয় জগতের সুখ ও সাফল্য লাভ করতে পারে। আমরা প্রথম যুগের মুসলিমদের জীবন থেকে নেওয়া দুটি দ্রষ্টান্ত এখানে দিতে পারি। কীভাবে তারা আল্লাহর বিধান, আদেশ-নিষেধ ও তাঁর দেওয়া সীমারেখা মেনে চলতেন, নিচের ঘটনা দুটি তার উজ্জ্বল দ্রষ্টান্ত—

[প্রথম ঘটনা] মদ নিষেধের আলোচনার সময় এদিকে আমরা ইঞ্জিত দিয়েছিলাম। আরবের লোকদের মধ্যে মদের নেশা ছিল তীব্র। চারদিকে মদ-শুরা, শুরাপাত্র ও মদের আড়তার ব্যাপক বিস্তৃতি। আল্লাহ তাআলা তো বিষয়টি জানতেনই। এক্ষেত্রে তিনি ধীরে ধীরে হারামের পথ অবলম্বন করলেন।

একপর্যায়ে চূড়ান্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো, কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হলো মদ। ঘোষিত হলো, মদ অপবিত্র এবং তা পান করা শয়তানের কাজ। আল্লাহ তাআলা মদকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে চূড়ান্ত আয়াত নাযিল করলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ ⑤ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاؤُ وَالْبُغْضَاءُ فِي  
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصْنَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهُنَّ مُنْتَهُونَ ﴿٥﴾

হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য-নির্ণয়ক শরসমূহ তো কেবলই ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা সেগুলো বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্রো ঘটাতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর মরণে ও সালাতে বাধা দিতে। অতএব তোমরা কি (মদ-সংশ্লিষ্ট সকল কার্যকলাপ থেকে) নিবৃত্ত হবে? [১]

এরপরেই নবিজি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদ্যপান, মদবিক্রি এবং অমুসলিমদের মদ হাদিয়া—সবই হারাম ঘোষণা করলেন। এ ঘোষণা শোনার পর মুসলিমদের স্টকে যত মদ ও মদের পাত্র ছিল, সেগুলো তারা মদিনার পথে পথে চেলে দিতে লাগলেন। মদ থেকে নিজেদের দায়মুক্তি ঘোষণার জন্য।

আল্লাহ তাআলার বিধান মানার বিস্ময়কর নির্দশনের একটি হলো, তাদের অনেকে তখন মদ্যপানরত অবস্থায় ছিলেন। কারো হাতে তখনো মদের পেয়ালা। পানের পরে পেয়ালায় কিছু অংশ পড়ে আছে। ইতোমধ্যে তাদের কাছে কুরআনের এ নির্দেশ পৌঁছল—‘فَهُلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُونَ’—‘অতএব তোমরা কি (মদ-সংশ্লিষ্ট সকল কার্যকলাপ থেকে) নিবৃত্ত হবে?’<sup>[১]</sup>

আল্লাহর এই কথায় সাড়া দিয়ে সাহাবিরা পেয়ালা থেকে অবশিষ্ট মদটুকু ফেলে দিয়ে বললেন, ‘ইয়া আল্লাহ, আমরা নিবৃত্ত হয়েছি।’<sup>[২]</sup>

মদের বিরুদ্ধে মুসলিম-সমাজের এই স্পষ্ট বিজয় আর যুক্তরাক্তের বিশাল পরাজয় যদি আমরা বাস্তবতার নিরিখে দেখি, তাহলে স্পষ্ট হয়ে যায়—মানুষের জন্য ঐশ্বী বিধানই একমাত্র উপযুক্ত। কেননা, ঐশ্বী বিধানগুলো ক্ষমতা ও আইনের চেয়ে অন্তর ও বিশ্বাসের ওপর অধিক নির্ভরশীল।

[দ্বিতীয় ঘটনা] দেহ-প্রদর্শনীতে নিষেধাজ্ঞা ও পর্দার আদেশ দেওয়ার পরে নারীদের প্রতিক্রিয়া এখানে স্মরণযোগ্য। জাহিলি যুগে নারীরা বুকের উর্ধ্বাংশ খোলা রেখে চলাফেরা করত। অধিকাংশ সময় তারা কাঁধ, চুলের ঝুঁটি, কানের দুল ইত্যাদি দেখিয়ে বেড়াত। আল্লাহ তাআলা নতুন বিধান জারি করে নারীদের ওপর জাহিলি যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করলেন। নির্দেশ দিলেন, তারা যেন জাহিলি নারীদের থেকে শালীনতা বজায় রেখে চলে। মাথার চুল, কানের দুল ও বুক ঢেকে রাখে।

নারী জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুমঙ্গ এই সৌন্দর্য, পোশাক-পরিচ্ছদ। সাধারণত নারীরা আকস্মিক এ জাতীয় কোনো পরিবর্তন মেনে নেয় না, নিতে

[১] সুরা মায়দা, আয়াত : ৯১

[২] আত-তাফসির মিন সুনানি সাইদ ইবনু মানসুর, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৫৬৯, হাদিস : ৮০৮

পারে না। কিন্তু আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা ও উম্মে সালামা রায়িয়াল্লাহু আনহা আমাদেরকে শোনাচ্ছেন, মুহাজির ও আনসার নারীগণ এই নতুন ব্যতিক্রমী ঐশ্বী বিধানকে কীভাবে সুগতম জানিয়েছিলেন!

আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা মুহাজির নারীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন—

بِرَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى لَمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَرْبَنْ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُبُوِيَّهِنَّ  
شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا

আল্লাহ তাআলা প্রাথমিক যুগের মুহাজির নারীদের ওপর রহম করুন, যখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, ‘তারা যেন তাদের ঘাড় ও বক্ষদেশে ওড়না ফেলে রাখে’<sup>[১]</sup>, তখন তারা (সঙ্গে সঙ্গে) নিজেদের চাদর ছিঁড়ে তা দিয়ে (ওড়না বানিয়ে) ঘোমটা টেনে দেন<sup>[২]</sup>

উম্মে সালামা রায়িয়াল্লাহু আনহা আনসার নারীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন—

لَمَّا نَزَّلَتْ {يُذْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيَّهِنَّ} ، خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ  
الْغَرْبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَّةِ

যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, ‘তারা যেন নিজেদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়’<sup>[৩]</sup>, তখন আনসার নারীরা এমনভাবে বের হতো, (কালো রঙের) পোশাক-পরিচ্ছদের কারণে মনে হতো যেন তাদের মাথার ওপর কাক বসে আছে<sup>[৪]</sup>

সাফিয়া বিনতু শাইবা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَذَكَرْتُ نِسَاءَ قُرْبَشِيَّ وَفَضْلَهُنَّ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ لِنِسَاءِ

[১] সুরা নূর, আয়াত : ৩১

[২] সহিলুল বুখারি : ৪৭৫৮; সুনানু আবি দাউদ : ৪১০২

[৩] সুরা আহ্�মাব, আয়াত : ৫৯

[৪] সুনানু আবি দাউদ : ৪১০১; তাফসিলু আব্দির রায়বাক : ২৩৭৭; হাদিসটি সহিহ।

فَرِيشٍ لَفَضْلًا، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ أَشَدَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَلَا  
إِيمَانًا بِالنَّتْزِيلِ لَقَدْ أَنْزَلْتُ سُورَةَ النُّورِ {وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُمِيعِهِنَّ} انْقَلَبَ رِجَالُهُنَّ  
إِلَيْهِنَّ يَتَنَوَّنَ عَلَيْهِنَّ مَا أَنْزَلَ إِلَيْهِنَّ فِيهَا، وَيَئْتُونَ الرَّجُلَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَابْنَتِهِ وَأَخْتِهِ، وَعَلَى  
كُلِّ ذِي قَرَابَتِهِ، مَا مِنْهُنَّ امْرَأٌ إِلَّا قَامَتْ إِلَى مِرْطَبِهَا الْمُرَحَّلِ فَاغْتَبَرَتْ بِهِ تَصْدِيقًا وَإِيمَانًا  
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ، فَأَصْبَحَنَ يُصَلِّينَ وَرَأَءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ  
مُغْتَبَرَاتٍ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْفِرْبَانَ

আমরা আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে বসে ছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি কুরাইশ নারীদের ফয়লত ও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আলোচনা করলাম। তখন আয়িশা রায়িয়াল্লাহু আনহা বললেন, কুরাইশ নারীদের অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্ব আছে। আল্লাহর কসম, আনসারি নারীদের চেয়ে উত্তম, আল্লাহর কিতাবের প্রতি অধিক অনুগত ও বিশ্বাসী কাউকে আমি দেখিনি। সুরা নুরের এ আয়াত অবতীর্ণ হলো—‘তারা যেন তাদের ঘাড় ও বক্ষদেশে ওড়না ফেলে রাখে,’<sup>[১]</sup> তখন আনসারি পুরুষগণ (নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিস থেকে) ঘরের নারীদের কাছে ফিরে এলেন। তারা এসে নারীদের সামনে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার নায়িলকৃত বিধান তিলাওয়াত করে শোনাতে লাগলেন। আনসারি পুরুষ সাহাবি তার স্ত্রী, কন্যা, বোন ও নিকটাত্ত্বাদের সামনে কুরআনের আয়াত পড়ে শোনাচ্ছিলেন। আল্লাহ তাআলার নায়িলকৃত বিধানের প্রতি অনুগত ও সমর্পিত হয়ে তাদের গায়ে থাকা ঝাকমকে চাদর দিয়েই সবাই তখন ঝটপট করে মাথা-চেহারা ঢাকতে শুরু করলেন। পরদিন সকালে আনসার নারীরা মাথা-চেহারা আবৃত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে ফজরের সালাত পড়ার জন্য এলেন। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল, যেন তাদের মাথার ওপরে কাক বসে আছে।<sup>[২]</sup>

আল্লাহ তাআলার বিধানের প্রতি প্রথম যুগের মুমিন নারীগণ এমন সমর্পিতই ছিলেন। কোনো দ্বিধা নেই, কোনো কালক্ষেপণ নেই; আদেশ এসেছে, পালন করো; বারণ এসেছে, বিরত থাকো। মাথা কিংবা বুক ঢাকার জন্য মানানসই কাপড় কেনা কিংবা বানানো, তার জন্য একদিন বা দুদিন সময় ক্ষেপণ, তা-ও চলবে না।

[১] সুরা নুর, আয়াত : ৩১

[২] তাফসিলু ইবনি আবি হাতিম : ১৪৪০৬; তাফসিলু ইবনি কাসির, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪৩; হাদিসটি হাসান।

হাতের কাছে যা-ই পেয়েছেন, যে রঙের কাপড়ই মজুত ছিল, তা-ই যথেষ্ট, তা-ই সুন্দর। কাপড় না থাকলে চাদর, জামা থেকে কিছু অংশ ছিঁড়ে শরীরের ওপরের অংশ ঢেকে নিয়েছেন। মাথা তাদের কাকের বাসা না ব্যাঙের ছাতার মতো লাগছে, তা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

শুধু হালাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞান থাকাটাই গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট নয়। মৌলিক হালাল-হারামের বিধান তো সাধারণত প্রায় সব মুসলিমেরই জ্ঞান আছে, তবু তারা বিভিন্ন নিষিদ্ধ কাজে স্বেচ্ছায় জড়িয়ে পড়ে এবং জেনে-শুনে জাহানামের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই সকল কর্মের নিয়ন্ত্রক মহান আল্লাহর ভয় হৃদয়ে থাকা অপরিহার্য। আরো সুন্দরভাবে বলা যেতে পারে, সবার মধ্যে একটি জীবন্ত হৃদয় থাকা দরকার, যার কাজ মুমিনকে হালালের সীমায় বেঁধে রাখা এবং হারাম থেকে দূরে রাখা। এ ধরনের হৃদয় কেবল ঈমানের উর্বর মাটিতেই জন্মায়।

ধীন ও শরিয়ার পরিপূর্ণ জ্ঞান যার লাভ হয়েছে, অন্তরও যার জাগ্রত, তার তো সোনায় সোহাগ। সকল কল্যাণ এখন তার হাতের মুঠোয়। বর্ণিত হয়েছে—

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعْدِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِنْ قَلْبِهِ يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ

আল্লাহ যখন তাঁর কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন তার জন্য ভেতর থেকে একজন পরামর্শদাতা তিনি সৃষ্টি করে দেন, যে তাকে (ভালো কাজে) আদেশ করে এবং (মন্দ কাজ থেকে) নিষেধ করে।<sup>[১]</sup>

[১] আয়-যুহদ, আহমাদ ইবনু হাস্বল : ১৭৬৮; আল-ইবানাতুল কুবরা, ইবনু বাত্তা : ১৭২৩; হিলইয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৬৪; বর্ণনাটির সনদ সহিহ।

এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী নাকি ইমাম ইবনু সিরিন রাহিমাহুল্লাহর উক্তি, এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়। হাফিয় ইরাকি রাহিমাহুল্লাহ দাইলামির সূত্রে এটাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি এর সনদকে হাসান বলেছেন। [তাখরিজুল ইহহয়া, ইরাকি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১২] তবে এ হাদিসটির সনদে অনেক কথা আছে। এটার সনদকে হাসান বলাটা মুশকিল। তাছাড়াও হাদিসটির সনদে ইবনু সিরিন রাহিমাহুল্লাহ উম্মু সালামা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনার কথা উল্লেখ আছে; অথচ হাদিস—বিশারদগণ বলেছেন, উম্মু সালামা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেকে ইবনু সিরিন রাহিমাহুল্লাহর হাদিস শোনাটা প্রমাণিত নয়। এছাড়াও এতে আরো সমস্যা আছে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাস্বল রাহিমাহুল্লাহ সহিহ সনদে এটা ইবনু সিরিন রাহিমাহুল্লাহ বস্ত্ব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু নুয়াইন আসবাহানি রাহিমাহুল্লাহও অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তাই সার্বিক দিক বিবেচনায় এখানেই বিশুধ্য মত এটাই যে, এ উক্তিটি ইমাম ইবনু সিরিন রাহিমাহুল্লাহর, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

সালাফদের থেকে বর্ণিত দুটার মাধ্যমে আমরা আমাদের এই রচনাটি এখানেই  
শেষ করছি—

اللَّهُمَّ أَغْنِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَبِطَاعِتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ، وَبِفَضْلِكَ عَمِّنْ سِوَاكَ

আল্লাহ-হুম্মা আগনিনা- বিহালা-লিকা ‘আন হার-মিক, ওয়া বিত্ত-‘আতিকা ‘আন  
মা’সিয়াতিক, ওয়া বিফাদ্বলিকা ‘আশ্বমান সিওয়া-ক।

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে আপনার হালাল দ্বারা আপনার হারাম  
থেকে, আপনার আনুগত্য দ্বারা আপনার অবাধ্যতা থেকে এবং আপনার অনুগ্রহ  
দ্বারা আপনি-ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী করুন [১]

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيْ تَوْلَأْنَ هَدَانَا اللَّهُ...  
.....

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদেরকে এ পথ দেখিয়েছেন।  
আর আমরা কিছুতেই পথ পেতাম না, যদি না আল্লাহ আমাদের পথ  
দেখাতেন [২]

.....




---

বাণী নয়। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

[১] কান্যুল উম্মাল, ৫০৩২, আল জামিউল কাবির, খণ্ড : ১৪; পৃষ্ঠা : ৩৪৫

[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ৪৩



## ଲେଖକ ପରିଚିତ

ଡ. ଇଉସୁଫ ଆବୁଲ୍ଲାହ ଆଲ କାରଯାବି। ୧୯୨୬ ଖ୍ରୀଟୀକେ ମିଶରେର ସାଫାତ ତୁରାବ ନାମକ ଗ୍ରାମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ। ତାର ବୟସ ଯଥନ ମାତ୍ର ୨ ବର୍ଷ, ତଥନ ତାର ବାବା ମାରା ଯାନ। ଏରପର ତିନି ଲାଲିତ-ପାଲିତ ହନ ଚାଚାର ତତ୍ତ୍ଵବଦ୍ଧାନେ। ୯ ବର୍ଷ ବୟସେ ସମ୍ପନ୍ନ କରେନ ହିଫ୍ୟୁଲ କୁରାଅନ। ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚତର ପଡ଼ାଶୋନା କରେନ ମିଶରେର ଜାମେ ଆୟହାରେ।

ଡ. ଇଉସୁଫ ଆଲ କାରଯାବିର ଜୀବନ ଛିଲ ବଡ଼ଇ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ! ରଚନା କରେଛେ ଦେଡ଼ ଶତାଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବିଶ୍ୱର ଖ୍ୟାତିମାନ ସବ ଶିକ୍ଷାପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ ତିନି ନିଯୋଜିତ ଛିଲେନ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରଧାନ ହିସେବେ। ଗଡ଼େଛେନ ବେଶ କରେକଟି ଜ୍ଞାନଚର୍ଚାକେନ୍ଦ୍ର। ଜେଲେ ଗିଯେଛେନ ଅସଂଖ୍ୟବାର। ପୂର୍ବସୂରି ଆଲିମଦେର ମତୋ ହେଁବେଳେ ନିର୍ବାସିତ। ମିଶର ଛେଡ଼େ ଆଶ୍ରଯ ନିଯେଛେନ କାତାରେ। ତିନି ଛିଲେନ ଏକଜନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଇସଲାମ ବାସତବାୟନେର ସୃଦ୍ଧିକ୍ରମୀୟ।

ତାର ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟୋଗ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳି—ହାଲାଲ-ହାରାମ, ଫିକହ୍ୟ ଯାକାତ, ଇସଲାମି ପୁନର୍ଜାଗରଣ, ଇସଲାମେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିମୋଚନ ଇତ୍ୟାଦି।

୨୦୨୨ ସାଲେର ୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏହି ମହାନ ମନୀଷୀ ପାଡ଼ି ଜମିଯେଛେନ ନା-ଫେରାର ଦେଶେ।  
ଗ୍ରାହିମାହୁଲ୍ଲାହ!

~~~~~

মুসলিম হিসেবে হালাল-হারামের ব্যাপারে আমাদের সর্বোচ্চ সতর্কতা আবশ্যিক। অবশ্য কিছু বিষয়ের হালাল-হারাম হওয়া নিয়ে কখনো কখনো বেশ দ্বন্দ্বে পড়ে যাই আমরা। এটা হালাল হলে ওটা হারাম কেন, এভাবে হারাম হলে ওভাবে হালাল কেন—এ জাতীয় নানা প্রশ্ন আমাদের মাথায় ঘূরতে থাকে। দিশেহারা হয়ে পড়ি আমরা। অথচ কোনো কিছুর হালাল কিংবা হারাম সাধ্যন্ত হওয়ার যে সামান্য কিছু মূলনীতি রয়েছে, সেগুলো জানা থাকলে এ অবস্থা থেকে অনেকাংশেই বেঁচে থাকা সম্ভব।

একজন মুসলিমের জন্য কোন কাজটি হালাল আর কোনটি হারাম, কোন কাজ এক জায়গায় জায়িয় হলেও অন্য জায়গায় বা অন্য সময়ে নাজায়িয়, কোনো কাজ জায়িয় এবং নাজায়িয় হওয়ার কারণগুলোই বা কী? ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক-জীবনস্থনিষ্ঠ এমন অসংখ্য বিষয়ের বাস্তবধর্মী আলোচনা নিয়ে ড. ইউসুফ আল-কারয়াবি রাহিমাহ্মাহর বিশ্বজুড়ে সাড়জাগানো গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো ‘হালাল-হারামের বিধান’ নামে।



বিক্রয়কেন্দ্র :

১৩/১, ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০১৮০৯-৮০০-৯০০

মন্ত্রালীন প্রকাশন